দুই পর্ব একত্রে প্রথম সংস্করণ
জুলাই, ১৯৫৯ ॥ আষাঢ়, ১৩৬৬

প্রকাশক
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রাকর
প্রিন্ট-ও-গ্রাফ
৯-সি ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা (দ্বিতীয় পর্ব)

ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা

[ভোল্গা সে গঙ্গা]

অনুবাদকমণ্ডলী

অসিত সেন, সুধীর দাস এবং মৃণাল চৌধুরী

ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ

মানব-সমাজ আজ যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে সেখানে পৌঁছাতে প্রারম্ভিক সময় থেকে আজ পর্যন্ত বড় বড় সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে তাকে আসতে হয়েছে। আমার লেখা 'মানব-সমাজ' গ্রন্থে মানব-সমাজ-প্রগতি সংক্রান্ত বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেছি। বিষয়টি সহজভাবেও লেখা যায় যাতে প্রগতির ধারা অনায়াসেই বুঝে নেওয়া সম্ভব। সেই কারণেই 'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা' রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। ভারতীয় পাঠকদের সুবিধার জন্য আলোচ্য গ্রন্থে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছি। মিশরীয়, সিরিয়ানী বা সিন্ধুজাতির বিকাশ ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির সহস্রাধিক বছর আগে ঘটে গেছে। সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে লেখক-পাঠক উভয়েরই বিস্তর ঝামেলা।

প্রত্যেক যুগের একটি করে প্রামাণিক দলিল চিত্রণে প্রয়াসী হয়েছি। তবে প্রাথমিক প্রচেষ্টায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। যদি আমার প্রয়াস আগামী দিনের লেখকের ত্রুটিহীন রচনার সহায়ক হয় তবে নিজেকে সার্থক মনে করব।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

সাত-আট মাসে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া লেখকের খুশী হবার মতো ব্যাপার কিন্তু তার চাইতেও সন্তোষজনক ব্যাপার হল —সনাতনপন্থী জ্ঞানপাপীদের অসংযত বচনামৃত, যেগুলো কখনও কখনও প্রকাশ পেয়েছে গালি-গালাজের মাধ্যমে। জনাকয়েক সজ্জন সংযমরক্ষার ব্যর্থপ্রয়াসে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় নেমেছেন। তাঁরা আশা করে বসে আছেন যে, বর্তমান লেখক তাঁদের লেখার প্রতিবাদ জানাতে কলম ধরবেন। যদিও উক্ত সমালোচকদের বিরামহীন লেখনীকে অচল করা আমার দ্বারা সম্ভব নয় তবুও দু-একটি কথা জবাব হিসাবে জানাতে হচ্ছে।

এই গ্রন্থের প্রতিটি কাহিনীর পৃষ্ঠপটে রয়েছে প্রাসঙ্গিক যুগ সম্পর্কিত গুরুত্ববাহী বস্তুনিচয়, যার তালিকায় আছে —দুনিয়ার কতই না ভাষা, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, মাটি-পাথর-তামা-পেতল লোহার ওপর খোদাই করা সাংকেতিক লিপি অথবা সাহিত্য এবং অলিখিত গীত-কাহিনী-রীতি-রেওয়াজ··· ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রন্থ-রচনাকালে লেখকের ইচ্ছা ছিল এবং যে-ইচ্ছা এখনও সজীব তা'হল গৃহীত তথ্যপ্রমাণের প্রামাণিকতা গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজন করার। কিন্তু ঐ পরিকল্পনার ব্যাপকতা ও বিশালতা এবং সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের অপ্রতুলতার কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত হাত গুটিয়ে নিতে হয়েছে। এ ধরনের বইতে মামুলি একটা পরিশিষ্ট জুড়ে দিলেই দায়মুক্ত হওয়া যায় না। আর এটাও মনে হয়েছে, ঐ ধরনের পরিশিষ্টের কলেবর মূল গ্রন্থের আয়তনের তুলনায় অনেক বড় হবে। বর্তমান সংস্করণে পরিবর্তন করা হয়েছে যৎসামান্য, এক ঝলকে কোনো রকমে কাজ সেরে নিয়েছি। ইচ্ছে ছিল, প্রতিটি কাহিনীর সঙ্গে একটি রঙীন চিত্র দেবার কিন্তু যুদ্ধকালীন দুঃসময়ে সেটাও সম্ভব হল না।

কিতাব মহল

প্রয়াগ

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

বাঙলা অনুবাদ প্রসঙ্গে

বন্ধুবর রাহুল সাংকৃত্যায়নের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী গ্রন্থ 'ভোলগা সে গঙ্গা' প্রায় সকল ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বহির্ভারতেও ইংরাজী, বর্মী ভাষায় এর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

'ভোলগা সে গঙ্গা' গ্রন্থখানির প্রথম আবেদন এর আখ্যানবস্তু। সমগ্র গ্রন্থটি ছোট ছোট গল্প বা কাহিনী আকারে লেখা কিন্তু এই কাহিনী বা আখ্যানের পিছনে একটি ব্যাখ্যাও রয়েছে। সে ব্যাখ্যা বিরাট পটভূমিকার ওপর ঐতিহাসিক সত্য বস্তুর। প্রায় ছয় হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দ কালে ভারতের সুদূর উত্তর পশ্চিমে দক্ষিণ-বাহিনী ভোলগার তীরে অরণ্যতুষারসমাচ্ছন্ন পরিবেশে যে মানবগোষ্ঠীর পদপাত শোনা গিয়েছিল, তাঁদেরই আবাস, জীবন, প্রেম ও ভালোবাসা নিয়ে এ মহাগ্রন্থের প্রথম দৃশ্যপট উত্তোলিত হয়। তারপর সেই মানুষ ক্রমে মধ্য ভোলগা তটে অগ্রসর হয়ে এল, তার সমাজ বিকাশিত হয়ে উঠল, ক্রমে ক্রমে তার ভাষাও বিন্যস্ত হয়ে এল। ক্রমে এই হিন্দী-স্লাভ ভাষাভাষী মানুষ আরও অগ্রসর হয়ে এল, তরঙ্গের পর তরঙ্গে তারা মধ্য এশিয়া অতিক্রম করে গেল —পামীর, উত্তর কুরুতে তাদের বসতি হল, এ বার জন্ম হল হিন্দী-ইরাণীয় ভাষার। ক্রমে তারা স্বাত উপত্যকায় পৌঁছে গেল, এ বার সারা গান্ধার জুড়ে তাদের আবাস —হিন্দু-আর্য ভাষা তখন জন্ম নিয়েছে, সম্ভবত সেখানেই ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল। ক্রমে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে এই আর্যদের বসতি স্থাপিত হয়েছে।

এইভাবে ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে কাহিনীর পর কাহিনীতে বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে। গ্রন্থের কাহিনীগুলো কাহিনী হলেও নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়। সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে গল্পগুলি ধারাবাহিকভাবে রচিত হয়েছে। তাই ইতিহাস আর সমাজ-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বকে কোথাও এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। কাহিনীতে কায়ালাভ করে ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই আরও বাস্তব ও সজীব হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়গুলি গল্পচ্ছলে অনুধাবন করার পক্ষে সুবিধাজনক, তাই এ গ্রন্থের মূল্য অনস্বীকার্য।

'ভোল্‌গা সে গঙ্গা'র প্রথম কয়েকটি কাহিনীতে বাস্তব তথ্য-প্রমাণের স্বাভাবিক অপ্রতুলতা রয়েছে কারণ ভোল্‌গা থেকে মানবের প্রাচীন গোষ্ঠীসমূহের ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশে পৌঁছাবার সময়টা প্রাগৈতিহাসিক। নিশা, দিবা, অমৃতাশ্ব, পুরুহুত প্রভৃতি রচনায় রাহুল প্রধানত লুইস মর্গানের 'এন্‌সেন্ট সোসাইটি', এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', রবার্ট ব্রিফলের 'দি মাদার্স' প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ খ্যাতনামা সমাজ-বিজ্ঞানীদের অনুমোদিত তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেছেন, তবে এখানেও তাঁর স্বকীয়তা অস্বীকার করা যায় না। হয়ত এ কথা সত্য যে, প্রকৃতপক্ষে ভূমিকা-লেখকও বহুতর ক্ষেত্রে রাহুলের মতামতকে সম্পূর্ণত স্বীকার করেন না —তার জন্য, যে উপায় এবং যে দৃষ্টি নিয়ে রাহুল এই সুদীর্ঘ প্রাগৈতিহাসিক কাল অধ্যয়ন করেছেন তার মূল্য তুচ্ছ হতে পারে না।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাহিনীগুলি প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের —পুরুধান থেকে প্রবাহণ পর্যন্ত কাহিনীগুলিতে রাহুল বেদ, ব্রাহ্মণ, মহাভারত, পুরাণ ও বৌদ্ধভাষ্য অট্‌ঠকথার সাহায্য নিয়েছেন। এর মধ্যে সুদাস সম্পূর্ণভাবে ঋগ্বেদের ওপর নির্ভর করে লেখা। প্রবাহণের আধার ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ ও তার সঙ্গে অট্‌ঠকথা। এই অংশে খৃষ্টপূর্ব দুই হাজার বৎসর থেকে সাত শত খৃষ্টপূর্ব বৎসর পর্যন্ত তেরশ' বছরের বর্ণনা রয়েছে।

তারপর পাঁচশ' খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে গুপ্তযুগের প্রাক্কাল অবধি কাহিনীগুলোর মোটামুটি আধার হচ্ছে বৌদ্ধশাস্ত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরানন্দ এই ক'টি গ্রন্থ —এ ছাড়া বিভিন্ন গ্রীক পর্যটকের ভ্রমণকথা, জয়সওয়াল-এর 'হিন্দু পলিটি' ও অন্যান্য ইতিহাস। তদুপরি প্রায় সমস্ত সংস্কৃত নাটক, উইণ্টারনিট্‌জের 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' রিজ্‌ ডেভিজ-এর 'বৌদ্ধ ভারত' এ পর্যায়ের কাহিনী রচনায় বিশেষ-ভাবে সহায়ক হয়েছে। এর পর সুপর্ণ যৌধেয় কাহিনীতে এসে গুপ্তযুগের বিবরণ পাওয়া গেল —এর বহু বিবরণ গুপ্তযুগের পুরালেখসমূহ হতে আহৃত হয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞানম্‌-শকুন্তলম্‌ থেকেই গৃহীত, তা'ছাড়া চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন-এর ভ্রমণবৃত্তান্তও কাজে লেগেছে।

এর পরের আখ্যান দুর্মুখ মূলত হর্ষচরিত,কাদম্বরী এবং হি উয়েন-সাঙ এবং ইৎসিঙ-এর বিবরণাদির ওপর নির্ভরশীল, তেমনি চক্রপাণির ঐতিহাসিকতারও মোটামুটি প্রমাণ নৈষধ, খন্দনখণ্ডখাদ্য এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু লেখমালা। তারপর নূরদীন থেকে গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ত্রয়োদশ থেকে বিংশ শতাব্দী অবধি ঐতিহাসিক প্রামাণিকতার নিদর্শন আরও স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, এ গ্রন্থের অধিকাংশ আখ্যানের পাত্রপাত্রীই সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তবে তাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা পূর্বাপর ঐতিহাসিক সময়সূত্রে গ্রথিত।

সর্বশেষে মূল হিন্দী থেকে অনুবাদ করার জন্য বন্ধুবর শ্রী সুধীর দাস ও শ্রীমান্ অসিত সেন যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানানোই যথেষ্ট নয় তাঁদের সফলতাকেও স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। আশা করি, অন্যান্য ভাষায় 'ভোল্‌গা সে গঙ্গা'র অনুবাদ যেরূপ সমাদার লাভ করেছে, বঙ্গানুবাদেও ততটা বা তার চেয়ে বেশী সমাদর লাভ করবে। এই গ্রন্থ প্রকাশে শ্রী গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বন্ধুবর শ্রী সুবোধচন্দ্র চৌধুরী, শ্রী কমল সরকার এবং শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের সাহায্য এবং সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিমধিকমিতি—

শ্রী মহাদেবপ্রসাদ সাহা

নিশা

দেশ : ভোল্‌গা নদীর তীর ।। কাল ৬০০০ খৃষ্টপূর্ব

বেলা দ্বিপ্রহর, অনেক দিন পরে আজ সূর্যের দেখা পাওয়া গেল। এখন দিনগুলি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তবুও এ সময় রৌদ্রের তীব্রতা নেই; মেঘঝঞ্ঝাহীন, তুষার ও কুয়াসামুক্ত সূর্যের সুদূরবিস্তারী কিরণ দেখতে মনোহর —তার স্পর্শ এক আনন্দানুভূতির সঞ্চার করে। আর চারিদিকের দৃশ্য ? ঘন নীল আকাশের নীচে পৃথিবী রয়েছে কর্পূরের মতো সাদা তুষারে ঢাকা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর তুষারপাত না হওয়ার জন্য পূর্বের দানা-দানা তুষারকণাগুলি কঠিন জমাট হয়ে গেছে। এই হিমবসনা ধরিত্রী দিগন্তপ্রসারী নয়, বরং উত্তর থেকে দক্ষিণে কয়েক মাইল পর্যন্ত চলে গিয়েছে আঁকাবাঁকা রূপালী রেখার মতো, যার দু'ধারে পাহাড়ের ওপর নিবিড় অরণ্যরেখা। আসুন, এই বনরাজিকে আরও কাছে গিয়ে দেখি। এই তরুশ্রেণীর মধ্যে মূলত দুই ধরনের বৃক্ষাদি আছে। একটির নাম ভূর্জ —শ্বেত বল্কলধারী এবং বর্তমানে নিষ্পত্র; অপরটি পাইন —উত্তুঙ্গ ও ঋজু। শাখাগুলি সমকোণে ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। সূচ্যগ্র পাতাগুলি হরিৎ বর্ণ —কোনোটা ঘন গাঢ় সবুজ আর কোনোটা ফিকে। তুষারের অজস্র দান থেকে গাছগুলি নিষ্কৃতি পায়নি, গাছের কোণে তুষারের স্তূপ সাদা কালোয় রূপ-রেখা সৃষ্টি করে কার যে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে! এ ছাড়া চারিদিকে ভয়ঙ্কর নীরবতার অখণ্ড রাজত্ব বিদ্যমান। কোনোদিক থেকেই শোনা যায় না ঝিঁঝির ঝঙ্কার, পাখীর কাকলী বা পশুর কোলাহল।

আসুন, পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরস্থিত পাইন গাছের ওপর উঠে চারিদিকটা দেখি। হয়ত ওখানে গেলে বরফ, জমি ও পাইন ছাড়া আরও কিছু দেখতে পাওয়া যেতে পারে। বড় বড় বৃক্ষরাজির দিকে তাকিয়ে মনে হতে পারে যে এখানে কি কেবল এই রকম গাছই জন্মায়? এই জমিতে কি ছোট ছোট চারা গাছ বা ঘাস জন্মায় না? কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা কোনো মতামত দিতে পারি না। শীত প্রায় শেষ হয়ে এল। এই বড় বড় গাছের গুঁড়িগুলি কতখানি বরফের স্তূপে ঢাকা পড়েছে তা বলা শক্ত, আমাদের কাছে মাপবার কিছু নেই। এই বরফের স্তূপ আট হাত অথবা তার চেয়েও বেশী হতে পারে। বরফ এ বছর বেশী পড়েছে —এ অভিযোগ সকলেরই।

পাইনের ওপরে এসে কি দেখা যাচ্ছে? দেখছি সেই বরফ, সেই বনরাজি আর সেই উঁচু-নীচু পার্বত্য-ভূমি। হ্যাঁ, পাহাড়ের অপর পারে এক জায়গায় ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে! জনপ্রাণী-শব্দশূন্য বনভূমির মধ্যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। আসুন ওখানে গিয়ে নিজেদের কৌতূহল মিটিয়ে আসি।

ধোঁয়া অনেক দূর। স্বচ্ছ মেঘশূন্য আকাশের পটভূমিতে কত কাছেই না মনে হচ্ছিল। যাইহোক, হাঁটতে হাঁটতে আমরা তার কাছে পৌঁছে গেছি, গন্ধ পাচ্ছি আগুনে পোড়া চর্বি আর মাংসের। শব্দও শোনা যাচ্ছে—শোনা যাচ্ছে শিশুদের কলরব। আমাদের খুব সাবধানে শ্বাস বন্ধ করে পা টিপে টিপে যেতে হবে। না হলে ওরা জানতে পারবে! জানতে পারলে—কে জানে, ওরা কিম্বা ওদের কুকুরগুলো কি রকম অভ্যর্থনা করবে!

হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই ছোট ছোট শিশুরা রয়েছে—এক থেকে আট বছরের মধ্যে এদের বয়স! একটি ঘরের মধ্যেই জনা ছয়েক ছোট ছেলেমেয়ে। একে ঠিক্ ঘর বলা চলে না—স্বাভাবিক পর্বতগুহা মাত্র। এই গুহাগৃহের পাশে ও পেছনে কতদূর পর্যন্ত অন্ধকার বিস্তৃত জানি না, আর জানার চেষ্টা করাও উচিত নয়! পূর্ণবয়স্ক একটি বৃদ্ধাকে দেখা যাচ্ছে—তার জটাধরা ধোঁয়াটে শনের মতো সাদা চুলগুলি এলোমেলোভাবে মুখে এসে পড়ছে, বুড়ি হাত দিয়ে মাঝে মাঝে মুখ থেকে সেগুলি সরিয়ে দিচ্ছে। ভুরুর চুলগুলিও পেকে সাদা রঙ ধরেছে। সাদা মুখের চামড়া কুঁচকে জায়গায় জায়গায় ঝুলে পড়েছে, গুহার ভেতরে আগুনের তাপ ও ধোঁয়া দুই আছে—বিশেষ করে যেখানে আছে শিশুগুলি ও তাদের দিদিমা। মাতামহীর দেহে কোনো আবরণ নেই, নেই কোনো কাপড়-চোপড়ের বালাই! শীর্ণ কঙ্কালসার হাত দুটি পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে আছে, চোখ কোটরাগত, ফিকে নীল চোখের দুটি তারা জ্যোতিহীন, কিন্তু মাঝে মাঝে ঝকমক করে ওঠে, এতে মনে হয় সেগুলি এখনো একেবারে নিষ্প্রভ হয়নি। কান দুটি তো খুবই সজাগ। মনে হচ্ছে দিদিমা যেন শিশুদের কথা মন দিয়ে শুনছে। এইমাত্র একটি শিশু চীৎকার করে উঠল, দিদিমা সেদিকে তাকাল। এক বছর ও দেড় বছরের দুটি শিশু, মাথায় দু'জনেই সমান। দু'জনেরই চুল পিঙ্গল বর্ণ। এদের চুলের রঙ বৃদ্ধার চেয়ে আরো সুন্দর ও উজ্জ্বল। এদের নধরকান্তি দেহ, দুধে আলতায় রঙ, বড় বড় চোখ, ঘন নীল তারা। ছেলেটি চীৎকার করে কাঁদছে, মেয়েটি দাঁড়িয়ে চুষিকাঠির মতো একটি ছোট হাড় চুষছে।

দিদিমা কম্পিত স্বরে ডাকল, "অগিন! আয়। এখানে আয় অগিন! এই যে তোর দিদি এখানে।"

অগিন উঠল না। একটি বছর আটেকের ছেলে এসে অগিনকে কোলে করে মাতামহীর কাছে নিয়ে গেল। এই ছেলেটিরও চুল অন্যদের মতো উজ্জ্বল স্বর্ণাভ

তবে কিছু বেশী লম্বা এবং জট পাকানো। দেহের বর্ণ গৌর, তবে শিশুদের মতো পরিপুষ্ট নয়। গায়ের এখানে ওখানে ময়লা জমে আছে। ছেলেটি ছোট শিশুটিকে এনে মাতামহীর কাছে দাঁড় করিয়ে বলল, "দাদী! রোচনা হাড় কেড়ে নিয়েছে, অগিন তাই কাঁদছে।"

ছেলেটি এই বলে চলে গেল। মাতামহী তার শীর্ণ হাতে শিশুটিকে তুলে নিল। অগিন তখনও কাঁদছিল। তার চোখের জলের ধারায় গালের ময়লা কেটে গিয়েছে, সেখানে উঁকি মারছে গৌরবর্ণের ওপরে সোনালী রেখা। মাতামহী অগিনের মুখে একটি চুমু খেয়ে বলল, "অগিন! কেঁদো না, আমি রোচনাকে মারছি।"

এই বলে মাতামহী খালি হাতটা চর্বিমাখা মাটির ওপর আঘাত করল। অগিনের কান্না তখনও থামেনি, চোখের জলও ফুরোয়নি। মাতামহী তার ময়লা হাত দিয়ে অগিনের মুখ মুছিয়ে দিলে—তার হাতের ময়লাতে শিশুর রক্তাভ গাল কালো হয়ে গেল। অগিনকে শান্ত করার জন্য মাতামহী তার নিজের শুকনো স্তনটি মুখে তুলে দিল। অগিনের কান্না বন্ধ হল, সে মাতামহীর স্তন চুষতে লাগল। এই সময় বাইরে কথাবার্তা শোনা গেল। শিশুটি শুকনো স্তন ছেড়ে সেইদিকে তাকাল।

কার যেন মিষ্টি গলার স্বর—"অ-গি-ই-ন!"

অগিন আবার কেঁদে উঠল। দুটি স্ত্রীলোক একটি কোণের দিকে তাদের মাথা থেকে কাঠের বোঝা ফেলে একজন রোচনার কাছে অপরজন অগিনের কাছে ছুটে গেল। ক্রন্দনরত অগিন আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠল "মা" "মা" বলে। মা তার ডান হাতকে খালি রেখে ডানদিকের স্তনের ওপর থেকে লোমযুক্ত বলদের চামড়ার আবরণটি খুলে ফেলল। শীতের দিনে খাওয়া-দাওয়া ভালো নেই বলে তরুণীর দেহ যথেষ্ট মাংসল নয়, কিন্তু সৌন্দর্যে অসাধারণ। ময়লাহীন আরক্তিম গালের উজ্জ্বল আভা, জটাবিহীন সোনালী কেশদাম, তন্বী দেহ, পরিপুষ্ট বুকের ওপর গোল গোল শ্যামল-মুখ স্তন, কৃশ কটি, আকর্ষণীয় নিতম্ব, পরিপুষ্ট পেশল জানু, পরিশ্রমে গড়ে ওঠা পায়ের ডিম। সেই অষ্টাদশী তরুণী অগিনকে দু'হাতে তুলে তার মুখ চোখ গাল অজস্র চুমুতে ভরে দিল। অগিন কান্না ভুলে গেল। তার দুটি রক্তাভ ঠোঁটের আড়ালে কচি দাঁতগুলি চিক্-চিক্ করছে, চোখ দুটি আধ-বোঁজা, গালে টোল পড়েছে। একটি বৃষভ-চর্মের ওপর বসে তরুণী তার কোমল স্তনটি তুলে দিল অগিনের মুখে। এই সময় অপর তরুণীটিও রোচনাকে নিয়ে তার কাছে উপবেশন করল, দেখলেই বোঝা যায় ওরা দু'জন সহোদরা।

২

গুহার মধ্যে এদের নিভৃত গল্প-গুজনে ব্যস্ত রেখে আমরা বাইরে এসে দেখছি বরফের ওপর চামড়ার আবরণে আচ্ছাদিত অনেকগুলি পায়ের চিহ্ন। আসুন, আমরা ওদের এই পদচিহ্ন দ্রুত অনুসরণ করি। পায়ের সারি গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের ওপাশের জঙ্গলে।

আমরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু চলমান পায়ের রেখা বহন করে নিয়ে চলেছে টাট্‌কা পায়ের ছাপ। আর—আমরা চলেছি শুভ্র তুষারক্ষেত্র অতিক্রম করে, আবার কখনও বা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে এসে পড়েছি অন্য কোনো হিমক্ষেত্রে—সর্বশেষে আমাদের নজরে পড়ল একটি বৃক্ষলতাহীন পাহাড়ের ওপরে। এখানে নীচে থেকে ওঠা শুভ্র হিমরাশি গিয়ে মিশেছে নীল নভোমণ্ডলে—আর নীলাকাশের পটভূমিতে মানবমূর্তি দেখা যাচ্ছে, এই মানুষের সারি গিয়ে অন্তর্হিত হচ্ছে পাহাড়ের প্রান্তে। মূর্তিগুলির পেছনে যদি নীলাকাশ না থাকত তা'হলে আমরা কিছুতেই মানুষগুলিকে দেখতে পেতাম না। ওদের শরীর ঢাকা আছে বরফের মতোই সাদা বৃষচর্মে; তাদের হাতের অস্ত্রগুলিও যেন ধবধবে সাদা। এই পরিব্যাপ্ত শ্বেত তুষারের ক্ষেত্রে আন্দোলিত মূর্তিগুলিকে কি করে চিনে ওঠা যায়!

আরো কাছে গিয়ে দেখা যাক। সবার আগে রয়েছে একজন স্ত্রীলোক, বলিষ্ঠ তার দেহ—বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশের মধ্যে। তার নগ্ন দক্ষিণ বাহুর দিকে তাকালেই বোঝা যায় সে খুব বলবতী। মাথার চুল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি আমাদের গুহায় দেখা পূর্বোক্ত তরুণীদ্বয়ের মতোই—তবে আকারে বড়। বাঁ হাতে একটি ছুঁচলো তিন হাত লম্বা ভূর্জ গাছের মোটা কাঠ। ডান হাতে কাঠের হাতলে দড়ি দিয়ে বাঁধা পাথরের কুঠার, শিকারের জন্য ঘষে ঘষে শান দেওয়া হয়েছে, তার পেছনে রয়েছে চারজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক। একজন পুরুষের বয়স মেয়েটির চেয়ে কিছু বেশী, আর বাকী সকলেই চৌদ্দ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে। বয়স্ক পুরুষটির মাথার চুল লম্বা এবং রঙ আর সকলের মতো স্বর্ণাভ-শুভ্র, সারা মুখ দাড়ি গোঁফে ঢাকা। পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকটির মতো শরীরের গঠন বলিষ্ঠ এবং তারও কাছে স্ত্রীলোকটির মতোই দুটি অস্ত্র আছে। বাকী তিনজন পুরুষের মধ্যে দু'জনের মুখ দাড়ি-গোঁফে ঢাকা, কিন্তু বয়স কম। স্ত্রীলোক দুটির মধ্যে একজনের বয়স বাইশ অপর জন ষোড়শী—হয়ত বা আরো কম। আমরা আগের গুহায় মাতামহীকে দেখেছি। এদের সকলকে মিলিয়ে দেখলে মনে হয় যেন এরা সকলেই একই ছাঁচে গড়া। হাতে কাঠ, হাড় ও পাথরের অস্ত্রাদি এবং তাদের অভিযান দেখে মনে হয়, তারা যেন যুদ্ধে যাচ্ছে।

পাহাড় থেকে নামার পথে প্রথম স্ত্রীলোকটি হচ্ছে মা। সে বাঁ দিকে ঘুরল, আর সকলে তাকে নীরবে অনুসরণ করল। বরফের ওপর দিয়ে চলার সময় তাদের চামড়ায় ঢাকা পায়ের কোনো শব্দ হচ্ছিল না। সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া একটি পাহাড়—তার চারপাশে কতকগুলি টিলা। শিকারীরা এবার তাদের গতি একেবারে কমিয়ে দিল। তারা সতর্কতার সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, তারপর অতি ধীরে সন্তর্পণে দূরে দূরে পায়ের পাতা ফেলে টিলার দিকে এগোতে লাগল। মা সকলের আগে গুহামুখে গিয়ে পৌঁছাল। গুহার বাইরের সাদা বরফের দিকে ভালো করে তাকাল—সেখানে কোনো

কিছুর পায়ের চিহ্ন পড়েছে কি-না ? দেখল কোনো চিহ্ন নেই। সে একলাই গুহার মধ্যে প্রবেশ করল ; কয়েক পা এগিয়ে গুহার একটি বাঁক দেখা গেল, আলো খুবই কম। কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে অন্ধকারকে চোখ-সওয়া করে নিল, তারপর এগলো। সেখানে দেখতে পেল, তিনটি ধূসর রঙ-এর ভাল্লুক —বাবা, মা ও তাদের বাচ্চা নীচের দিকে মুখ করে নিশ্চলভাবে পড়ে আছে —মরে গিয়েছে কি-না অনুমান করা যায় না। জীবনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

মা পা টিপে টিপে ফিরে এল। মায়ের উৎফুল্ল মুখ দেখে পরিবারের আর সকলেই ব্যাপারটা আন্দাজে বুঝে নিল। বুড়ো ও কড়ে আঙুল চেপে মা তিনটি আঙুল তুলে দেখালে। তারপর মা আবার গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। অস্ত্রাদি বাগিয়ে তার পিছনে চলল দু'জন পুরুষ। বাকি সবাই দমবন্ধ করে সেইখানেই অপেক্ষা করতে লাগল। গুহার মধ্যে গিয়ে মা দাঁড়াল মরদ ভাল্লুকটির কাছে, আর দু'জন পুরুষের মধ্যে একজন মাদী ভাল্লুকটির কাছে, অপরজন বাচ্চাটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তিনজনে একই সঙ্গে ভাল্লুকের উদরে সুতীক্ষ্ণ কাঠের বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত জখম করল। জন্তুগুলো আর নড়াচড়া করবার অবসর পেল না, তাদের শীতকালের ছ'মাস নিদ্রাভঙ্গের তখনও একমাস বাকি। কিন্তু শিকারীদের পক্ষে তখন তা জানার উপায় ছিল না। তাদের তাই সতর্ক হয়েই কাজ করতে হয়। ডাণ্ডার তীক্ষ্ণ ফলাটি আরো তিন চার বার সজোরে আঘাত করে ভাল্লুকগুলিকে উল্‌টে দিল। তারপর নির্ভয়ে ভাল্লুক তিনটির পা ও মুখ ধরে বাইরে টেনে আনল। সকলেই খুশী হয়েছে, এতক্ষণে তাদের প্রাণ-খোলা হাসি ও গলা-ছেড়ে চীৎকার শোনা গেল।

বড় ভাল্লুকটিকে চিৎ করে ফেলে মা চকমকি পাথরের ছুরিটা চামড়ার পোষাক থেকে বার করে পুনরায় ভাল্লুকটির প্রথম আঘাত স্থানের ক্ষত থেকে সুরু করে পেটের চামড়টা চিরে ফেললে। পাথরের ছুরি দিয়ে এত পরিষ্কারভাবে চামড়া চেরা খুবই অভ্যস্ত ও মজবুত হাতের কাজ। তারপর মা নরম হৃৎপিণ্ড থেকে একখণ্ড মেটে কেটে নিজের মুখে পুরল এবং আর একখণ্ড সর্বকনিষ্ঠ ছেলেটির মুখে দিল। সবাই ভাল্লুকটির চারিদিকে ঘিরে বসল আর মা তাদের সবাইকেই কলিজার মাংস খণ্ড খণ্ড করে কেটে ভাগ করে দিতে লাগল। একটি ভাল্লুকের মেটে খাওয়া শেষ করে অন্যটির কলিজা কাটবার জন্য যখন উদ্যোগ করছিল তখন দলের যোল বছরের মেয়েটি বাইরে এসে একখণ্ড বরফ মুখে পুরে দিল ; এই সময় দলের প্রবীণ পুরুষটিও বেরিয়ে এসে বরফের টুকরো তুলে মুখে দিল এবং ষোড়শী মেয়েটির হাত চেপে ধরল। মেয়েটি প্রথমটা একটু ইতস্তত করে শান্ত হল। পুরুষটি তাকে বাহুবেষ্টিত করে এক পাশে চলে গেল। এরা দু'জনে যখন হাত-ভর্তি বরফকণা নিয়ে কাটা ভাল্লুকের কাছে ফিরে এল তখন তাদের চোখ মুখের রঙ উজ্জ্বল, গাল রক্তিমাভ।

পুরুষটি বলল, "এবার দাও আমি কাটি, তুমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছ।"

মা তার হাতে ছুরিটি তুলে দিল। তারপর একটু নত হয়ে পাশে উপবিষ্ট চব্বিশ বছরের যুবকটির মুখে চুমু খেয়ে তার হাত ধরে বেরিয়ে গেল।

এরা সকলে মিলে তিনটি ভাল্লুকের মেটে খেয়ে ফেলল। চার মাসের অনাহারী নিদ্রিত ভাল্লুকগুলোর চর্বি বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে বাচ্চা ভাল্লুকটির মাংসই শেষ পর্যন্ত দেখা গেল নরম ও উপাদেয়। তাই তার অনেকখানি মাংস এরা খেয়ে ফেলল। তারপর সবাই পাশাপাশি শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিল।

এবার তাদের ঘরে ফেরার পালা ; মদ্দা ও মাদী ভাল্লুক দুটির চার পা চামড়ার দড়িতে বেঁধে লাঠিতে ঝুলিয়ে দু'জন করে কাঁধে নিল, বাচ্চাটিকে কাঁধে নিল ষোড়শী তরুণী, পাথরের কুড়ুল হাতে নিয়ে মা আগে আগে চলল।

এইসব বন্য মানুষগুলির সময়ের হিসাব ছিল না, ঘড়ির কাঁটার কোনো জ্ঞান না থাকলেও এ ধারণা তাদের ছিল যে আজকের রাত চাঁদনী রাত হবে। তারা কিছুদূর যাবার পর সূর্য দিগন্তে অস্তমিত হল বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু তখনো সূর্যাস্ত হয়নি —আরো কয়েক ঘণ্টা গোধূলির আলো রইল। সূর্যকিরণের শেষ গোধূলির আলো মিলিয়ে যেতে না যেতে বিশ্বচরাচর শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে ভরে গেল।

তাদের গুহাশ্রয় তখনো অনেক দূরে। পথে চলতে চলতে মা হঠাৎ প্রান্তরের মধ্যে থমকে দাঁড়াল, কান পেতে কিছু শুনতে লাগল। ষোল বছরের মেয়েটি ছাব্বিশ বছরের ছেলেটির কাছে গিয়ে বলল, "গুর্‌র্, গুর্‌র্, বৃক্, বৃক্" অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ।

মা মেয়েটির কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, "বহু বৃক্, বহু বৃক্" অনেক নেকড়ে। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে মা আবার বলল, "প্রস্তুত হও।"

শিকার মাটিতে রেখে সকলে নিজ নিজ হাতিয়ার শক্ত করে ধরল এবং প্রতি দু'জনে পিঠে পিঠ দিয়ে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়াল ; নিমেষের মধ্যে সাত আটটি নেকড়ে বাঘের একটি দল লক্‌লকে জিভ বার করে তাদের দিকে এগিয়ে এল, তারা কাছে এসে গজরাতে গজরাতে চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল। মানুষের হাতে কাঠের বর্শা ও পাথরের কুঠার দেখে নেকড়েগুলো তাদের আক্রমণ করতে ইতস্তত করতে লাগল। ইতিমধ্যে চক্রের মাঝখানের সর্বকনিষ্ঠ ছেলেটি তার লাঠির সঙ্গে বাঁধা কাঠের ফলক খুলে নিজের কোমরে বাঁধা শক্ত চামড়ার দড়ি কাঠে বেঁধে ধনুক তৈরি করে ফেলল। কে জানে কোথায় নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল ছুঁচলো পাষাণ ফলকের তীর। সে চব্বিশ বছরের যুবকটির হাতে তীর ধনুক দিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল চক্রের মধ্যস্থলে নিজের জায়গায়, আর নিজে গিয়ে তার জায়গায় দাঁড়াল। চব্বিশ বছরের যুবকটি তখন ধনুকের গুণকে আরো শক্ত করে বেঁধে নিল, তারপর তীর ছুঁড়ে একটি নেকড়ের পেটে

বিদ্ধ করল। নেকড়েটি গড়িয়ে পড়ে গেল, কিন্তু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার যখন মরিয়া হয়ে আক্রমণের উদ্যোগ করছিল যুবকটির দ্বিতীয় তীর গিয়ে লাগল—আঘাতটা হল মারাত্মক। নেকড়েটাকে নিশ্চল অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে অন্যগুলি তার কাছে এগিয়ে এলো, তার দেহ থেকে ঝরে-পড়া গরম তাজা রক্ত পান করতে লাগল; আর পরক্ষণেই মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করে তার মাংস খেতে সুরু করল।

জানোয়ারগুলিকে ভোজন উৎসবে ব্যস্ত রেখে দলটি নিজেদের শিকার তুলে নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে দ্রুত পায়ে এগুতে লাগল। এবার মা চলছে সবার পিছনে, আর বার বার পিছনে ফিরে চারিদিকে নজর রাখছিল। আজ তুষারপাত হয়নি, তাই চাঁদনী রাতের আলোতে নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণের কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। তাদের গিরিগুহা থেকে যখন তারা আধ মাইল পথ দূরে, তখন নেকড়ের পাল আবার তাদের ঘিরে ধরল। তারা শিকারগুলো মাটিতে রেখে হাতিয়ার বাগিয়ে দাঁড়াল। ধনুকধারী কয়েকটি তীর ছুঁড়ল, এবার কিন্তু একটিকেও বিদ্ধ করা সম্ভব হল না। কারণ, নেকড়েগুলি এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় প্রতি মুহূর্তে স্থানবদল করে বেড়াচ্ছিল। কিছুক্ষণ পাঁয়তাড়া কষবার পর চারটে নেকড়ে একসঙ্গে ষোড়শীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মা তার পাশেই ছিল। সে একটি নেকড়ের পেটে তার বর্শা ঢুকিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। কিন্তু, অন্য তিনটে নেকড়ে মেয়েটির উরুতে নখ দিয়ে মাটিতে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বার করে ফেলল। সকলের নজর যখন এই ষোল বছরের মেয়েটিকে বাঁচাবার দিকে—সেই সময়েই অন্য তিনটে নেকড়ে চব্বিশ বছরের যুবকটির অরক্ষিত পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর আত্মরক্ষার সামান্য সুযোগটুকুও না দিয়ে তার পেট চিরে ফেলল। যখন অন্য সকলে আবার যুবকটিকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত, সেই অবসরে নেকড়েগুলো ষোড়শীর ক্ষত-বিক্ষত দেহ প্রায় হাত পঁচিশেক দূরে টেনে নিয়ে গেল। মা চেয়ে দেখল মৃতপ্রায় নেকড়ে বাঘটির পাশে চব্বিশ বছরের যুবকটিও শেষ নিশ্বাস ফেলছে। মুমূর্ষু নেকড়েটির মুখে ডাণ্ডা ঢুকিয়ে দিয়ে, একজন সামনের পা চেপে ধরেছে আর সকলে তার ক্ষতস্থানে মুখ লাগিয়ে লবণাক্ত রক্ত পান করছে। নেকড়ের কণ্ঠনালি কেটে দিয়ে মা তাদের কাজ আরো সহজ করে দিল। ব্যাপারগুলি ঘটে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। তারা জানত যে মেয়েটিকে খাওয়া শেষ করে নেকড়েগুলি আবার তাদের ওপর আক্রমণ করবে। তাই তারা মৃতপ্রায় যুবকটিকে সেখানে ফেলে রেখে তাদের তিনটি ভাল্লুক ও মৃত নেকড়েটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটতে লাগল এবং নিরাপদে নিজেদের গুহায় পৌছাল।

গুহার মধ্যে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল, তারই লাল আভায় শুয়ে ঘুমচ্ছিল শিশুরা আর তরুণীরা। শিকারীদের ফিরে আসার শব্দ পেয়ে বৃদ্ধা ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল, "নিশা-আ-আ এলি?"

"হ্যাঁ" বলে মা প্রথমে এক কোণে তার অস্ত্র-শস্ত্র রেখে চামড়ার পোষাকটি খুলে সম্পূর্ণ দিগম্বরী হল, অন্যেরাও শিকারগুলো মাটিতে রেখে তার মতো চামড়ার পোষাক ছেড়ে নগ্ন দেহের প্রতি রোমে আগুনের আরামদায়ক উত্তাপ উপভোগ করতে লাগল।

এখন গোটা ঘুমন্ত পরিবারটি জেগে উঠল। সামান্য শব্দে জেগে ওঠার অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই এদের মজ্জাগত। খাদ্য রসদ যা পাওয়া যেত তা খুব হিসাবের সঙ্গে খরচ করেই মা তার এই গোষ্ঠীকে এ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে। হরিণ, খরগোস, বনগরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতি শিকার করার সুযোগ শীত আরম্ভ হওয়ার আগেই পাওয়া যায়, কারণ শীতের দিনে এইসব প্রাণী দক্ষিণের গরম প্রদেশে চলে যায়। মায়ের পরিবারেরও আরো কিছুটা দক্ষিণে যাওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু ঐ সময়টাতেই ষোড়শী তরুণীটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই যুগের মানব সমাজের নিয়ম অনুসারে পরিবারের মা অর্থাৎ গোষ্ঠীর কর্ত্রী একজনের জন্য পরিবারের সকলের জীবন বিপন্ন করতে পারত না—তা বিধেয় ছিল না। কিন্তু মায়ের আন্তরিক দুর্বলতা প্রকাশ পেল এই মেয়েটির অসুখের সময় এবং তার ফলে আজ তাকে একজনের বদলে পরিবারের দু'জনকে হারাতে হল। শিকারযোগ্য প্রাণীদের এই অঞ্চলে ফিরে আসবার এখনো দু'মাস বাকি। এর মধ্যে না জানি আবার কত জনকে হারাতে হয়। তিনটি ভাল্লুক এবং একটি নেকড়ের মাংস বাকি শীতকালের খোরাকের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

ছোট ছেলেমেয়েগুলি খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে—বেচারিরা খালি পেটেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মা আগে নেকড়ের মেটে কেটে ছোটদের মধ্যে ভাগ করে দিতে লাগল, ছেলেরা গোগ্রাসে চেটেপুটে খাচ্ছিল। এই অবসরে মা খুব সতর্কতার সঙ্গে নেকড়ের চামড়াটা ছাড়িয়ে ফেলল, কারণ লোমশ চামড়া খুবই দরকারী। মাংস কাটার সময় যারা খুব ক্ষুধার্ত তারা খানিকটা কাঁচা খেয়ে নিল। তারপর আগুনে ঝলসে নিয়ে খেতে লাগল। প্রত্যেকেই তাদের পোড়া মাংস থেকে এক কামড় খাবার জন্য মাকে অনুরোধ করতে লাগল।

মা বলল, "ব্যস্, আজ তোমরা সকলে পেট ভরে খাও, কাল থেকে কিন্তু এতটা পাবে না।" মা উঠে গুহার একটি কোণ থেকে চামড়ার থলি নিয়ে এসে বলল, "এইটুকু মধু সুরা আছে, আজ সুরা পান, নৃত্য ও ফুর্তি কর।"

ছোটদের এক-আধ ঢোক দেওয়া হল, বড়রা পেল বেশী বেশী। ক্রমেই মদোন্মত্ত উল্লাস দেখা দিল, চোখ হল লাল, আর হাসির উঠল ফোয়ারা। এদের মধ্যে কেউ একজন গান ধরল, প্রবীণ লোকটি একটা লাঠির ওপর কাঠি দিয়ে বাজাতে আরম্ভ করল—আর সকলে মিলে নাচ জুড়ে দিল। আজ হল অবারিত আনন্দের রাত। পরিবার ছিল মাতৃশাসনে কিন্তু সে রাজ্যে অন্যায় বা অসাম্য ছিল না। বুড়ি মাতামহী

ও প্রবীণ পুরুষটি ছাড়া বাকি সকলেই মায়ের সন্তান-সন্ততি। মা এবং প্রবীণ পুরুষটি আবার বৃদ্ধা মাতামহীর সন্তান, কাজেই এদের মধ্যে 'এটা আমার', 'ওটা তোমার' এই প্রশ্ন ওঠেনি। বস্তুত সে যুগে তখনো মানুষের মনে সম্পত্তিবোধ সৃষ্টি হয়নি। তবে এ কথা ঠিক যে, মায়ের অধিকার ছিল সমস্ত পুরুষের ওপর আর সে অধিকার সর্বাগ্রগণ্য। চব্বিশ বছরের যে যুবকটি নেকড়ের আক্রমণে মারা গেল সে ছিল মায়ের পুত্র এবং পতিও বটে। তার মৃত্যুতে মায়ের মনে কোনো কষ্ট হয়নি তা নয়, তবে সে যুগে মানুষ অতীতের চেয়ে বর্তমানের কথা বেশী ভাবতে বাধ্য হত। মায়ের এখন দু'জন স্বামী বর্তমান —তার অপর সন্তানের বয়স চৌদ্দ মাত্র, তবে সে অল্পকালেই স্বামী হবার উপযুক্ত হবে। মায়ের রাজত্বকালের মধ্যেই এখন যারা শিশু, তাদের ক'জন স্বামী হবে তা কেউ বলতে পারে না। মা চব্বিশ বছরের যুবকটিকে ভালোবাসত বেশী। তাই তিনজন তরুণীর ভাগে পঞ্চাশ বছরের পুরুষটি ছিল।

শীত শেষ হবার আগেই বৃদ্ধা মাতামহী একদিন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হল। শিশুদের তিনটিকে নেকড়ে বাঘে নিয়ে গেছে আর প্রবীণ লোকটি বরফ গলার সময় তুষারস্রোতে ভেসে গেল। এইভাবে ষোলজনের পরিবারের মাত্র ন'জন বেঁচে রইল।

৩

এখন বসন্তকাল। দীর্ঘদিনের হিম-মৃত্যুতে ঢাকা প্রকৃতি আবার নবজীবনে মঞ্জরিত হয়ে উঠছে। গত ছ'মাস যে ভূর্জ গাছ ছিল নিষ্পত্র —তাতে নবপল্লব জন্ম নিচ্ছে। বরফ গলে যাওয়ার পর পৃথিবী আবার হয়ে উঠেছে শ্যামল, বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাসে বনস্পতি ও ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধে ছড়াচ্ছে অপূর্ব মাদকতা। দিগন্তব্যাপী সারা পৃথিবী নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠছে। কোথাও গাছে গাছে শোনা যেতে লাগল পাখীদের কাকলী, কোথাও বা ঝিঁঝি পোকার একটানা ডাক। গলে-যাওয়া বরফের স্রোতের ধারে বসে কোথাও বা নানাজাতীয় জলচর পাখী ছোটখাট পোকা-মাকড় খুঁটে খাচ্ছে, আবার কোথাও বা রাজহংসগুলিকে প্রণয়-ক্রীড়া-রত দেখা যাচ্ছে। এখন এই শ্যামল পার্বত্য বনের মধ্যে দেখা যাবে দলে দলে হরিণগুলোকে ছুটে বেড়াতে। কোথাও ভেড়া, কোথাও ছাগল, রক্তমৃগ বা গরু চরে বেড়াচ্ছে আর এদের শিকারের জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে নেকড়ে আর চিতাবাঘ।

শীতের সময় নদী হয়ে যায় অবরুদ্ধ জমাট বরফ। শীতের অবসানে আবার বিগলিত ধারায় প্রবাহিত হয়। অবরুদ্ধ নদীর মতোই যে মানুষের দল আটকে পড়েছিল তারাও দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আপন আপন অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, চামড়া ও ছোট ছেলেমেয়েদের বোঝা ঘাড়ে করে গৃহ-অগ্নি নিয়ে মানুষের দল আরও উন্মুক্ত অঞ্চলে অগ্রসর হতে থাকল। যতই দিন যেতে লাগল —পশু ও বনস্পতির মতোই মানুষের

শুক্‌নো কুঞ্চিত চামড়ার নীচে আবার মেদ-মাংস জমতে লাগল, কখনও কখনও তাদের পোষা রোমশ কুকুরগুলো হরিণ বা ছাগল ধরে আনত, আবার কখনও বা তারা নিজেরাই ফাঁদ পেতে তীর বা কাঠের বর্শা দিয়ে জানোয়ার শিকার করত। নদীতে মাছও ছিল প্রচুর, ভোল্‌গার তীরবর্তী অধিবাসীদের জাল কখনো খালি উঠত না।

এই সময় রাত্রে ঠাণ্ডা পড়ত, তবে দিনের বেলা থাকত গরম। বর্তমানে আরও কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে মিলে ভোল্‌গার তীরে নিশা পরিবার বসবাস করছিল। নিশার পরিবারের মতো অন্যান্য পরিবারগুলিও মায়েদের ছিল। এদের পরিবার পিতৃশাসিত নয়, পরিবারগুলি মাতৃশাসিত। তার কারণও ছিল, তখন কে কার পিতা তা বলা আদৌ সম্ভব ছিল না। নিশার বয়স বর্তমানে পঞ্চান্ন। তার আটটি মেয়ে ও ছ'টি ছেলের মধ্যে চার মেয়ে এবং তিনটি ছেলে বেঁচে আছে। তারা যে নিশার সন্তান তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ প্রসবের সাক্ষী স্বয়ং বর্তমান, কিন্তু কে যে পিতা তা বলা যায় না। নিশার পূর্বে তার মা অর্থাৎ বৃদ্ধা মাতামহীর যখন শাসন ছিল, তখন তার পরিণত বয়সে অনেকগুলি স্বামী ছিল। এই স্বামীদের মধ্যে কেউ বা ভাই-স্বামী কেউ বা পুত্র-স্বামী। তারা আবার বহুবার নিশার সঙ্গে নাচ গানের সময় প্রেমপ্রার্থী হয়েছে। তারপর নিশা যখন নিজে কর্ত্রী হল তখন তার নিরন্তর পরিবর্তনশীল কামনাকে প্রত্যাখ্যান করবার সাহস তার ভাই বা পুত্রদের ছিল না। এই জন্যেই নিশার জীবিত সাত সন্তানের কে কার পিতা বলা অসম্ভব। নিশার পরিবারে এখন সে নিজেই সবচেয়ে বড় —বয়স ও প্রতিপত্তি দুই দিক দিয়েই। অবশ্য এই কর্তৃত্ব আর বেশীদিন থাকবে না। দু'এক বছরের মধ্যে সে নিজেও বুড়ি দিদিমাতে পরিণত হবে। আর মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠা শক্তিশালিনী কন্যা হচ্ছে লেখা —সে তার স্থান দখল করবে। অবশ্য এই অবস্থাতে লেখার সঙ্গে তার বোনেদের ঝগড়া অনিবার্যভাবেই বাধবে। প্রত্যেক বছরই কিছু লোক নেকড়ে বা চিতাবাঘের মুখে, ভাল্লুকের থাবায়, বুনো ষাঁড়ের সিং-এ, ভোল্‌গার স্রোতে যেখানে প্রাণ হারাচ্ছে সেই ক্ষয়িষ্ণু পরিবারকে রক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে প্রতি পরিবারের রাণী মায়ের। অবশ্য লেখার বোনদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ স্বাভাবিকভাবেই স্বতন্ত্র পরিবার গড়ে তুলবে। এই রকম ভাবে পরিবারের শাখা বেরিয়ে যাওয়া তখনি বন্ধ হবে যখন পুরুষ হবে দলের কর্তা। অনেক পুরুষের একজন স্ত্রীর বদলে, একজন পুরুষ অনেক স্ত্রীর স্বামী হবে।

পরিবারের কর্ত্রী নিশা লক্ষ্য করেছে তার মেয়েদের মধ্যে লেখাই শিকারে সবচেয়ে পটু। পাহাড়ে চড়তে পারে হরিণের মতো দ্রুত গতিতে। একদিন সকলের নজরে পড়ল উঁচু পাহাড়ের শৃঙ্গদেশে একটি মৌচাকের ওপর। এত উঁচু যে মধুকর ভাল্লুকও সেখানে পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু লেখা লাঠির পরে লাঠি বেঁধে টিকটিকির মতো দেওয়াল বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠে রাত্রে মশাল জ্বেলে হুলো মাছিগুলোকে পুড়িয়ে মৌচাক ফুটো

করে দিয়ে তার নীচে থলি ধরল। তাতে কম করে হলেও তিরিশ সেরের কম মধু পড়েনি। শুধু নিশা পরিবার নয়, লেখার এই দুঃসাহসিকতার প্রশংসা অন্যান্য পরিবারগুলিও করেছিল। কিন্তু মা নিশা এতে আনন্দিত হল না। মা দেখল যে তার পুত্রেরা এখন লেখার ইঙ্গিতে নাচতে যতটা উৎসাহ পায় ততটা আগ্রহান্বিত নয় তার কথায়। অবশ্য খোলাখুলিভাবে তাকে অবজ্ঞা করবার সাহস এখনো তাদের হয়নি।

কিছুকাল ধরেই নিশা একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছিল। অনেক সময় তার ইচ্ছা হত লেখাকে ঘুমন্ত অবস্থায় মেরে ফেলতে, কিন্তু সে সাহস পেত না। সে জানত লেখা তার চেয়ে শক্তিশালিনী। সে অন্যের সাহায্য চাইতে পারে, কিন্তু তাকে অন্যেরা সাহায্য করবে কেন? পরিবারের সব পুরুষই লেখার প্রেম-প্রার্থী, কৃপার পাত্র হতে চায়; নিশার অন্য মেয়েরাও তাকে সাহায্য করবে না, কারণ তারা ভয় করত লেখাকে। তারা জানত যদি এই ধরনের কোনো ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় তা'হলে তাদের সকলকেই অসহ্য কষ্ট পেয়ে মরতে হবে। নির্জনে বসে বসে নিশা ভাবছিল। সহসা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, লেখাকে পরাস্ত করার উপায় সে খুঁজে পেয়েছে। বেলা তখন এক প্রহর। নিশা ও পরিবারের অন্যান্য সকলেই নিজ নিজ তাঁবুর পেছনে বসে অথবা শুয়ে, নগ্নদেহে রোদ পোহাচ্ছিল। নিশা বসেছিল তাঁবুর সামনে, লেখার তিন বছরের ছেলেটি খেলছে তার সামনে।

নিশার হাতে ছিল পাতার ঠোঙা-ভর্তি লাল স্ট্রবেরী ফল। পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে ভোল্‌গা নদী, নিশার সমুখের জমি ঢালু হতে হতে ভোল্‌গার জলে গিয়ে মিশেছে। নিশা একটা ফল মাটিতে গড়িয়ে দিল—ছেলেটি দৌড়ে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে খেল। আবার একটি ফল নিশা গড়িয়ে দিল, এটা কুড়িয়ে নিতে ছেলেটি আরো কিছুদূর এগিয়ে গেল। আরও একটা ফল গড়িয়ে দিল—আরো দূরে গেল ছেলেটি। এভাবে দ্রুততালে একটার পর একটা ফল নিশা গড়িয়ে দিতে লাগল। ক্রমেই ছেলেটি তা কুড়িয়ে নিতে আরো দ্রুত আরো দূরে যেতে লাগল। এমনি করে এক সময় হঠাৎ পা পিছলে ভোল্‌গার খরস্রোতে ছেলেটি পড়ে গেল।

সেইদিকে চেয়ে নিশা চীৎকার করে উঠল। লেখা কিছু দূরে বসে সব দেখছিল। সে ছুটে এসে নদীর খরস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছেলেটি তখনো একবার ভাসছে একবার ডুবছে—লেখা তাকে ধরে ফেলল। ছেলেটি ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা জল খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। তা'ছাড়া ভোল্‌গার বরফ-গলা ঠাণ্ডা জল ছুঁচের মতো তার গায়ে বিঁধছিল। অনেক কষ্টে লেখা তার ছেলেকে নিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে লাগল। এক হাতে তার ছেলে অন্য হাত ও পা দিয়ে সে সাঁতার কেটে এগোবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সে টের পেল—এক জোড়া বলিষ্ঠ হাত তার গলা চেপে ধরেছে। লেখার আর বুঝতে বাকি রইল না—কে সে? অনেক দিন ধরেই লেখা লক্ষ্য করছিল তার প্রতি নিশার

আচরণের পরিবর্তন। আজ দেখল সুযোগ বুঝে নিশা তার পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলতে উদ্যত। লেখা তখনো নিশাকে নিজের শক্তির পরিচয় দিতে পারত কিন্তু তার হাতে ছিল ছেলে। লেখাকে বাধা দিতে দেখে নিশা নিজের দেহের সমস্ত ভার নিয়ে লেখার মাথার ওপর নিজের বুকটাকে চেপে ধরল। এতক্ষণ পর লেখা প্রথম জলের নীচে তলিয়ে গেল। প্রাণপণে ওপরে উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে ছেলেটা হাত থেকে ফস্‌কে গেল। ইতিমধ্যে নিশা লেখাকে বেশ সঙ্কটজনক অবস্থায় এনেছিল। কিন্তু হঠাৎ নিশার গলার নাগাল পেয়ে লেখা তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে হাত দিয়ে নিশার গলা চেপে ধরল। লেখা ততক্ষণে নিজেও অজ্ঞান হয়ে গেছে আর তার দেহের গুরুভার নিশাকেও জলের নীচে টেনে নিচ্ছিল —নিশার তখন বাধা দেবার সামর্থ্য ছিল না। তবু নিশা কিছুটা চেষ্টা হয়ত করত কিন্তু এখন সবই বিফল। দু'জনে দু'জনের দ্বারা পিষ্ট হয়ে ভোল্‌গার স্রোতে তলিয়ে গেল।

পরে নিশা পরিবারের কর্ত্রী-মা হল পরিবারের সবচেয়ে বলিষ্ঠা স্ত্রীলোক রোচনা।*

দিবা

দেশ : মধ্য ভোল্‌গা তট ।। কাল : ৩৫০০ খৃষ্টপূর্ব

"দিবা! রোদ বড় কড়া, দ্যাখ তোর সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। আয়, এই শিলাখণ্ডের ওপর বসি।"

"বেশ তাই হোক, সুরশ্রবা-আ" এই বলে দিবা সুরশ্রবার সঙ্গে এক বিশাল পাইন গাছের ছায়ায় শিলাখণ্ডের ওপর বসল।

গ্রীষ্মকাল, সময় মধ্যাহ্ন! হরিণের পেছনে এত ছুটোছুটির পর দিবার ললাটে অরুণাভ মুক্তাকেশের মতো স্বেদবিন্দু ঝরবে —তাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু এ স্থানটি এমনই যে ক্লান্তি দূর হতে মোটেই সময় লাগে না। পাহাড়ের নীচ থেকে মাথা পর্যন্ত শ্যামল আস্তরণে আচ্ছাদিত। বিশাল পাইন বৃক্ষ আপন শাখা ও সূচালো পত্রাবলী বিস্তার করে সূর্যকিরণের গতিরোধ করছে, নীচে স্থানে স্থানে বিচিত্র বনৌষধি, লতাগুল্ম ও নানাবিধ গাছ-গাছড়া পুষ্পসম্ভারে মুকুলিত হয়ে আছে। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর তরুণ-তরুণীর শ্রান্তি বিদূরিত হল। চারিদিকে রঙ বেরঙ-এর ফুল, অপূর্ব মধুর গন্ধ তাদের মন হরণ

* আজ থেকে ৩৬১ পুরুষ আগেকার কথা। তখন ভারত, ইরাণ এবং য়ুরোপের জাতিগুলি ট্রাইব স্তরে ছিল। সেটা ছিল মানব সমাজের প্রারম্ভিক কাল।

করছিল। তরুণ যুবকটি আপন ধনুর্বাণ ও পাথরের কুঠার শিলাখণ্ডের ওপর রাখল, ক্ষণকাল পরে পার্শ্বস্থিত কলকল শব্দে প্রবাহিত স্ফটিকস্বচ্ছ জলস্রোতের পাশে এসে সাদা বেগুনী ও লাল রঙ-এর ফুল আহরণ করতে লাগল। তরুণীও আপন অস্ত্রাদি রেখে তার দীর্ঘ সোনালী চুলে হাত দিয়ে অনুভব করল যে চুলের গোড়া তখনো ভিজে। একবার নীচের দিকে তাকিয়ে প্রবাহিতা ভোল্‌গার প্রশান্ত রূপ দেখে নিল। পাখীর কলগুঞ্জনে আকৃষ্ট হয়ে চোখ ফেরাতে গিয়ে দৃষ্টি আবদ্ধ হল পুষ্পচয়নরত তরুণের প্রতি। যুবকের চুলও সোনালী, তবু তরুণী তার নিজের কেশরাশির সঙ্গে তুলনা করতে চাইল না। সে জানতো তার নিজের কেশদাম অনেক সুন্দর। তরুণের মুখমণ্ডল ঘন পিঙ্গল বর্ণ গুম্ফ শ্মশ্রুতে ঢাকা, তার উপরে নাসিকা, কপোল ও ললাটের অরুণিমা দেখা যাচ্ছিল। তরুণীর দৃষ্টি এইবার পুরুষটির পুষ্ট রোমশ বাহুর ওপর পড়ল। তার মনে পড়ে গেল, একদিন সুরশ্রবা তার ঐ শক্ত হাত দিয়ে পাথরের কুঠারের ঘায়ে হিংস্র শূকরের কোমর ভেঙে দিয়েছিল। সেদিন মনে হয়েছিল পুরুষের ঐ হাত কতই না কর্কশ ও কঠিন, আর আজ পুষ্পচয়নরত সেই বাহুকেই মনে হচ্ছে কেমন কোমল। তবে এ কথা ঠিকই যে, বাহুর শক্ত পেশী ও তার সঞ্চালনে স্ফীত মনিবন্ধের শিরা আজও সেই শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। একবার তরুণীর মনে হল, উঠে গিয়ে ঐ বাহুযুগলকে চুম্বন করে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে তা খুব প্রিয় মনে হচ্ছিল। এইবার যুবকের উরুদ্বয়ের দিকে দিবার নজর পড়ল। প্রতি পদক্ষেপে গতির তরঙ্গ লীলায়িত হচ্ছিল। একেবারেই চর্বিহীন পেশীবহুল উরু। শক্তিমান জঙ্ঘা এবং ক্ষীণ কটি দিবার কাছে অতি লোভনীয় মনে হচ্ছিল। সুর অনেকবারই দিবার ভালোবাসা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে—অবশ্য মুখে নয় ভাবে ভঙ্গীতে; নাচের কলা-কৌশল দেখিয়ে দিবাকে খুশী করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার 'জনের' অন্য যুবকেরা যখন দিবার সঙ্গে নাচের সুযোগ পেয়েছে, যখন হয়ত দিবার অধর চুম্বনের অনুমতি পেয়েছে কিম্বা বহুবার হয়ত তাদের অঙ্কশায়িনী হয়েছে তখন হতভাগ্য সুর একটি চুম্বন, একটি আলিঙ্গন—এমন কি নৃত্যের সময় একবার হাতে হাত ধরবার সুযোগও পায়নি।

সুর অঞ্জলি-ভরা ফুল নিয়ে দিবার দিকে এগিয়ে আসছিল। কি অপূর্বই না দেখাচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়ে এখানে বসে আজ দিবার মনে ক্ষোভ জেগে উঠল। কেন সে এতদিন সুরের কথা ভাবেনি। অবশ্য এর জন্য দিবাকে দোষ দেওয়া যায় না—অপরাধ যদি কারুর থাকে তা সুরের। তার মুখচোরা লজ্জা এতদিন তার মুখ ফোটাতে দেয়নি। সুর কাছে এলে দিবা হাসিমুখে বলল, "কি সুন্দর ফুলগুলো, কি সুমিষ্ট এর গন্ধ!"

উপলখণ্ডের ওপর ফুলগুলো রেখে সুর বলল, "তোমার ঐ সোনালী চুলে এই ফুলগুলো গুঁজে দিলে তবেই এর সৌন্দর্য পরিপূর্ণ হবে।"

"আচ্ছা স্বর! সত্যিই কি আমার জন্যে এই ফুলগুলি তুমি এনেছ?"

"হ্যাঁ, দিবা। এই ফুলগুলো দেখে তোমার মুখের দিকে তাকালাম —মনে পড়ল জলপরীদের কথা!"

"জলপরী?"

"হ্যাঁ! জলপরীরা খুবই ভালো। তারা খুশী হলে সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে— আর যদি রুষ্ট হয় প্রাণ নিতেও ছাড়ে না।"

"আমাকে কি ধরনের জলপরী মনে হয়, স্বর!"

"রুদ্রাণী নয়।"

"কিন্তু, আমি তো তোমার ওপর কখনও সোহাগ দেখাইনি।" দিবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল।

ক্ষণকাল পরে স্বরশ্রবা বলল, "না দিবা! তুমি আমার ওপর কখনও রুষ্টা হওনি। তোমার মনে পড়ে কি আমাদের ছেলেবেলার কথা?"

"তখনও তুমি কিন্তু এমনি লাজুক ছিলে!"

"তবে তুমি আমার ওপর কখনও বিরূপ হওনি?"

"তখন আমি নিজে থেকেই তোমাকে চুমু খেতাম।"

"হ্যাঁ, কি মিষ্টিই না লাগত তোমার সেই মুখচুম্বন।"

"কিন্তু যখন আমার যৌবনের উন্মেষ হল, যখন সারা 'জন'-এর তরুণকুল আমাকে পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল সেই সময় থেকেই আমি তোমার কথা ভুলে গেলাম।"

"তোমার কোনো দোষ ছিল না দিবা।"

"তবে দোষটা কার?"

"আমারই। আমাদের 'জন'-এর ছেলেরা চুমু খেতে চাইলে তুমি তা দিয়েছ, তারা যখনই তোমার প্রেমালিঙ্গন কামনা করেছে তাও দিয়েছ। আমাদের মধ্যে সুন্দর সবল যে কোনো যুবক মৃগয়ায় শৌর্য কিংবা নাচে কুশলতা দেখিয়েছে —তুমি তো কখনো তাদের কাউকে নিরাশ করনি।"

"কিন্তু স্বর! তুমিও তো তাদেরই মতো —বরং তাদের চেয়ে কর্মঠ, ক্ষিপ্রগতি, সুগঠিত তোমার দেহ —আমি তোমার কামনাকে তো নিরাশ করেছি।"

"আমি তো কখনও কামনা প্রকাশ করিনি, দিবা!"

"মুখে করনি বটে! মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা, তখন তুমি মুখে কিছুই প্রকাশ করতে না কিন্তু তোমার মনের কথা বুঝতে পারতাম। তারপর দিবা স্বরকে ভুলে গেল। দিবা কখনও স্বরকে —দিন কখনও সূর্যকে ভুলে থাকতে পারে? না স্বর! দিবা আর কখনও তোমাকে ভুলে থাকবে না।"

"তা' হলে ছেলেবেলার সেই দিবা-সুর হয়ে উঠব আমরা আবার।"

ছোট শিশুর মতো নগ্ন মনোরম-মূর্তি পরিপূর্ণভাবে পরস্পরের অধরে অধর মিলিয়ে দিল। আর দিবা, সুরের তিসি ফুলের মতো নীল চোখ দুটোর ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চুমু খেতে খেতে বলল, "তুমি আমার আপন মায়ের ছেলে —আর আমি তোমাকেই ভুলে ছিলাম!"

দিবার চোখ জলে ভরে উঠল। সুর দিবার গাল নিজের চোখের জলের ধারায় মুছিয়ে দিয়ে বলল, "না তুমি তো আমায় কখনো বঞ্চিত করনি, দিবা। তুমি যখন বড় হয়ে উঠলে, তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার চোখ, তোমার সারা দেহে যখন পরিবর্তন দেখা দিল তখন আমিই তোমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম।"

"মনের দিক দিয়ে নিশ্চয়ই নয় সুর?"

"দিবা, সে কথা…"

"না, তোমাকে বলতেই হবে। তুমি বল আর কখনো তুমি আমায় দেখে লজ্জা পাবে না?"

"না, আর কখনো তোমার কাছে আমার লজ্জা-ভয় থাকবে না। …আচ্ছা, এবার আমি তোমার চুলে ফুলগুলো সাজিয়ে দিই?"

সুর লম্বা গাছের ছাল থেকে আঁশ বার করে সেই সুতোয় লাল, সাদা, বেগুনি প্রভৃতি নানা রঙ-এর ফুল নিয়ে একটি সুন্দর মালা গাঁথল। দিবার চুলের রাশ একত্র করে তা পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিল। গরমের দিনে ভোল্‌গার তীরবাসী তরুণ-তরুণীরা প্রায়ই জলে নেমে স্নান করত সাঁতার কাটত। তাই দিবার চুলে কোনো জট ছিল না। সুর নিজের গাঁথা মালাটি দিবার চুলে তিন ভাঁজ করে, কটিবন্ধে মেখলা জড়ানোর মতো করে দু'পাশে সাজিয়ে দিয়ে একটা প্রান্ত তার কপালের ওপর ঝালরের মতো ঝুলিয়ে দিল— তার দু'পাশে রইল দুটো রক্তবর্ণের আর মাঝখানে সাদা রঙ-এর ফুলের সারি।

দিবা তখনও সেই শিলাখণ্ডের ওপর বসেছিল, সুর একটু দূরে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। কত সুন্দরই না দেখাচ্ছিল দিবাকে! আরও একটু পেছনে সরে এসে সুর দেখতে লাগল —আরও সুন্দর দেখাল দিবাকে। তবে দূরে চলে আসার জন্যে ফুলের আর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল না। ফিরে এসে সুর দিবার পাশে বসল, নিজের গালের সঙ্গে গাল মিলিয়ে দিল। দিবা তার সাথীর চোখে চুমু খেল আর নিজের ডান হাত সুরের কাঁধের ওপর রাখল। সুর তার বাঁ হাত দিয়ে দিবার কটিদেশ জড়িয়ে ধরে বলল, "দিবা! এই ফুলগুলো আগের চেয়েও কিন্তু অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"ফুল না আমি?"

সুরের মুখে কোনো উত্তর যোগাল না, ক্ষণকাল মৌন থেকে সে বলল, "আমি যখন

তোমাকে দূর থেকে দেখছিলাম তখন তোমাকে কতই না সুন্দর দেখাচ্ছিল, তারপর আরও একটু দূরে গেলাম —আরও অনেক বেশী সুন্দর লাগল।"

"আর যদি ভোল্‌গা তট থেকে দেখতে —তা'হলে ?"

"না, না অতদূর থেকে নয়" —এই কথা বলার সময় সুরের চোখে দুশ্চিন্তার ঝলক নেমে এল। সে আবার বলল, "বেশী দূরে গেলে ফুলের গন্ধ পাওয়া যায় না, আর তোমার মুখটাও অস্পষ্ট হয়ে যায়।"

"তুমি তা'হলে কিভাবে আমাকে দেখতে চাও ? দূর থেকে না কাছ থেকে ?"

"কাছে থেকে। দিনের মধ্যেই সূর্য থাকে উজ্জ্বল —দিবার কাছেই থাকবে সুর।"

"আচ্ছা, আজ তুমি আমার সঙ্গে নাচবে তো !"

"নিশ্চয়ই।"

"আজ সারাদিন আমার সঙ্গে থাকবে ?"

"অবশ্যই।"

"সারারাত ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"তা'হলে আমি আজ 'জন'-এর অন্য কোনো পুরুষকে কাছে থাকতে দেব না।" —এই বলে দিবা সুরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করল।

এই সময় শিকারী তরুণ-তরুণীরা ফিরে এল। তাদের সাড়া পেয়েও এরা দু'জনে আগের মতোই দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে রইল।

নবাগতাদের একজন বলল, "কিরে দিবা ! আজ তুই সুরকেই সাথী করে নিলি ?"

ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে দিবা বলল, "হ্যাঁ, এই দেখ, সুর আমাকে ফুল দিয়ে সাজিয়েছে।"

একটি তরুণী কলকণ্ঠে বলল, "সুর, তুমি তো বেশ ফুল সাজাতে পার ? আমার চুলও সাজিয়ে দাও না ?"

দিবা প্রতিবাদ করে বলল, "আজ নয়, আজ সুর আমার —আমার একার।"

তরুণী বলল, "বেশ কাল সুর আমার।"

"না, কালও সুর আমার থাকবে।"

তরুণী এবার রাগতস্বরে বলল, "রোজ রোজ সুর তোমারই থাকবে না-কি ? এ ঠিক না, দিবা।"

দিবা নিজের ভুল বুঝতে পারল। বলল, "রোজ রোজ নয়, শুধু আজ আর কাল।"

ক্রমে আরও অনেক শিকারী সেখানে এসে হাজির হল। একটা বিরাট কালো কুকুর এল তাদের সঙ্গে —আর এসেই সুরের পা চাটতে লাগল। সুরের মনে পড়ে গেল তার

নিজের শিকার-করা ভেড়াটার কথা। দিবার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে কি বলে এক দৌড়ে সে চলে গেল।

২

কাঠের দেওয়াল এবং খড়ের ছাউনি দেওয়া এক বিশাল কুটির। পাথরের কুঠার ধারাল হলেও তাই দিয়ে ভারী ভারী কাঠের গুঁড়ি কাটা সম্ভব হয়নি। কুড়ুলের ব্যবহার করলেও বড় বড় কাঠ কাটার ব্যাপারে আগুনের সাহায্য নিতে হয়েছে। আর এত বড় কুটির? নিশা নাম্নী পুরাকালের কোনো স্ত্রীলোকের বংশধরদের নামেই নিশা-জনের উৎপত্তি। হ্যাঁ, নিশা-জনের সমস্ত লোকজনই এখানে বাস করে। সমগ্র জন বা গোষ্ঠী এক ছাউনির নীচে বাস করে, একই সঙ্গে শিকার করে, ফল মধু সবই একত্রে আহরণ করে। সবাই একজন কর্ত্রীকে মানে। গোষ্ঠী পরিচালিত হয় সমষ্টিগতভাবে—সমিতির দ্বারা। পরিচালনা—হ্যাঁ, এই পরিচালনায় জনের ব্যক্তি বিশেষের জীবনের কোনো ঘটনাই সমষ্টি জীবনের বাইরে ছিল না। শিকার, নাচ, প্রেম, গৃহ-নির্মাণ, চামড়ার গাত্রবাস তৈরী—সমস্ত কাজই জনসমিতির পরিচালনায় হত আর এই সমস্ত কাজে জন-মাতাদের প্রাধান্যই ছিল প্রবল। নিশা-জনে দেড় শ' নরনারী বাস করে। তবে কি এরা সকলে একই পরিবারভুক্ত? এক অর্থে তাদের সবাইকে একটা পরিবার-ভুক্ত বলা চলে আবার অন্য অর্থে কয়েকটি পৃথক পরিবারের সমষ্টিও বলা চলে। মাতার জীবনকালে তাদের কন্যাদের যে সন্তানাদি হয় তার দ্বারা আবার ছোট ছোট শাখা পরিবারের সৃষ্টি হয়, কারণ মাতার নামেই সন্তানরা পরিচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দিবার সন্তানরা দিবা-পুত্র বা দিবা-কন্যা বলেই পরিচিত। কিন্তু, খাদ্য মাংস বা ফল বা মধু যাই তারা সংগ্রহ করুক না কেন তা দিবা সন্তানদের ব্যক্তিগত নিজস্ব সম্পত্তি হবে না। জনের স্ত্রী পুরুষ সকলে একত্রে সম্পত্তি অর্থাৎ খাদ্যবস্তু প্রভৃতি সংগ্রহ করে—আর সকলে মিলেই তা ভোগ করে। যদি কিছুই আহরণ করা সম্ভব না হয়, তবে একসঙ্গে সকলেই অনাহারে থাকবে। জন থেকে পৃথক করে ব্যক্তি বিশেষের কোনো বিশেষ অধিকার থাকে না। জনের বা গোষ্ঠীর আজ্ঞা এবং রীতিনীতি পালন করা তাদের কাছে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার মতোই সহজ বলে মনে হত।

এই কুটিরটাও তাদের অস্থায়ী বাসস্থান। কারণ যখন শিকারযোগ্য জীব এখান থেকে চলে যাবে, ফলমূলের অভাব ঘটবে তখন সারা গোষ্ঠীর মানুষরা এ জায়গা ছেড়ে নতুন অঞ্চলে সরে যাবে। বহু যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানে, কোথায় কখন শিকার পাওয়া যাবে। এখান থেকে চলে যাবার পর এই ছাউনি পড়ে যাবে কিন্তু কাঠের দেওয়াল কয়েক বছর পর্যন্ত টিঁকে থাকবে। নতুন জায়গায় গিয়ে এরা অনুরূপভাবে পরিত্যক্ত দেওয়ালের ওপর খড়ের ছাউনি দিয়ে নতুন ঘর বানাবে আর

তারই একাংশে জিনিস-পত্র রাখা ও অপরাংশ রান্নার কাজে ব্যবহার করবে। এরা এখন হাতে-গড়া মাটির বাসন তৈরী করতে শিখেছে। কখনো বা কাঁচা মাংস খায়—আবার তাজা মাংস পুড়িয়েও খায়, তবে শুক্‌নো মাংস সেঁকে খাওয়ার রীতি নেই —তা নিষিদ্ধ। ভোল্‌গার এই অংশে মধু পাওয়া যায় যথেষ্ট আর তার জন্যে মধুপায়ী ভাল্লুকের সাক্ষাৎও মিলত প্রচুর। নিশাগোষ্ঠী আহার এবং মদ্যপানের জন্য মধু সংগ্রহ করত।

মধুর সংগীতের আওয়াজ আসছে, ঘরে গানের আসর বসেছে। নারী-পুরুষ সকলেই গলা ছেড়ে সজীব কণ্ঠে গান ধরেছে। চামড়া পিটিয়ে যখন গাত্রবস্ত্র তৈরী হত সেই কর্মরত মানুষের সংগীত। তখনকার দিনে সমস্ত গোষ্ঠীর লোক কোনো কাজ শুধু যে সম্মিলিতভাবেই করত তা নয়, পরন্তু তা সম্পাদন করত মনোরঞ্জন ভঙ্গিমা সহকারে। তা ছিল সম্মিলিত কাজের একটি অঙ্গ। সংগীতের মূর্চ্ছনা কর্মের ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়, কিন্তু এই গান কর্মকালীন গান নয়। এখন বিশ্রামকালীন আনন্দের গান হচ্ছে। একবার নারীকণ্ঠের ললিত সুর-লহরী শোনা যাচ্ছে—আবার শোনা যায় পুরুষ কণ্ঠের পরুষ ও গম্ভীর সুর।

কুটিরের এক অংশে গোষ্ঠীর স্ত্রী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, একত্রে সমবেত হয়েছে। ছাউনির মাঝখানের ছাত কাটা আছে, আর তারই নীচে পাইন কাঠের আগুন জ্বলছে। স্ত্রী পুরুষ সুললিত তালে গান গাইছে, গানের পদে এই শব্দগুলো বোঝা যাচ্ছে—

"অ-গ্‌-গ্‌-গ-ন-ী-ী-এ-ে-স-া-া..."

মনে হচ্ছে, এরা যেন আগুনের কাছে প্রার্থনা করছে। গোষ্ঠীর নেত্রী ও জন-সমিতির লোকেরা আগুনের মধ্যে মাংস, চর্বি, ফল ও মধু আহুতি দিতে আরম্ভ করল। বর্তমানে জনের হাতে অনেক শিকার সঞ্চিত হয়েছে, প্রচুর ফল ও মধু আহরিত হয়েছে আর এই ঋতুতে কেউ জানোয়ার বা শত্রুর দ্বারা নিহত হয়নি। তাই আজ জনের মানুষেরা পূর্ণিমার রাত্রে অগ্নি-দেবতার কাছে কৃতাঞ্জলি ও প্রার্থনা নিবেদন করছে। জনের নেত্রী এক পাত্র সোমরস আগুনে সমর্পণ করল এবং গোষ্ঠীর সবাই আগুনের চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়াল। জন্মের সময় মানুষ যেমন উলঙ্গ হয়ে পৃথিবীতে আসে—এরা সেই জন্ম থেকে আজও নিরাভরণ, সেইভাবেই এখানে এসেছে। এখন আর শীতকাল নয়—গরমের সময়, মৃত পশুর চামড়ায় নিজের দেহ আবৃত করার দরকার মনে করে না।

কিন্তু, কি সুন্দর সুডৌল এদের শরীর! কারও ভুঁড়ি গজায়নি, কারও শরীরে চর্বি জমে দেহ স্থূল হয়নি। একেই বলে দেহসৌন্দর্য—সুন্দর স্বাস্থ্য! এদের সকলের মুখশ্রী একই ছাঁচের। আর, না-হবেই বা কেন? এরা সকলেই নিশা সন্তান—পিতা-পুত্র-ভাইদের দ্বারা জাত। সকলেই স্বাস্থ্যবান এবং বলিষ্ঠ। অস্বাস্থ্য এবং ক্ষীণবল ব্যক্তি বেঁচে থাকতে পারে না, এই প্রকৃতি ও শিশু জগতের শত্রুতার মধ্যে টিঁকে থাকা

সম্ভব নয়। গোষ্ঠী-কর্ত্রী উঠে কুটিরের বড় ঘরটায় গেল। অন্যান্য সকলে কুটিরের মাটিলেপা মেঝেতে এসে বসল।

চামড়ার থলির পর থলি ভর্তি হয়ে সোমরস আসতে লাগল। কারও কাছে চষক (পেয়ালা) মাটির পাত্র, কেউবা নিয়েছে ভাঁড়, কারও হাতে মাথার খুলি, আবার কেউ হয়ত জোগাড় করেছে গাছের পাতার ঠোঙা। তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই পানাহারে মত্ত হল। সব দলে দলে পৃথক হয়ে বসে খাচ্ছিল। অবশ্য এটা সাধারণ রীতি নয়। বৃদ্ধদের মনে পড়ছিল, তাদের বয়সকালে তারা জীবনের আনন্দ কিভাবে উপভোগ করেছে। তারা জানে এখন তরুণ-তরুণীদের পালা, কোনো কোনো তরুণী অবশ্য বৃদ্ধের মুখে মদের পাত্র তুলে ধরছিল, যারা জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁচেছে, তাদের কাছে পৌছে দিচ্ছিল যৌবনের হাতছানি। ঐ দেখুন দিবাকে। তাকে ঘিরে কত তরুণ-তরুণী বসে আছে। তার হাত আজ রিভুর কাঁধে। স্বর বসেছে আজ দামার সঙ্গে।

পান-আহার, নৃত্যগীত এ সবের পর একই ঘরের মধ্যেই প্রেমিক-প্রেমিকারা পরস্পরের অঙ্কশয্যায় শয়ন করে রইল। সকালে উঠে কতক স্ত্রী-পুরুষ ঘরের কাজে লাগবে, কতক শিকারে বেরুবে, আর কিছু লোক যাবে ফল আহরণে। রক্তিম কপোল ছোট ছোট শিশুরা কেউ মায়ের কোলে, কেউ গাছের ছায়ায় বিছানো চামড়ার ওপর শুয়ে রইল। আবার কেউ বা একটু বয়স্ক বালক বালিকার কোলে কাঁধে চেপে ঘুরতে লাগল, কেউ কেউ ভোল্‌গার বালুতটে লাফালাফি করে বেড়াতে লাগল।

নিশার যুগের তুলনায় এ যুগের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অনেক বেশী শান্ত ও সন্তুষ্ট। গোষ্ঠী বা জন এখন আর একজন মায়ের অধীনে নয়। পরন্তু অনেক জীবিতা মায়ের ছেলেমেয়ে এখন একত্রে এক গোষ্ঠীতে বা বৃহৎ পরিবারে সমবেত হয়েছে এবং এখানকার কর্ত্রী-মায়ের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়—রাজত্ব একচ্ছত্র নয়। জন-সমিতি এখন দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। তাই আজ আর কোনো নিশার আপন কন্যাকে জলে ডুবিয়ে মারবার দরকার হয় না।

৩

দিবা এখন চার পুত্র এবং পাঁচ কন্যার জননী, বয়স পঁয়তাল্লিশ। এখন সে নিশা-গোষ্ঠীর কর্ত্রী মায়ের পদে অধিষ্ঠিতা। গত ২৫ বছরে নিশা-গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা তিন গুণ বেড়ে গেছে। এই বাড়বাড়ন্তের জন্য স্বর যখনই দিবাকে চুমু খেয়ে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছে, দিবা জবাব দিয়েছে, "এ সবই অগ্নির দয়ায়—সূর্য দেবতার কৃপায়। অগ্নি ও সূর্য যারই সহায় হন, সে সেখানেই থাক—ভোল্‌গার স্রোতের মতোই তার ঘরে মধুর বন্যা বইবে; দলে দলে হরিণ আসবে বনে—তার আহার যোগাবার জন্যে।"

নিশা জনের সমস্যাও বেড়েছে অনেক। আগে তারা যে সমস্ত জঙ্গলে আস্তানা গাড়ত এখন আর সেইরকম ছোট জঙ্গলে তাদের কুলোয় না। তাদের 'জন-দম'

(যৌথ বাসগৃহ) গুলিই যে তিন গুণ বাড়াতে হয়েছে শুধু তাই নয়, মৃগয়াক্ষেত্রের পরিধি ও দরকার তিন গুণ। বর্তমানে তারা যে মৃগয়াভূমির কাছে আস্তানা নিয়েছে, তার ওপারে উষা-জনের মৃগয়াক্ষেত্র। উভয়ের সীমানার মাঝখানে ছিল একটি অনধিকৃত বনভূমি। নিশা-গোষ্ঠীর লোকেরা সময়ে সময়ে শুধু যে অনধিকৃত ভূমিতে শিকার করত তা নয়—পরন্তু তারা উষা-গোষ্ঠীর মৃগয়াভূমিতে কয়েকবার শিকার করতে গিয়েছে। জন-সমিতি (গোষ্ঠীর মন্ত্রণা পরিষদ) দেখল যে এতে করে উষা-গোষ্ঠীর সঙ্গে নিশা পরিবারের সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে, কিন্তু এর প্রতিকারের কোনো উপায় ছিল না। একদিন তো দিবা স্পষ্টভাবে 'জন-সমিতি'কে বলল, "ভগবান যখন আমাদের এতগুলি জীব দিয়েছেন তখন এইসব বন-জঙ্গলে তাদের খাদ্যও নিশ্চয় পূর্ণ থাকবে। এইসব মৃগয়াক্ষেত্র ছাড়া এতগুলো মুখে আহার যোগানো সম্ভব নয়। এইসব জঙ্গলে যে সমস্ত ভাল্লুক, গরু, ভেড়া আছে তা কিছুই ছাড়া যায় না —যেমন ছেড়ে দিতে পারি না এই ভোল্‌গার মাছ।"

উষা-গোষ্ঠী দেখল যে নিশা-জন অন্যায়ের পর অন্যায় করে চলেছে। একবার দু'বার উষা-জনের জন-সমিতি নিশা-গোষ্ঠীর জন-সমিতির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করল, স্মরণ করিয়ে দিল, এই দুই জনের মধ্যে আবহমান কাল ধরে কোনো সংঘর্ষ হয়নি ; এ কথাও বলল যে প্রতিবার শীতের সময় তারাই এখানে এসে থাকে। কিন্তু অনাহারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে যদি নিশা-গোষ্ঠীকে ন্যায়ের পথ নিতে হয় —তা কি করে সম্ভব! সকল আইন যখন বিফল তখন জঙ্গল আইনের আশ্রয় নিতে হয়। উভয় গোষ্ঠীই ভেতরে ভেতরে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাতে লাগল। একের খবর অপরের পাবার উপায় ছিল না। কারণ এই সময়ে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ আপন-আপন গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

নিশা-জনের একটি দল একদিন পাশের বনে উষা-জনের মৃগয়াভূমিতে শিকার করতে গেল। উষা-গোষ্ঠীর লোকেরা লুকিয়ে বসেছিল, তারা আক্রমণ করল। নিশা-গোষ্ঠীর লোকেরা বীরত্বের সঙ্গে লড়ল কিন্তু তারা আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে বেশীসংখ্যায় আসেনি। আপন দলের বহু মৃতকে ফেলে —আহতদের সঙ্গে নিয়ে শিকারীর দল পালিয়ে এল। জন-মাতা সমস্ত শুনল, জন-সমিতি আলোচনা করল, তারপর সর্বশেষে সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল। সমস্ত ঘটনা তাদের সামনে উপস্থিত করা হল। মৃতের নাম বার-বার উচ্চারিত হল, আহতদের সামনে এনে হাজির করা হল। মৃত ও আহতদের ভাই ছেলেরা, মা-মেয়ে-বোনেরা রক্তাক্ত প্রতিহিংসার জন্য উত্তেজিত করতে লাগল। রক্তের প্রতিশোধ নিতে না পারা এবং জন-ধর্মের বিরোধিতা করা —কেউ কল্পনা করতে পারত না। সমগ্র গোষ্ঠী সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত নিল, মৃতের রক্তের প্রতিশোধ নিতে হবে।

নাচের বাজনা যুদ্ধের বাজনায় পরিবর্তিত হল। শিশু ও বৃদ্ধদের রক্ষার জন্য কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষকে রেখে বাকি সকলে যুদ্ধযাত্রা করল ; ধনুক, পাষাণ-কুঠার, কাঠের

বল্লম ও কাঠের মুদ্গর আর দেহরক্ষার জন্য কঠিন ও দৃঢ় চামড়ার বর্ম আবরণ। সামনে চলল বাদকেরা, তারপর চলল যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত স্ত্রী-পুরুষ। গোষ্ঠী নেত্রী দিবা সকলের আগে চলল, প্রধানা হিসাবে সেই যুদ্ধের পরিচালিকা। বাজনার আওয়াজে দিগন্ত ধ্বনিত ও অনুরণিত হল, লোকের কোলাহলে বনভূমি মুখরিত হল, পশুপক্ষীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক সেদিক পালাতে স্বরু করল।

একটু পরেই তারা অনধিকৃত বনভূমিতে এসে পৌছল। কোনো সীমারেখা না থাকা সত্বেও এই সমস্ত গোষ্ঠীর লোকেদের সীমান্ত সম্পর্কে ভালোভাবেই জ্ঞান ছিল এবং এ ব্যাপারে তারা মিথ্যা বলতে পারত না। মিথ্যা তখন মানব-সমাজে অপরিচিত আর সে বিদ্যা আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। অপর গোষ্ঠীর শিকারীরা আপন গোষ্ঠীতে গিয়ে খবর দিল, এবং ঊষা-জনের যোদ্ধারা হাতিয়ারে সুসজ্জিত হয়ে ময়দানে এল। ঊষা-গোষ্ঠী বস্তুত ন্যায় চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল আপন মৃগয়াক্ষেত্র রক্ষা করতে। আর আপন ভূমি রক্ষার জন্যই তাদের সংগ্রাম। কিন্তু নিশা-গোষ্ঠী এই ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে প্রস্তুত ছিল না। ঊষা-গোষ্ঠীর মৃগয়াক্ষেত্রে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। উভয় পক্ষ থেকেই পাথরের ফলাযুক্ত বাণ শন-শন করে বর্ষিত হতে লাগল, কুঠারে-কুঠার, বল্লমে-বল্লম, মুদ্গরে-মুদ্গর যুদ্ধ হতে থাকল, উভয়পক্ষের লোকই আহত হল। হাতিয়ার ভেঙে বা হাত থেকে পড়ে গেলে হাতে হাতে, দাঁতে বা মাটি থেকে কুড়িয়ে নেওয়া পাথরের সাহায্যে লড়াই চলতে লাগল।

নিশা-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ঊষা-গোষ্ঠীর দ্বিগুণ, কাজেই ঊষা-গোষ্ঠীর পক্ষে জয়লাভ ছিল অসম্ভব। কিন্তু একটি বালকও জীবিত থাকা পর্যন্ত তাদের যুদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এক প্রহর দিন অর্থাৎ সূর্য ওঠার তিন ঘণ্টা পর যুদ্ধ স্বরু হয়েছিল —ঊষা-গোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক বনের মধ্যেই নিহত হল। গোষ্ঠী-যুদ্ধে আহত শত্রুকে ছেড়ে যাওয়া নিতান্ত অধর্মের কাজ। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ ভোল্‌গা তটে তাদের শেষ শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করে প্রাণ দিল। কয়েকজন জননী শিশু ও বৃদ্ধদের নিয়ে আবাসভূমি ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না, প্রতিহিংসা-পরায়ণ শত্রুরা তাদের অনুসরণ করে ধরে ফেলল —স্তন্যপায়ী শিশুদের ধরে ধরে তারা পাহাড়ের ওপর আছড়ে গুঁড়িয়ে দিল, বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষদের গলায় পাথর বেঁধে ভোল্‌গার জলে ডুবিয়ে দিল। তাদের বাসগৃহে রক্ষিত মাংস, ফল, মধু ও সুরা এবং অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার বাইরে এনে অবশিষ্ট জীবিত শিশু ও স্ত্রীলোকদের ঘরে বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দিল। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার লেলিহান আভার মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবন্ত মানুষের আর্তনাদ বিজয়ী নিশা-গোষ্ঠীর লোকদের উল্লসিত করে তুলল। তারা অগ্নি দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাল, শত্রুর সঞ্চিত মদ ও মাংসে দেবতা ও নিজেদের উদর পরিতৃপ্ত করল।

দিবা খুবই উল্লসিত হয়ে উঠল। তিন তিনটি মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে-আনা শিশুকে পাথরে আছড়ে মেরেছে। আজ পানাহারের পর স্থরু হল নৃত্য। ঐ আগুনের সামনেই দিবা তার তরুণ ছেলে বাস্থকে নিয়ে নাচতে স্থরু করে দিল। নাচের তালে তালে দুই উলঙ্গ নরনারী পরস্পরকে আলিঙ্গন আর চুম্বন করতে লাগল—কখনও বা ছাড়াছাড়ি হয়ে নিজেদের নিজস্ব নাচের ভঙ্গিমা দেখাতে লাগল। সকলেই বুঝল আজ রাতে বাস্থই হবে নেত্রী দিবার ক্রীড়া ও শয্যাসঙ্গী। বাস্থ তার জয়োন্মত্তা মায়ের কামনাকে অবহেলা করতে চাইল না।

নিশা-গোষ্ঠীর মৃগয়াভূমি এখন চার গুণ বেড়ে গেল আর শীতকালে তারা কোথায় থাকবে সে চিন্তাও দূর হল। তবু একটা দুশ্চিন্তা তাদের রয়ে গেল—উষা-গোষ্ঠী জীবিত অবস্থায় যে ক্ষতি করতে পারেনি এখন মৃত্যুর পর প্রেতযোনি পেয়ে তাদের প্রতিশোধ নেবে। যে ঘরে জীবিতদের পোড়ানো হয়েছিল সেই ঘরটা তো ভূতের আড্ডা হল—নিশা-গোষ্ঠীর কেউ একা সেখান দিয়ে যেতে সাহস পায় না। বহুবার শিকারীরা না-কি দেখেছে শত শত উলঙ্গ নরনারী জ্বলন্ত আগুনের সামনে নাচছে। বাসভূমি পরিবর্তনের প্রয়োজনে যেদিন ওই পোড়াঘরের সামনে দিয়ে যেতে হয়েছে—সংখ্যায় তারা বেশী ছিল আর দিনের আলো ছিল বলে রক্ষে। দিবা তো কয়েকবারই দেখছে যে, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশু মাটি থেকে উঠে এসে তার হাত ধরে ঝুলছে—ভয়ে সে চীৎকার করে উঠেছে।

৪

দিবার বয়স এখন সত্তরের ওপর। এখন সে আর নিশা-জনের কর্ত্রী নয়—তবু গোষ্ঠীর সকলেই তাকে সম্মান করে। তার বিশ বছরের নেতৃত্বে সে বংশের বৃদ্ধি এবং কল্যাণের জন্য অনেক কিছু করেছে। এই বিশ বছরে জনকে অপর গোষ্ঠীর সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করতে হয়েছে, তাতে ক্ষয়-ক্ষতি ও জনহানি হয়েছে। এখন তাদের দখলে পর্যাপ্ত মৃগয়াভূমি—তাতে কয়েক মাস স্বচ্ছন্দে চলে যায়। দিবার কাছে এ সবই ভগবানের কৃপা বলে মনে হয়। দিবার মনের ভয় এখন কাটেনি—হাতে ঝোলা মৃত স্তন্যপায়ী শিশুরা এখনও মাঝে মাঝে তার রাতের ঘুম ঘুচিয়ে দেয়।

শীতকাল এসে পড়েছে। ভোল্‌গার স্রোত জমাট হয়ে গেছে—তার ওপর কয়েক মাসের সঞ্চিত তুষার স্তূপের দিকে দূর থেকে তাকালে মনে হয় রৌপচূর্ণের অথবা পেঁজা তুলোর আঁকাবাঁকা রেখা চলে গেছে। অপর দিকে বনভূমিতে হিমশীতল নির্জীবতা ও স্তব্ধতা বিরাজ করছে। নিশা-গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা আরও বেড়েছে। তাই তাদের খাদ্যেরও প্রয়োজন বেড়েছে। এই সময়ের মধ্যে কাজ করার লোকও অনেক বেড়েছে—কাজের দিনে তাদের খাদ্যভাণ্ডারে প্রভূত পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। এমন কি

শীতকালেও পোষা কুকুর নিয়ে নিশা পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিকারে বেরুলে কিছু না কিছু পেয়েই থাকে।

শিকারের একটি নতুন উপায় তারা বার করেছে —হরিণ, গরু, বুনো ঘোড়া নিজেদের খাবারের খোঁজে এ-বন ও-বন ঘুরে বেড়ায়। বনে থাকতে থাকতে শিকারীরা লক্ষ্য করেছে যে মাটিতে বীজ পড়লে তাতে অঙ্কুর জন্মায়। তাই তারা ভিজে মাটির ওপরে ঘাসের বীজ ছড়াতে সুরু করল। ফলে সেখানে ঘাস জন্মাল, তৃণভোজী পশুরাও আসতে আরম্ভ করল —ক্রমে তারা একই অঞ্চলে বেশীদিন থাকতে লাগল।

একদিন ঋক্ষশ্রবার শিকারী কুকুরটা একটা খরগোসের পেছনে তাড়া করল— ঋক্ষশ্রবাও ছুটল তার পেছন পেছন। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল, তাই সে আপন চামড়ার আবরণটি খুলে কাঁধের ওপরে ঝুলিয়ে নিল। ইতিমধ্যে কুকুরটা কখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। তুষারের ওপর পায়ের ছাপ পড়েছে —তাই পদচিহ্ন দেখা গেল। ঋক্ষ হাঁপাতে হাঁপাতে একটা গাছের গুঁড়িতে বিশ্রামের আশায় বসে পড়ল। পূর্ণ বিশ্রামের আগেই কুকুরটার ডাক শুনতে পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে আবার দৌড়তে লাগল। ক্রমেই সে শব্দটার কাছে এসে পড়ল ; আরও কাছে এসে দেখতে পেল যে একটা পাইন গাছে হেলান দিয়ে একটি অপূর্ব সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। সাদা চামড়ার একটি পোষাক তার পরনে —সাদা শিরস্ত্রাণের নীচে আলুলায়িত কেশগুচ্ছগুলি দেখা যাচ্ছে। আর তার পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা খরগোস। ঋক্ষ এসে পৌছাল আর কুকুরটা জোরে ডাক ছাড়তে ছাড়তে তার কাছে এল। ঋক্ষ মেয়েটির মুখের দিকে চাইল। মেয়েটি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, "বন্ধু ! এ কুকুরটি কি তোমার ?"

"হ্যাঁ আমার ! কিন্তু তোমাকে তো এর আগে কখনো দেখিনি !"

"আমি কুরুবংশের মেয়ে। এই এলাকাটা —আমাদেরই।"

"কুরুবংশ !"

কুরু-গোষ্ঠী শুনে ঋক্ষর মনে কিছুটা বিদ্বেষ জন্মাল। কুরুরা তাদের প্রতিবেশী এবং কয়েক বছর ধরে বিরোধ চলছে। বিরোধ কয়েকবার যুদ্ধের পর্যায়ে উঠেছে। কুরুরা অবশ্য উষা-গোষ্ঠীর চেয়ে বেশী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। তারা বুঝেছিল যে, যুদ্ধে জেতবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই পালানোই শ্রেয় ও কার্যকরী বলে স্থির করেছে। অস্ত্রের জোরে রক্ষা না পেলেও —পালিয়ে বেঁচেছে। নিশা বংশের যোদ্ধারা প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল, তারা কুরুবংশ ধ্বংস করবে —কিন্তু এখনও সে প্রতিজ্ঞা পালিত হয়নি।

তরুণী বলল, "তোমার কুকুর এই খরগোসটি মেরেছে —এটা তুমি নিয়ে যাও।"

"কিন্তু কুরুদের মৃগয়াক্ষেত্রে মেরেছে।"

"হ্যাঁ তা মেরেছে। কিন্তু আমি কুকুরের মালিকের প্রতীক্ষায় ছিলাম।"

"প্রতীক্ষায় !"

"হ্যাঁ, মালিকের হাতে খরগোস দিয়ে দেব বলে !"

কুরু-কুলের নাম শুনে ঋক্ষর মনে যে বিদ্বেষের সঞ্চার হয়েছিল তা সুন্দরীর নম্র আলাপে বিদূরিত হল। প্রত্যুপকারের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলল, "শুধু শিকার নয়, তুমি আমার কুকুরকে ফিরিয়ে দিয়েছ। এই কুকুর আমার খুবই প্রিয়।"

"কুকুরটা সত্যিই খুব সুন্দর।"

"সারা গোষ্ঠীর মাঝে থাকলেও আমার ডাক শুনতে পেলে ছুটে আসে।"

"এর নাম ?"

"শম্ভু !"

"তোমার নাম, বন্ধুবর !"

"ঋক্ষশ্রবা, রোচনা পুত্র !"

"রোচনা পুত্র ? আমার মা'র নামও রোচনা ছিল। ঋক্ষ, খুব তাড়া না থাকলে একটু বস।"

ধনুক ও পরিধান বরফের ওপর রেখে সুন্দরীর পায়ের কাছে বসতে বসতে ঋক্ষ বলল, "তোমার মা বেঁচে নেই ?"

"না ! নিশা-গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেছে। আমাকে খুব ভালোবাসত।" বলতে বলতে তরুণীর চক্ষু আর্দ্র হয়ে এল।

ঋক্ষ নিজের হাতে তরুণীর অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বলল, "কি বিচ্ছিরি এই যুদ্ধ !"

"হ্যাঁ, কত প্রিয়জনের বিচ্ছেদ এতে সইতে হয়।"

"কিন্তু, এখনও তো যুদ্ধ মিটছে না !"

"একের উচ্ছেদ ছাড়া কি করে থামবে ?" তরুণী বলল, "শুনছি নিশা-পুত্রেরা আবার আক্রমণ করবে। আমি ভাবছি ঋক্ষ ! তোমার মতোই তো ওরাও তরুণ !"

"তোমার মতো সুন্দরী মেয়েও তো কুরু-গোষ্ঠীতে আছে।"

"তবু আমাদের একের অন্যকে মারতে হবে ঋক্ষ, এ কোন ধারা ?"

ঋক্ষের মনে পড়ল তিন দিন পর তাদের গোষ্ঠী কুরুগণের ওপর আক্রমণ করবে। ঋক্ষ কিছু বলার আগেই তরুণী বলল, "কিন্তু আমরা আর যুদ্ধ করব না।"

"লড়বে না ? কুরুরা আর যুদ্ধ করবে না !"

"ঠিকই ! আর লড়বে না। আমাদের লোক এত কমে গেছে যে, আমাদের জেতবার আর কোনো আশাই নেই।"

"কুরুরা তবে কি করবে ?"

"ভোল্‌গা তট ছেড়ে চলে যাবে। ভোল্‌গা মায়ের ধারা আমাদের কত প্রিয়। একে

আর দেখতে পাব না —তাই আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এখানে বসে বসে এর স্বপ্ত ধারাকে দেখছি।"

"তুমি তা'হলে আর ভোলগাকে দেখবে না ?"

"সাঁতারও কাটতে পাব না। এই শান্ত জলস্রোতে সাঁতার কেটে কি আনন্দই না পেতাম।" —সুন্দরীর কপোলে চোখের জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল।

"কত ক্রূর, কত নিষ্ঠুর এই যুদ্ধ !" উদাস স্বরে ঋক্ষ বলল।

"কিন্তু এই তো 'জন'-এর ধর্ম !" রোচনা বলল।

"আর বর্বর ধর্মও বটে !" ঋক্ষ জবাব দিল।*

অমৃতাশ্ব

দেশ : মধ্য এশিয়া, পামীর (উত্তর কুরু) ।। কাল : ৩০০০ খৃষ্টপূর্ব

ফরগনার সবুজ শ্যামল পাহাড়, স্থানে স্থানে প্রবাহিত নদী বা ঝরণাধারা, তা যে কত সুন্দর সে শুধু তারাই জানে যারা দেখেছে কাশ্মীরের সুষমা। শীতের অবসানে বসন্ত এসেছে, আর বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্য এই পার্বত্য উপত্যকাকে করে তুলেছে মর্তের স্বর্গ, পশুর পাল গিরিগুহার শীতের আবাস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বিস্তৃত গোচারণ ভূমিতে। দূরে দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার লোমের তৈরী তাঁবু —তার মধ্যে যেগুলি খুব লাল সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে। একটি তাঁবু থেকে জল-ভরার চামড়ার মশক কাঁধে করে একটি তরুণী বেরিয়ে এল, সে পাথরের ওপর দিয়ে নদীর তীরের দিকে এগোতে লাগল। তাঁবু থেকে বেশী দূরে সে যায়নি এমন সময় একটি পুরুষ তার সামনে এসে দাঁড়াল। তরুণীর মতোই তার শরীর একটি পাতলা সাদা পশমের কম্বলে ঢাকা। কম্বলের দুইটি প্রান্ত এমনভাবে ডান কাঁধের ওপরে গেরো দিয়ে বাঁধা যে শুধু ডান হাত, কাঁধ আর বুকের অর্ধাংশ অনাবৃত। পুরুষটির চুলগুলি পিঙ্গল, গোঁফটি সুন্দরভাবে পাকানো। পুরুষটিকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। মুচকি হেসে পুরুষটি বলল, "সোমা আজ দেরি করে জল ভরতে যাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ, ঋজ্রাশ্ব। কিন্তু পথ ভুলে তুমি এদিকে কোথায় ?"

"ভুলিনি সখি ! আমি তোমার কাছেই এসেছি।"

---

* আজ থেকে সোয়া দুইশত পুরুষ আগের আর্যগোষ্ঠীর কাহিনী। এদের হিন্দী-স্লাভ ভাষী বা শতমবংশ বলা হত। তখন ভারত-ইরাণ-রুশের শ্বেতজাতি একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল।

"আমার কাছে? অনেক দিন পরে।"

"আজ সোমার কথা মনে পড়ল!"

"তা বেশ ভালোই, আমাকে জল নিয়ে ফিরতে হবে, অমৃতাশ্ব খেতে বসেছে!" দু'জনেই কথা বলতে বলতে নদী তীর পর্যন্ত গিয়ে ঘরে ফিরল!

ঋজ্রাশ্ব বলল, "অমৃতাশ্ব বেশ বড় হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ, তুমি তো অনেক দিন দেখনি।"

"ওর চার বছর বয়স থেকে।"

"এখন তার বয়স হল বারো। সত্যিই বলছি ঋজ্রাশ্ব, রূপে সে তোমারই মতো।"

"কি জানি, সে সময় আমি ছিলাম তোমার কৃপার পাত্র। তা অমৃতাশ্ব এতদিন ছিল কোথায়?"

"বাহ্লীকে দাদামহাশয়ের কাছে।"

তরুণী জলভর্তি মশকটি নামিয়ে রেখে নিজের স্বামী কৃচ্ছ্রাশ্বকে ঋজ্রাশ্বের আসার খবর দিল। তারা স্বামী স্ত্রী দু'জনে এবং পেছনে অমৃতাশ্ব তাঁবু থেকে বাইরে এল। ঋজ্রাশ্ব সসম্মানে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "বল বন্ধু কৃচ্ছ্রাশ্ব, কেমন ছিলে তুমি?"

"অগ্নিদেবতার কৃপায় ভালোই আছি ঋজ্রাশ্ব। এস খাওয়া যাক। এক্ষুনি সিদ্ধি বেটে মধু আর অশ্বিনী-ক্ষীর যোগে এই সোমরস তৈরী হয়েছে।"

"মধু সোম? কিন্তু এত সকালে কি করে?"

"আমি ঘোড়ার চারণভূমিতে যাচ্ছি। বাইরে দেখছ না ঘোড়া তৈরী?"

"তা'হলে আজকে সন্ধ্যায় ফিরবার ইচ্ছা নেই?"

"নাও ফিরতে পারি। তাই এ সোমের মশক আর অশ্ব-মাংস সঙ্গে নেব।"

"অশ্ব-মাংস!"

"হ্যাঁ, আমার পশুগুলির ওপর অগ্নিদেবতার কৃপা আছে। আমি তো ঘোড়াই বেশী পালন করি।"

"হ্যাঁ, কৃচ্ছ্রাশ্ব! তোমার নামটা কিন্তু উল্টো।"

"মা বাবার সময় আমাদের অশ্বের কৃচ্ছ্রতা ছিল, তাই আমার নাম কৃচ্ছ্রাশ্ব।"

"কিন্তু এখন ত ঋদ্ধাশ্ব হওয়া উচিত।"

"আচ্ছা, ভেতরে চল।"

"এই পাইন গাছের নীচে সবুজ ঘাসের ওপরই বসি না কেন, বন্ধু!"

"ঠিকই। সোমা, তুমি তা'হলে নিয়ে এস, সোম আর মাংস। এখানেই বসে বন্ধুকে তৃপ্ত করি।"

"কিন্তু কৃচ্ছ্র, তুমি তো ঘোড়ার পালের দিকে যাচ্ছিলে যে?"

"আজ না হয় কাল যাব। বস ঋজ্রাশ্ব!"

সোমা ভাণ্ডের মশক এবং চষক নিয়ে এল। দু'বন্ধুর মাঝে অমৃতাশ্বও বসে পড়ল। সোমা ভাণ্ড ও চষক মাটিতে রেখে বলল, "একটু অপেক্ষা কর, বিছানা এনে দিচ্ছি।"

"না সোমা! এই নরম ঘাস বিছানার চেয়েও ভালো।" —ঋজ্রাশ্ব বলল।

"আচ্ছা, বল তো ঋজ্র! লবণ দিয়ে সেদ্ধ-করা মাংস খাবে, না পোড়া-মাংস খাবে? আট মাসের বাছুরের-মাংস খুবই নরম।"

"আমি তো বাছুরের পোড়ানো মাংসই পছন্দ করি। আমি কখনও কখনও গোটা বাছুর আগুনে পোড়াই। পোড়াতে দেরি হলেও কিন্তু মাংস খুব সুস্বাদু হয়। তোমাকে কিন্তু সোমা! ঠোঁটের স্পর্শে আমার চষক মিষ্টি করে দিতে হবে।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, সোমা! ঋজ্র দীর্ঘ দিন পরে এসেছে।" —কৃচ্ছ্রাশ্ব বলল।

"আমি এখুনি আসছি, জোর আগুন আছে, মাংস পোড়াতে দেরি হবে না।"

কৃচ্ছ্রাশ্বকে চষকের পর চষক নিঃশেষ করতে দেখে ঋজ্রাশ্ব বলল,"এত তাড়া কিসের?"

"সিদ্ধি হচ্ছে অপূর্ব! সোমার হাতে তৈরী সিদ্ধি আরও অপূর্ব! যেন অমৃত। এ সিদ্ধি লোককে অমর করে। সিদ্ধি পান কর এবং অমর হও।"

"তুমি কি অমর হতে চাও? যে রকম চষকের পর চষক নিঃশেষ করে চলেছ, তাতে অচিরেই মৃত্যুর পর অমরত্ব লাভ করবে।"

"কিন্তু তুমি তো জান ঋজ্র, সিদ্ধি আমি কত ভালোবাসি!"

এই সময় সোমা চামড়ায় করে পোড়ানো তিন টুকরো মাংস নিয়ে এসে বলল, "কৃচ্ছ্র! সোমাকে কি তুমি ভালোবাস না?"

কৃচ্ছ্র স্বর পরিবর্তন করে বলল, "সোমা ও সোম দুটিকেই আমি ভালোবাসি।" তার চোখ লাল হয়ে উঠছিল। সে বলল, "সোমা, আজ তোমার কিসের চিন্তা?"

"হ্যাঁ, আজকে তো আমি ঋজ্রের।"

"অতিথি না পুরানো বন্ধু?" —কৃচ্ছ্র হাসতে চেষ্টা করে বলল।

ঋজ্রাশ্ব সোমার হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে সোমপূর্ণ চষক তার মুখের কাছে ধরল। সোমা দু'ঢোক পান করে বলল, "এখন তুমি খাও ঋজ্র! অনেক দিন পরে আজ আবার সুদিন ফিরেছে।"

ঋজ্রাশ্ব পুরো চষকটি এক নিঃশ্বাসে পান করে পাত্রটি মাটিতে রেখে বলল, "তোমার ঠোঁটের স্পর্শে সোম না জানি কতই মিষ্টি হয়।"

কৃচ্ছ্রাশ্বের ভেতর সোমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি নিজের চষকটি ভর্তি করে নিয়ে সেই পেয়ালা সোমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আড়ষ্ট গলায় বলল, "তা'হলে সোমা, এটাও মধুর বানিয়ে দাও!"

সোমা ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করে চষক ফিরিয়ে দিল। অমৃতাশ্ব বৃদ্ধদের প্রেমালাপে রস পেল না, তাই সমবয়স্ক বালক বালিকাদের সঙ্গে খেলতে চলে গেল। কৃচ্ছ্রাশ্বের মাথা ঝুঁকে পড়ছিল, সে ঢুলু ঢুলু চোখে বলল, "সোমা আমি গান গাই…"

"হ্যাঁ, তোমার মতো গায়ক কুরুদের মধ্যে আর কেউ কি আছে?"

"ঠি-ই-ক ব-লে-এ-ছ, আ-মা-র জু-উ-ড়ি-ই নে-ই। বেশ তা-া-হোলে…"

"থাক্ কৃচ্ছ্র! দেখছ না তোমার গান শুনে সমস্ত পশু-পক্ষী জঙ্গল ছেড়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।"

"হু-হু-ম-ম"

এটা সোম খাওয়ার সময় নয়। সাধারণত তার সময় সূর্যাস্তের পরে; কিন্তু কৃচ্ছ্রাশ্বের তো কোনো একটি বাহানার দরকার। সে বেহুঁশ হয়ে পড়ায় সোমা ও ঋজ্রাশ্ব চষক রেখে দিল এবং দু'জনে নদীর ধারে একটি টিলার ওপর গিয়ে বসল। পাহাড়ের মধ্যে যেখানটা কিছুটা সমতল সেখান থেকে নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। নদী ছিল ছোট-বড় উপলখণ্ডে ভরা। তার ওপর জলের আঘাত লাগায় শব্দ হচ্ছিল। পাথরের আড়ালে মাছগুলিকে চলতে ফিরতে দেখা যাচ্ছিল। তীরস্থিত শুষ্ক জমিতে বিশাল শাল, দেবদারু বৃক্ষাদি বিরাজ করছিল। পাখীর সুমিষ্ট সঙ্গীত আর ফুলের সুগন্ধি মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছিল। অনেকদিন পরে তারা দু'জনে এই স্বর্গীয় ভূমিতে অতীত দিনের প্রেমালাপের পুনরাবৃত্তি করছিল। তাদের মনে পড়ছিল সে-দিনগুলির কথা, যখন কিনা সোমা ছিল ষোড়শী পিঙ্গলা-কেশী। বসন্ত উৎসবের সময় ঋজ্রাশ্বও বাহ্লীকে আপন মামার ঘরে গিয়েছিল। সোমা ছিল তার মাতুল কন্যা। ঋজ্রাশ্বও ছিল তার প্রেমিকদের একজন। তখন সোমার প্রণয়াভিলাষীদের ভেতর বেশ প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু জয়মাল্য জুটল কৃচ্ছ্রাশ্বের অদৃষ্টে। অন্যান্য সকলের মতো ঋজ্রাশ্বকেও পরাজয় স্বীকার করে নিতে হল। আজ সোমা কৃচ্ছ্রাশ্বের স্ত্রী কিন্তু সেই প্রাণপূর্ণ যুগে স্ত্রীলোক পুরুষের একচেটে জঙ্গম সম্পত্তি হতে স্বীকার করেনি, এর জন্য অস্থায়ী প্রেমিক গ্রহণ করবার অধিকার ছিল। অতিথি এবং বন্ধুর নিকট নিজের স্ত্রীকে সেবা করতে পাঠানো তখন সর্বমান্য সদাচার বলে গণ্য হত। তাই আজ সোমা ঋজ্রাশ্বের।

সন্ধ্যায় গ্রামের নরনারী মহাপিতরের বিস্তৃত আঙ্গিনায় জড়ো হল। সোমা মধু সুরা এবং সুস্বাদু গো-অশ্ব মাংস নিয়ে যাচ্ছিল। মহাপিতরের পুত্রের আজ জন্ম উৎসব। কৃচ্ছ্র নিজে বেসামাল অবস্থায় ছিল তাই তার বদলে সোমা এবং ঋজ্রাশ্ব উপস্থিত ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত পান, গীত, নৃত্য করে মহোৎসব হল। সোমার গান এবং ঋজ্রাশ্বের নৃত্য কুরু-জন সর্বদাই ভালোবাসত।

২

"মধুরা ! তুমি ক্লান্ত হওনি তো ?"

"না, আমি ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসি ।"

"কিন্তু, সেই দস্যুরা তোমাকে কি খুব খারাপভাবে আটক করেছিল ?"

"হ্যাঁ, বাহ্লীকরা পক্‌থদের শুধু গরু এবং ঘোড়াই নয় পরন্তু তারা মেয়েদেরও লুট করতে এসেছিল ।"

"হ্যাঁ, পশু-লুণ্ঠন দুটি 'জন'-এর মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি করে । কিন্তু কন্যা লুট করলে শত্রুতা ক্ষণস্থায়ী হয়, কারণ শেষপর্যন্ত শ্বশুরকে জামাতার সমাদর করতেই হয় ।"

"কিন্তু তোমার নাম আমার মনে নেই ।"

"অমৃতাশ্ব ; কৃচ্ছ্রাশ্ব-পুত্র, কৌরব ।"

"কৌরব ! কুরু আমার মামার কুল ।"

"মধুরা এখন তুমি নিরাপদ । বল —কোথায় যাবে ?"

মধুরার মুখে আনন্দের রেখা ফুটে উঠে অচিরেই বিলীন হয়ে গেল দেখে অমৃতাশ্ব কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, "অতীতে পক্‌থদের কন্যারা আমাদের গাঁয়েও এসেছে ।"

"সমস্তই লুট করে তো ?"

"না, তাদের ভেতর অধিকসংখ্যক মাতুল কন্যা ছিল ।"

"তা'হলেও মেয়েদের লুট-পাট করা আমার খুব খারাপ লাগে ।"

"আর আমিও এটা খারাপ মনে করি, মধুরা ! বিশেষ করে যেখানে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রেমের সম্ভাবনা আছে কি-না —তা জানা নেই ।"

"মাতুল কন্যা বিয়ে করা এর চেয়ে ভালো । কেন না তা'হলে প্রথম হতেই পরিচিত হওয়ার সুযোগ মেলে ।"

"তোমার এ রকম কোনো প্রেমিক ছিল না-কি, মধুরা ?"

"না, আমার কোনো পিসীমা নেই ।"

"অন্য কোনো লোক ?"

"স্থায়ীভাবে নয় ।"

"তুমি কি আমাকে ভাগ্যবান করতে পার ?"

মধুরার সলজ্জ দৃষ্টি নত হয়ে গেল । অমৃতাশ্ব বলল, "মধুরা ! এ রকম জনপদও আছে যেখানে স্ত্রী অন্যের নয়, নিজের ।"

"তোমার কথা বুঝলাম না, অমৃতাশ্ব !"

"স্ত্রীলোককে কেউ লুট করে না কিম্বা স্থায়ী পত্নী করে রাখতে পারে না, সেখানে স্ত্রী পুরুষ সবাই সমান ।"

"পুরুষের মতো মেয়েরাও সমানে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে ?"

"হ্যাঁ, স্ত্রীর সে স্বাধীনতা আছে।"

"কোথায় সে 'জনপদ' অমৃতাশ্ব —অঃ অমৃতাশ্ব !"

"তুমি আমায় অমৃত বল মধুরা ! সে 'জনপদ' পশ্চিমে, এখান থেকে অনেক দূরে !"

"অমৃত, তুমি কি সেখানে গিয়েছ ?"

"হ্যাঁ, সেখানে নারী আজীবন স্বাধীনভাবে থাকে, যে রকম জঙ্গলে মৃগ স্বতন্ত্র বিচরণ করে, পাখি গাছে গাছে স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়ায়।"

"নিশ্চয়ই খুব সুন্দর 'জনপদ' ? সেখানে কেউ মেয়েদের লুট করে না তো ?"

"স্বাধীনা বাঘিনীকে জীবন্ত কে লুট করতে পারে ?"

"আর পুরুষ, অমৃত ?"

"পুরুষও স্বাধীন।"

"ছেলেমেয়েরা ?"

"মধুরা, সেখানকার সংসার অন্য রকমের —সমস্ত গ্রাম নিয়ে একটি পরিবার।"

"সেখানে পিতার কর্তব্য কি ?"

"পিতা কে তা বলা যায় না। সেখানে নারী পত্নী নয়, স্বচ্ছন্দ তার প্রেম।"

"তা'হলে সেখানে কেউ পিতাকে জানে না ?"

"ঘরের সমস্ত পুরুষই পিতা।"

"এ কেমন প্রথা ?"

"এই জন্যই সেখানে নারী স্বতন্ত্র, তারা যোদ্ধা, শিকারী !"

"আর গরু-ঘোড়া পালনের কি ব্যবস্থা ?"

"গরু-ঘোড়া জঙ্গলে থাকে, যেভাবে এখানে থাকে হরিণ।"

"আর ছাগল, ভেড়া ?"

"সেখানকার মানুষ পশুপালন জানে না। শিকার, মাছ এবং জঙ্গলের ফলমূল খেয়ে দিন কাটায়।"

"শুধু শিকার ! তা'হলে কি তাদের দুধ জোটে না ?"

"জোটে মানুষের দুধ, তাও আবার শৈশবেই।"

"ঘোড়ায় চড়ে না ?"

"না। আর চামড়া ছাড়া তারা অন্য কিছু পরিধেয়ও জানে না।"

"তারা নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পায় ?"

"তা'হলেও সেখানকার স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন। পুরুষের মতোই তারা ফল সংগ্রহ করে, শিকার করে, যুদ্ধের সময় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে।"

"আমিও এ জিনিস পছন্দ করি। আমি অস্ত্র চালাতে শিখেছি কিন্তু পুরুষের মতো যুদ্ধে যাওয়ার সুযোগ কোথায় ?"

"পুরুষরা এ কাজ নিজ হস্তে গ্রহণ করেছে। গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া তারা পালন করে ; তারা স্ত্রীকে পশু-পত্নী নয়, গৃহপত্নী করেছে।"

"আর মেয়েদের লুট করার উপযুক্ত করে তৈরী করেছে। সেখানে মেয়েদের লুট করা হয় না তো, অমৃত !"

"একটি 'জন'-এর ছেলেমেয়ে সর্বদাই সেই জনের ভেতর থাকে। 'জন'-এর বাইরে যেতে দেওয়া হয় না, গ্রহণ করাও হয় না।"

"এ কি রকম প্রথা ?"

"সে সব এখানে চলতে পারে না।"

"তাই বলে মেয়ে লুট চলতে থাকবে ?"

"হ্যাঁ, মধুরা ! আচ্ছা, তখন তুমি কি বলছিলে যেন ?"

"কোন বিষয় ?"

"আমার প্রেম সম্বন্ধে।"

"আমি তোমার বশীভূত, অমৃত !"

"কিন্তু আমি তোমাকে লুট করে নিয়ে যেতে চাই না।"

"তুমি কি আমাকে যুদ্ধ করতে দেবে ?"

"যতদূর পর্যন্ত আমার পক্ষে সম্ভব।"

"আর শিকার করতে ?"

"যতদূর আমার ক্ষমতা আছে।"

"ব্যাস এটুকুই··· ?"

"কেন না আমাকে মহাপিতরের আদেশ পালন করতে হবে। নিজের দিক থেকে যদি বল মধুরা —আমি তোমাকে স্বাধীন মনে করব।"

"প্রেম করা না-করার জন্যও ?"

"প্রেম আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করছে। আচ্ছা তার জন্যেও।"

"তবে অমৃত, আমি তোমার প্রেম গ্রহণ করছি।"

"তা'হলে আমরা কুরু 'জনে' চলে যাব না-কি পক্‌থ 'জনে' ?

"যেখানে তোমার খুশী।"

অমৃত ঘোড়া ফিরিয়ে মধুরার নির্দেশিত পথে পক্‌থ গ্রামে পৌছাল। গ্রামে কোনো তাঁবুতে কেউবা মারা গিয়েছে ; কেউ জখম হয়েছে, কারুর কন্যা লুষ্ঠিত হয়েছে। চারিদিকে হল্লা হচ্ছিল।

মধুরার মা কাঁদছিল এবং বাবা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। এ সময় অমৃতাশ্বর ঘোড়া গিয়ে তাদের তাঁবুর বাইরে দাঁড়াল।

অমৃতাশ্ব নীচে নামার পর মধুরা লাফিয়ে পড়ল এবং অমৃতাশ্বকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে গেল। হঠাৎ একাকী কন্যাকে দেখে বাপ মা প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারল না। মা তাকে জড়িয়ে ধরল তার চোখের জলে মেয়ের মুখ ভেসে যেতে লাগল। মা শান্ত হলে, বাবার প্রশ্নের উত্তরে মধুরা বলল, "বাহ্লীকরা পক্‌থ কন্যাদের লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে লুট করে যে নিয়ে যাচ্ছিল সে একটু পেছিয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে আমি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ি। ঠিক সে সময় একটি তরুণ অশ্বারোহী এসে উপস্থিত হল, সে বাহ্লীককে যুদ্ধে আহ্বান করে জখম করে মাটিতে ফেলে দিল। সেই কুরু তরুণ আমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিতে এনেছে।"

পিতা বলল, "সেই কুরু তরুণ তোমাকে নিয়ে যেতে চাইল না?

"বলপূর্বক নয়।"

"কিন্তু আমাদের জনপদের নিয়ম অনুসারে তুমি তার।"

"বাবা, আমি তাকে ভালোবাসি!"

মধুরার পিতা বাইরে এসে অমৃতাশ্বকে অভ্যর্থনা করে তাকে তাঁবুর ভেতর নিয়ে গেল। গ্রামবাসীরা সব কথা শুনে আশ্চর্য বোধ করল। সকলের সম্মান ও সহানুভূতির মধ্যে অমৃতাশ্ব মধুরাকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায় নিল।

৩

অমৃতাশ্ব তখন নিজ কুরু-গ্রামের মহাপিতর। তার পঞ্চাশাধিক অশ্ব, গরু ও অনেকগুলি ছাগল আর ভেড়া ছিল। তার চার ছেলে ও মধুরা পশু-পালন এবং গৃহকাজ করত। গ্রামের দরিদ্রশ্রেণীর কিছু লোকও তার ওখানে কাজ করত। তবে ভৃত্যের মতো নয়, আপন লোকের মতোই। একজন কুরুকে আর একজন কুরুর সমতা স্বীকার করতে হত। অমৃতাশ্ব যে সব গ্রামে চলাফেরা করত সে সব গ্রামে পঞ্চাশটির অধিক পরিবার বাস করত। তাকে তাদের ঝগড়ার আপোষ এবং মামলার বিচার করতে হত। আবার জল, রাস্তা-ঘাট এবং অন্যান্য সার্বজনিক কাজও তাকেই করতে হত। যুদ্ধ—যা প্রায়ই ঘটত তাতে মহাপিতরকে সৈন্যদলের প্রধানের কাজ করতে হত। বস্তুত, যুদ্ধে সফলতা লাভ করলেই সে সময় মানুষ মহাপিতরের পদ লাভ করত।

অমৃতাশ্ব বড় যোদ্ধা ছিল। পক্‌থ, বাহ্লীক ও অন্যান্য জনের সঙ্গে যুদ্ধে সে নিজের বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। মধুরাকে সে যে কথা দিয়েছিল তা পালন করেছিল। মধুরা অমৃতাশ্বের সঙ্গে শুয়োর, বাঘ শিকারই শুধু করত না, যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করত। যদিও কেউ কেউ এ কাজ পছন্দ করত না—তারা বলত স্ত্রীলোকের কাজ হল ঘরে।

অমৃতাশ্বকে প্রথম যেদিন মহাপিতর নির্বাচন করা হয় সেদিন কুরু-পুরে মহোৎসব পালন করা হল। সেদিন তরুণ-তরুণীরা অস্থায়ী প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ হল। গ্রীষ্মের দিনে নদীর উপত্যকায় এবং পাহাড়ের ওপরে গরু, ঘোড়ার পাল মনের সুখে বিচরণ করছিল। গ্রামবাসীরা ভুলেই গেল যে তাদেরও শত্রু আছে। পশু-ধন হতেই তাদের শত্রু সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কুরুজন ভোল্‌গার তীরে যে যুগে বাস করত, তখন তাদের নিকট পশু ধন ছিল না। তাদের জঙ্গল থেকে আহার্য সংগ্রহ করতে হত। শিকার, মধু কিংবা ফল না পেলে তারা অনাহারে থাকত। আর এখন! কুরুগণ আহারের জন্য কিছু পশু, গরু, ঘোড়া, ছাগল, গাধা ইত্যাদি স্থায়ীভাবে রাখে। তাদের শুধু মাংস, দুধ, চামড়াই নয় এই পশুগুলো পশমের বস্ত্র পর্যন্ত সরবরাহ করে। কুরু স্ত্রীগণ সুতো কাটতে আর কম্বল বুনতে কুশলী! তাদের এ কুশলতা সমাজে বেশীদিন পূর্বসম্মান অধিকার করে থাকতে পারল না। এখন স্ত্রীর নয় পুরুষের রাজ্য। পুরুষ-শাসিত সমাজে সম্পদের অধিকার, সামাজিক ব্যবস্থা অনেক বদলে গেল। স্ত্রীর রাজ্যে যেখানে একাধিক পরিবার একত্রে বাস করত, একসঙ্গে কাজ করত, সেখানে আজকের ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের, ভিন্ন ভিন্ন পশু-সম্পদ এবং ভিন্ন ভিন্ন লাভ লোকসান। হ্যাঁ, সকলের বিপদের সময় 'জন' আবার পুরনো 'জন'-এর রূপ নিত।

অমৃতাশ্ব মহাপিতর নির্বাচিত হল। মহাপিতরের মহোৎসবে মত্ত 'জন'-এর লোকেরা নিজেদের পশু-ধনের প্রতি কোনো নজর রাখল না। বাদ্যের শব্দে নৃত্যপর তরুণরা কেবল সোম-সুরা এবং সুন্দরী তরুণীদের কথাই মনে করতে পারত। এক প্রহর রাত আর বাকি কিন্তু নৃত্যগীত তখনও বন্ধ হওয়ার কোনো উপক্রম নেই। ঠিক এই সময় চারদিক থেকে কুকুরগুলিকে জোরে চীৎকার করতে করতে উপত্যকার ওপরের দিকে ছুটতে দেখা গেল। অমৃতাশ্ব পরিমিত সোম পান করত, আর তাতেই আনন্দ পেত। চোখে লাল রঙ ফুটে ওঠে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বেহুঁস হয়ে পড়ে না। কুকুরগুলির ডাক শুনে সে উঠে দাঁড়াল। কাঠের হাতলযুক্ত নিজের পাষাণ মুদ্গার বাগিয়ে নিল এবং নদীর যেদিক হতে শব্দ আসছিল সেদিকে চলতে সুরু করল। সামান্য অগ্রসর হওয়ার পর অস্তগামী চাঁদের আলোতে একটি স্ত্রীলোককে আসতে দেখা গেল। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। মূর্তি, নিকটবর্তী হলে দেখা গেল —সে মধুরা। মধুরা তখনও ঘন-ঘন শ্বাস নিচ্ছিল, সে উত্তেজিত স্বরে বলল, "পুরুরা আমাদের পশুগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে!"

"তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে? আর আমাদের ছেলেরা নেশায় চুর! তুমি কতদূর ওদের পেছনে পেছনে গিয়েছিলে, মধুরা?"

"একেবারে কাছে নয় —যতদূর থেকে দেখা যায় সেই পর্যন্ত।"

"আমাদের সমস্ত পশু নিয়ে যাচ্ছে?"

"ওদের দেখে মনে হল —চারিদিকে ছড়ানো পশুদের একত্র করে নিয়ে যাচ্ছে।"

"তুমি কি মনে করছ, মধুরা ?"

"দেরী করবার আর সময় নেই।"

"কিন্তু আমাদের সব ছেলেরা নেশায় মত্ত !"

"যারা চলতে সক্ষম তাদের নিয়ে এখনই আক্রমণ করা চাই।"

"হ্যাঁ, ঠিক কথা ; কিন্তু, মধুরা, আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া উচিত নয়। এই খবরেই অর্ধেক লোকের নেশা কেটে যাবে এবং বাকি লোকদের দই খাওয়াতে হবে। যখনই যার নেশা কেটে যাবে তখনই তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো চাই।"

"আর কুরু মেয়েরা ?"

"আমি কুরুদের মহাপিতর হিসাবে এই আদেশ দিচ্ছি, তারাও যুদ্ধক্ষেত্রে যাক্ ! সেই প্রাচীন প্রথাকে আবার আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে।"

"আমি আগে যাবার চেষ্টা করব না ; তবে তাড়াতাড়িই কাজ সারতে হবে।"

মহাপিতরের আদেশে বাজনা একদম বন্ধ হল। নর-নারী মহাপিতরের চারিদিকে জড়ো হল। সত্যি-সত্যিই গো-অশ্ব চুরির কথা শুনে তাদের মধ্যে অনেকেরই নেশা কেটে গেল। তাদের চেহারায় প্রণয়ের কোমলভাব কেটে গিয়ে বীরভাব প্রকাশ পেল, মহাপিতর মেঘগম্ভীর কণ্ঠে বলল, "কুরু নর-নারীগণ ! পুরু শত্রুর কাছ থেকে আমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে হবে। তোমাদের মধ্যে যাদের চেতনা আছে, নিজ নিজ হাতিয়ার নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হও এবং আমাকে অনুসরণ কর, যারা নেশায় এখনও নিঝুম হয়ে আছ তারা মধুরার কাছ থেকে দই নিয়ে খাও আর নেশা কাটার সঙ্গে সঙ্গে চলে এস। কুরুনারীগণ ! আজ তোমাদেরও যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে নির্দেশ দিচ্ছি। প্রাচীন কালের কুরু রমণীগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত —এ কথা আমরা বৃদ্ধদের কাছে শুনেছি। আজ তোমাদের মহাপিতর অমৃতাশ্ব তোমাদের এই আদেশ দিচ্ছে।"

মুহূর্ত মধ্যে চল্লিশটি ঘোড়া সংগ্রহ হল। পুরুরা যতগুলি পশু জড় করতে পেরেছিল তা' তারা উপত্যকার অপর পারে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পুরো দু'ঘণ্টা পশ্চাৎধাবনের পর উষার প্রথম আলো ফোটার সময় কুরুগণ তাদের দেখতে পেল। ঘোড়া আর গরুর দল-গুলিকে একত্রিত করে পাহাড়ের ওপর তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়াটা সহজ কাজ ছিল না। পুরু অশ্বারোহীগণ তাদের চামড়ার চাবুক বাতাস এবং পাথরের ওপর আঘাত করে পশুগুলিকে ভয়াতুর করছিল। অমৃতাশ্ব দেখল যে, পুরুরা সংখ্যায় প্রায় শ'খানেক হবে। মাত্র চল্লিশটি ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ সুরু করা উচিত কি অনুচিত তা নিয়ে বেশীক্ষণ অযথা মাথা ঘামাতে চাইল না। শিংয়ের লম্বা ভল্ল বাগিয়ে অমৃতাশ্ব শত্রুর ওপর আক্রমণের নির্দেশ দিল।

কুরু বীর এবং বীরাঙ্গনাগণ সম্মুখে ঘোড়া ছোটাল। তাদের দেখা মাত্রই পুরুরা কিছু লোককে পশুগুলি আটকিয়ে রাখবার জন্যে ছেড়ে দিল। পুরুগণ নীচের দিকে ছুটতে লাগল এবং ঘোড়ার পুরো সুযোগ গ্রহণের জন্য নদী তীরের একটি উন্মুক্ত মাঠে দাঁড়িয়ে কুরুদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অমৃতাশ্বের সে মূর্তি তখন সত্যই দেখবার মতো। অমৃতাশ্বের ঘোড়া অমৃত, এখন দু'জনকেই অভিন্ন বলে মনে হচ্ছিল। তার হরিণের সুতীক্ষ্ণ ভল্ল একবার যার শরীরে লাগত, দ্বিতীয় আঘাতের জন্য তাকে ঘোড়ার ওপর বসে থাকতে হত না। পুরুগণ ধনুর্বাণ ও পাষাণ-পরশুর ওপর বেশী নির্ভর করে ভুল করেছিল। যদি তাদের কাছে অত শিংয়ের ভল্ল থাকত তা'হলে নিশ্চয়ই কুরুরা তাদের মোকাবিলা করতে পারত না। যুদ্ধ এক ঘণ্টা চলছে, পুরুগণ তখনও সংগ্রাম করছিল। কিন্তু তাদের এক তৃতীয়াংশ যোদ্ধা হতাহত হয়েছে, এটাই হল ভয়ের কারণ। ঠিক এই সময় ত্রিশজন কুরু অশ্বারোহী যুদ্ধক্ষেত্রে এসে হাজির হল। কুরুদের সাহস অনেক বেড়ে গেল। পুরুগণ ভয়ানকভাবে প্রাণ হারাতে লাগল। নিজেদের অবস্থা খারাপ দেখে যে অশ্বারোহীদের লুণ্ঠিত পশুগুলিকে আগ্‌লাবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তারাও এসে হাজির হল কিন্তু ঠিক্ এই সময়ে চল্লিশ জনের একটি কুরু নারীর দল নিয়ে মধুরা এসে যুদ্ধে যোগ দিল; দেড় ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধ হল। অধিকাংশ পুরু হতাহত হল আর কিছু পালিয়ে গেল।

আহতদের শেষ করে কুরুবাহিনী পুরুদের গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল। গ্রাম চার ক্রোশের ওপর! সমস্ত গ্রাম জনশূন্য। লোকজন তাঁবু ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। তাদের পশুগুলো এখানে-ওখানে বিচরণ করছে। সর্বপ্রথম কুরুদের বোঝাপড়া করতে হবে পুরুদের সঙ্গে। পুরুগণ বিপন্ন হল চারিদিক থেকে ঘেরাও হয়ে। উত্তরের দিকে পালিয়ে যাওয়ার সুবিধেও ছিল না। উপত্যকা ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হয়েছে আর চড়াইও ছিল খুব কষ্টকর। তবু প্রাণের দায়ে নর-নারী ঘোড়ায় করে পালাচ্ছিল। অবশেষে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছাল যে ঘোড়া আর সামনের দিকে চলতে পারে না। লোকজন পায়ে হেঁটে চলতে লাগল। কুরুগণ তাদের খুব কাছে এসে পড়ল। বৃদ্ধ, স্ত্রী ও শিশুরা তাড়াতাড়ি এগুতে পারছিল না, তাই তাদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবার জন্য কিছু পুরু যোদ্ধা একটি সঙ্কীর্ণ জায়গায় দাঁড়াল। কুরুরা তাদের সমস্ত শক্তি কাজে লাগাতে পারছিল না। এ জন্যই পুরুদের হাত থেকে রাস্তা উন্মুক্ত করতে কয়েক দিন সময় লাগল। পুরু এবং কুরু উভয় দলই পায়ে হেঁটে আসছিল। কিন্তু পুরুদের ভেতর পুরুষের সংখ্যা দশ-বার জনের বেশী ছিল না। তাই তারা মাত্র অল্পদিনই পুরু পরিবারকে রক্ষা করতে পারল। একদিন কিছু সাহসী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিয়ে একটি দুরূহ পথ ধরে ওই উপত্যকা ত্যাগ করল এবং পাহাড় পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেল। পুরুদের শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকেরা প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল—কুরুরা শেষ পর্যন্ত তাদের পাকড়াও

করল। বন্দী করে রাখা তখনকার পিতৃতান্ত্রিক যুগের আইন-বিরুদ্ধ কাজ ছিল। তাই শিশু থেকে আরম্ভ করে সমস্ত পুরুকুলকে তারা মেরে ফেলল এবং স্ত্রীগণকে সঙ্গে নিয়ে গেল। পুরুদের সমস্ত পশু-ধনও তারা করায়ত্ত করল। এখন সেই হরিৎ নদীর উপত্যকার নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত কুরুদের চারণভূমি। এক পুরুষ পর্যন্ত মহাপিতর একাধিক পত্নী গ্রহণ করবার বিধান দিলেন এবং এই সময় কুরুদের ভেতর সর্বপ্রথম সপত্নী দেখা গেল।*

পুরুহুত

দেশ : বক্ষু উপত্যকা (তাজিকিস্তান) ॥ কাল : ২৫০০ খৃষ্টপূর্ব

বক্ষুর কলকল ধ্বনি মুখরিত ধারা বয়ে চলেছে। এর দক্ষিণতটের জলধারা থেকেই পাহাড় সুরু হয়েছে, কিন্তু বামদিকে বেশী ঢালু হওয়ার দরুন উপত্যকা প্রশস্ত বলে মনে হচ্ছে। দূর থেকে দেখলে গাঢ়-সবুজ উত্তুঙ্গ পাইন-বৃক্ষরাজির কালো ছায়া ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু কাছে এলে দেখা যায় এদের সূচ্যগ্র পত্রবিশিষ্ট শাখাসমূহ, নীচ থেকে ক্রমশ ছোট হয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে। পাইন বৃক্ষশ্রেণীর নীচে অন্যান্য রকমারি বনস্পতি বিরাজ করছে। গ্রীষ্মের শেষ কিন্তু বর্ষা এখনও সুরু হয়নি।

বক্ষুর বাম-তট ধরে হেঁটে চলছিল একটি তরুণ, পরনে তার পশমের এক গাত্রাবরণ—তার ওপর কয়েক ভাঁজে জড়ানো কোমরবন্ধনী। নীচে পশমের পাজামা এবং বহুবিস্থনী যুক্ত চপ্পল। মাথা থেকে টুপীটা খুলে পিঠের উপরকার ঝুড়িতে রাখল, দীর্ঘ উজ্জ্বল পিঙ্গল কেশরাশি তার পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ে হাল্কা হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়তে লাগল। তরুণের কোমরে চামড়ার খাপে মোড়া তামার তরবারি। পিঠের ওপর বৃক্ষ-শাখা-নির্মিত ঝুড়ি, তার ভিতর অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে খোলা ধনুক এবং বাণপূর্ণ তূণীর রেখে দিয়েছিল। তরুণের হাতে একটি দণ্ড, সেটাকে ঝুড়ির নীচে ঠেকিয়ে দাঁড়ানো অবস্থাতেই মাঝে মাঝে বিশ্রাম করে নিচ্ছিল। অধিকতর চড়াই আরম্ভ হয়েছে এখন। তার সামনে ছটি মোটা মোটা ভেড়া চলছিল, এদের পিঠের উপর ঘোড়ার লোমের তৈরী ছাতুভরা বড় বড় থলি। তরুণের পেছন পেছন আসছিল এক লাল রঙ-এর লোমশ কুকুর। বিহগকুলের মধুর স্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিল পর্বত ; তরুণের ওপরও তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল এবং শিস্ দিতে আরম্ভ করেছিল সে।

---

* আজ থেকে ছশো পুরুষ আগেকার একটি আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠীর কাহিনী। তখন পশুপালনই তাদের জীবিকা ছিল।

একটি খাড়াই-এর ওপর থেকে এক সূক্ষ্ম রূপালী ঝর্ণার ধারা ঝরছিল। খাড়াই-এর প্রান্তদেশ কেটে কে যেন কাঠের নালা তৈরী করে রেখেছিল। শ্রান্ত ভেড়ার পাল জল খেতে লাগল। তরুণ দেখল কাছেই আঙুর লতায় আঙুরের গুচ্ছ। ঝুড়ি নামিয়ে আঙুর ছিঁড়ে খেতে লাগল —কাঁচা আঙুর ফলে টক একটু বেশী। পাকতে এখনও মাসখানেক দেরী, তবু তরুণ পথিকের কাছে এই-ই ভালো লাগছিল। সম্ভবত সে অত্যন্ত পিপাসার্ত ছিল এবং তাড়াতাড়ি এসেই শীতল জল পান করা ক্ষতিকর মনে করে কিছুটা সময় অপেক্ষা করছিল।

জলপানের পর ভেড়াগুলো চারিদিককার সবুজ ঘাসের ওপর চরে বেড়াতে লাগল। লোমশ কুকুরটা অতিরিক্ত গরম বোধ করছিল, কাজেই সে তার প্রভু বা ভেড়ার পাল কারও অনুকরণ না করে ঝর্ণার জলের মধ্যে বসে পড়ল। তার পেট হাপরের মতো ওঠা-নামা করছিল। আর তার লম্বা লাল জিভ মুখ থেকে বেরিয়ে থরথর করে কাঁপছিল।

ঝর্ণার নীচে মুখ রেখে এক নিঃশ্বাসে তরুণ তার পিপাসা দূর করল। তারপর চোখে জল দিয়ে সামনের চুল গোড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে মুখ ধুয়ে নিল। তার অরুণাভ গাল এবং লাল ঠোঁট দুটো ঢেকে ফেলবার জন্য সবে মাত্র পিঙ্গল রোমরাজির উদ্গম হতে আরম্ভ করেছে। খুশী মনে ভেড়াগুলোকে চরতে দেখে ঝুড়ির পাশে বসে পড়ল সে। কান খাড়া করে স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকা কুকুরের চোখের ভাব পরখ করে ঝুড়ির এক পাশ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল, তারপর একখণ্ড ভেড়ার মাংস বের করে কোমরবন্ধনী থেকে প্রলম্বিত চামড়ার খাপে মোড়া ধারালো তামার ছুরি দিয়ে কেটে কেটে কিছু নিজে খেল আর কিছুটা কুকুরকে খাওয়াতে লাগল। এমন সময় কাঠের ঘণ্টার খট্-খট্ আওয়াজ শোনা গেল। তরুণ দূর থেকে দেখল —ঝোপের আড়ালে অর্ধেক ঢাকা অবস্থায় এক গাধাকে আসতে। তার পিছনে পিছনে এক ষোড়শী তরুণী তারই মতো পোষাক ও পিঠে ঝুড়ি নিয়ে আসছে। হাল্কাভাবে শিস্ দিতে লাগল তরুণ। সে যখনই কিছু ভাবতে থাকে —তার মুখ থেকে নিঃশ্বাসের মতোই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমনি শিসের আওয়াজ বেরিয়ে পড়ে। ষোড়শীর কানে একবার অন্তত শিসের আওয়াজ পৌঁছাল এবং সেইদিক লক্ষ্য করে তাকালও কিন্তু তরুণের দেহ লতাগুল্মের আড়ালে ছিল। তরুণ যদিও হাত পঞ্চাশ দূর থেকে দেখছিল, তবু ষোড়শীর মুখের হাল্কা অথচ সুন্দর এক ছাপ তার অন্তস্তলে রেখাপাত করছিল, তাই উন্মুখ আগ্রহে জানবার প্রতীক্ষায় বসে রইল— কোথায় চলেছে ওই তরুণী। এ-ধারে বক্ষুর ওপরে আর কোনো বসতি নেই এ কথা তরুণ জানত, কাজেই সেও যে পথচারিণী তা বুঝতে পারল।

অপরিচিত ষোড়শীকে দেখে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে সুরু করল, তরুণ 'চুপ' বলতেই সেখানে চুপ করে বসে গেল। ষোড়শীর গাধাটি জল খেতে লাগল, তরুণী

তার পিঠ থেকে ঝুড়ি খুলতেই তরুণটি এগিয়ে এসে শক্ত হাতে সেটাকে নামিয়ে নিচে রেখে দিল। মৃদু হেসে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তরুণী বলল, "বড্ড গরম আজ।"

"গরম নয়, চড়াই পেরিয়ে আসবার জন্যে এ রকম মনে হচ্ছে। একটু বিশ্রাম নিলেই ঘাম শুকিয়ে যাবে।"

"এই সময়টাতে দিনগুলো বেশ ভালো থাকে।"

"আর দশ-পনের দিনের মধ্যে বৃষ্টি হবার ভয় নেই।"

"বৃষ্টিকে আমার সত্যিই বড় ভয়। নালার জলে আর পিছল কাদায় রাস্তাগুলো এত বিশ্রী হয়ে যায়!"

"গাধাগুলোর পক্ষে পথ চলা আরও মুশকিল হয়ে পড়ে।"

"বাড়িতে আমাদের ভেড়া নেই বলে আমি গাধা নিয়ে বেরিয়েছি। আচ্ছা, বন্ধু তুমি কোথায় যাবে?"

"পাহাড়ের ওপর, আজকাল আমাদের ঘোড়া, গরু ভেড়া সব ওখানেই আছে।"

"আমিও ঐখানেই যাচ্ছি। আমি ছাতু, ফল, নুন এইসব পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।"

"তোমার পশুদের কে দেখছে সেখানে?"

"আমার প্রপিতামহ, আর ভাইবোনেরাও আছে।"

"বাবার ঠাকুর্দা! সে নিশ্চয় খুবই বুড়ো?"

"খুবই বুড়ো। এত বুড়োমানুষ বোধহয় কোথাও দেখা যায় না।"

"তবে পশুদের কি করে দেখাশোনা করে?"

"এখনও খুব শক্ত সমর্থ আছে। তার চুল, ভ্রূ সব সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু দাঁত এখনও প্রায় নতুনের মতো রয়েছে। দেখলে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বয়স বলে মনে হয়।"

"তা'হলে তো তাকে ঘরেই বসিয়ে রাখা উচিত।"

"রাজীই হয় না। আমার জন্মের আগে থেকে সে গাঁয়ে যায়নি কখনো।"

"গাঁয়ে যায়নি!"

"যেতে চায় না। গাঁ-কে সে ঘৃণা করে। বলে, 'মানুষ এক জায়গায় বন্দী হয়ে থাকবার জন্যে জন্মায়নি।' অনেক প্রাচীন কাহিনী আমাদের শোনায়। আচ্ছা তোমার নাম কি বন্ধু?"

"পুরুহুত মাদ্রীপুত্র পৌরব। আর তোমার নাম বোন?"

"রোচনা মাদ্রী।"

"তা'হলে তুমি তো আমার মাতুলকুলের লোক! তোমরা উত্তরমাদ্র না নিম্ন?"

"উত্তরমাদ্র।"

বক্ষু নদীর বামতটে পুরুদের গ্রাম, কিন্তু তার নিম্নভাগ —যা নীচের সমতলভূমির

সঙ্গে গিয়ে মিশেছে —মন্থদের অধিকারে ছিল। দক্ষিণতটে উপরিভাগ মাত্র এবং নিম্নভাগ পরশুদের অধিকারে ছিল। ভূমি এবং জনসংখ্যার বিচারে পুরুরা মাদ্রদের চেয়ে ছোট ছিল না। পুরুদের নিম্নে অবস্থিত মাদ্রদের নিম্নমাদ্র বলা হত। রোচনা উচ্চমাদ্রের বংশ।

এইসব কথা জানবার পর দু'জনেই আরও অধিক আত্মীয়তা অনুভব করল। পুরুহুত বলল, "রোচনা, আজ কিন্তু আমরা পাহাড়ের ওপর পৌঁছাতে পারব না। কিন্তু একলা আসবার সাহস তুমি কোত্থেকে পেলে?"

"হ্যাঁ, আমি জানতাম যে রাতে চিতাবাঘের হাত থেকে গাধাগুলোকে বাঁচানো মুশ্‌কিল, কিন্তু বুড়ো মানুষটির জন্য খাওয়ার জিনিস আনবার দরকার ছিল পুরুহুত। আমার ওপর তিনি অনেকখানি ভরসা করেন। আমি ভেবেছিলাম যে রাস্তায় আরও কেউ হয়ত জুটে যাবে, আজকাল ওপরে অনেক লোকই যায়। আর এও মনে করেছিলাম রাত্রে আগুন জালিয়ে নিলেই কাজ চলে যাবে।"

"রাস্তায় চলতে চলতে আগুন জ্বালানো সম্ভব নয়। তোমার কাছে কি অরণী আছে?"

"আছে।"

"থাকলেও অরণী ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালানো সহজ কাজ নয়। যা'হোক, আমার কাছে এক পবিত্র অরণী আছে, পিতামহের আমল থেকে আমাদের ঘরে এটা ব্যবহৃত হচ্ছে। এই অরণীর আগুনে বহু যজ্ঞ, বহু দেবপূজার অনুষ্ঠান হয়েছে। অগ্নিদেবতার মন্ত্রও আমার জানা আছে, কাজেই এ দিয়ে তাড়াতাড়িই আগুন জ্বলে যায়!"

"তা ছাড়া আমরা এখন দু'জন পুরুহুত, কাজেই আমাদের সামনে আসবার মতো সাহস চিতাবাঘের হবে না।"

"আর আমার কুকুরও তো রয়েছে, রোচনা।"

"কুকুর!"

"হ্যাঁ, আমার এই লাল শিকারী কুকুর।"

কুকুরটাকে ডাকতেই সে দাঁড়িয়ে তার প্রভুর হাত চাটতে লাগল। রোচনাও আদর করে ডাকল তাকে। সে এসে তার গা শুঁকতে লাগল, তারপর রোচনা যখন তার পিঠে হাত দিল তখন লেজ নাড়তে নাড়তে সে তার পায়ের ওপর বসে পড়ল। পুরুহুত বলল, "ও খুব বুদ্ধিমান, রোচনা।"

"খুব বলিষ্ঠও বটে।"

"হ্যাঁ, ভাল্লুক, নেকড়ে, চিতা কাউকেই ভয় করে না।"

ভেড়া এবং গাধাগুলো এতক্ষণে প্রচুর ঘাস খেয়েছে, ক্লান্তিও দূর হয়ে গেছে, তাই দুই পথিক আবার পথ চলা সুরু করল। কুকুরটা তাদের পিছনে পিছনে চলল। চলার পথ যদিও এঁকে-বেঁকে তেরছাভাবে ওপরে উঠেছে, তবুও চড়াই অত্যন্ত কঠিন ছিল,

এ জন্য অত্যন্ত সাবধানে এবং ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে চলছিল তারা। পুরুহূত কখনও সরস লাল স্ট্রবেরী ফল, কখনও বা করমচা ফল ছিঁড়ছিল এবং রোচনাকেও তার ভাগ দিচ্ছিল। ভালো ভালো ফলগুলো এখনও তেমন পাকেনি, পুরুহূতকে তাই কিছুটা নিরাশ হতে হচ্ছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এমনি আলাপ করতে করতে ওপরে উঠল। ঘন গুল্মরাজির নীচ দিয়ে কল-কল স্বরে ধাবিত এক ঝর্ণাধারা তাদের নজরে এল, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পাশেই একটুখানি খোলা জায়গা, সেখানে পড়ে রয়েছে আধপোড়া কাঠের গুঁড়ি আর ছাই। পুরুহূত ঝুঁকে পড়ে ছাইগুলো নাড়া দিল, ভিতরে আগুন চাপা ছিল। খুব খুশী হয়ে বলল, "রোচনা রাতের বিশ্রামের জন্য এর থেকে ভালো জায়গা সামনে আর পাওয়া যাবে না। কাছেই জল রয়েছে, আর প্রচুর ঘাস এবং শুকনো কাঠ। এ ছাড়াও সকালে এখান থেকে যে সব পথিক রওনা হয়েছে, তারা ছাই চাপা দিয়ে আগুনও রেখে গেছে।"

"হ্যাঁ পুরুহূত, এর চেয়ে ভালো জায়গা পাওয়া যাবে না। আজ এখানেই থাকা যাক। পরের ঝর্ণা পর্যন্ত পৌছাতে অন্ধকার হয়ে যাবে।"

পুরুহূত বসে পড়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঝুড়িটা নীচে নামিয়ে পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল, তারপর রোচনার ঝুড়িটা নামল। দু'জনে মিলে গাধাগুলোর পিঠ থেকে বোঝা নামাল এবং তাদের জিন্ খুলে দিল। গাধাগুলো দু-তিনবার গড়াগড়ি খেয়ে চরতে চলে গেল। ভেড়ার বোঝা নামাতে কিছু দেরী হল, কারণ তাদের জোর করে ধরে আনতে হচ্ছিল। মশক হাতে রোচনা ঝর্ণার জল ভরতে গেল। পুরুহূত পাতা এবং কাঠের টুক্‌রো দিয়ে আগুন জ্বালাল, তারপর বড় বড় কাঠের খণ্ড দিয়ে বড় রকমের অগ্নিকুণ্ড তৈরী করল। রোচনা যখন জল নিয়ে ফিরল, তখন পুরুহূত এক তামার পাত্র সামনে রেখে গরুর একখণ্ড পা ছুরি দিয়ে কাটছে। রোচনাকে দেখে সে বলল, "কাল সন্ধ্যার মধ্যে আমরা ওপরে পৌছে যাব রোচনা। তোমার গোষ্ঠ তো তবে আর বেশী দূর হবে না?"

"পাহাড়ের মাথায় আমরা যেখানে পৌছাই, সেখান থেকে তিন ক্রোশ পূবে।"

"আর আমার ছ'ক্রোশ পূবে। তা'হলে তো তোমার প্রপিতামহের গোষ্ঠ আমার যাবার পথেই পড়বে।"

"তুমিও তবে তাকে দেখাতে পাবে। তার সঙ্গে কি করে তোমার দেখা হবে এইটেই ভাবছিলাম।"

"আর তো মাত্র এক দিন আছে, সিকি ঠ্যাং-ই যথেষ্ট একদিনের জন্যে।"

"আমার কাছেও বাছুরের আধখানা ঠ্যাং আছে। আজকাল মাংস বেশীদিন রেখে দিলে দুর্গন্ধ হয়।"

"নুন দিয়ে মাংস রাঁধলে কি রকম হবে?"

"খুব ভালো হবে। আর আমার কাছে গুড়ের রসও রয়েছে, পুরুহুত। মাংস, গুড়ের রস আর শেষে কিছুটা ছাতু মিশিয়ে দিলেই চমৎকার স্যুপ তৈরী হবে। শুতে যাবার আগেই স্যুপ খাব আমরা।"

"আমি একলা হলে স্যুপ বানাতাম না রোচনা, বড় সময় লাগে ওতে। কিন্তু এখন সেই সময়টা আমি পশুগুলোকে বাঁধতে এবং কথাবার্তা বলেই কাটিয়ে দেব।"

"প্রপিতামহ আমার রান্না স্যুপ বড়ই পছন্দ করেন, পুরুহুত। তোমার এ তামার কড়াই কি সুন্দর!"

"হ্যাঁ তামার, কিন্তু অনেক দাম রোচনা। এই কড়াই-এর পিছনে একটা ঘোড়ার দাম খরচ হয়েছে; কিন্তু রাস্তায় বেশ কাজে আসে এগুলো।"

"তোমার ঘরে নিশ্চয়ই তা'হলে অনেক পশু আছে পুরুহুত?"

"হ্যাঁ রোচনা, ধানও অনেক। এইজন্যই তো এক ঘোড়ার মূল্যের এই কড়াই। আচ্ছা নাও এইবারে মাংস কাটা আমার শেষ হয়ে গেছে। জল আর নুন দিয়ে মাংস আগুনে চড়িয়ে দাও, আর আমি ওই দিকটাতেও কাঠের আগুন তৈরী করি। তারপর কিছু ঘাস কেটে আমাদের গাধা আর ভেড়াগুলোকে তার মাঝখানে বাঁধতে হবে। জান তো আমাদের কাছে বাছুরের মাংস যেমন লাগে, চিতার কাছে গাধার মাংস তার চেয়ে মিষ্টি।" তার কুকুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আর তুইও ততক্ষণ এটাকে চাটতে থাক।" কিছুটা মাংসসুদ্ধ একটা হাড় কুকুরের সামনে ছুঁড়ে দিল পুরুহুত। কুকুরটা লেজ নাড়াতে নাড়াতে পায়ের নীচে হাড়ের টুকরো চেপে দাঁত দিয়ে ভাঙবার চেষ্টা করতে লাগল।

পুরুহুত ওপরের গাত্রবাস এবং কোমরবন্ধনী খুলে ফেলল। হাতাবিহীন জামার নীচে তার প্রশস্ত বক্ষ এবং পেশীবহুল বাহুযুগল জানিয়ে দিতে চায় এই বিশ বছর বয়স্ক তরুণের দেহে অপরিসীম শক্তি। কাজ করবার সময় পুরুহুতের রোমরাজি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ঝুড়ির ভিতর থেকে কোদাল বের করে এক লহমায় একগাদা ঘাস সংগ্রহ করে ফেলল। তারপর কান ধরে গাধাগুলোকে নিয়ে এসে খুঁটো গেড়ে বাঁধল এবং তাদের সামনে ঘাস ছড়িয়ে দিল। ভেড়াগুলোর ব্যবস্থা একই হল।

কাজ শেষ করে পুরুহুতও আগুনের কাছে এসে বসল। কড়াই থেকে সিদ্ধ মাংসখণ্ড তুলে চামড়ার ওপরে রাখতে যাচ্ছিল রোচনা। পুরুহুত ঝুড়ির ভিতর থেকে এক টুকরো চামড়া বের করে বিছিয়ে দিল। তারপর কাঠের এক সুন্দর চষক এবং জন্তুর পেটের চামড়ায় তৈরী বোতল বের করে রাখল, সেই সঙ্গে বাঁশীটাও মাটিতে পড়ে গেল। যেন কোনো কোমল শিশু মাটিতে পড়ে গেছে এবং ব্যথা লাগবার ভয়ে তার মা কেঁপে উঠছে—এমনিভাবে তাড়াতাড়ি বাঁশীটাকে তুলে কাপড়ে মুছল। তারপর তাকে চুমু খেয়ে ঝুড়ির

ভিতর রাখতে গেল। রোচনা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। সে বলে উঠল, "পুরুহুত, তুমি বাঁশী বাজাতে পার?"

"এই বাঁশী আমার বড়ই প্রিয়, রোচনা, আমার প্রাণটাই যেন এই বাঁশীর সঙ্গে বাঁধা।"

"আমাকে বাঁশী শোনাও পুরুহুত।"

"এখন না, খাওয়ার পরে।"

"এখন একটু শোনাও, খাওয়ার পরে আবার শুনব।"

"আচ্ছা ..." বলে পুরুহুত বাঁশীতে ঠোঁট লাগিয়ে আটটি আঙুল যখন তার ছিদ্রগুলোর ওপর দিয়ে চালাতে সুরু করল, তখন বিশাল বৃক্ষরাজির ছায়া থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারী সন্ধ্যার অন্ধকার আর স্তব্ধতার মাঝে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করা মধুর ধ্বনি চারদিকে মায়াজাল বিস্তার করতে লাগল। রোচনা সমস্ত কিছু ভুলে তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল সেই ধ্বনি। কোন উর্বশীর বিয়োগব্যথায় ব্যাকুল পুরূরবার বেদনাপূর্ণ গান বাঁশীতে বাজিয়ে চলেছিল পুরুহুত! গান শেষ হয়ে গেলে রোচনার মনে হল, যেন স্বর্গ থেকে সোজা ধরণীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে।

আনন্দাশ্রু পূর্ণ চোখে সে বলল, "তোমার বাঁশীর গান বড় মধুর পুরুহুত, বড়ই মধুর। আমি এমন বাঁশী কখনও শুনিনি। কি সুন্দর এই সুর!"

"লোকে এই কথাই বলে রোচনা, কিন্তু আমি তা বুঝতে পারি না। বাঁশীতে ঠোঁট লাগানো মাত্রই আমি সব ভুলে যাই। এই বাঁশী যতক্ষণ আমার কাছে থাকে ততক্ষণ পৃথিবীর কোনো কিছুই আমি চাই না।"

"আচ্ছা —এস পুরু, নইলে মাংস জুড়িয়ে যাবে।"

"রোচনা, আমি যখন রওনা হই, তখন মা এই দ্রাক্ষাসুরা দিয়েছিলেন, অল্পই আছে। মাংসের সঙ্গে পান করলে বেশ লাগবে।"

"সুরা তোমার খুব প্রিয়, পুরু?"

"প্রিয় বলা যায় না রোচনা। প্রিয় জিনিসে অরুচি হয় না। কিন্তু আমার চোখদুটো একটু লাল হয়ে উঠলেই আর এক ঢোকও পান করতে পারি না।"

"আমারও ঠিক্ এমনই মনে হয় পুরু। নেশায় চুর লোক দেখলে আমার বড় ঘৃণা হয়।" —বলতে বলতে রোচনা নিজের কাঠের পেয়ালা বের করে নীচে রাখল।

তিনভাগের একভাগ মাংস কুকুরকে দেওয়া হয়েছিল। ওরা দু'জন অনেক দেরীতে পানাহার শেষ করল। চারিদিকে ঘন অন্ধকারের আস্তরণ ছড়িয়ে পড়েছে। মোটা কাঠের গনগনে আগুনের লাল আভা আর তার আশপাশের কিছুটা জায়গা ছাড়া আর কিছুই সেখানে দেখা যাচ্ছিল না। তবে কিছু আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল —মনে হয় পোকামাকড়ের ডাক। গল্প-গুজব এবং মাঝে মাঝে বাঁশী বাজানো চলতে লাগল। শেষ কয়েকঘণ্টার মধ্যে

ছাতু দিয়ে মাংসের স্যুপ তৈরী হয়ে গেল। দু'জনেই নিজ নিজ পেয়ালা নিয়ে গরম গরম স্যুপ পান করল। অনেক রাত হয়ে গেলে ওরা ঠিক করল ঘুমোবে। চামড়ার বিছানা তৈরী করে রোচনা নিজের পরিচ্ছদ খুলতে লাগল। পুরুহুত আগুনের ওপর আরও কাঠ সাজিয়ে দিল, পশুগুলোর সামনে ঘাস এগিয়ে দিল, তারপর বনদেবতার কাছে প্রার্থনা শেষ করে পরিচ্ছদ খুলে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে উঠে দু'জনেই অনুভব করল যেন একরাত্রির ভিতরে দু'জনের মধ্যে সহোদর ভাই-বোনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। রোচনা উঠবার পর পুরুহুত নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। বলল, "তোমার মুখে আমার চুমু দিতে ইচ্ছা করছে, রোচনা বোন!"

"আমারও, পুরু! এ জগতে আমরা পরস্পর ভাইবোন।"

রোচনার বিস্রস্ত এলোচুলের রাশি পিছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে পুরুহুত তার গাল-দুটোতে চুমু দিল, দু'জনের মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠল এবং চোখ জলে ভরে এল।

এরপর মুখ ধুয়ে সামান্য ছাতু এবং শুকনো মাংস খেয়ে পশুগুলোর পিঠে বোঝা চাপিয়ে তারা যাত্রা করল। কথাবার্তায় সময় এত তাড়াতাড়ি কেটে গিয়েছিল যে তারা বুঝতেই পারেনি কখন ওপরে এসে পৌঁচেছে।

রোচনা মাদ্র প্রপিতামহের কাছে পুরুহুতের পরিচয় দিলে সে পুরুদের বীরত্বের প্রশংসা করতে করতে তাকে অভ্যর্থনা করল।

২

এই গিরিপথে মাদ্রদের একটি ছোটখাট গ্রাম। সমস্ত ঘরই তাঁবু অথবা খড়ের ছাউনি। নীচের দিকে ঢালু এবং খাড়া পাহাড়ের ওপর কেবল ঘন পাইনের জঙ্গল কিন্তু এই পর্বতচূড়ায় বৃক্ষের চিহ্নমাত্র নেই। এখানে ভূমি সমতল, ওপরে সবুজ ঘাসের পুরু গালিচা বিস্তৃত। এই সবুজভূমির কোথাও ভেড়া, কোথাও বা ঘোড়ার দল চরে বেড়াচ্ছিল। এদেরই মধ্যে কোথাও কোথাও এদেরই ছোট ছোট বাচ্চারাও লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছিল। এই সমতলভূমিকে দেখেই মাদ্রবাবা বলেছিলেন, 'মানুষ এক জায়গায় বন্দী হয়ে থাকবার জন্য জন্মলাভ করেনি।' মাদ্রবাবার তাঁবু এখানেই পড়েছে এ মাসে। ঘাস কমে গেলে অন্য জায়গায় চলে যাবে। এখানে দুধ, দই, মাখন এবং মাংসের প্রাচুর্য। তাঁবুর ভেতরে এইসব জিনিসই রয়েছে। পনেরো-বিশ দিন অন্তর গ্রাম থেকে লোক এসে এখান থেকে মাখন ও মাংস নিয়ে যায়। শীতের দিনে এই পাহাড়ের চূড়ায় বরফ পড়তে থাকে। প্রপিতামহ পারলে এখানেই থেকে যেত কিন্তু পশুরা বরফ খেয়ে থাকতে পারে না, এ জন্য তাকে আঁকা-বাঁকা রাস্তা ধরে কিছুটা নীচে চলে আসতে হয়। আর পশুরা চলে যায় নীচের গ্রামে। বৃদ্ধকে কিন্তু গ্রামে যাওয়ার কথা বললেই তেড়ে মারতে আসে।

বেলা থাকতে থাকতেই দুই পথিক তার তাঁবুতে পৌঁচেছিল। জিনিসপত্র নামিয়ে নেবার পর বৃদ্ধ সফেন ঘোড়ার দুধে ভরা কাষ্ঠ পেয়ালা তাদের সামনে রাখল, তিন-চার পেয়ালাতেই পথের ক্লান্তি দূর হল। সন্ধ্যার সময় রোচনার ভাই-বোন এবং গাঁয়ের অন্যান্য তরুণ রাখালরা ঘোড়া, গরু, বাছুর নিয়ে এসে পড়ল। এদিকে রোচনা তার সেই বুড়ো প্রপিতামহের কাছে পুরুহুতের বাঁশীর প্রশংসা করছিল। তার মতো গম্ভীর লোকও পুরুহুতকে ছাড়তে রাজী নয়। সে এবং গোষ্ঠীর সমস্ত তরুণই বাঁশী অত্যন্ত ভালোবাসে। রাত্রে যখন নৃত্যানুষ্ঠান চলল, পুরুহুতও তখন তার বাঁশীর যাদু দেখিয়ে দিল।

সকালে উঠে পুরুহুত যাবার কথা বলল, কিন্তু প্রপিতামহ তাকে এত তাড়াতাড়ি যেতে দেবে কেন। দুপুরে খাওয়ার পরে বৃদ্ধ নিজের কথা আরম্ভ করলে এবং কথারম্ভ হল ঝুড়ির পাশে পড়ে থাকা তামার কড়াইকে কেন্দ্র করে। বৃদ্ধ বলল, "এই তামা এবং ক্ষেতগুলোকে দেখলে আমার সারা অন্তর জ্বলে ওঠে। যখন থেকে বক্ষুতটে এইসব জিনিসের আমদানী হয়েছে, তখন থেকে চারিদিকে পাপ-অধর্ম ছেয়ে গেছে, দেবতারাও রুষ্ট হয়েছেন, মহামারী বেড়ে গেছে —প্রবল হয়ে উঠেছে হানাহানি।"

"তা'হলে কি আগে এ সব জিনিস ছিল না দাদু?" —পুরুহুত প্রশ্ন করল।

"না বাবা, এইসব জিনিস আমার ছোটবেলাতেই সুরু হয়েছে একটু একটু করে। আমার ঠাকুর্দা তো এ সবের নাম পর্যন্ত শোনেনি, সে সময় সমস্ত কিছুই পাথর, হাড়, শিং কিম্বা কাঠ থেকে তৈরী হত।"

"কাঠ কি করে কাটত দাদু?"

"পাথরের কুড়ুল দিয়ে।"

"তা'হলে তো অনেক সময় লাগত, আর এত সুন্দর করে কাটা যেত না নিশ্চয়ই?"

"এত তাড়াহুড়োর তাগিদই তো সমস্ত কাজ মাটি করেছে, এখন তোমরা ছ'মাসের খাবার অথবা অর্ধেক জীবন কাটাবার মতো একটা ঘোড়া দিয়ে একখানা তামার কুড়ুল নাও, তারপর জঙ্গলের পর জঙ্গল কেটে উজাড় কর অথবা গাঁ-এর পর গাঁ-কে নিশ্চিহ্ন করে ফেল! কিন্তু গাঁগুলো জঙ্গলের গাছ-গাছালির মতো নিরস্ত্র নয়। তাদের কাছেও অমনি তীক্ষ্ণ কুড়ুল রয়েছে। এ তাম্র-কুঠার যুদ্ধকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। এর আঘাতে বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আগে তীরের ফলা পাথরে তৈরী হত। এই তামার ফলা দিয়ে দুধের ছেলেরা বাঘ শিকার করতে চায়। এখন আর লোকে কুশলী ধনুর্ধর হতে চাইবে কেন?"

"তোমার একটা কথার সঙ্গে আমি এক মত দাদু —মানুষ এক জায়গায় বন্দী হয়ে থাকবার জন্যে জন্মায়নি।"

"হ্যাঁ বাছা, প্রথম দিনের ময়লার ওপর রোজ রোজ ময়লা ফেলা খুবই খারাপ।

আমাদের তাঁবু আজ এখানেই রয়েছে। পশুরা এখানকার ঘাস খেয়ে ফেলবে। এর আশেপাশে মানুষ এবং পশুর মলমূত্র জমে উঠতে থাকবে, আর সেই সময় আমরা এই জায়গা ছেড়ে চলে যাব—যেখানে নতুন নতুন সবুজ ঘাস প্রচুর মিলবে, জলহাওয়া অনেক বেশী নির্মল হবে।"

"হ্যা দাদু, আমিও এমনি ভালোবাসি—এই মাটিতেই আমার বাঁশীর স্বর আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে।"

"ঠিক বলেছ বাছা! আগে আমরা এই তাঁবুর মেলাকেই গাঁ বলতাম, আর এইসব মেলা এক জায়গায় এক বছর কেন তিন মাসও থাকত না, কিন্তু এখনকার গাঁ পুত্র-পৌত্র এমন কি একশ' পুরুষের বসতি হিসাবে তৈরী হচ্ছে। পাথর, কাঠ আর মাটির দেওয়াল তোলা হয়, ফলে ভিতরে হাওয়া ঢুকতে পারে না। অগ্নিকে দেবতা বলা, বায়ুকে দেবতা বলা আজ শুধু মুখের কথায় দাঁড়িয়ে গেছে, আজ আর আমাদের হৃদয়ে তাদের জন্য সেই শ্রদ্ধা-সম্মান নেই। এই জন্যেই এখন বহু নতুন নতুন রোগের উৎপত্তি। হে মিত্র, হে নাসত্য, হে অগ্নি! তুমি যে এই মানবকুলের ওপর ক্রোধ বর্ষণ করছ, তা ঠিকই।"

"কিন্তু দাদু, এই তামার কুড়ুল, তামার খাঁড়া, তামার শল্য ছাড়া আমরা কি করে বেঁচে থাকব? এ সব ত্যাগ করলে শত্রুরা আমাদের এক দিনেই গ্রাস করবে।"

"আমি স্বীকার করি বাছা, ছ'মাসের আহার অথবা আজীবন কাটাবার মতো ঘোড়া খুশী মনে বেচে লোকে তামার খাঁড়া কেনেনি। ঐ নিম্নমাদ্র এবং পরশুরা বক্ষু মাতার গায়ে কলঙ্কের দাগ লাগিয়েছে। বক্ষু নদী কতদূর পর্যন্ত বয়ে গেছে আমি তা জানি না, মিথ্যাবাদীরা অবশ্য বলে, পৃথিবীর প্রান্তে যে অপার জলরাশি রয়েছে সেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে। এ কথা আমরাও জানি যে, মাদ্র আর পরশুদের দেশ শেষ হতেই বক্ষু নদী পাহাড় ছেড়ে সমতলভূমিতে চলে যায়, আর তারপরেই হল মিথ্যাবাদী দেবশত্রুদের দেশ। তারা বলে সেখানে না-কি বড় বড় ঠ্যাংওয়ালা ছোটোখাটো পাহাড়সদৃশ জন্তু আছে, কি যেন তাদের নাম বাবা? ...স্মৃতিশক্তি এখন ক্ষীণ হয়ে আসছে আমার।"

"উট বলে দাদু। কিন্তু সে পাহাড়ের মতো উঁচু হয় না। একদিন এক নিম্নমাদ্র উটের বাচ্চা নিয়ে এসেছিল। বলল, ছ'মাসের বাচ্চা, আকারে সে তো আমাদের ঘোড়ার মতোই ছিল।"

"হ্যা বাছা, বাইরের দেশ থেকে যারা ঘুরে আসে, তারা বড় বেশী মিথ্যা বলতে শেখে। তারা বলত—কি যেন ওর নাম?"

"উট।"

"হ্যা হ্যা উট। বল তো উটের গলা কি এত লম্বা যে, সে বক্ষুর এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের ঘাস খেতে পারে!"

"এ মিথ্যা কথা, তাই না দাদু ?"

"হ্যাঁ বাবা, সেই বাচ্চার গলা ঘোড়ার থেকে সত্যিই লম্বা ছিল ; কিন্তু ঘাস খাওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা···"

"এই মিথ্যাবাদী মাদ্র এবং পরশুরাই তামার কুড়ুল, তামার খাঁড়ার জিগীর তুলেছে। পরশুরা আমাদের উত্তর-মাদ্রের ওপর ওইসব অস্ত্র নিয়েই হামলা করেছিল। এ ঘটনা ঘটে আমাদের আমলে। আমাদের লোকেরাও নিম্নমাদ্রদের কাছ থেকে দুটো করে ঘোড়ার বিনিময়ে তামার কুড়ুল কিনেছিল।"

"তামার কুড়ুল-এর সামনে পাষাণ-কুঠার কিছুই কাজের নয়, তাই না দাদু ?"

"হ্যাঁ, একেবারে কিছুই নয় বাছা! এই জন্যই বাধ্য হয়ে আমাদের তাম্র-অস্ত্র নিতে হয়েছিল। আর যখন পুরুদের ওপর নিম্নমাদ্ররা আক্রমণ চালাল, তখন তোমাদের লোকেরা আমাদের কাছ থেকে তাম্র-অস্ত্র খরিদ করল। উত্তর-মাদ্র এবং পুরুদের মধ্যে কখনও ঝগড়ার খবর শোনা যায়নি কিন্তু পরশু এবং নিম্নমাদ্রেরা সব সময়েই দস্যুবৃত্তি চালিয়ে এসেছে, সর্বদাই পুরনো ধর্মকে ছেড়ে নতুন নতুন কথা বলেছে, আর তারই ফলে আমাদের লোকদেরও প্রাণরক্ষার জন্য সেই একই ব্যাপার করতে হয়েছে। আমি বুঝি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিম্নমাদ্র এবং পরশুগণ তামার অস্ত্রপাতি ত্যাগ না করে, ততক্ষণ আমাদের অধিবাসীদের পক্ষে সে সব ত্যাগ করা আত্মহত্যারই সামিল। কিন্তু তামার এতটা প্রসার যে খুবই খারাপ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই বাছা! আর এই পাপের প্রসারে সাহায্য করছে ঐ দুটো দল—দেবতার আশীর্বাদ এরা কোনোদিনই পাবে না। ঘোর অন্ধকারময় পাতালে প্রবেশ করতে হবে ওদের। ওদের দেখাদেখি, ওদের ভয়ে আমাদের মাটি-পাথরের গ্রাম তৈরী করতে হয়েছে। আগে—আজ এখানে, কাল ওখানে সরিয়ে নেওয়ার মতো তাঁবুর গ্রাম ছিল বক্ষু উপত্যকায়। কিন্তু নিম্নমাদ্র আর পরশুরা এই ব্যবস্থা নষ্ট করে দিয়ে এইসব তামার অস্ত্র দিয়ে মাটি মায়ের বুক চিরে দেবার বুদ্ধি কোত্থেকে পেল! এমন পাপ কেউ কখনও করেনি। মাটিকে আমরা মা বলি বাছা।"

"হ্যাঁ দাদু, মাটিকে মা বলি, দেবী বলি, তাকে পূজাও করি।"

"আর সেই মায়ের বুক নিজ হাতে চিরে দিয়েছে ওই সব পাপীরা। আরও কি সব করেছে—নাম ভুলে যাচ্ছি, স্মৃতিশক্তি ঠিক কাজ করছে না বাছা।"

"কৃষি, চাষ।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কৃষি আর চাষ চালু করেছে ওরা, গম বোনে, ধান বোনে এ সব শোনাই যায়নি আগে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কখনও ধরিত্রী মায়ের বুক চেরেনি, কখনও দেবীর অপমান করেনি। ধরিত্রী মাতা আমাদের পশুকুলের আহারের জন্য ঘাস দিত। জঙ্গলে রকমারী মিষ্টি ফল ছিল, আমরা খেলেও সে সব ফুরাত না। কিন্তু এই মাদ্রদের পাপ আর

তার দেখাদেখি আমাদের কৃত পাপের ফলে সেই এক মানুষ উঁচু ঘাস আজ কোথায়? আগেকার মতো সেই পুষ্ট গরু, যা দিয়ে একটা গোটা মাদ্র-গোষ্ঠীর একদিনের পর্যাপ্ত আহার হয়ে যেত—তা এখন কোথায়? সেই গরু, সেই ঘোড়া সেই ভেড়া কিছুই নেই। জঙ্গলের হরিণ আর ভাল্লুকও এখন আর অত বড় হয় না। মানুষ আর আগের মতো বেশীদিন বাঁচে না। এই সবই ধরিত্রী দেবীর কোপের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"দাদু, তুমি কতগুলো শীত দেখেছ?"

"একশ'র ওপরে বাছা! এক সময়ে আমাদের গাঁয়ে দশটি তাঁবু ছিল, আর এখন মাটি-পাথরের দেয়ালে তৈরী একশ' ঘর হয়ে গেছে সেখানে। যখন ক্ষেত ছিল না, তখন আমাদের চলতি-ফিরতি ঘর, চলতি-ফিরতি গাঁ হত। কিন্তু যখন ক্ষেত চালু হল, তখন হরিণের মুখ থেকে শস্য রক্ষার জন্যে ক্ষেত মানুষকে বেঁধে রাখবার খুঁটিতে পরিণত হল। কিন্তু বাছা, মানুষ এক জায়গায় বন্দী হয়ে থাকবার জন্য জন্ম নেয়নি। দেবতারা যা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেনি, নিম্নমাদ্র আর পরশুরা সে সব তৈরী করছে।"

"কিন্তু দাদু, আমরা কি এখন ইচ্ছা করলেও এইসব চাষ-আবাদ ছেড়ে দিতে পারি? ধানই যে আমাদের অর্ধেক খাদ্য আজ।"

"সে কথা স্বীকার করি কিন্তু ধান আমাদের পূর্বপুরুষেরা খেত না; এখান থেকে পঁচিশ ক্রোশ দূরে গমের বন আছে, সেখানে আপনাআপনিই গম জন্মায়। ফসল ধরে তারপর ঝরে যায়, সেগুলো গরুরা খায়, তাদের দুধ বেড়ে যায়। ঘোড়ারা খেয়ে মোটাসোটা হয়ে ওঠে। প্রতি বছর আমাদের পশুরা সব সেখানে যায়। ধরিত্রী মা মানুষের জন্য ধান সৃষ্টি করেনি—তার দানা আমাদের ক্ষেতের গম থেকে ছোট—পশুকুলের জন্যই ওগুলো। আমার ভয় হয় যে, কোনোরকমে এই জংলী গম নষ্ট হয়ে না যায়! আমাদের খাওয়ার জন্য এই সব গরু রয়েছে; ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল রয়েছে; জঙ্গলের ভেতর ভাল্লুক, হরিণ, শুয়োর, নানা রকমের শিকার রয়েছে, আঙুর প্রভৃতি কত রকমের ফল রয়েছে। এইসব আহার ধরিত্রী মা আমাদের খুশী মনেই দিত; কিন্তু এই সর্বনাশা নিম্নমাদ্র আর পরশু এরা পুরনো সেতু ভেঙে ফেলে নতুন সড়ক তৈরী করছে। আর তাদের এই পাপ কাজে মানুষের ওপর দেবতার কোপদৃষ্টি পড়েছে। জানি না বাছা এখন বক্ষুবাসীদের ভাগ্যে আর কী কী দুর্দশা লেখা রয়েছে। আমি তো পঁচিশ বছর থেকে পাহাড়ের চুড়ো ছেড়ে গাঁয়ে যাইনি কখনও। শীতের সময় নীচের দিকে এক ছাউনিতে চলে যাই। যে সব লোক পূর্বপুরুষের বাঁধা সেতুকে ভেঙে ফেলতে চাইছে তাদের মধ্যে কেন যাব! পূর্বপুরুষের মুখনিঃসৃত বাণীও আমি এতদিন গোপন রেখেছিলাম, এখনও যার শিখবার দরকার, সে-ই আমার কাছে চলে আসে। কিন্তু সেইসব বাণী অমান্য করে চলবার লোক বেড়েই চলেছে। এখন শুনতে পাচ্ছি মাদ্র-পরশুদের ক্ষেত থেকেও পেট ভরছে না। এখন এরা বক্ষুবাসীদের

আহার-পরিধান বয়ে নিয়ে কোথায় দিয়ে আসছে, আর তার জায়গায় কি পাওয়া যাচ্ছে? —ছাখ একটা ঘোড়ার বিনিময়ে কেনা এই কড়াই। ক্ষুধায় মরতে থাকলে কি এই কড়াইতে পেট ভরবে? এখন পেটের আহার এবং দেহের পোষাকের বদলে তাদের ঘরে ঘরে দেখতে পাবে এইসব কড়াই।"

"এ ছাড়া আর একটা কথা শুনেছি দাদু, নিম্নমাদ্রদের স্ত্রীলোকেরা না-কি কানে এবং গলায় হলদে আর সাদা গয়না পরতে সুরু করেছে। একটা কানের গয়নার দাম না-কি একটা ঘোড়া, ওগুলো তামা নয়, সোনা বলে, আর শাদা-শাদাগুলোকে বলে রূপো।"

"কেউ মার দেয় না এইসব অধর্মীদের! সারা বক্ষুজনমণ্ডলের সর্বনাশ করে ছাড়বে! আমাদের স্ত্রীরাও ওদের দেখাদেখি দুই ঘোড়ার বিনিময়ে কর্ণকুণ্ডল পরবে। হে দয়ালু অগ্নি! আর বেশীদিন আমাকে মানুষের মধ্যে রেখ না, পিতৃলোকে নিয়ে চল আমাকে।"

"আরও একটা গুরুতর পাপ রয়েছে দাদু! নিম্নমাদ্র আর পরশুরা কোন্‌খান থেকে মানুষ ধরে নিয়ে আসে, আর তাদের দিয়ে তামার খাঁড়া, কুড়ুল তৈরী করায়। এরা অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী দাদু। কিন্তু নিম্নমাদ্র আর পরশুরা এদের যখন খুশী পশুর মতো বেচে দেয়, আবার দরকার মতো নিজেদের কাছে রাখে। ক্ষেতের কাজ, কম্বল বোনার কাজ, আরও অন্যান্য নানা রকমের কাজ এইসব ধরে-আনা লোকদের দিয়ে করায়। এদের দাস বলা হয়।"

"মানুষকে কেনা-বেচা! কিন্তু আমরা তো খাবার, পোষাক বেচাও অন্যায় মনে করতাম। আমাদের পূর্বপুরুষরা ভাবতেও পারেনি, যে এই মাদ্র-কলঙ্ক এত দূর নীচে নেমে যাবে। আঙ্গুলে যদি পচ ধরে তো তার ওষুধ হল তাকে কেটে ফেলা; না হলে সমস্ত শরীরটাই পচে যাবে। এই মাদ্র-পরশুদের বক্ষুতটে থাকতে দেওয়া পাপ বাছা। আমি আর বেশীদিন এ সব দেখবার জন্যে বেঁচে থাকব না।"

মাদ্র দাদুর কথাবার্তা বড়ই মনোরঞ্জক ছিল, কিন্তু পুরুহুতের এও বোঝবার ক্ষমতা ছিল যে নতুন হাতিয়ার সৃষ্ট হয়েছে, তাকে ত্যাগ করে মানব এবং পশুর শত্রুতার মাঝে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তৃতীয় দিনে যখন পুরুহুত বিদায় নিতে গেল তখন বৃদ্ধ তার ললাট এবং ভ্রূ চুম্বন করে তাকে আশীর্বাদ করল। রোচনা বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল তাকে এবং বিদায়ের মুহূর্তে একে অপরের দুই গণ্ডকে অশ্রুসিক্ত করে দিল।

৩

মাদ্র দাদুর কথাই সত্য প্রমাণিত হল, যদিও তা পঁচিশ বছর পর। নিম্নমাদ্র এবং পরশুরা দিনের পর দিন ওপরের বাসিন্দা পুরু আর উত্তর মাদ্রদের দাবিয়েই চলল। এই ওপরের বাসিন্দা জনগণের মধ্যে কাপড়, কম্বল-বোনা স্ত্রী-পুরুষরা সবাই স্বাধীন; এদের খাওয়া পরায় বেশী খরচ লাগে, এবং তার ফলে তাদের হাতে বোনা দ্রব্য সূক্ষ্ম হলেও বেশী

দামের হয়, কিন্তু নীচের মাদ্র আর পরশুদের আছে ক্রীতদাস ; যাদের তৈরী জিনিস ভালো না হলেও দামে সস্তা। সেখানকার ব্যবসায়ীরা যখন এইসব জিনিস উট অথবা ঘোড়ার পিঠে বোঝাই করে দেশে দেশে নিয়ে যেত, তখন সেগুলো যথেষ্ট বিক্রী হত। ওপরের বাসিন্দাদের কাছেও এখন তামার জিনিস অধিকতর সংখ্যায় প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। একে তো ওগুলো বছর বছরই সস্তা হয়ে পড়ছিল, দ্বিতীয়ত মাটি-কাঠের জিনিস থেকে ওগুলো দীর্ঘস্থায়ী। পঁচিশ বছর আগে যেখানে মাত্র দু'এক ঘরে তামার কড়াই দেখা যেত, সেখানে আজ মাত্র দু'একটা ঘরই আছে যেখানে তামার কড়াই ব্যবহৃত হয় না। সোনা-রূপার ব্যবহারও অনেক বেড়েছে। আর এইসবের বিনিময়ে জনসাধারণকে তার আহার্য, কম্বল, চামড়া, ঘোড়া অথবা গরু বেচতে হচ্ছে, ফলে তাদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়ছিল। ওপরের বাসিন্দা কিছু লোক নিজেরাই ব্যবসা করার চেষ্টা করেছিল, কেননা তাদের সন্দেহ হচ্ছিল যে, নীচের পড়শীরা তাদের ঠকিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু বক্ষুর নীচে যাবার রাস্তা নীচের অধিবাসীদের আবাসভূমির ভিতর দিয়েই গিয়েছে এবং তারা এ রাস্তায় যাতায়াত করতে দিতে চায়নি। এই নিয়ে কয়েকবার ছোটো-খাটো ঝগড়াও হয়ে গেছে। অনেকবারই উত্তর-মাদ্র এবং পুরুরা বাইরের দেশসমূহে যাবার অন্য রাস্তা বের করতে চেয়েছে, কিন্তু তাতে তারা সফল হয়নি। ওপরের আর নীচের উপত্যকার মধ্যে এই সংঘর্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ছিল যে, নীচের লোকেরা নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় একতা বজায় রাখতে পারত না ; ওপরের অধিবাসীরা একতাবদ্ধ হয়ে আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ চালাতে পারত। এইসব যুদ্ধে আপন বীরত্ব এবং বুদ্ধিমত্তার জন্যে পুরুহুত নিজ গোষ্ঠীর প্রিয়পাত্র ছিল, আর মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই সে পুরু-গোষ্ঠী কর্তৃক গোষ্ঠী-নেতা নির্বাচিত হয়েছিল।

পুরুহুত পরিষ্কার বুঝেছিল যে, নিম্ন মাদ্রদের এই অন্যায় ব্যবসা যদি বন্ধ না করা যায় তো উপরবাসীদের কোনো কিছুই আশা নেই আর। তামার ব্যবহার কমে যাবার বদলে দিন দিন বেড়েই চলেছিল। হাতিয়ার, বাসনপত্র বা গয়নাতেই শুধু নয়, লোকে এখন বিনিময়ের কাজেও মাংস বা কম্বল বয়ে নিয়ে যাবার বদলে তামার তলোয়ার বা ছুরি নিয়ে যাওয়াই বেশী পছন্দ করছে। নিজ গোষ্ঠীর বৈঠকে পুরুহুত তাদের দুঃখের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখাল যে, তার মূলে রয়েছে নিম্ন মাদ্রদের অন্যায় ব্যবসা। সকলেই এ বিষয়ে একমত হল যে, পথের কাঁটা এই মাদ্রদের সরিয়ে না দিলে তাদের হাতে খেলার পুতুল হয়ে থাকতে হবে। হয়ত বা এমন দিন আসবে যখন তাদের পরশু ও নিম্ন মাদ্রদের দাসে পরিণত হতে হবে—পুরু এবং উত্তর মাদ্রের নেতৃবৃন্দের মিলিত বৈঠক এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হল। দুই গোষ্ঠী সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পুরুহুতকে সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতি নির্বাচিত করল এবং তাকে ইন্দ্র উপাধিতে ভূষিত করল। এইভাবে পুরুহুতই প্রথম ইন্দ্র হল।

প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে পুরুহুত সেনাবাহিনী সংগঠন করতে লাগল। ইন্দ্র হয়েই সে অস্ত্র নির্মাণ-ব্যবস্থার জন্য দু'জন দাস লৌহ-কারিগরকে আপনার আশ্রয়ে এনে রাখল। ওপরের বাসিন্দারা তাদের সঙ্গে খুব ভালোভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল, আর তাদের সহায়তায় নিজেরা লৌহ-শিল্পী তৈরী হয়ে উঠল। তাদের প্রতিবেশীরা নিজেদের লোহার দাসদের ফিরিয়ে দেবার কথাই শুধু বলল না, লড়াইও করবে বলল। কিন্তু নীচের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যবসায়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধা-সুলভ পরাক্রম কমে এসেছিল। লড়াইতে সফল হতে না পেরে তামা দেওয়া বন্ধ করে দিল তারা। কিন্তু শীগ্‌গিরই তারা বুঝতে পারল যে এতে করে তাদেরই ব্যবসা মাটি হয়ে যাচ্ছে। এদিকে উত্তর মাদ্র আর পুরুরা আগের কেনা কড়াই এবং অন্যান্য বাসনপত্র থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র এক পুরুষ ধরে সরবরাহ করতে সক্ষম ছিল।

অবশেষে ইন্দ্র এবং তার দুই গোষ্ঠী, নিম্ন মাদ্র ও পরশুদের ধ্বংস করার সঙ্কল্প গ্রহণ করল, পুরুহুত স্বয়ং লৌহকারের কাজ শিখেছিল, এবং তার উপদেশ মতো খড়্গ, ভল্ল এবং বাণ-ফলকের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। বলিষ্ঠ এবং কুশলী যোদ্ধাদের শত্রুর আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্য বহু তামার ঢাল তৈরী করিয়েছিল।

ইন্দ্র ঠিক করল যে, প্রথমে শুধু এক শত্রুকে আক্রমণ করা হবে, আর সেই আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে পরশুদেরই বেছে নিল সে! শীতের দিনে পরশুরা অধিক সংখ্যায় ব্যবসা উপলক্ষে বাইরে চলে যেত। ইন্দ্র এই সময়টাকেই সবচেয়ে সুবিধাজনক মনে করল। উত্তর মাদ্র এবং পুরুগণের যোদ্ধবৃন্দকে রণকৌশল শেখাল। যদিও পরশু আর উত্তর মাদ্রদের সঙ্গে শত্রুতা বহুদিন ধরেই চলে আসছিল, কিন্তু তারা বুঝতেই পারেনি যে এমন আচমকা তাদের ওপর শত্রুর এমন এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ আরম্ভ হবে যে বক্ষু উপত্যকা থেকে তাদের নাম পর্যন্ত মুছে যাবে। ইন্দ্র স্বয়ং তার নেতৃত্বে বাছাই করা উত্তর মাদ্র আর পুরু যোদ্ধাদের নিয়ে আক্রমণ করল।

যুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝতে পরশুদের দেরী হল না, এবং বুঝবার পর তারা প্রাণপণ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করল। কিন্তু সেই দ্রুত আক্রমণের মুখে তারা সমস্ত পরশু গ্রাম একসঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম হল না। ইন্দ্রের সৈন্যেরা একের পর এক গ্রাম অধিকার করে হাজার হাজার পরশুকে হত্যা করল —কাউকেই বন্দী করে রাখল না। এদিকে নিচের মাদ্ররা যখন সঙ্কটকে উপলব্ধি করতে পারল, তখন আর সময় নেই। পরশুদের কয়েকটি মাত্র গ্রাম অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। তাদের জন্য কিছু সৈন্য রেখে পুরুহুত কুরু-ভূমিতে চলে এল। নিম্ন মাদ্ররা পাল্টা আক্রমণ করল, কিন্তু তাদেরও পরশুদের দশা হল। নিম্ন মাদ্র এবং পরশুদের যে কোনো লোক —শিশু, তরুণ, বৃদ্ধ হাতের কাছে এল তাকেই ওরা মেরে ফেলল। স্ত্রীলোকদের আপন স্ত্রীদের সঙ্গে সামিল করে নিল। অধিকৃত দাসদের মধ্যে যারা

নিজ দেশে ফিরে যেতে চাইল, তাদের ফিরে যেতে দেওয়া হল, কিছু নিয় মাদ্র এবং পরশু স্ত্রী-পুরুষ প্রাণ বাঁচিয়ে বক্ষু-উপত্যকা ছেড়ে পশ্চিমের দিকে চলে যায়। তাদের বংশধরেরাই পরে পরশু (পার্সিয়ান) এবং মাদ্র (মিডিয়ান) নামেপ্রসিদ্ধ হয়েছে। এদের পূর্বপুরুষদের ওপর ইন্দ্রের নেতৃত্বে যে অত্যাচার হয়েছিল, তা এরা ভুলতে পারেনি। এই জন্য ইরাণীরা ইন্দ্রকে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করে। সমগ্র বক্ষু-উপত্যকা উত্তর মাদ্র ও পুরুদের হাতে এসেছিল। বক্ষুর দক্ষিণ এবং বাম তট আপোষে ভাগ করে নিল এই দুই দল।

বক্ষুবাসীগণ প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল নতুনকে সরিয়ে পুরনো ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করবার, কিন্তু এরা তামা ছেড়ে পাথরের হাতিয়ারের প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পারেনি। তামার জন্য বক্ষুর পাহাড়ী উপত্যকার বাইরে ব্যবসা বিস্তার করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল —বিজয়ী পুরু এবং উত্তর মাদ্রদের। কিন্তু দাসত্বকে তারা কখনোই মেনে নেয়নি, এবং বাইরের লোককে কখনও বক্ষু উপত্যকায় স্থায়ী অধিবাসী হতে দেয়নি। বহু শতাব্দী পরে যখন ইন্দ্র পুরুহূতকেও লোকে ভুলতে আরম্ভ করল অথবা তাকে দেবতার রূপে কল্পনা করতে লাগল, তখন এতটা বংশবৃদ্ধি হয়ে গেছে যে সকলের ভরণ-পোষণ করতে আর বক্ষু উপত্যকা সক্ষম নয়। এ জন্য তার বহু অধিবাসীকেই বাধ্য হয়ে দক্ষিণের দিকে চলে যেতে হল।

আগে এক গোষ্ঠী অপরের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকত, মহাপিতরের প্রাধান্য থাকলেও তার সব কিছুই জনতার ওপর নির্ভর করত। কিন্তু বক্ষুতটের শেষ-সংঘর্ষ একাধিক গোষ্ঠীর এক সেনাপতি ইন্দ্রকে জন্ম দিয়েছিল।*

পুরুধান

দেশ : উপরিস্বাত ॥ কাল : ২০০০ খৃষ্টপূর্ব

সুবাস্তুর বাঁদিকে সবুজে ঢাকা পর্বতমালা, পাহাড় থেকে আছড়ে-পড়া ঝর্ণার ধারা, আর দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে আন্দোলিত গমের ক্ষেতে সুশোভিত এই অঞ্চল গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে। কিন্তু এই অঞ্চলের আর্যভাষীদের সবচেয়ে বেশী গর্ব ছিল পাথরের দেওয়াল ও পাইন শাখায় আচ্ছাদিত গৃহচূড়া নির্মিত নিজেদের বাসস্থান সম্পর্কে। আর এই জন্যেই এই প্রদেশের নামও তারা দিয়েছিল সুবাস্তু, অর্থাৎ স্বাতসুন্দর গৃহসজ্জিত

* আজ থেকে ১৮০ পুরুষ আগেকার কাহিনী। এই সব গোষ্ঠীর কারও কারও সন্তানেরা ভারতের দিকে প্রস্থানরত ছিল। এই সময় কৃষি এবং তামার ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। তারা দাসত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তার থেকে আবার মুক্তি চেয়েছিল।

প্রদেশ। বক্ষুতট পরিত্যাগ করে আর্যভাষীগণ পামীর ও হিন্দুকুশের দুর্গম গিরিপথ এবং কুনার ও পঞ্জ-কোরার নদী অতিক্রম করে এসেছিল। অতীতের সেই স্মৃতি সম্ভবত অনেক দিন অম্লান ছিল। মঙ্গলপুরের (মঙ্গলোরের) ইন্দ্র উৎসব হচ্ছে আজ। উৎসবের এই বিরাট প্রস্তুতির কারণও বোধহয় ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন —কারণ আপন ইন্দ্রের পরিচালনায় দুর্গম পার্বত্যপথ তারা একদিন নিরাপদেই অতিক্রম করেছিল।

মঙ্গলপুরে পুরুরা তাদের সুন্দর ঘরগুলি পাইন শাখায় ও রঙ বেরঙের পতাকায় সাজিয়েছিল। পুরুধান তার ঘর সাজাচ্ছিল এক বিশেষ ধরনের রক্ত পতাকা দিয়ে। তা দেখে প্রতিবেশী সুমেধ বলল, "মিত্র পুরু! তোমার পতাকাগুলো বেশ হাল্‌কা ও চিকন দেখছি। আমাদের এখানে তো এ রকম কাপড় বোনা হয় না, এতে বোধহয় অন্য কোনো ধরনের ভেড়ার লোম ব্যবহার করা হয়েছে?"

"না, এ-তো কোনো ভেড়ার লোমে বোনা হয়নি, সুমেধ!"

"তা'হলে?"

"এ এক রকমের পশম —গাছে জন্মায়। আমরা ভেড়ার গা থেকে পশম নিয়ে কাপড় বুনি, আর এই পশম জন্মায় জঙ্গলের গাছে।"

"এ রকম শোনা যায় বটে কিন্তু নিজের চোখে এ ধরনের গাছ কখনো দেখিনি।"

উরুর ওপর তকলী ঘষে সেটা ঘুরিয়ে দিয়ে ভেড়ার লোমের ফেটি লাগাতে লাগাতে সুমেধ বলল, "কী ভাগ্যবান তারা, যাদের গাছে এই পশম জন্মায়! আচ্ছা, আমাদের এখানে ঐ গাছ লাগানো যায় না?"

"তা বলতে পারি না। কতটা শীত-তাপ সে গাছ সহ্য করতে পারে তাও জানি না। কিন্তু সুমেধ! মাংস তো আর গাছে জন্মাতে পারে না!"

"কোনো দেশে যদি গাছে পশম জন্মাতে পারে —কে জানে হয়ত এমন দেশও আছে যেখানে গাছেই খাবার মাংস পাওয়া যায়। যাক্‌, এ কাপড়ের দাম কত?"

"পশমী কাপড়ের চেয়ে অনেক কম, তবে টেঁকে না বেশীদিন।"

"কোথায় খরিদ করলে?"

"অসুরদের কাছ থেকে। এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে তাদের দেশ, সেখানকার লোকেরা গাছের পশমের কাপড় পরে।"

"এত সস্তা যখন, তখন আমরাই বা পরি না কেন?"

"ঐ কাপড়ে শীত কাটে না।"

"তবে অসুররা পরে কি করে?"

"ওদের দেশে ঠাণ্ডা কম, বরফ পড়েই না।"

"আচ্ছা পুরু, তুমি কেবল দক্ষিণ দিকেই ব্যবসা করতে যাও কেন?"

"লাভ বেশী হয় —সেই জন্যই ! আর বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্রও পাওয়া যায়। তবে খুব কষ্টও হয়। ওদিকে গরম প্রচণ্ড, একটু ঠাণ্ডা জলের জন্য প্রাণ ছট্‌ফট করে।"

"ওখানকার লোকেরা সব কেমন, পুরুধান ?"

"লোকগুলো বেঁটে বেঁটে, রঙ তামাটে। বড়ই কুৎসিত। আর নাক আছে কি নেই সেটা বোঝা যায় না —খুব চেপ্টা ও ভোঁতা। আর সবচেয়ে খারাপ হল যে, সেখানে মানুষ কেনা-বেচা চলে।"

"কি বললে ? মানুষ কেনা-বেচা !"

"হ্যাঁ, ওরা এই ব্যবসাকে বলে দাস-ব্যবসা।"

"দাস ও তাদের প্রভুদের মধ্যে কি চেহারার কোনো পার্থক্য আছে ?"

"না। তবে দাসরা খুব গরীব ও পরাধীন —দেহ-মন সবই প্রভুদের অধীনে।"

"ইন্দ্র রক্ষা করুন, এমন লোকের মুখ যেন দেখতে না হয় !"

"মিত্র সুমেধ ! তোমার তকলী তো ঘুরছেই — যজ্ঞে যাবে না ?"

"যাব না কেন ! ইন্দ্রের দয়াতেই আমরা নধর পশু আর মধুর সোমরস পাচ্ছি। এমন কোন হতভাগা আছে যে এই ইন্দ্রপূজায় মিলিত হবে না ?"

"তোমার বউটির খবর কি ? তাকে তো আজকাল দেখা-ই যায় না !"

"কেন, তুমি তার প্রেমে মজেছ না-কি, পুরুধান ?"

"মজবার কথা হচ্ছে না। তুমি তো জেনেশুনেই বুড়ো বয়সে তরুণীর সঙ্গে প্রণয়ের জিদ্ ধরেছিলে !"

"পঞ্চাশে লোক বুড়ো হয় না।"

"কিন্তু, পঞ্চাশ আর বিশ বছর বয়সের মধ্যে পার্থক্য কত, জান ?"

"বেশ তো, সে তা'হলে তখনই আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেই পারত !"

"তুমি তখন গোঁফ-দাড়ি মুড়িয়ে চেহারা করেছিলে যেন আঠারো বছরের ছোকরা ! আর উষার মা-বাপের নজর ছিল তোমার পালিত পশুদের ওপর।"

"এ সব কথা বন্ধ কর পুরু। তোমরা ছেলেছোকরা তো খালি …।"

"বেশ, এ সব কথা না হয় বলব না। ওদিকে কিন্তু বাজনা আরম্ভ হয়ে গেছে —উৎসব এ বার সুরু হবে।"

"দিলে এখানে দেরী করিয়ে —বেচারা সুমেধ এখন গাল্ খাক্ আর কি !"

"বেশ তো চল, উষাকেও সঙ্গে নেওয়া যাক্।"

"সে কি এখনও বাড়ি বসে আছে না-কি !"

"যাক্, এই পশম আর তকলীটা রেখে চল এখন।"

"আরে, এগুলো সঙ্গে থাকলে যজ্ঞের কিছু অঙ্গহানি হবে না।"

"এই জন্যেই তো উষা তোমায় পছন্দ করে না।"

"পছন্দ ঠিকই করে —অবশ্য তোমরা মঙ্গলপুরের তরুণরা যদি তাকে পছন্দ করতে না দাও —তা'হলে আমার আর দোষ কি ?"

কথা বলতে বলতে দুই সঙ্গী শহরের সীমা ছাড়িয়ে এগুতে লাগল যজ্ঞ-বেদীর দিকে। পথে যে কোনো যুবক বা যুবতীর সঙ্গে পুরুধানের চোখাচোখি হয় —সে-ই মুচকি হেসে চলে যায়; পুরুধানও চোখ ঠেরে মাথা ঘুরিয়ে নেয়। এই অবস্থায় একজন তরুণকে সুমেধ পাকড়াও করে বকে উঠল, "এই তরুণরাই হচ্ছে মঙ্গলপুরের কলঙ্ক।"

"কি ব্যাপার, মিত্র !"

"মিত্র-টিত্র নয়, ওরা আমাকে দেখে হাসছে।"

"আরে বন্ধু, ও তো বদমাস —তুমিও সেটা জান। ওর কথা ভাবছ কেন ?"

"আমি তো মঙ্গলপুরে কাউকে ভালো দেখি না।"

যজ্ঞ-বেদীর পাশে বিস্তৃত ময়দান —তাতে এখানে-ওখানে মঞ্চ এবং পাইন পাতায় সজ্জিত তোরণ প্রস্তুত হয়েছিল অতিথিদের স্বাগত জানাবার জন্য। গ্রামের বহুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষ বেদীর চতুর্দিকে জমায়েত হয়েছিল কিন্তু আসল বড় সমাবেশটা সন্ধ্যার পরই হওয়ার কথা, তখন সারা পুরু-জনের সকল স্ত্রী-পুরুষ এই উৎসবে যোগ দেবে —স্বাত নদীর অপর পারের মাদ্র-জনের স্ত্রী-পুরুষেরাও আসবে।

উষা দুই বন্ধুকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি তাদের কাছে গিয়ে সুমেধের হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে তরুণী প্রেমিকার মতো চটুল ভঙ্গীতে বলল, "প্রিয় সুমেধ ! সারা সকাল তোমায় খুঁজে খুঁজে আমি প্রায় শেষ হয়ে গেলাম, তবু তোমার পাত্তাই নেই।"

"কেন, আমি কি মরে ভূত হয়ে ছিলাম !"

"এমন কথা মুখে এনো না ! বেঁচে থেকে আমাকে বিধবা বানিয়ো না।"

"পুরু-জনের বিধবাদের ভাবনা কি, দেবরের অভাব নেই !"

"কেন, সধবাদের কাছে দেবররা কি বিষতুল্য ?" —পুরুধান প্রশ্ন করল।

সুমেধ বলল, "ঠিক বলেছ পুরু। ও আমাকে শেখাতে এসেছে। নিজে কোন ভোরে বেরিয়েছে —না জানি এর মধ্যে কত ঘর ঘুরে এসেছে ! সন্ধ্যার পর এ বলবে আমার সঙ্গে নাচ, ও বলবে —না আমার সঙ্গে। এই নিয়ে বেধে যাবে ঝগড়া, রক্তারক্তি। আর এই বউ-এর জন্যে বদনাম হবে বেচারা সুমেধের।"

উষা সুমেধের হাত ছেড়ে দিয়ে চোখের চাউনি ও কণ্ঠের স্বর বদলে চীৎকার করে বলল, "তুমি কি আমাকে বাক্সে বন্ধ করে রাখতে চাও না-কি ? যাও না —রান্না ভাঁড়ারের ভার নাওগে, আমিও নিজের পথ দেখে নিই।" যাবার সময় পুরুধানকে একান্তে মুচকি হাসির ইসারা দিয়ে বেদী সংলগ্ন ভিড়ের মধ্যে উষা হারিয়ে গেল।

বছরের একটা বিশেষ দিন বলে এই দিনটা গণ্য হত। বক্ষু তটে (অক্সাসের তীরে) স্বাত উপত্যকায় অতীতের পুরু-জনের প্রথা অনুসারে পশুপালের সেরা ঘোড়াটি বলি দেওয়া হত। সারা স্বাত উপত্যকায় এই সময় ঘোড়া খাওয়ার রেওয়াজ ছিল না —তবু ইন্দ্রপূজার বলি হিসাবে সকলেই ভক্তিভরে প্রসাদ নিত। জনের মহাপিতর —যাকে এখানে জনপতি বলা হয় —আজ আপন জনপরিষদের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রপূজার প্রিয় অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগ দিত। এই বলিদানের সব বিধি-বিধান প্রত্যেকেরই জানা। বক্ষু উপত্যকার অধিবাসীরা যে মন্ত্র পড়ে ঘোড়া ইন্দ্রের নামে উৎসর্গ করত —তা তাদের সবটাই মুখস্থ ছিল। বাদ্য ও মন্ত্রস্তুতির সঙ্গে অশ্বকে স্পর্শ করে এবং প্রক্ষালন থেকে বলি পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হল। তারপরে ঘোড়াটির চামড়া ছাড়িয়ে তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কাটা হল —পরে কয়েক খণ্ড মাংসে মশলা মাখিয়ে আহুতি হিসাবে আগুনের মধ্যে দেওয়া হল।

যজ্ঞের বলি, প্রসাদ বিতরণ করতে করতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ইতিমধ্যে যজ্ঞভূমি নর-নারীতে ভরে গেছে। এই দিন সকলেই আপন-আপন শ্রেষ্ঠ বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে এসেছে। মেয়েদের দেহে ছিল সূক্ষ্ম রঙিন কম্বল —কোমরের কাছে বাঁধা কারুকার্যখচিত নানা রঙের কোমরবন্ধনী, আর নীচে সুন্দর লোমবস্ত্রের আবরণ। প্রায় প্রত্যেকের কানেই সোনার কুণ্ডল। বসন্ত শেষ হয়ে আসছে —সারা উপত্যকায় ফুল যেন আজকের দিনটিকে লক্ষ্য করে বিকাশিত হয়েছে। আজকের রাত নর-নারীর স্বচ্ছন্দ বিহারের রাত —ইচ্ছামতো প্রণয় ও কামনা-ভোগের রাত। রাত্রে যখন উৎসবের সজ্জায় সুসজ্জিতা উষা পুরুধানের হাতে হাত মিলিয়ে ঘুরছিল তখন সুমেধের নজর পড়ল, কিন্তু কি বা করতে পারে সে —হতাশ ভঙ্গীতে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ইন্দ্রের উৎসবের দিনে নর-নারীর যথেচ্ছ মিলনে রাগ করার পর্যন্ত অধিকার কারুর নেই।

রাতে মধু ও ভাঙ-এর নদী বয়ে যাচ্ছিল। সারা গাঁয়ের মানুষ জড়ো করেছে, ভোগ দেওয়ার জন্য সুস্বাদু গোমাংস আর সোমরস। সর্বত্রই অভিনব প্রেমের মাদকতাপূর্ণ জড়ানো কণ্ঠের সম্ভাষণ আর যুগ্ম তরুণ-তরুণীর পদচারণ নজরে পড়ছে। এক টুকরো মাংস মুখে পুরে এক পেয়ালা সোমরসে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে। বাজনা বেজে উঠছে —আর বাজনার তালে তালে নাচছে তারা। শ্রান্ত হলে বিশ্রামের পর অপর গ্রামের আগন্তুকদের গিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সারা গোষ্ঠীর লোকদের উদ্যোগে উৎসবের আয়োজনও ছিল বিরাট —আর নাচের জন্য আসরও ছিল বিস্তৃত। ইন্দ্র উৎসব ছিল যুবজনের মহোৎসব। এদিন তাদের কোনো কিছু করতেই বাধা-নিষেধ ছিল না।

২

উপরি-স্বাতের এই অংশ পশু এবং শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ —এখানকার লোকেরা সুখী এবং সমৃদ্ধ। এদের যে-সব জিনিসের অভাব —তার মধ্যে তামা এবং সখের জিনিস যেমন

সোনা-রূপা ও কয়েকটি বস্তু যার অভাব দিন-দিনই বেড়ে চলেছে। এইসব জিনিসের জন্য স্বাত এবং কুভা (কাবুল) নদীর সঙ্গমস্থলে অসুর-নগর রয়েছে। মনে হয়, এই আর্যভাষীরা অসুর-নগরকে পুষ্কলাবতী (=চরসদ্দা) নামে ডাকে আর আমরাও এখানে এই নামকে স্বীকার করে নিচ্ছি। শীতের মাঝামাঝি —স্বাত, পঞ্জকোরা, এবং অন্যান্য উপত্যকাবাসী পাহাড়ী গোষ্ঠীসমূহ, যথা পুরু, কুরু, গান্ধার, মাদ্র, মল্ল, শিবি, উশীনর ইত্যাদি —নিজ নিজ ঘোড়া, কম্বল এবং অপরাপর বস্তু নিয়ে পুষ্কলাবতীর বহির্ভাগে অবস্থিত ময়দানে ডেরা (তাঁবু) বেঁধে বসত। বহু শতাব্দী ধরে এই নিয়ম ভালোভাবেই চলে আসছিল, এ বছর পুরুদের যে সার্থ (ক্যারাভ্যান) বা বণিকদল পুষ্কলাবতী গেল তাদের নেতা ছিল পুরুধান। এ দিকে কয়েক বছর থেকে পাহাড়ীদের ধারণা হচ্ছিল যে, অসুররা ভয়ানক ঠকাচ্ছে। অসুর নাগরিকেরা এই পাহাড়ীদের চেয়ে বেশী চতুর, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। সঙ্গে সঙ্গে তারা এদের নিরেট উজবক্ জংলী বলে মনে করত। এতে কিছুটা সত্যতাও ছিল। তবে নীল চোখ বিশিষ্ট আর্যভাষী ঘোড়সওয়ার কখনই নিজেকে অসুর নাগরিকদের চেয়ে হীন বলে মানতে রাজী ছিল না। ধীরে ধীরে যখন আর্যভাষীদের মধ্যে থেকে পুরুধানের মতো বহু লোক অসুরদের ভাষা বুঝতে শিখল এবং তাদের সমাজে চলাফেরা করবার সুযোগ পেল তখন জানল, অসুররা আর্যভাষীদের পশু-মানব বলে মনে করে।

অসুরদের নগরগুলি সুন্দর, সেখানে পাকা ইঁটের বাড়ি, স্নানাগার, সড়ক ইত্যাদি তৈরী হত। আর্যভাষীরাও পুষ্কলাবতীর সৌন্দর্যকে অস্বীকার করত না। অসুর তরুণীর নাক, কেশ ও উচ্চতা পছন্দ মতো না হলেও তাদের সৌন্দর্যকে তারা মানতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু এ কথা তারা কখনই স্বীকার করত না যে, দেবদারু-সমাচ্ছাদিত পর্বত-মেখলার মাঝে অবস্থিত চিত্র-বিচিত্র কাঠের অট্টালিকা যুক্ত মঙ্গলপুরের সুসজ্জিত স্বচ্ছগৃহপংক্তি পুষ্কলাবতী থেকে কোনো অংশে হীন। পুষ্কলাবতীতে এক মাস কাটানোও তাদের পক্ষে মুস্কিল হত, এবং বারবার আপন জন-ভূমির কথা স্মরণে আসত। যদিও ঐ স্বাত নদী পুষ্কলাবতীর ধার দিয়েও বয়ে চলেছে, কিন্তু তারা দেখত নদীর জলে সেই স্বাদ নেই। তাদের বক্তব্য ছিল, অসুরদের স্পর্শে এই পবিত্র জল কলুষিত হয়ে গেছে। সে যাই হোক না কেন, আর্যভাষীরা কোনো রকমেই অসুরদের আপন সমকক্ষ বলে মানতে রাজী ছিল না। বিশেষ করে যখন তারা তাদের হাজার হাজার দাস-দাসী এবং ঘরে বসে আপন দেহ বিক্রয়কারিণী বেশ্যাদের দেখত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আর্যভাষীদের অসুরদের মধ্যে এবং অসুরদের আর্যভাষীদের মধ্যে বহু মিত্র ছিল। অসুরগণের রাজা পুষ্কলাবতী থেকে কিছু দূরে সিন্ধুতটের পার্শ্ববর্তী কোনো নগরে বাস করত। এ জন্য পুরুধান তাকে কোনোদিন চোখে দেখেনি। হ্যাঁ, রাজার স্থানীয় অমাত্যকে দেখেছিল সে —বেঁটে, মোটা আর অত্যন্ত অলস, সুরার প্রভাবে তার চোখের পাতা সর্বদাই বুঁজে থাকত। সারা দেহে বহুবিধ সোনা-রূপার অলঙ্কারে সজ্জিত

এই রাজকর্মচারীটি পুরুধানের চোখে কুরূপতা এবং বুদ্ধিহীনতার প্রতীক বলে মনে হত। যে রাজ্যের এমন প্রতিনিধি তার প্রতি পুরুধানের মতো লোকের উঁচু ধারণা থাকতে পারে না। পুরুধান শুনেছিল যে, সে অসুররাজের শালা এবং এই একটি মাত্র গুণের জোরে সে এই পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

কয়েক বছরের সামরিক সংস্পর্শ হেতু অসুরসমাজের ভিতরকার বহু দুর্বলতা পুরুধানের চোখে ধরা পড়ে। উচ্চশ্রেণীর অসুররা আপন অধীনস্থ ভট এবং দাসদের শক্তির জোরে শত্রুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায়। দুর্বল শত্রুকে জয় করতে এরা ভালোভাবেই সফল হয়, কিন্তু বলবান শত্রুর সামনে লড়তেই পারে না। অসুরদের শাসক, রাজা, সামন্ত ভোগ-বিলাসকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করত। প্রত্যেক সামন্তেরই শত শত স্ত্রী এবং দাসী থাকত। স্ত্রীদের তারা দাসীর মতো করেই রাখত। হালে কিছু পাহাড়ী স্ত্রীকেও বলপূর্বক অসুররাজা আপন অন্তঃপুরে এনে রেখেছিল। এর ফলে আর্যভাষী জনের ভিতরে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু অসুবিধা এই ছিল যে, অসুর-রাজের রাজধানী সীমান্ত থেকে বহুদূরে, আর্যভাষী-জনের পক্ষে সেখানে উপস্থিত হওয়া মুখের কথা নয়। তাই আর্যভাষী রমণীদের অসুরপুরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে আর্যভাষী জনেরা কিংবদন্তী বলেই মনে করত।

পুষ্কলাবতীর রাজার কাছ থেকে নানাপ্রকার অলঙ্কার, কার্পাস-বস্ত্র, অস্ত্র-শস্ত্র এবং অপরাপর দ্রব্যসম্ভার, সুবাস্তু কুনারের উপরিভাগে কাঁটার ছাউনিতে পৌঁছাতে আরম্ভ করেছিল। সুবাস্তুর স্বর্ণকেশী আর্যভাষী রমণীরা দক্ষ অসুর শিল্পীদের হাতে গড়া অলঙ্কারে মুগ্ধ হয়ে প্রতি বছর অধিকতর সংখ্যায় পুষ্কলাবতী আসতে আরম্ভ করল।

সুমেধ বেচারা সত্যি-সত্যিই উষাকে বিধবা বানিয়ে চলে গিয়েছিল, উষা এখন তার খুড়তুতো দেবর পুরুধানের পত্নী। এ বছর সেও পুষ্কলাবতীতে এসেছিল। পুষ্কলাবতীর নগরাধিপতির লোকজনেরা আর্যভাষীদের তাঁবুর ভিতর বহু সুন্দরী দেখে সেই খবর আপন প্রভুর কাছে পৌঁছে দিল। তারা ঠিক করল, সার্থ যখন ফিরে যেতে থাকবে তখন পাহাড়ে ঢুকতেই হামলা করে তাদের লুটে নিয়ে যাবে। যদিও এই কাজ বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ, কারণ পীতকেশীরা অত্যন্ত যুদ্ধকুশল—এ খবর তাদেরও জানা ছিল। কিন্তু নগরাধিপতির মগজে বুদ্ধির লেশমাত্র ছিল না। নগরের বড় বড় শেঠ-সাহুকেরা তাকে ঘৃণা করত। যে ব্যাপারীর সঙ্গে পুরুধানের মিত্রতা ছিল, তার সুন্দরী কন্যাকে হালে নগরাধিপতি জবরদস্তি করে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছিল, এ জন্য সে তার সারা জীবনের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। উষাও এই অসুর সওদাগরের বাড়ি কয়েকবার গিয়েছে। যদিও ঐ সওদাগর পত্নীর একটি কথাও বুঝতে পারত না, পুরুধানের দোভাষীর কাজে এবং শেঠগিন্নীর ব্যবহারে দুই নারীর ভিতর সখিত্ব সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল। বিদায় নেবার দিন

দুই আগে সওদাগর তার বড় গ্রাহক পুরুধানকে নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করল। সেই সময় সে পুরুধানের কানে নগরাধিপতির ঘৃণ্য মতলবের কথা জানিয়ে দিল।

সমস্ত আর্যভাষী সার্থ-নায়ককে ডেকে সারারাত পরামর্শ করল পুরুধান।

যাদের হাতে অস্ত্র কম ছিল, তারা নতুন অস্ত্র কিনল। বিক্রী করবার জন্যে আনীত ঘোড়া এবং অন্যান্য ভারী মোট তারা বেচে দিল। শুধু নিজেদের চড়বার ঘোড়া এবং অন্যান্য কেনা জিনিসপত্র, যেমন অলঙ্কার এবং অন্যান্য ধাতব দ্রব্য রেখে কিছুটা হাল্‌কা হল। আর্যভাষী রমণীদের মধ্যে অলঙ্কার-প্রীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল, কিন্তু এই সময় পর্যন্ত তাদের শিক্ষায় নৃত্যগীতের সঙ্গে শস্ত্র-শিক্ষাও চলে আসছিল, এ জন্য সঙ্কটের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও আপন-আপন খড়্গ এবং চামড়ার ঢাল তুলে নিল।

পুরুধানের এ খবর জানা ছিল যে, অসুর সৈন্য সীমান্তের গিরিবর্তে আগে থেকে রাস্তা আটকে আক্রমণ করবে এবং সেই সময় তাদের এক অংশ পিছন থেকেও ঘিরে ফেলতে চাইবে। এ জন্য পুরুধান পুরোদস্তুর তৈরী হয়ে গেল, আর প্রথমেই খবর পাওয়া গেল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। যদিও শত্রুকে জানতে না দেবার জন্য তারা পুষ্কলাবতী থেকে দু-একদিন আগে পিছে রওনা দিল, কিন্তু ঠিক হল যে অজার (অবাজই) দ্বারে সকলেই এক সঙ্গে পৌছাবে। দ্বার যখন ক্রোশ দুই বাকি, পুরুধান তখন পঁচিশ জন সওয়ারীকে আগে পাঠাল। যে সময় সওয়ারীরা দ্বারের ভিতরে এগুতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময়ে অসুর সৈন্যরা তাদের ওপর বাণ ছুঁড়তে আরম্ভ করল। আক্রমণের সংবাদ সত্যে পরিণত হল, সওয়ারীরা পিছু হটে আপন সার্থ-নায়কদের সংবাদ দিল। পুরুধান প্রথমে পিছন থেকে এগিয়ে আসা শত্রুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইল। এতে সুবিধাও ছিল, কারণ যদিও অসুরেরা প্রতি বছর আর্যভাষীদের কাছ থেকে হাজার হাজার ঘোড়া কিনেছিল বটে কিন্তু তারা তখনও পর্যন্ত সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈনিক হয়ে উঠতে পারেনি।

সার্থ রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক উটকে সেখানে ছেড়ে বাকি সওয়ারীদের সঙ্গে পেছনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। অসুর-সেনা প্রত্যাশা করেনি যে, পীতকেশীরা এভাবে পাল্টা মার দেবে। পীতকেশীদের দীর্ঘ বল্লম এবং খড়্গের সামনে তারা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না, কিন্তু আর্যরা এদের শুধু পরাজিত করেই ছাড়তে চাইল না। তারা এইসব বোঁচা-নাক, কালো অসুরদের বুঝিয়ে দিতে চাইল যে, পীতকেশীদের ওপর নজর দেওয়া কি ভয়ঙ্কর বিপদের কাজ। অসুর-সেনাদের পলায়ন করতে দেখে পুরুধান সার্থকে খবর পাঠাল এবং নিজে ঘোড়সওয়ার নিয়ে পুষ্কলাবতীতে এসে পড়ল। অসুর সেনানীদের মতো তাদের নগরাধিপতিও এমনটি আশা করেনি। অসুরেরা তাদের পূর্ণ শক্তিকে সংগঠিত করবার সুযোগ পেল না এবং সহজেই অসুর-দুর্গ এবং নগরাধিপতি, পীতকেশীদের অধিকারে চলে এল। তারা খুব নিষ্ঠুরভাবে অসুর পুরুষদের বধ করল। আর নগরাধিপতিকে

নগরের চৌরাস্তায় এনে অসুর প্রজাদের সামনে তার এক-একটি অঙ্গচ্ছেদ করে হত্যা করল। স্ত্রীলোক, শিশু এবং ব্যাপারীদের তারা মারল না। ঐ সময়ে অসুরদের যদি দাস বানাবার ইচ্ছা থাকত তবে এত অধিকসংখ্যক অসুর নিহত হত না। পুষ্কলাবতীর বহুলাংশ তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলল। অসুর দুর্গের এই প্রথম পতন ঘটল। অসুর এবং পীতকেশীদের মহান্ বিগ্রহের, দেবাসুরের সংগ্রাম —এইভাবেই সূত্রপাত হল।

পুরুধান ফিরে এসে অজাগিরিবর্তে অসুর সৈন্যবাহিনীকে নির্মূল করল। তারপর সমগ্র পীতকেশী সার্থ আপন আপন জন-ভূমিতে ফিরে গেল। কয়েক বছরের জন্য পুষ্কলাবতীর ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। পীতকেশীরা অসুর-পণ্য নিতে অস্বীকার করল, কিন্তু তামা, পিতলকে কতদিন দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে ?*

অঙ্গিরা

স্থান : গান্ধার (তক্ষশিলা) ॥ কাল : ১৮০০ খৃষ্টপূর্ব

"এই সুতি কাপড় একেবারেই অকেজো এতে না আটকায় শীত ; না রোখে বর্ষা !" নিজের গা থেকে ভিজে কাপড়টি খুলতে খুলতে যুবকটি বলল।

দ্বিতীয় তরুণটি তার আপন পরিধেয় দরজার কপাটে মেলে দিতে দিতে বলল, "কিন্তু যাই বল, গ্রীষ্মকালের পক্ষে এগুলো ভালো" —সন্ধ্যা হতে তখনও দেরী কিন্তু ইতিমধ্যেই অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় লোক জুটতে সুরু করেছিল। তরুণদ্বয় ধোঁয়া-ভরা অগ্নিকুণ্ডের পাশে না বসে জানালার ধারে গিয়ে বসল, ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্যে দুটো কম্বল নিজেদের গায়ে জড়িয়ে নিল।

প্রথম তরুণটি বলল, "আমরা এখনও এক যোজন পথ হাঁটতে পারতাম, তা'হলে কাল ভোরে গান্ধারনগর (তক্ষশিলায়) পৌছাতে পারতাম, কিন্তু এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পথ চলা বড় কষ্টকর।"

দ্বিতীয় তরুণ বলল, "শীতের আগমনকালীন ঋতুর এই পরিবর্তন খুবই খারাপ লাগে— এখন বর্ষায় চারিদিক ছেয়ে যাবে। অথচ এই বৃষ্টি না হলে কৃষকেরা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করবে —পশুপালকেরা করবে কান্নাকাটি।"

প্রথম জন উত্তর দিল, "মিত্র, ঠিকই বলেছ। একমাত্র আমাদের মতো পথিকরাই

---

* আজ থেকে ১৬০ পুরুষ আগে দেবাসুর সংঘর্ষ হয়েছিল। আর্যভাষীদের সমাজে দাসপ্রথা স্বীকৃত হয়নি কিন্তু তামা-পিতলের ব্যবসা জোর কদমে এগিয়ে চলল।

এই বৃষ্টি পছন্দ করে না। আর সকলে তো সর্বদা পথে থাকে না!" এমন সময় তার সঙ্গীটির গলায় ক্ষতচিহ্নের প্রতি নজর পড়ায় সে প্রশ্ন করল, "তোমার নাম কি বন্ধু?"

"পাল মাত্র। আর তোমার?"

"বরুণ সৌবীর।"

"তা'হলে তুমি পূবদিক থেকেই আসছ?"

"হ্যাঁ মাদ্রদেশ থেকে। আর তুমি দক্ষিণ থেকে তো? আচ্ছা বন্ধু বল তো আমরা যে শুনেছি অসুররা না-কি এখনও আর্যভাষীদের সঙ্গে লড়াই করছে।"

"একমাত্র সমুদ্রতটে একটি শহরকে কেন্দ্র করে এই লড়াই চলছে। আমাদের মঘবা ইন্দ্র কিভাবে অসুরদের একশ নগর-দুর্গ ধ্বংস করেছিল—তার কথা কি জান, বন্ধু?"

"শুনেছি, অসুরদের নগর-দুর্গ লৌহ (তাম্র) নির্মিত ছিল।"

"অসুরদের এত লোহা নেই যে তা দিয়ে তারা দুর্গ বানাবে। এই গুজব ছড়িয়ে পড়ল কি করে তা অবশ্য জানি না। তাদের বাড়ি-ঘর ইঁট দিয়ে বানানো, শহরের চারপাশের মোটা দেওয়ালও ইঁটের। মাটি আগুনে পুড়িয়ে লালচে রঙ-এর ইঁট হয় কিন্তু তা মাটির চেয়ে চারগুণ শক্ত—লোহার মতো মজবুদ্‌। তবু ইঁট আর লোহার তফাৎ অনেক। অনেকে ভুল করে ইঁটকে হয়ত লোহা মনে করে।"

"তুমি যাই বল বরুণ, আমরা কিন্তু লৌহদুর্গের কথাই শুনেছি।"

"আমাদের ইন্দ্রকে দুর্গ ধ্বংস করতে অনেক কষ্ট ও শক্তিক্ষয় করতে হয়েছে—তাই বোধহয় এ দুর্গ লৌহনির্মিত বলে কথিত হয়েছে।"

"তা ছাড়া সম্বরের শৌর্যবীর্যের কত না কাহিনী আমাদের কানে এসেছে। সমুদ্রের মধ্যে তার না-কি ঘর, আকাশ পথে তার রথ উড়ে চলত!"

"রথের কথা তাহা মিথ্যা, একেবারেই আজগুবি। তা'ছাড়া অশ্বারোহী যোদ্ধা হিসাবে অসুরেরা দুর্বল। এখনও, তাদের উৎসবের সময় অশ্বরথের জায়গায় বৃষরথ নিয়ে আসে। আমরা যুদ্ধে জিতেছি ঘোড়ার জোরে—ভালো ঘোড়সওয়ার হতে না পারলে যুদ্ধে আমরা অসুরদের হারাতে পারতাম না। সম্বর প্রায় দু'শ বছর হল মারা গেছে! আকাশপথে উড়ে যাওয়া দূরের কথা, তার কাছে অশ্বরথ পর্যন্ত ছিল না।"

"সম্বর যদি এতই সাধারণ মানুষ ছিল, তবে ওই অসুর শত্রুকে পরাজিত করায় আমাদের ইন্দ্রের এত নামডাক কেন?"

"কারণ, সম্বর ছিল খুব বড় বীর! সৌবীর নগরে আমি তার স্বর্ণখচিত তাম্রকবচ (বর্ম) দেখেছি—সেটা যেমন দৃঢ়, তেমনিই বিশাল। অসুররা সাধারণভাবে বেঁটে গড়নের কিন্তু সম্বর ছিল বিরাট্‌কায়, খুবই বলিষ্ঠ। আর আমাদের মঘবা ইন্দ্র ছিল পাতলা ছিপছিপে জোয়ান মানুষ। সিন্ধু নদের তীরে এখনও দেখতে পাবে পুরনো দিনের অসুর

নগরীর অবশেষ। মনে কর সেইসব দিনের কথা, দুর্গের মধ্যে থেকে কিছু তীরন্দাজ হাজার হাজার আক্রমণকারীকে হটিয়ে দিত। ঐ দুর্গগুলো ছিল দুর্ভেদ্য —আর এই অপরাজেয় পুরীকে ধ্বংস করেছিল আমাদের মঘবা ইন্দ্র।"

"আচ্ছা বরুণ, দক্ষিণে কি অসুরদের শক্তি অটুট আছে ?"

"তোমাকে কি বলিনি, সমুদ্রতটের শেষ দুর্গও অসুরেরা হারিয়েছে। আমরা তা ধ্বংস করেছি। ঐ যুদ্ধে আমিও যোগ দিয়েছিলাম।" কথা বলতে বলতে বরুণের মুখমণ্ডলে রক্তিমাভা ফুটে উঠল। সে তার দীর্ঘ সোনালী চুলের গোছা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল, "অসুরদের সর্বশেষ দুর্গের পতন ঘটে গেছে।"

"এই যুদ্ধে আমাদের ইন্দ্র কে ছিল ?"

"ইন্দ্রের পদ আমাদের বিলোপ করেছি।"

"বিলোপ করেছ ?"

"হ্যাঁ, আমরা দক্ষিণের আর্যভাষীরা ক্রমেই শঙ্কিত হচ্ছিলাম।"

"শঙ্কিত হচ্ছিলে! কেন ?"

"আর্যভাষীরা সেনানায়ককে সর্বেসর্বা বলে মেনে চলতে রাজী নয়! যুদ্ধের সময় সেনানায়কের আদেশ যতই শিরোধার্য হোক না কেন, আর্যভাষীরা সব সময় তাদের জন-পরিষদকে সর্বোচ্চ স্থান দেয় যেখানে স্বাধীনভাবে প্রত্যেকে নিজের চিন্তাধারা উত্থাপন করবার অধিকারী।"

"হ্যাঁ, ঠিকই তো, এ অধিকার আছে।"

"কিন্তু অসুরদের প্রথা অন্য রকম। তারা ইন্দ্রকে রাজা বলে মনে করে। আর এই রাজা নিজেকেই সব কিছু মনে করে—নিজের ওপরে জন-পরিষদকে স্থান দেয় না। অসুররাজের মুখ দিয়ে একবার যা বেরিয়ে গেল তা সমস্ত অসুরের অবশ্য পালনীয়, আর সেটা পালন না করলে মৃত্যুবরণ করতে হবে।"

"না, এ ধরনের ইন্দ্রকে আমরা কখনো স্বীকার করতে পারি না।"

"কিন্তু অসুরেরা এই ধরনের ইন্দ্রকেই বারবার মেনে এসেছে। তারা তাদের রাজাকে মানুষের উর্ধ্বে দেবতার আসনে বসিয়েছিল। জীবিত মানুষ রাজাকে পূজো পর্যন্ত করত। আর এই পূজার অনুষ্ঠানের কথা বললে তুমি তো বিশ্বাসই করবে না।"

"হ্যাঁ, আমি নিজেই দেখেছি অসুর পুরুতরা মানুষকে গাধা বানিয়ে ছাড়ে।"

"তারা জনসাধারণকে গাধার চেয়েও ছোট মনে করে। তুমি বোধহয় শুনেছ তারা লিঙ্গপূজা করে! শরীরের এই প্রত্যঙ্গ দুটি নর-নারীর সুখ-সম্ভোগের এবং ভবিষ্যবংশ সৃষ্টির কারণ বটে, কিন্তু তাকে পূজা করা আহম্মুকি নয় কি ? অনেক জায়গায় আবার মাটির লিঙ্গ গড়ে পূজা করা হয়।"

"আহম্মুকি তো বটেই।"

"আর অসুররাজারা এই ধরনের পূজায় বিশেষ আসক্ত। আমার মনে হয়, এর মধ্যে একটা মস্ত চালাকী আছে, বিশেষত অসুররাজারা আর তাদের পুরোহিতরা মূর্খ হয় না, তারা আমাদের আর্যভাষীদের চেয়ে চতুর। তাদের মতো নগর বা দুর্গ বানাতে আমাদের অনেক শিখতে হয়েছে। তাদের দোকান-পাট, পুষ্করিণী, প্রাসাদ, রাজপথ —এ সমস্ত জিনিস তুমি আমাদের এই ভূখণ্ডে দেখতে পেতে না। আমি উত্তর সৌবীরের পরিত্যক্ত অসুর নগরী ও অধুনা বিজিত অসুর নগরটি দেখেছি। আমরা তাদের পুরনো নগরগুলি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হইনি —বিশেষ করে এই নতুন নগর, যা সম্বর নিজে প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে প্রবাদ আছে তা তো দেবপুরীর সমতুল্য।"

"বল কি, দেবপুরী ?"

"সত্যি বলছি। পৃথিবীর কোনো জিনিসের সঙ্গেই এর তুলনা হয় না। একটি পরিবারের বাসোপযোগী থাকবার গৃহের কথাই ধর না কেন। তাতে আছে —সুসজ্জিত বৈঠকখানা, চুল্লী সমেত রান্নাঘর, তার ধোঁয়া বেরবার আলাদা ব্যবস্থা, চত্বরে বাঁধানো কূপ, স্নানের ঘর, শোবার ঘর আর তা'ছাড়া আছে আলাদা গোলাঘর। দু-তিন তলার বাড়ি দেখেছি —সেখানে সাধারণ লোকেরাই থাকত। এর সঠিক বর্ণনা দেওয়া শক্ত, তুলনা করতে হয় দেবপুরীর সঙ্গেই।"

"পূব দেশেও অসুর নগরী আছে, সেগুলো আমাদের মাদ্রদেশ (বর্তমানে শিয়ালকোট) থেকে অনেক দূরে।"

"আমি তাও দেখেছি বন্ধু! এ রকম নগর যারা নির্মাণ করেছে, যারা পরিচালনা করেছে —তারা যে আমাদের থেকে অনেক বুদ্ধিমান ও চতুর এটা স্বীকার করতেই হবে। তুমি সমুদ্রের কথা শুনেছ কখনো ?"

"নাম শুনেছি।"

"নাম শুনে বা বর্ণনা শুনে তুমি মহাসাগর সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারবে না। সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে যখন তুমি দেখবে তার নীল জলরাশি আকাশ স্পর্শ করেছে— তখন তোমার চেতনায় আসবে —কিছুটা অনুমান করবে।"

"আকাশ পর্যন্ত কি করে সাগর পৌঁছাতে পারে, বরুণ ?"

"হ্যাঁ, তাই হয়। তোমার দৃষ্টি যতদূর যাবে —তুমি দেখবে বিশাল জলরাশি, তরঙ্গের পর তরঙ্গে ক্রমেই ওপরে উঠছে —ফেনিল জলরাশি ক্রমেই আকাশ স্পর্শ করছে। উভয়ের বর্ণও এক, সমুদ্র নীলাকাশের মতোই নীল। আর দিগন্তহীন সাগরে অসুররা তাদের বড় বড় নৌকা নির্ভয়ে ভাসিয়ে দেয় —মাস, বছর অতিক্রম করে সমুদ্রপথে ঘুরে বেড়ায়, আর সমুদ্র পার থেকে রত্ন-ভাণ্ডার সংগ্রহ করে। অসুরদের সাহস ও কুশলতার এও

একটা নজির। এ ছাড়াও আর একটি ব্যাপার আছে যা তুমি কোনোদিন শোননি। অসুররা মুখ ছাড়াই কথা বলতে পারে।"

"এঁ্যা! শব্দ না করে? কি বলছ বন্ধু?"

"হ্যা বিনা শব্দে। মাটি ও পাথর দিয়ে চামড়া বা কাপড়ের ওপর দাগ কেটে যাবে—অন্য অসুররা একটা শব্দ না শুনে বা মুখের দিকে না তাকিয়েই ঐ সমস্ত সঙ্কেত বুঝতে পারবে। আমরা যা দু'ঘণ্টা কথা বলে বোঝাতে পারব না, তা তারা পাঁচ-দশটা সঙ্কেতে বুঝিয়ে দেবে! আর্যরা এ বিদ্যা জানত না। এখন তারা এইসব সঙ্কেত বুঝতে চেষ্টা করছে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে শিখেও কায়দা করতে পারছে না।"

"এ কথা নিঃসন্দেহ যে, অসুররা আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান।"

"দেখ না কেন! এখন আমরা তাদের সর্বত্রই কারিগর, মৃৎশিল্পী, তন্তুবায়, রথ প্রস্তুতকারক ও কর্মকার হিসাবে দেখতে পাই। তারা যে আমাদের চেয়ে গুণী তাতে আর সন্দেহ কি?"

"আর তুমিই তো বলছ অসুররা বীরও বটে।"

"হ্যা, বীর তো বটেই! তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। আর্যভাষীদের মতো ওদের বাচ্চারা মায়ের পেট থেকে পড়েই তরবারি নিয়ে খেলতে শেখে না। ওদের মধ্যে আছে কারিগর, বণিক, দাস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। তেমনি সেনানী বা যোদ্ধা হচ্ছে আলাদা শ্রেণী। যোদ্ধশ্রেণী ছাড়া আর কেউ অস্ত্রবিদ্যা শেখে না। যারা যুদ্ধবিদ্যা শেখে না, যোদ্ধারা তাদের হেয় জ্ঞান করে। আর দাসদাসীরা পশু অপেক্ষা হীন জীবন যাপন করে। অসুররা শুধু এদের বেচাকেনাই করত না, তারা এদের দেহ এবং জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।"

"তাদের যোদ্ধা কত?"

"শতকরা একজনও হয়ত তাদের সৈন্য নয়, কিন্তু দাসের সংখ্যা অনেক বেশী—শতকরা চল্লিশ জন। আর তাদের শিল্পী এবং কৃষকরাও অর্ধ-দাস, শতকরা দশ জন হবে ব্যবসায়ী আর বাকীরা বৃত্তিধারী।"

"তাই তো অসুররা আর্যভাষীদের কাছে হেরে গেল।"

"হ্যাঁ, ওদের হেরে যাওয়ার এটা একটা প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, তারা রাজাকে দেবতা বলে মানত, তাকে জনসাধারণের চেয়ে অনেক ওপরে স্থান দিয়েছিল।"

"আমরা এ ব্যবস্থা কখনই মানব না।"

"এইজন্যেই তো আমাদের ইন্দ্রের পদ বিলোপ করতে হল। মঘবার পর এক ইন্দ্র অসুর রাজার মতো হতে চেয়েছিল। আর সে কি একা, তারপর আরও অনেকে ইন্দ্র হবার চেষ্টা করেছিল। আর কয়েক জন আর্যভাষীও তাদের সাহায্য করতে গিয়ে ধরা পড়ল।"

"সাহায্য করতে গেল!"

"হ্যা, তাই সমগ্র জন-পরিবারের স্বার্থ বিবেচনা করে সৌবীর-জন সিদ্ধান্ত নিল যে, এরপর আর কাউকে ইন্দ্র করা হবে না। বজ্র ধারণ করে যে দেবতা তার নামের সঙ্গে মিশে এই নামের মোহ মানুষকে বিভ্রান্ত করছিল—ইন্দ্রপদ তুলে দেওয়ার সেটাও কারণ বটে।"

"বন্ধু, সৌবীর-জন ভালো কাজই করেছে।"

"কিন্তু আর্যভাষীদের সুনামে কলঙ্ক আরোপ করার জন্যে কিছু লোক আছে যারা অসুরদের সব কিছুকেই প্রশংসা করতে ক্লান্তিবোধ করে না। তাদের অনেক কিছুই প্রশংসনীয়, আমি নিজেও তার সমাদর করি। আমরা তাদের হাতিয়ার দেখেই আমাদের অস্ত্র বানিয়েছি, তাদের বৃষভ-রথ দেখেই তো আমাদের মঘবা ইন্দ্র তার অশ্বরথ নির্মাণ করেছিল। একজন তীরন্দাজের পক্ষে ঘোড়ার চেয়ে রথে বসে যুদ্ধ করা অনেক বেশী সুবিধাজনক। রথে বেশী তূণ রাখতে পারে, শত্রুর তীর থেকে আত্মরক্ষার জন্য আবরণও রাখতে পারে। আর্যরা অসুরদের বর্শা, গদা, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রাদি সম্পর্কে অনেক শিক্ষা নিয়েছে। অসুরদের নগর-পরিকল্পনা থেকে আমরা অনেক কিছু গ্রহণ করেছি। তাদের কাছ থেকে সমুদ্রযাত্রা আমাদের শিখতে হবে, কারণ তামা ও অন্যান্য ধাতু-রত্ন সাগরতীর থেকে আসে; এখনও এই ব্যবসা অসুর ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া। আমরা যদি তাদের থেকে স্বতন্ত্র হতে চাই তা'হলে সাগরে নৌ-চালনা শিক্ষা করতেই হবে। তবু এমন অনেক বিষয় আছে যা অসুরদের কাছ থেকে নেওয়া বিপদ্‌জনক—যেমন লিঙ্গপূজা।"

"কিন্তু লিঙ্গপূজা কোন আর্যভাষী স্বীকার করে নেবে!"

"আর বলো না বন্ধু! আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যারা বলছে অসুরদের মতো আমাদেরও পুরোহিত দরকার। আমাদের এখানে অসুরদের মতো পুরোহিত, ব্যবসায়ী, কৃষক ও শিল্পীদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, সবাই সব কাজ খুশীমতো করতে পারে কিন্তু অসুররা আলাদা আলাদা শ্রেণী বিভাগ করেছে। এখন একবার যদি আমাদের মধ্যে পুরোহিত সৃষ্টি করতে দাও তো দেখবে কিছুদিনের মধ্যেই লিঙ্গপূজাও সুরু হয়ে যাবে। লাভ ও লোভের জন্যে আর্যভাষী পুরোহিতদেরও ঐ কাজই সুরু করতে হবে।"

"এ তো অত্যন্ত খারাপ হবে, তা'হলে বরুণ!"

"গত দু'শো বছর অসুরদের সংস্পর্শে এসে আর্যদের মধ্যে কতই না পাপ প্রবেশ করেছে। আর তাই দেখে বৃদ্ধরা ক্রমেই হতাশ হচ্ছে। আমি অবশ্য নিরাশ হইনি। আমি বিশ্বাস করি, যদি অতীতের মহান্ দিনগুলির কথা আর্যভাষী জনদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, যদি তাদের ভালো করে বোঝানো যায়—তবে তারা পথভ্রষ্ট হবে না। শুনেছি তক্ষশিলায় অঙ্গিরা নামে এক ঋষি আর্যভাষীদের প্রাচীন বিদ্যা জানেন। তিনি

আর্যমার্গে চলবার শিক্ষা দেন। আমি আর্যভাষীদের বিজয়ের জন্ম তরবারি ধরেছি। এখন আর্য রীতি-নীতি রক্ষার জন্যে কিছু শিক্ষার প্রয়োজন।"

"কি আশ্চর্য! আমিও তো চলেছি ঋষি অঙ্গিরার কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে।"

"খুব ভালো, কিন্তু তুমি তো পূবদিকের আর্যভাষী জনদের কথা কিছুই বললি!"

"পূবদেশের আর্যভাষী জন দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। গান্ধারের পরের ভূখণ্ড আমাদের মাদ্ররা দখল করেছে। তারপরের অঞ্চল দখল করেছে মল্লরা, এবং ক্রমশ কুরু, পঞ্চাল প্রভৃতি জন বড় বড় প্রদেশ আপন করতলগত করেছে।"

"তা'হলে আর্যভাষীরা ওখানে সংখ্যায় অনেক বেশী।"

"খুব বেশী নয় তবে যতই তারা এগিয়ে চলেছে ততই অসুর ও অন্যান্য জাতির সম্মুখীন হচ্ছে।"

"অন্যরা আবার কারা।"

"অসুরদের গায়ের রঙ তামাটে। কিন্তু পূবদিকে এক রকম লোক আছে—তাদের কোল বলা হয়—তারা কয়লার মতো কালো। এই কোলেরা গ্রামেও থাকে জঙ্গলেও আছে। বন্য কোলেরা নানা রকমের পাথরের অস্ত্র তৈরী করে।"

"তা'হলে তো মনে হয় এই অনার্যদের সঙ্গে খুবই লড়াই করতে হচ্ছে।"

"বড় ধরনের সামনা-সামনি যুদ্ধ খুব কম হয়। আর্যভাষীদের ঘোড়া দেখলেই অনার্যরা পালিয়ে যায়। কিন্তু রাতে আমাদের আক্রমণ করে। এর প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমাদের অনেক সময় ক্রুর ব্যবহার করতে হয়। ফলে অসুর এবং কোলদের গ্রাম প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে। এখন তারা ক্রমেই পূবদিকে পালিয়ে যাচ্ছে।"

"তা'হলে, তোমাদের ওখানে অসুরদের রীতি-নীতির প্রভাবের কোনো ভয় নেই?"

"মাদ্র-জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভয় নেই, মল্লদের বেলাও এ কথা বলা যায়। আরো আগের কথা বলতে পারি না, আমাদের ওখানের অনার্যরা জঙ্গলের বাসিন্দাই রয়ে গেল।"

দুই বন্ধু এইভাবে রাত্রি পর্যন্ত তাদের পরস্পরের খবরাখবর ও গল্পে মশগুল ছিল। অতিথিশালায় পরিচারিকা এসে খাওয়া-দাওয়ার কথা জিজ্ঞেস না করলে তাদের কথা হয়ত শেষই হত না। এই অতিথিশালাটি নির্মিত হয়েছিল গ্রামবাসীদের খরচে—পথিকদের বিশেষ করে শ্বেতজাতির পথিকদের বিশ্রামের জন্য নির্মিত এ কথা অবশ্য বলার কোনো দরকার হয় না। যাদের কাছে আহার্য কিছু থাকত না, তাদের জন্য চাল-ভাজা ও গো-মাংসের সুরুয়ার ব্যবস্থা হত। কোনো পথিকের কাছে খাদ্যবস্তু থাকলে তা সে অতিথিশালার রক্ষকের কাছে দিলে সে রান্না করে দিত, আর তা না থাকলে সমতুল্য কিছু দিতে হত। এই অতিথিশালাটি সোমরসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দুই বন্ধু গো-মাংস এবং মদ্য একত্রে পানাহার করে তাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় করে নিল।

২

ঋষি অঙ্গিরা সিন্ধুনদের পূর্ব-পারের এই গান্ধার জন-এর শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হয়েছিল, সে একদা জন-পতি পর্যন্ত ছিল। পুষ্কলাবতীর (চরসদ্দা) প্রথম যুদ্ধের পর অসুররা পিছু হটতে সুরু করে। পরবর্তী পুরুষে গান্ধার জনের একটি শাখা কুনার তীর থেকে এসে পশ্চিম গান্ধার অঞ্চল অধিকার করল। তাই অসুররা পশ্চিম গান্ধার দেশ দ্রুত ত্যাগ করতে লাগল। মাত্র তিরিশ বছর যেতে না যেতেই গান্ধার ও মাদ্ররা সিন্ধুনদের পূব-পারের ভূ-খণ্ড জয় করল। বিজিত দেশ তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল; বিতস্তা থেকে সিন্ধুর মধ্যকার ভূমি পেল গান্ধার জন আর বিতস্তা থেকে ইরাবতীর মধ্যকার ভূখণ্ড দখল করল মাদ্র-জন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ দুটি অঞ্চলই দখলকারীদের নামানুসারে পূর্ব গান্ধার ও মাদ্র জনপদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করল। এই প্রারম্ভিক দেবাসুর যুদ্ধে উভয় জাতিই অমানুষিক নৃশংসতার পাল্লা দিয়েছিল, যার পরিণামে গান্ধারভূমিতে একটি অসুরও অবশিষ্ট ছিল না। মাদ্রদের ভূখণ্ডেও খুব অল্পসংখ্যক অসুর অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধেরও আস্তে আস্তে ভাঁটা পড়তে লাগল। পীতকেশীরাও তাদের যুদ্ধের সময়কার নিষ্ঠুরতা কমিয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বরুণ সৌবীরের বর্ণনা অনুযায়ী পীতকেশীদের ওপর অসুরদের নানা প্রকার প্রভাব পড়তে লাগল। ঋষি অঙ্গিরা বক্ষু উপত্যকা থেকে আগত আর্যদের অতীত ঐতিহ্যের শুধুমাত্র বড় পণ্ডিতই ছিল না, সে চাইত আর্যভাষীরা তাদের রক্ত ও আচার-ব্যবহারের বিশুদ্ধতা বজায় রাখুক। এই কারণেই পূর্ব গান্ধার দেশে অশ্ব-মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে আবার সেখানে অশ্বপালন প্রথা পুনরায় চালু করল। ঋষি অঙ্গিরার এ আর্যপ্রীতি, আর্য ঐতিহ্য ও আর্য শিক্ষায় তার অনুরক্তি এবং যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ কুশলতায় খ্যাতি, তাকে এমনি প্রথিতযশা করে তুলেছিল যে, সুদূর জনপদ থেকে আর্য কুমারগণ তার কাছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য আসত। কিন্তু সেদিন কে জানত যে, অঙ্গিরা রোপিত গান্ধারপুরের এই বিদ্যা-অঙ্কুর ভাবীকালে একদিন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়-রূপ বিশাল মহীরূহে পরিণতি লাভ করবে! কে জানত, এই মহীরূহের ছায়ায় সুমিষ্ট ফললাভের প্রয়াসে সহস্র যোজন পথ দূর থেকে আর্যগাথার ভক্তরা ছুটে আসবে!

ঋষি অঙ্গিরার বয়স ৬৫ বছর। পলিত কেশ, কটি-বিলম্বিত শ্বেত উজ্জ্বল শ্মশ্রু এবং সৌম্য মুখমণ্ডল ঋষির আকৃতিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সেদিন থেকে কয়েক শতাব্দী পরে কালি-কলম ও ভূর্জপত্রে লেখার রীতি মানুষের আয়ত্তে এসেছিল। তখন ছিল শ্রুতি ও স্মৃতির যুগ, তাই সব শিক্ষাই প্রদত্ত হত মৌখিকভাবে, বিদ্যার্থীরা পুরাতন সংগীত ও কাহিনী বার বার আবৃত্তি করে—স্মরণে রাখত। দূর দেশ হতে আগত বিদ্যার্থীরা দীর্ঘদিনের উপযোগী নিজেদের খাদ্য-বস্ত্র আনতে পারে না। ঋষি অঙ্গিরাকেই খাদ্য-বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হত। এর জন্যে তার নিজের জমি চাষ করার পরও বিদ্যার্থীদের দিয়ে জংলা

জমি চাষ করে নতুন আবাদ করেছিল। তাইতেই সারা বছরের উপযোগী যথেষ্ট গম উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত পুষ্প-উদ্যান করার রেওয়াজ হয়নি। কিন্তু বনের জংলী ফলমূল যখন পাকবার সময় হত তখন সে নিজের শিষ্যমণ্ডলী নিয়ে সেখানে তা আহরণে যেত, তখন তারা ফুলও সংগ্রহ করত। চাষের কাজে, বীজ বপন ফসল কাটা অথবা ফুল ফল জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের সময় বিদ্যার্থীরা বক্ষুর তীরে সুবাস্তুর তটভূমিতে রচিত গানগুলি পরম আদরে উচ্চ রাগিণীতে সমবেতভাবে গাইত। অঙ্গিরার অশ্বশালাও ছিল গান্ধারের মধ্যে সবচেয়ে বড়। দূর-দূরান্তের শিষ্য বা পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে অনুরোধ পাঠাত ভালো জাতের ঘোড়া ভেট আনবার জন্যে, উচ্চশ্রেণীর ঘোটক-ঘোটকী সংগ্রহ করে ভালো জাতের ঘোড়ার বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করত। পরবর্তীকালের বিখ্যাত সিন্ধী-ঘোটক সৃষ্টি হয়েছিল তারই অশ্বশালা থেকে। এ ছাড়া হাজার হাজার গরু ও ভেড়া ছিল। শিষ্যদের বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমের কাজও করতে হত। অঙ্গিরা নিজেও কাজ করত কারণ কায়িক পরিশ্রম না করলে সকলের খাদ্য-বস্ত্রের সংস্থান হতে পারে না।

তক্ষশিলার পূর্ব-দিকের অধিকাংশ পাহাড় ছিল সুজলা সুফলা। একদিন বরুণ ও পাল একদল বিদ্যার্থীর সঙ্গে পশুচারণ ভূমিতে কাজে লিপ্ত ছিল। তাঁবু থেকে অনতিদূরে শ্বেত ও লোহিতাভ বর্ণের গো-বৎস খেলে বেড়াচ্ছিল। ঋষি অঙ্গিরা শিষ্যদের মাঝে বসে তকলি কাটছিল আর অতীত ও বর্তমানের আর্য ও অনার্যের রীতি, নীতি, শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণীয় [illegible] ব্যাখ্যা করছিল।

"বৎস! যা কিছু নতুন তা সবই পরিত্যাগ করতে হবে, অথবা প্রাচীন হলেই তা গ্রহণযোগ্য —এই ধরনের কথা খুবই ভুল। আর এই আপ্তবাক্যকে কাজে লাগানো তো একেবারেই অসম্ভব। বক্ষু নদীর তটভূমিতে আর্যরা যেদিন পাথরের অস্ত্রাদি ছেড়ে উন্নত ধরনের তামার অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখল সেদিন কত লোকই না নতুন হাতিয়ারের বিরুদ্ধতা করেছিল।"

শিষ্য বরুণ প্রশ্ন করল, "পাথরের অস্ত্রাদি দিয়ে কিভাবে কাজ চলত?"

"বৎস, আজ তামার প্রচলন হয়েছে তাই তামার হাতিয়ার খুবই তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে। ভবিষ্যতে এর চেয়েও তীক্ষ্ণ কোনো ধাতুর হাতিয়ার গড়া হবে তখন আবার মানুষ হয়ত তোমার মতো প্রশ্ন করবে তামার হাতিয়ার দিয়ে কিভাবে কাজ চালাত। মানুষ যখন যে হাতিয়ার সংগ্রহ করতে পারে, তখন তাই দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয় —সেইভাবেই তারা অভ্যস্ত হয়। যখন পাথরের কুড়ুল দিয়ে যুদ্ধ করত, তখন উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের পাথরের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু যে-ই একপক্ষ তামার তরবারির ব্যবহার শিখল তখনই অপর পক্ষের কাছে পাথরের কুড়ুল ত্যাগ করে তামার তরবারি ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে উঠল। আর তারা যদি তা না করত, এ দুনিয়াতে তাদের

কোনো চিহ্ন থাকত না। তাই আমি বলছিলাম, সমস্ত নতুন চিন্তাধারা পরিত্যাজ্য এ কথা খুবই ভুল। আমি নতুনের বিরোধী হলে এত সুন্দর সুন্দর ঘোড়া, গরু প্রতিপালন করতে পারতাম না। আমি জেনেছিলাম যে, ভালো ঘোড়ার বাচ্চা পেতে হলে ভালো জাতের ঘোটক-ঘোটকীর মিলন চাই। তাই আজ পঁয়ত্রিশ বছর পরে এ-জাতীয় শ্রেষ্ঠ ঘোটক-ঘোটকী দেখতে পাচ্ছ।

"অসুররা ক্ষেতের জমি ভালোভাবেই দেখা-শোনা করত, তাতে ভালো সার দিত। তারা পাহাড়ী নদী থেকে খাল কেটে সেচের যে ব্যবস্থা করত —তা যে খুব উঁচু ধরনের এ কথা আমরা স্বীকার করি। তাদের শহর গড়ার কায়দা ও চিকিৎসায় নানা রকম ভালো ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। এ কথা ভাবলে চলবে না যে, এটা নতুন না পুরনো, এটা আর্য না অনার্য —খাওয়া-পরা ও জীবনধারণের মানকে উন্নত ও সহজ করার জন্যে যত রকম জিনিস পাওয়া যায়, তাকে স্বীকার করে কাজে প্রয়োগ করতে হবে। আগে আর্যরা কার্পাস তুলার ব্যবহার জানত না, সুতী বস্ত্রের নাম পর্যন্ত শোনেনি। কিন্তু এখন আমরা গ্রীষ্মকালে সুতী বস্ত্র পরি, গরমের দিনে এই কাপড় খুবই আরামদায়ক। এইভাবে নতুন জিনিস আমরা যেমন গ্রহণ করেছি তেমনি অনেক কিছু বর্জনও করেছি। এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলো বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করা উচিত। অসুরদের লিঙ্গপূজা, তাদের ধর্ম অনুসরণ করা যেমন আমাদের পক্ষে নিন্দনীয়, তেমনি তাদের জাতি-বিভাগও বর্জনীয়। জাতি-বিভাগের জন্যেই মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে অস্ত্রধারণ করে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। এতে শুধু নিজেদের মধ্যে ছোট ও বড়, উঁচু-নীচু এই চিন্তার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এ কথাও ঠিক যে, অসুরদের সঙ্গে আমাদের রক্তের মিশ্রণ হওয়া উচিত নয়, কেননা, তাতে আমাদের অসুরবৃত্তি গ্রহণেরই পথ উন্মুক্ত হবে। আর এর ফলে আর্যভাষীদের মধ্যেও নানা শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ছোট ও বড় জাতিবিভাগ দেখা দেবে।"

পাল প্রশ্ন করল, "রক্তের সংমিশ্রণকে প্রত্যেকটি আর্যভাষী খুব অনুচিত কাজ বলে মনে করে কি?"

জবাবে ঋষি বলল, "হ্যাঁ, তবে এর জন্যে তারা ততো বেশী মনোযোগ দিতে রাজী নয়। আর্যভাষীরা অসুর কিম্বা কোল স্ত্রীদের সঙ্গে সমাগম করে।"

বরুণ, "সীমান্তের লোকেরা এ কথা বলেই থাকে যে, আমাদের যোদ্ধারা অসুরপুরীর বারাঙ্গনাদের কাছে হামেশাই যাতায়াত করে।"

ঋষি বলল, "কথাটা ঠিক। কিন্তু, এর পরিণাম কি? এর ফলে বাড়বে বর্ণ-সঙ্করতা। অসুরদের মধ্যেও পীতকেশ বালক-বালিকা জন্ম নেবে। ভ্রমবশত আর্যরা এদের নিয়ে আসবে নিজেদের পরিবার পরিজনের মধ্যে, তখন আর্য-রক্তের বিশুদ্ধতা কোথায় থাকবে? আর এই রক্ত-শুদ্ধতার জন্য চাই আমাদের সমস্ত আর্য স্ত্রী-পুরুষের জাতীয় সচেতনতা।

আর এর জন্ত চাই, আর্যদের মধ্যে দাসপ্রথা কিছুতে প্রবেশ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা। কারণ, এর মতো রক্তের শুদ্ধতা নষ্টকারী সর্বনাশা জিনিস আর কিছুই নেই। আর্যজনপদে অনার্যরা যাতে কিছুতেই প্রবেশ করতে না পারে তারও ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। সবচেয়ে বিপদ্‌জনক ও সকল মন্দের মূলে আছে অস্থরদের রাজ-প্রথা, আর এরই অপর অঙ্গ হচ্ছে পুরোহিত প্রথা। অস্থর-জন তাদের সমস্ত অধিকার হারিয়ে বসে আছে। অস্থর জনের কোনো স্বাধীনতা নেই, অস্থর-রাজা যা বলবে সেই মতো কাজ করা অস্থররা ধর্ম বলে মনে করে। অস্থরদের পুরোহিতরা শেখায় যে, জনগণের ভালো-মন্দের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছে ওপরে ভগবান, আর নীচে তার প্রতিনিধি রাজা। এই ধর্মমত অনুসারে সাধারণের কিছু বলবার বা করবার নেই। ধরিত্রীতে স্বয়ং রাজাই হচ্ছে দেবতা। তাই আমি যখন শুনলাম, শিবি-সৌবীররা ইন্দ্র পদ তুলে দিয়েছে তখন খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। যদিও এ কথা ঠিকই যে অস্থর-রাজের স্থান ইন্দ্র কোনোদিনই অধিকার করতে পারেনি। আর্যদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান হচ্ছে —জন কর্তৃক নির্বাচিত একজন বড় যোদ্ধা বা সেনাপতি মাত্র। জনের ওপর শাসন করবার কোনো অধিকার তার নেই। তবুও ওই পদ থেকে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা ছিল এবং কিছু লোক ওই পদের আড়াল থেকে আর্যভাষীদের মধ্যে রাজ-প্রথা কায়েমের চেষ্টাও করেছিল। আর্যভাষীরা যদি নিজেদের আর্যত্ব বজায় রাখতে চায় তা'হলে কাউকেই রাজ-অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, আর তা উচিতও হবে না। কিন্তু যেদিন অস্থরদের মতো রাজপদের সৃষ্টি হবে সেই দিনই অস্থরদের মতোই পুরোহিতদেরও আবির্ভাব ঘটবে। আর এ-সব হলেই বুঝবে যে, আর্যভাষীদের আর্যত্ব নষ্ট হয়েছে। সমগ্র জন পরিশ্রম করবে, আর সেই পরিশ্রমের ফল ভোগ করবে রাজপদে আসীন একজন ব্যক্তি। এর ওপর আছে পুরোহিত, পুরোহিতকে উৎকোচ দিতে পারলে ভগবানের আশীর্বাণী পাওয়া যাবে। এইভাবে রাজা ও পুরোহিতে মিলে সমগ্র জনকে তাদের দাস করে ছাড়বে। আমাদের আর্যভাষীদের প্রাচীন রীতি-নীতিকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে থাকতে হবে এবং যেখানেই কোনো আর্য-জন ব্যতিক্রম ঘটাবে—তাদের আর্য-শ্রেণী থেকে দূর করে দিতে হবে।"

৩

সৌবীরের (তৎকালীন সৌবীর দেশ বর্তমান করাচীর কাছে) দক্ষিণ অঞ্চল থেকে এখানে নানা রকমের দুঃসংবাদ আসতে থাকায় বরুণ ক্রমেই চিন্তান্বিত হয়ে পড়ছিল। সে বুঝতে পারছিল যে, অস্থরদের শেষ দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আর্যদের নিজেদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর আত্মকলহের ঝড় আসন্ন। বরুণ কয়েকবারই সৌবীরের সমস্যা নিয়ে গুরুর সঙ্গে আলোচনা করেছিল। ঋষি অঙ্গিরার বক্তব্য ছিল যে, হতে পারে এই ঝগড়ার সূত্রপাত সৌবীরদের মধ্যেই সুরু হয়েছে, কিন্তু এ কথা ঠিকই যে, এই বিরোধ একদিন সারা

আর্য জনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। আর্যভাষীরা চিরকাল জনের (সমষ্টির) অধিকারকে ব্যক্তির অধিকারের ওপর স্থান দিয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি অসুরদের রাজসত্তার এই নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা ও ভোগবিলাসিতার নিদর্শন অনেক আর্যভাষী নেতাকে ক্ষমতালোভী ও আত্মসর্বস্ব করে তুলবার আশঙ্কা হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই দুই মনোবৃত্তির সংঘাতও ছিল অবশ্যম্ভাবী, আর যে জনপদে অসুররা সংখ্যায় বেশী—সংঘর্ষের সম্ভাবনাও সেখানে বেশী ; কারণ পরাজিত অসুররা আর্যদের এই আত্মঘাতী সংঘর্ষ থেকে লাভবান হতে চেষ্টা করবে এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক।

সৌবীরপুর থেকে দুঃসংবাদ আসতে থাকায় বরুণ আট বছরের আবাসস্থল গান্ধারপুর ছেড়ে দেশে ফিরতে মনস্থ করল। এখানে আসার পথে ঋষি শিষ্যদের মধ্যে প্রথম যাকে পথ-চলা সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিল সেই পুরাতন বন্ধু পাল মাত্র তার সহযাত্রী হল। গান্ধারপুরের সীমানা অতিক্রম করে তারা লবণ-পাহাড়ের পথ ধরে সিন্ধু জনপদে প্রবেশ করল। লবণের খনিতে কর্মরত ব্যাপারী ও শ্রমিকদের মধ্যে অসুরদের সংখ্যা বেশী, আর এদের প্রভাব পীতকেশী আর্যভাষীদের ওপর পড়েছিল। আর্যরা ইতিমধ্যেই অলস ও আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা নিজেদের কাজগুলো অনার্য কারিগর দিয়ে করিয়ে নিত। তারা ভাবত তরবারি নিয়ে অস্ত্রচালনা করা বা অশ্বারোহণ করাই তাদের একমাত্র উপযুক্ত কাজ। অসুর-রাজ যেমন অন্যের ওপর নিজে প্রতিপত্তি দেখাত তেমনি একইভাবে অনার্যদের ওপর ছোট ছোট প্রতিপত্তি খাটাতে গিয়ে আর্যদের মনে রাজসত্তার অঙ্কুর উদ্গমের ভূমি প্রস্তুত হতে লাগল। দুই বন্ধু ধীর পদে লবণ-পাহাড় অতিক্রম করে এসে পৌছাল সৌবীর সীমান্তে (এই স্থানকে বর্তমানে মূলতান বলা হয়), এখানকার অবস্থা কিছুটা উন্নত মনে হল। এখানকার সমস্ত অধিবাসী আর্য, আর জনের পক্ষে সেটা ছিল খুবই গর্বের ব্যাপার। এখানকার ভীষণ গরম সহ্য করে জনপদকে এরা পুরোপুরি আর্যভাষী জনপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বরুণ ও পাল সিন্ধু নদের ওপর দিয়ে নৌকা বেয়ে চলেছিল, তাই সময়টা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি হলেও পুরো কষ্টটা তারা পায়নি। তবু সৌবীর নগরের আবহাওয়া ছিল অত্যধিক গরম, তার প্রভাব অবশ্যই কিছুটা পড়েছে।

আর্যরা তখন পর্যন্ত অক্ষর আবিষ্কার করতে পারেনি। তখন এদের মধ্যে লেখার সঙ্কেত (লিপি) প্রচলিত হয়নি। তাই বরুণ মাঝে মাঝে সৌবীরের পথিকদের মারফতে তার মিত্রদের কাছে যে সমস্ত সংবাদ পাঠাত তা পুরোপুরি কোনোদিনই পৌছাত না। এই সময় অসুরদের মধ্যে প্রচলিত লিপির কথা তার মনে আসত।

সৌবীরপুরে পৌছে সে বুঝতে পারল যে, অবস্থা অনেক দূর গড়িয়েছে। খাস সৌবীরপুরে সুমিত্রের সমর্থক কম ছিল ; কিন্তু দক্ষিণ সৌবীরপুরে অসুরদের শেষ দুর্গ ধ্বংসকারীদের মধ্যে বহু আর্য সুমিত্রের পক্ষ গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত ছিল। এই শেষ

দুর্গটির পতনের পর সেনাপতি সুমিত্র অসুর নাগরিকদের প্রতি অতিরিক্ত অনুকম্পা দেখিয়েছিল বলে বরুণ সেই সময় তার খুব প্রশংসা করেছিল। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারল যে, সেটা ছিল সুমিত্রের একটি চাল মাত্র। সুমিত্র জানত যে, অসুররা আর কোনোদিনই আর্যদের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে পারবে না। তাই তাদের ওপর এই অনুকম্পা দেখিয়ে সাগরপারের সার্থবাহ অসুরদের সম্পত্তি ও তাদের শক্তির সাহায্যে নিজের ব্যক্তিগত লোভ চরিতার্থ করতে পারবে।

সুমিত্র তখনও সমুদ্রতীরের অসুরপুরী আপন সৈন্য দিয়ে দখল করে রেখেছিল আর কাল্পনিক যুদ্ধ পরিচালনার অজুহাত সৃষ্টি করে সেখান থেকে ফেরবার নাম পর্যন্ত করত না। সাধারণ দলপতিদের সঙ্গে দেখা করে বরুণ বুঝতে পারল যে, তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই; তারা ভাবত ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলে কোনো কোনো জন-নায়ক সুমিত্রের বিরোধিতা করছে। বরুণ যখন জনের শাসনভারপ্রাপ্ত প্রধান জন-নায়কের সঙ্গে দেখা করল তখন সে বরুণকে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলল এবং বলল যে, সুমিত্রের উদ্দেশ্য যদিও তার কাছে খুবই স্পষ্ট, তবু এ কথা ঠিকই যে, জনের সাধারণ মানুষ এখনও সুমিত্রের আসল মতলবের কথা জানে না, তারা তাকে অন্যভাবেই দেখে।

অসুরপুরী আক্রমণের সময় বরুণ ছিল সুমিত্রের সহসেনাপতি। ইতিমধ্যে যদিও ন'টা বছর কেটে গেছে; তবু আজও তার তরবারি চালনার প্রশংসা থেমে যায়নি। জনকে বোঝাবার আগে নিজেই অসুরপুরীতে গিয়ে সুমিত্র সম্পর্কে সঠিক সংবাদ নিয়ে আসা মনস্থ করল। এই উদ্দেশ্যে দুই বন্ধু একদিন দক্ষিণ সৌবীর যাত্রী একটি নৌকায় আরোহণ করল। তারা নিজেদের গান্ধারদেশীয় বণিকের বেশে সুসজ্জিত করেছিল। অসুরপুরী দেখে তাকে কিছুতেই আর্যভাষীদের নগরী বলে মনে হয় না—তা সত্যি সত্যি অসুরদের পুরী ছিল। তখনও তা আর্যনগরী হয়নি। শহরের পণ্যবীথি প্রাসাদমালায় পূর্ণ ছিল, ছিল সমুদ্রযাত্রী অসুর বণিকদের নিয়ে আসা নানা দেশের বাণিজ্য সম্ভার। বহু সামন্ত অসুর-পরিবার তাদের আপন আপন পল্লীতে আগের মতোই বসবাস করছিল, তাদের গৃহে পূর্বের মতো শৃঙ্খলিত বন্দী দাস-দাসী অপেক্ষা করছে বিক্রী হওয়ার জন্যে। এইসব দেখতে দেখতে ওদের মনে প্রশ্ন উঠল, এই পরিবেশে বিজয়ী আর্যরা কোথায়? সুমিত্র নিজেও অসুর-রাজের পুরাতন রাজপ্রাসাদে বাস করে।

একদিন বরুণ, পাল মাত্রকে সুমিত্রের কাছে পাঠাল—গান্ধার বণিকের কাছ থেকে উপঢৌকন নিয়ে যাবার ছল করে। পাল ফিরে এসে বলল, পীতকেশ ও গৌরবর্ণ বাদ দিলে সুমিত্র এখন পুরোপুরি একটি অসুর-রাজ বনে গেছে। তার প্রাসাদ আর আর্যভাষী সেনাপতির সরল অনাড়ম্বর বাসস্থান নয়, রৌপ্য অলঙ্কারে ঝলমল অসুর-রাজের প্রাসাদকক্ষের মতোই সুসজ্জিত। তার পার্শ্বচর সৈনিকদের মধ্যেও অনাড়ম্বরতার কোনো

চিহ্ন নেই। সপ্তাহ যেতে না যেতেই তারা ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট করে বুঝল —এখন আর্যভাষী সেনানায়কদের খবর নিতে হলে অসুর কন্যাদের নৃত্য ও সুরাপানের আড্ডা-গুলিতে সন্ধান করতে হবে। বহু আর্যভাষী রমণী তাদের স্বামীদের কাছে এসে গৃহ-সংসার পাততে চায়, কিন্তু নানা অজুহাত দেখিয়ে তাদের আসতে মানা করা হচ্ছে। সুমিত্র তার স্ত্রীর কাছ থেকে বহু অনুরোধ পাওয়া সত্ত্বেও তাকে আসতে নিষেধ করেছে, এদিকে সে নিজে অসুর পুরোহিতের কন্যাকে প্রেম সমর্পণ করছে। শুধু তাই নয়, এ নগরীর বহু অসুর-সুন্দরী তার অন্তঃপুরচারিণী। নিজের পার্শ্বচর আর্য সৈনিকদের জন্যে এ ব্যাপারে তার পূর্ণ শিথিলতা ছিল। কিন্তু অন্য আর্যভাষীরা যদি এখানে যাতায়াত সুরু করত তা'হলে অনার্য দাসদের দিয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে দিত ফলে বাইরের আর্যভাষীরা এখানে আসা বন্ধ করেছে।

বরুণ পুরোপুরি খবরাখবর নিয়ে তার বন্ধুর সঙ্গে চুপচাপ সৌবীরপুরে ফিরে এল। সৌবীরপুরে এসে জন-নায়কদের বলল যে, সুমিত্র ইতিমধ্যে তার শক্তি যথেষ্ট দৃঢ় করেছে ; অসুরপুরের শুধু আর্যশক্তিই নয় —অসুরদের বিরুদ্ধেও আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, আর এ জন্যে তৈরী হয়েই সমস্ত কথা সাধারণ মানুষকে বলতে হবে।

বরুণ ছিল নাচের আসরের প্রিয় পাত্র। বছরের পর বছর যে সমস্ত স্ত্রীরা স্বামীদের জন্যে বৃথাই অপেক্ষা করে বিরহ সহ্য করছে তারা যখন এই সুন্দর নর্তকের মুখে তাদের স্বামীদের কীর্তিকলাপ শুনল তখন তা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করল। ক্রমেই এক কান থেকে অপর কানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কথাটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বরুণ নিজে ছিল একজন কবি, পতি-বিরহিণী আর্য রমণীদের জবানীতে অসুর কন্যাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ উপলক্ষে সুমিত্রের বিলাসপূর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ-সর্বস্ব জীবনের আলেখ্য নিয়ে সুন্দর সুন্দর গান রচনা করল। এই গান ক্রমেই দাবানলের মতো সারা সৌবীরের আর্য গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে গেল —মুখে মুখে গীত হতে লাগল। কিছু কিছু আর্য স্ত্রীরা যাতে তাদের স্বামীর কাছে যায় তার ব্যবস্থা করা হল। স্বামীদের কাছে তিরস্কৃত হয়ে তাদের ফিরে আসার পরিণাম আরও খারাপ হল। এবার সুমিত্রকে সৌবীরপুরে ফিরে আসতে বলা হল এবং সে ফিরে আসতে অস্বীকার করায় তার স্থলে বরুণকে সেনানায়ক নিযুক্ত করে বৃহৎ আর্যবাহিনীর সেনাপতি হিসাবে বরুণকে পুরোভাগে রেখে অসুরপুরীতে অভিযান সুরু হল। বরুণের আগমন বার্তায় সুমিত্রের সৈন্যদের মধ্যে ভাঙন ধরল এবং অনেকেই নিজেদের অনার্য ব্যবহারের জন্যে অনুতপ্ত হল। অবশিষ্ট সৈন্যদের সাহায্যে সুমিত্রর জিতবার আশা ছিল না ; তাই সে বরুণের হাতে নগর সমর্পণ করে সৌবীরপুরে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এইভাবে আর্য-জন প্রথমবারের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। বরুণ অসুরদের প্রতি কোনো প্রকারের দয়া প্রদর্শন করল না। অসুরদের কাছে

কোনো অস্ত্র না থাকা সত্ত্বেও এবং তারা কোনো যুদ্ধ না করলেও বরুণ তাদের রেহাই দিল না। আর্যরা যাতে অসুরদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে তার জন্যে এক আলাদা আর্যনগরী নির্মাণ করে ঋষি অঙ্গিরা বর্ণিত শিক্ষাকে কাজে লাগান হল।*

সুদাস

স্থান : কুরু-পঞ্চাল (উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম) ।। কাল : ১৫০০ খৃষ্টপূর্ব

বসন্তকাল শেষ হয়ে আসছিল। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পাকা সোনালী গমের শীষগুলি হাওয়ায় দোল খাচ্ছিল, আর এদিক সেদিক থেকে স্ত্রী-পুরুষ গান গাইতে গাইতে ক্ষেতের ফসল কাটছিল। কাটা ক্ষেতের যে সব জমিতে নতুন ঘাসের উদ্গম হয়েছে সেখানে বাচ্চাসমেত ঘোড়াগুলিকে চরবার জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রখর রৌদ্রের মধ্যে একজন ক্লান্ত পথিককে আসতে দেখা গেল ; তার পরণে মলিন ছিন্ন বসন, মাথায় একটি পুরনো চাদর। প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ছিন্ন উষ্ণীষে ঢাকা সোনালী চুলের জট দেখা যাচ্ছিল —পুরনো চাদরে শরীর আবৃত, কোমরে জড়ানো ছিলো অন্তর্বাস —হাঁটু পর্যন্ত একখণ্ড কাপড়।

হাতের লাঠির ওপর ভর করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলছিল ; পিপাসায় গলার তালু পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে। তবু পরবর্তী গ্রামে পৌছাবেই এই পণ নিয়ে সে এগিয়ে চলছিল, কিন্তু পথের ধারে একটি কূয়া ও ছোট শমীবৃক্ষ দেখে তার পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভেঙে গেল। প্রথমে সে উষ্ণীব বস্ত্র খুলল পরে উলঙ্গ হয়ে পরণের ধুতি খুলে একত্রে বেঁধে কূয়ার মধ্যে একটি প্রান্ত ফেলে দিল, কিন্তু জলের নাগাল পেল না। একান্ত নিরাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল। তার মনে হতে লাগল আর কোনোদিন সে উঠতে পারবে না। ঠিক সেই সময়ই এক কাঁধে একটি মশক, অন্য কাঁধে দড়ি আর হাতে চামড়ার কলসী নিয়ে হাজির হল একটি কুমারী মেয়ে। তরুণীটি কূয়ার কাছে এসে কলসীটা যখন জলে ডোবাতে যাচ্ছে, তার চোখ পড়ল পথিকের দিকে। পথিকের মুখের চেহারা ফ্যাকাশে, ঠোঁট দুটো ফেটে গেছে, চোয়াল গেছে চুপসে —কিন্তু তা সত্ত্বেও তারুণ্যের দীপ্তি তার মুখমণ্ডলে স্পষ্ট ফুটে বেরুচ্ছিল।

মাথাভরা সোনালী চুলে শিরস্ত্রাণ, পরণে কাঁচুলি ও অন্তর্বাস আর শরীরের উপরাংশ উত্তরীয় দিয়ে ঘেরা —সাধারণ হলেও শালীনতা সম্পন্ন বেশভূষায় সজ্জিতা কুমারীকে

---

* প্রায় দেড়শত পুরুষ আগেকার কাহিনী।

পথিক দেখল। রৌদ্রে পথ চলার ফলে তরুণীটির মুখ রক্তিমাভ, আর তার কপাল ও ঠোঁটের ওপর দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল। তরুণীটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপরিচিত পুরুষটির দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর মাদ্রদেশের মেয়েদের সহজাত মৃদু হাসিতে মুখখানিকে উদ্ভাসিত করে যুবকের অর্ধেক তৃষ্ণা মিটিয়ে মধুস্বরে প্রশ্ন করল, "ভাই আমার মনে হচ্ছে তুমি খুবই তৃষ্ণার্ত।"

পথিক ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ আমি খুবই তৃষ্ণার্ত।"

"বেশ, আমি তোমায় জল এনে দিচ্ছি।"

তরুণীর জলপাত্র ভর্তি হল। ততক্ষণে পথিকও আস্তে আস্তে উঠে তার পাশে এসে দাঁড়াল। তার দীর্ঘ দেহ ও মোটা হাড়ের চেহারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, তার শরীরে অসাধারণ পৌরুষ বিদ্যমান। মশকের সঙ্গে চামড়ার গেলাসটি ভরে তরুণী পথিকের হাতে দিল। পথিক এক চুমুক জল কোনো রকমে ঢোক গিলে খেয়ে মাথা নীচু করে একটু বসে রইল। তারপর এক নিশ্বাসে গেলাসের সমস্ত জলটাই শেষ করল। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে গেলাসটা ছিটকে গড়িয়ে পড়ল আর নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করেও পেছনে টলে পড়ল। তরুণী কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপর তরুণের চোখের দিকে চেয়ে বুঝল, সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেই সে চট করে নিজের মাথায় বাঁধা শিরস্ত্রাণের কাপড়টি জলে ভিজিয়ে চক্ষু ও কপাল মুছে দিতে লাগল। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর যুবকটি চোখ খুলল। তরুণীটিকে সেবা করতে দেখে লজ্জা ও কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, "তোমাকে এইভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত।"

"আমার কোনো কষ্ট হয়নি, আমি ভয় পেয়েছিলাম এই রকম কেন হল ভেবে?"

"বিশেষ কিছু নয়, পেটটা একেবারে খালি তার ওপর অত্যধিক তৃষ্ণায় বেশী জল খেয়েছিলাম—তাই। কিন্তু এখন আর কোনো কষ্ট নেই।"

"তোমার পেট একেবারে খালি?" এই কথাগুলি বলে পথিককে জবাব দেবার কোনো অবসর না দিয়ে তরুণী এক দৌড়ে এক পাত্র দই, ছাতু ও মধু নিয়ে উপস্থিত হল। তরুণের চেহারায় সঙ্কোচ ও লজ্জার ভাব দেখে কুমারী বলল, "পথিক, কোনো সঙ্কোচ কর না। কয়েক বছর হল, আমার ভাই ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে, তোমার চেহারার সঙ্গে তার অনেকটা মিল আছে তাই তোমাকে সাহায্য করার সুযোগ পেয়ে আমার সেই হারানো ভাই-এর কথাই মনে পড়ছে।"

পথিক পাত্র নিয়ে নিল। তরুণী বালতি থেকে জল দিল। যুবকটি সেই জলে ছাতু গুলে পান করল। খাওয়া-দাওয়ার পর তার চেহারা থেকে পথশ্রমের চিহ্ন প্রায় অর্ধেকটা মুছে যেতে তার মুখে ফুটে উঠল একটা কৃতজ্ঞতার ভাব। কিভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়—সে ভাবছিল।

তরুণী তার মনের ভাব আঁচ করেই বলল, "সঙ্কোচ করার কোনো দরকার নেই। বোধহয় তুমি অনেক দূর থেকে আসছ, তাই না?"

"হ্যাঁ, অনেক দূর, পূর্বদিক —পঞ্চাল থেকে।"

"কোথায় যাবে?"

"এখানে ওখানে —যেখানে হোক।"

"তবু?"

"এখন তো আমি কাজ খুঁজছি, যাতে খাওয়া পরার ব্যবস্থাটা হতে পারে।"

"ক্ষেতের কাজ করবে?"

"কেন করব না? চাষের সব কাজই পারি। মাড়াই করতেও জানি। গরু, ঘোড়ার রাখালি —তাও পারি। আমার শরীরে শক্তিও যথেষ্ট, এখন একটু কাহিল হয়ে পড়েছি বটে কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে আবার কঠিন পরিশ্রমের উপযুক্ত স্বাস্থ্য আমি ফিরে পাব। এটা বলতে পারি যে, আমার কাজে কোনোদিনই কোনো মালিক অখুশী হয়নি।"

"তা'হলে আমার মনে হচ্ছে আমার বাবা তোমাকে কাজ দেবে। জলের পাত্র ভরে নিই, তুমি আমার সঙ্গে চলে।"

তরুণটি মশক বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করল, কিন্তু তরুণী কিছুতেই রাজী হল না। ক্ষেতের ওপর একটি লাল তাঁবু আর বাইরে বসেছিল প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন স্ত্রী-পুরুষ। এদের মধ্যে তরুণীর পিতা কে, পথিক সেটা আন্দাজ করতে পারল না। সকলেরই সাদা কাপড়, হরিতাভ কেশ, গৌরবর্ণ গায়ের রঙ ও প্রাণবন্ত মুখ। তরুণী জল-ভরা মশক ও বালতিটি রাখল, তারপর ষাট বছরের বৃদ্ধ কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ পুরুষের কাছে গিয়ে বলল, "পিতা, এই পরদেশী তরুণ কাজ চাইছে।"

"হে কন্যা! ক্ষেতের কাজ করতে চায় কি?"

"হ্যাঁ, যেখানে হোক।"

"তা'হলে এখানেই কাজ করুক। অন্যরা যা মজুরী পায় সেও তাই পাবে।"

তরুণ কথাবার্তা সবই শুনছিল। বৃদ্ধ তাকে ডেকে নিয়ে কথাগুলি আবার বলল, সে রাজী হল। বৃদ্ধ পুনরায় তাকে বলল, "এস আগন্তুক, আমরা এখন মধ্যাহ্ন ভোজন করছি —তুমিও যোগ দাও।"

"হে আর্য! আমি এখনি খেয়েছি, তোমার মেয়ে আমাকে দিয়েছে।"

"আর্য-টার্য নই, আমার নাম জেতা, ঋজু-পুত্র মাত্র। এস তুমি যা পার খাও ও পান কর। অপালা, মেরয় (ঘোটকীর দুধে তৈয়ারী কাঁচা মদ) দাও তো। রৌদ্র-তাপে দগ্ধ হলে শরীরে বল এনে দেবে। হে তরুণ! এখন আর কোনো কথা নয় সন্ধ্যায় আমরা আলাপ-আলোচনা করব। তোমার নামটা বল।"

"সুদাস পঞ্চাল।"

"সুদাস নয়, সুদা—সুন্দর দান দেয় যে! তোমরা পূর্ব-দেশের লোকেরা ঠিকমতো শব্দের উচ্চারণ করতে পার না। তোমার দেশ পঞ্চাল জনপদে? ভালো কথা। অপালা, এই পূর্ব-দেশের লোকেরা একটু বেশী লাজুক হয়। একে ভালো করে খাওয়াও, যাতে সন্ধ্যার মধ্যে কিছু কাজ করার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে।"

অপালার উপরোধে সুদাস দু'তিন পাত্র মেরয় আর রুটি গলাধঃকরণ করল। গত দু'দিন তার পেটে কিছু পড়েনি তাই ক্ষুধাবোধও কমে গেছে। সূর্যের তেজ যতই কমতে লাগল সুদাসের শরীরেও তত বল ফিরে আসতে লাগল আর সন্ধ্যার কাজ শেষ হবার আগে দেখা গেল, ক্ষেতে গম কাটার ব্যাপারে সে কারুর পেছনে পড়ে রইল না।

জেতার ক্ষেত যে খুবই বড় ছিল তা মাড়াই করার জন্য উপস্থিত দুই শতের বেশী লোক দেখে বোঝা যায়। ক্ষেতের এক প্রান্তে রন্ধন কাজে ব্যাপৃত লোকেরা ব্যস্ত। একটা পুষ্ট ষাঁড় আজ কাটা হয়েছে তার কিছু হাড়, নাড়িভুঁড়ি আর কিছুটা মাংস টুকরো করে বড় ডেক্‌চিতে সন্ধ্যা হবার ঘণ্টা তিনেক আগেই চাপানো হয়েছিল। বাকিটা নুনের সঙ্গে জলে ফুটিয়ে রাখা হচ্ছে। ঘরগুলোর পাশেই বড় সমতলভূমি—মাড়াই-এর কাজ হয়। জলের জন্য কাঁচা পাতকুয়া আর জলভর্তি কুণ্ড ছিল। স্ত্রী-পুরুষেরা এখানে হাত মুখ ধুচ্ছিল—কেউ কেউ অবগাহন করে নিল। রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জলের ধারে সারি দিয়ে বসা স্ত্রী পুরুষের সামনে রুটি, মাংসখণ্ড ও পাত্রভর্তি মদ দেওয়া হল। সুদাসের লাজুকতার কথা মনে রেখে অপালা তাকে তার পাশেই বসিয়েছিল, সুদাসকে দেখে তার নিরুদ্দিষ্ট ভাই-এর কথাই মনে পড়ছিল। খাওয়ার পর নাচ-গান সুরু হল। আজকের রাতের নৃত্য আসরে সুদাস যোগ দেয়নি বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে এই নৃত্যসভায় সে সর্বপ্রিয় গায়ক ও নর্তক হয়েছিল।

মাস দেড়েক ফসল কাটা, মাড়াই ও বাঁধার কাজ চলতে লাগল। সপ্তাহ দুই যেতে না যেতে সুদাসকে যেন আর চেনাই যায় না—একেবারে নতুন মানুষ। তার গালে স্বাভাবিক রক্তাভা দেখা দিল। হাড় আর শিরাগুলো মাংস ও চামড়ার মধ্যে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রথম সপ্তাহের শেষে জেতা তাকে এক প্রস্থ কাপড় উপহার দিয়েছে।

ফসল মাড়াই-এর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। পিতা-পুত্রী ও সুদাস সমেত মোট জনা ছয়েক তখনও কাজ করছিল—বাকি সকলে ফসলের ভাগ নিয়ে চলে গেছে। এইসব লোকদের জমির পরিমাণ খুবই কম, তাই তারা নিজেদের ফসল কাটার পর জেতার জমিতে এসে কাজ করত।

একদিন সন্ধ্যার পর জেতা সুদাসের সামনে পূর্ব-দেশ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করল। অপালা পাশে বসে শুনতে লাগল। জেতা বলল, "সুদা! পূর্ব-দেশে আমি খুব বেশীদূর

পর্যন্ত যাইনি বটে, কিন্তু পঞ্চালপুরে (অহিচ্ছত্রে আমি গেছি। সেখানে শীতকালে আমি ঘোড়া বিক্রী করতে যেতাম।"

"পঞ্চাল (রোহিলখণ্ড) তোমার কেমন লাগল, হে আর্যবৃদ্ধ!"

"জনপদ হিসাবে মন্দ নয়, আমাদের এই মাদ্র দেশের মতোই সুরক্ষিত ও সম্পন্ন; বরং ক্ষেতের উর্বরতার দিক থেকে এখানকার চেয়ে বেশী সুফলা, কিন্তু..."

"কিন্তু কি?"

"ক্ষমা কর সুদা —ওখানে মানুষ থাকে না।"

"মানুষ থাকে না! তা'হলে থাকে কারা —দেবতা না দানব?"

"আমি এইটুকুই শুধু বলব যে, ওখানে মানুষ থাকে না।"

"আর্যবৃদ্ধ! আমি রাগ করব না, আমায় বল, কেন তোমার এই ধারণা?"

"তুমি এখানে দু'শো নর-নারীকে আমার ক্ষেতে কাজ করতে দেখেছ?"

"হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।"

"তারা আমার জমিতে কাজ করে। জমিতে কাজ করে বেতন পায় কিন্তু কখনও কি দেখেছ মাথা নীচু করে তাদের হীনতা প্রকাশ করতে?"

"না, বরং মনে হয় সকলেই যেন তোমার পরিবারের মানুষ।"

"হ্যাঁ, একেই মানুষ বলে। তারা আমার পরিবারেরই লোক। সকলেই মাদ্রের নর-নারী। পূর্ব-দেশেও এই রকম দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে দাস ও স্বামী সম্পর্ক, মানুষ নেই, বন্ধু পাওয়া যায় না।"

"আর্যবৃদ্ধ! তুমি সত্য বলেছ। মানবতার মূল্য শতদ্রু পেরিয়ে এই মাদ্রভূমিতে এসে দেখছি। মানুষের মধ্যে বাস করতে পাওয়াটা আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা।"

"পুত্র, তোমার কথায় আমি খুশী হয়েছি। তুমি আমার কথায় রাগ করনি। আপন আপন জন্মভূমিকে সকলেই ভালোবাসে, তা হল দেশপ্রেম।"

"কিন্তু প্রেম মানে দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে চোখ বুঁজে থাকা নয়!"

"আমি কুরু-পঞ্চাল দেশে যাবার সময় বহুবার এ কথা ভেবেছি, এ দেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনাও করেছি। এইসব দোষ কি করে এল তার কারণ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু প্রতিকার কি করে হবে জানি না।"

"কারণগুলো কি আর্যবৃদ্ধ?"

"যদিও পঞ্চালদের বাসস্থানকে পঞ্চাল জনপদ বলা উচিত, কিন্তু পঞ্চালের অর্ধেক অধিবাসীও পঞ্চাল-জনের নয়।"

"হ্যাঁ, বাইরে থেকে আসা আগন্তুকও অনেক আছে।"

"আগন্তুক নয় পুত্র! আদি-নিবাসী অনেক আছে। ওখানকার শিল্পী, কারিগর,

ব্যবসায়ী ; ওখানকার দাস, সকলেই পঞ্চাল-জনের লোকেরা ওখানে পৌঁছবার অনেক আগে থেকেই বাস করত। তাদের গায়ের রঙ দেখেছ ?"

"হ্যাঁ, পঞ্চাল-জন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কালো অথবা তাম্রবর্ণ।"

অপালা প্রশ্ন করল, "পঞ্চাল-জনের গায়ের রঙ কি মাদ্রদের মতোই গৌরবর্ণ।"

সুদাস উত্তর দিল, "কম বেশী হবে।"

জেতা বলল, "হ্যাঁ কম বা বেশী। কেন না অন্যের সঙ্গে রক্ত সংমিশ্রণের ফলে এই পরিবর্তন ঘটেছে। আমার ধারণা, যদি মাদ্রদের মতোই ওখানে শুধু পিঙ্গল কেশ আর্যরা বাস করত তা'হলে হয়ত শুধু মানুষ দেখা যেত। আর্য ও আর্য-ভিন্ন দুই উঁচু-নীচু ধারণা থেকেই ভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হতে পারে।"

"তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি বোধহয় জান, এই আর্য-ভিন্নদের অর্থাৎ যাদের আগে অসুর বলা হত তাদের মধ্যে উঁচু-নীচু ও প্রভুর সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল।"

"হ্যাঁ, কিন্তু পঞ্চালেরা সকলেই তো আর্য-জনের এক রক্ত এক শরীর থেকে জন্মলাভ করেছে। কি করে তাদের মধ্যে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ এসে অনুপ্রবেশ করল! পঞ্চালের রাজা দিবোদাস একবার আমার কাছ থেকে ঘোড়া কিনেছিল, আমাকে তার সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুগঠিত দেহ গৌরবর্ণের যুবক, কিন্তু মাথায় এক ভারী মুকুট, তাতে লাল হলদে রঙ। কানে বড় বড় কুণ্ডল। তার আঙ্গুলে ও গলায় নানা অলঙ্কার। তাকে দেখে আমার মন করুণায় ভরে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল পূর্ণচন্দ্রকে যেন রাহু গ্রাস করেছে। তার সঙ্গে তার স্ত্রীও ছিল, তাকে যে-কোনো মাদ্র সুন্দরীর মতোই দেখাচ্ছিল কিন্তু লাল-হলদে অলঙ্কারে বেচারী নুয়ে পড়েছিল।"

সুদাসের বুক দুরদুর করে উঠল। তার মনের চাঞ্চল্য যাতে মুখে ফুটে না ওঠে তারই চেষ্টা সে প্রাণপণে করতে লাগল, কিন্তু তাতে সফল না হয়ে কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলল, "আর্যবৃদ্ধ! পঞ্চালরাজ কি তোমার ঘোড়াগুলো কিনল ?"

"হ্যাঁ, কিনল তো বটেই, ভালো দামও দিল। কত দিয়েছে এখন আর মনে নেই। কিন্তু দেখতে দেখতে আমার জ্বর আসছিল, পঞ্চাল-জনেরা রাজার সম্মানে নতজানু হয়ে যেভাবে বন্দনা করছিল তা দেখে কার না গা ঘেন্নায় শিউরে ওঠে! যদি মাথাও কেটে নেওয়া হয় তবু কোনো মাদ্র ওইভাবে মাথা নোয়াতে পারবে না।"

"তোমাকে তো আর ওই রকম করতে হয়নি, আর্যবৃদ্ধ ?"

"আমাকে বললে ওইখানেই খুনোখুনী হয়ে যেত। পূর্ব-দেশের রাজারা কোনো মাদ্রকে ওই ধরনের হুকুম করতে সাহস পায় না। তবে ওখানে, ওটা তাদের সনাতন রীতি।"

"কেন বলুন তো ?"

"কেন, জানতে চাও ? সে এক বিরাট কাহিনী। যখন পশ্চিম থেকে এগোতে

এগোতে পঞ্চাল-জনের লোকেরা যমুনা, গঙ্গা ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী দেশে বসতি স্থাপন করল তখন তারা মাত্র-জনের মতো একটি পরিবারের মতো থাকত। তারপর অসুরদের সঙ্গে ওদের মেলামেশা বাড়তে লাগল আর তাদের অনুকরণে পঞ্চাল-জনের লোকেদের মধ্যে অনেকে সর্দার, রাজা বা পুরোহিত হবার জন্য লালায়িত হতে লাগল।"

"কিন্তু লালায়িত হল কেন?"

"লোভের জন্য, নিজে মেহনত না করে অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার জন্যে। এই রাজা ও পুরোহিতরাই পঞ্চালদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে—এরাই আর তাদের মানুষ থাকতে দেয়নি"—কথা বলতে বলতে জেতা নিজের কাজে চলে গেল।

২

মাদ্রপুরে (শিয়ালকোট) জেতার পরিবারের মধ্যে সুদাস চার বছর কাটিয়ে দিল। জেতার স্ত্রী ইতিপূর্বেই মারা গেছে। বিবাহিতা ভগ্নী ও কন্যাদের মধ্যে দু'একজন মাঝে-মধ্যে এসে থাকত কিন্তু গৃহের স্থায়ী বাসিন্দা ছিল জেতা, সুদাস আর অপালা। অপালার বয়স এখন বছর কুড়ি। উভয়ের ব্যবহারে বেশ বোঝা যেত যে, অপালা ও সুদাসের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম বিদ্যমান। মাদ্রপুরের সুন্দরীদের মধ্যে অপালার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল আর সেখানে সুন্দর তরুণের অভাব ছিল না যারা তার প্রেম প্রার্থনা করত। আবার সুদাসের মতো সুপুরুষ যুবকের জন্যে সুন্দরী তরুণীরও অভাব ঘটত না। কিন্তু এখানকার লোকেরা সর্বদাই দেখেছে সুদাসকে অপালার সঙ্গে আর অপালাকে সুদাসের সঙ্গে নাচতে। জেতাও এ কথা জানত; এর পরিণামের কথা ভেবে সে খুশীও হত যদি সুদাস স্থায়ীভাবে তাদের মধ্যে বসবাস করতে রাজী হয়। কিন্তু সুদাস মাঝে মাঝে তার বাবা মা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে তাতেই জেতার ভাবনা, কারণ সে জানত, সুদাস মা-বাপের একমাত্র সন্তান।

চন্দ্রভাগা নদীর অপর নাম ছিল প্রেমিক-প্রেমিকাদের নদী। একদিন অপালা ও সুদাস সেখানে স্নান করতে গেছে। এর আগেও অনেকবারই স্নানের সময়ে সুদাস অপালার নগ্ন শারীরিক সৌন্দর্য দেখেছে, কিন্তু প্রায় পঞ্চাশটি নিরাভরণ দেহের সুন্দরীর নগ্ন সৌন্দর্যের পাশে অপালার সৌন্দর্য দেখে মনে হল যে, আজই যেন প্রথম সে তার সঙ্গিনীর অপরূপ লাবণ্যময়ী রূপ-মাধুরীর পূর্ণ পরিচয় পেল। ফিরবার পথে সুদাসকে মৌন দেখে অপালা প্রশ্ন করল, "সুদাস! আজ যে তুমি কথা বলছ না, খুব পরিশ্রান্ত না-কি? চন্দ্রভাগার খরস্রোতে দু'বার সাঁতরে পাড়ি দিলে পরিশ্রম তো হবেই।"

"পরিশ্রম তো তোমারও হয়েছে অপালা! তুমিও একবার পাড়ি দিয়েছ, আর আমি মাত্র দু'বার; সময় পেলে দশবার এপার-ওপার করতে পারতাম।"

"জল থেকে উঠবার সময় আমি দেখছিলাম তোমার বুকের ছাতিটা চওড়া হয়েছে; তোমার হাত পায়ের পেশীগুলিও যেন দ্বিগুণ স্ফীত।"

"সাঁতার কাটা খুবই ভালো এতে শরীর বলিষ্ঠ ও সুন্দর হয়। কিন্তু অপালা তোমার সৌন্দর্যের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। তুমি ত্রিভুবনের মধ্যে অনুপম সুন্দরী।"

"নিজের চোখ দিয়েই দেখে বলছ তো সুদাস?"

"হ্যা। মোহের বশবর্তী হয়ে বলছি না অপালে!"

"বেশ! কিন্তু তুমি কোনোদিন আমার চুম্বন প্রার্থনা করনি, অথচ তুমি জান, মাদ্র তরুণীরা এ জিনিস খুবই উদারভাবে বিতরণ করে থাকে।"

"আমি না চাইতেই তোমার দানের উদারতায় তুমি ভরিয়ে দিয়েছ।"

"সে তো তোমাকে দেখে আমি আমার ভাই শ্বেতপ্রবাহকেই দেখতে পাই।"

"তা'হলে এখন আর চুমু দেবে না?"

"চাইলে কেন দেব না?"

"আর চাইলে তুমি আমার হবে?"

"ও কথা বলো না সুদাস! অস্বীকার করলে আমিই দুঃখ পাব।"

"কিন্তু এ দুঃখ আসতে না দেওয়া তোমারই হাতে।"

"আমার নয়, তোমারই হাতে!"

"কি ভাবে?"

"তুমি কি সারা জীবনের জন্যে আমার পিতার এই ঘরে থাকতে প্রস্তুত?"

সুদাস বহুদিন থেকেই এই মুহূর্তটির আশঙ্কা করছিল, যখন মধুভরা ওই মুখ থেকে এই কঠিন প্রশ্নটি শুনতে হবে। বিদ্যুতের মতো কথাটা মর্মস্থলে আঘাত করল। এক মুহূর্তের জন্য মুখটা ম্লান হয়ে উঠেছিল দ্বিধা ও সঙ্কোচে। কিন্তু তার মনোভাব অপালাকে বুঝতে না দিয়ে সে শান্তভাবে বলল, "অপালে, তোমায় আমি ভালোবাসি।"

"তা আমি জানি, আর তুমিও আমার মনের কথা জান। আমি চিরকালের জন্যই তোমার হয়ে থাকতে চাই, তাতে আমার বাবাও খুশী হবে। কিন্তু তার জন্যে তোমায় পঞ্চাল থেকে চিরবিদায় নিতে হবে!"

"পঞ্চাল চিরকালের জন্যে ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন নয়; কিন্তু সেখানে রয়েছে আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা। আমি ছাড়া মায়ের আর কোনো সন্তান নেই। মাকে আমি কথা দিয়েছিলাম, মৃত্যুর আগে তার সঙ্গে দেখা আমি করবই।"

"মাকে যে কথা দিয়েছ তার খেলাপ করাতে আমি চাই না, সুদাস! তোমার প্রতি আমার যে প্রেম তা চিরকালই থাকবে; এমন কি তুমি যদি আমায় ফেলে চলে যাও তা'হলেও। আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করব কিন্তু আমাদের নিজেদের কাছে করা প্রতিজ্ঞা আমরা দু'জনেই ভাঙতে পারি না।"

"তোমার মনের কথা বল, অপালে!"

"মানবভূমি ছেড়ে অ-মানবভূমিতে কখনো যাব না।"

"অ-মানবভূমি, পঞ্চাল জনপদ ?"

"হ্যাঁ, যে দেশে নারীর স্বাধীনতা নেই —সে দেশে মনুষ্যত্বের মূল্য নেই।"

"তোমার সঙ্গে আমি একমত।"

"আর এই জন্যেই তোমাকে এই চুম্বন দিচ্ছি।" এই বলে অপালা তার অশ্রুসিক্ত গালটি সুদাসের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল। সুদাসের চুম্বন শেষ হলে অপালা তার ঠোঁট দিয়ে সুদাসের ঠোঁটে দীর্ঘ চুমু খেল। তারপর বলল, "তুমি যাও, একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করে এস ; তোমার জন্যে আমি এই মাদ্রপুরে অপেক্ষায় থাকব।"

অপালার এই অকৃত্রিম কথাগুলি শুনে সুদাসের নিজের ওপর অসীম ঘৃণা জন্মাল, যা কোনোদিনই সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মা বাপকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি চাইল, পিতা-পুত্রী উভয়েই সম্মতি দিল।

প্রস্থানের আগের দিনটা অপালা বেশী বেশী করে সুদাসের আশেপাশে অনুক্ষণ ঘুরতে থাকল। তাদের দু'জনেরই পদ্ম পাপড়ির মতো নীল চোখ দুটো জলে ভেসে যাচ্ছিল, আর ওরা তা গোপন করছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা চুম্বনে, নিভৃতে নীরব হয়ে চোখে চোখ রেখে বসে রইল, আবার কখনও দৃঢ় আলিঙ্গনে পরস্পরকে আবদ্ধ করল।

যাবার মুহূর্তে অপালা শেষবারের মতো তার কণ্ঠলগ্না হয়ে বলল, "আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব, সুদাস !"

৩

সুদাস তার মাকে ভালোবাসত গভীরভাবে। পিতা দিবোদাস ছিলেন একজন প্রতিভাশালী রাজা —যাঁর গুণগানে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ শ্লোক লিখেছেন। এই শ্লোকগুলি লিপিবদ্ধ আছে ঋগ্বেদে, (ঋগ্বেদ ৬।২৬।২, ২৫) এগুলো সংগৃহীত হওয়া ও ঋগ্বেদে স্থান পাওয়ায় নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ঋষিদের চাটুকারের অভাব ছিল না।

সুদাসের ভালোবাসা ছিল তার মায়ের জন্য। সে ভালোভাবেই জানত, তার মায়ের মতো দিবোদাসের আরো স্ত্রী আছে, আছে অসংখ্য দাসী। পঞ্চালের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী —রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মা হিসাবে বিশেষ সম্মান পেলেও বৃদ্ধা দন্তহীনার জন্যে রাজার অন্তরে কোনো প্রেম ছিল না ; দিবোদাসের অন্তঃপুরে রাত্রিবাসের জন্য নিত্য নব তরুণীর আনাগোনা ছিল। সুদাস মায়ের একমাত্র পুত্র হলেও তার পিতার একমাত্র পুত্র ছিল না। তার অনুপস্থিতিতে বৈমাত্রেয় ছোট ভাই প্রতর্দন দিবোদাসের উত্তরাধিকারী হত।

বছরের পর বছর কেটে যাবার পর সুদাসকে না দেখে মা তাকে দেখবার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। আর অনবরত চোখের জল ফেলতে ফেলতে চোখের দৃষ্টি হয়েছিল ক্ষীণ।

সুদাস একদিন কাউকে খবর না দিয়ে, বাবার সঙ্গে দেখা না করে মায়ের সামনে এসে হাজির হল। মাকে নিষ্প্রভ চোখ দুটো মেলে সুদাসের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে সুদাস বলল, "মা! আমি তোমার সুদাস।"

শুনে মায়ের চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু নিজের জায়গা থেকে একটুও না নড়ে বলল, "তুই সত্যিই যদি আমার সুদাস, তবে আমার দৃষ্টির বাইরে দূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তোর দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরছিস্ না কেন? আমার কোলে মাথা রাখছিস না কেন?"

সুদাস মায়ের কোলে মাথা রাখল। মা হাত বুলিয়ে দেখল। নিজের চোখের জলে সুদাসের গাল, কপাল, চুল ভিজিয়ে দিয়ে বার বার চুমু খেতে লাগল। মায়ের চোখের জল বন্ধ করতে না পেরে সুদাস বলল, "মা! আমি তো এখন তোমার কাছে এসে গেছি, তবু কাঁদছ কেন তুমি?"

"আজকের দিনটা, শুধু আজকের দিনটা আমায় কাঁদতে দাও। আজ আমি একটু কেঁদে নি। এই আমার শেষ কান্না সুদাস, আমার চোখের মণি!"

খবর গিয়ে পৌঁছাল অন্তঃপুর থেকে রাজার কানে। রাজা এল দৌড়ে, সুদাসকে আলিঙ্গন করল, আনন্দাশ্রু বইতে লাগল তারও চোখে।

দিন কাটতে লাগল, দিন থেকে মাস গেল। বছর গেল—দুটো বছর শেষ হল। মা-বাপের সামনে সুদাস মুখের প্রসন্নতা বজায় রাখার চেষ্টা করত, কিন্তু নির্জনে তার কানে সেই বজ্রচ্ছেদিকা ধ্বনি বেজে উঠত: 'আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।' আর তার চোখের সামনে ভেসে উঠত সেই কম্প্রমান রক্তাভ ওষ্ঠদ্বয়—চোখের দৃষ্টি যতক্ষণ না ঝাপসা হয়ে উঠত, সে যেন অপালাকে দেখতে পেত! মনের দোটানায় ছিঁড়ে পড়ত। একদিকে অপালার অকৃত্রিম প্রেম অপরদিকে বৃদ্ধা মায়ের বাৎসল্য-ভরা হৃদয়। মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ করে চলে যাওয়া নিজের কাছে আত্মসর্বস্ব নীচ কাজ বলে মনে হত। তাই সে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করল, মা বেঁচে থাকা পর্যন্ত পঞ্চাল ছেড়ে যাবে না। কিন্তু রাজ-পুত্রের মতো বিলাসিতার জীবন সে মেনে নিতে পারছিল না। সে বুঝেছিল এটা তার সামর্থ্যের বাইরে। পিতার প্রতি তার সশ্রদ্ধ ব্যবহার বজায় রেখে তার আদেশ পালনের চেষ্টা করত।

একদিন বৃদ্ধ রাজা পুত্রকে ডেকে বললেন, "বৎস সুদাস! আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। আর আমার পক্ষে পঞ্চালের শাসনভার বহন করা সম্ভব নয়।"

"তা'হলে আর্য! এই ভার পঞ্চালদের ওপর দিচ্ছ না কেন?"

"পঞ্চালদের? তোমার অভিপ্রায় আমি বুঝতে পারলাম না।"

"আর্য, এ রাজ্য আসলে পঞ্চালদেরই। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা পঞ্চাল-জনের সাধারণ লোক ছিল। তখন পঞ্চালের কোনো রাজা ছিল না। পঞ্চাল-জনের সাধারণ লোকেরাই

শাসন চালাত। যেমন আজও মল্ল, মাদ্র, অথবা গান্ধার-জনের লোকেরা চালায়। তারপর প্রপিতামহ বধ্র্যশ্ব, আত্মসুখের লোভ, ভোগের লোভ, অপরের পরিশ্রমের ফল ভোগের লোভে পড়েছিল। একদা সে হয়ত জন-পতি ছিল, পরে হয়ত সেনাপতি হয়েছিল, আর কয়েকটা যুদ্ধে জয়লাভ করে সারা জনের সম্মান লাভ করল। সেই সবের সুযোগে জনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। জন-শাসন খতম করে অসুরদের মতো ব্যক্তি-শাসন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। অসুরদের মতোই পুরোহিতদের সৃষ্টি করল, বশিষ্ঠ বা বিশ্বামিত্রের পূর্ব পুরুষকে পুরোহিত পদ ঘুষ দেওয়া হল, তার পরিবর্তে সেই সব পুরোহিতরা সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে প্রচার সুরু করে দিল —ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরুণ, বিশ্বদেব এবং অন্যান্য দেবতারা রাজাকে পাঠিয়েছে পৃথিবীর প্রজাকে শাসন করার জন্যে। কাজেই জনের সাধারণ মানুষ যেন রাজার হুকুম মেনে চলে আর যথাবিহিত সম্মান করে। এর সবটাই ছিল বেইমানি। ডাকাতির ভাগ বাঁটোয়ারা। পিতা! আমাদের পূর্ব পুরুষ যে রাজত্ব গড়ে গেছে তা বিশ্বাসহন্তার রাজত্ব। তাদের নাম পর্যন্ত আমাদের ভুলে যেতে হবে —তাদের প্রতি আমাদের কোনো রকম কৃতজ্ঞতা বা মোহ থাকা উচিত নয়।"

"না পুত্র! বিশ (সারা) জনকে আমি আমার রাজকৃত (রাজা করার অধিকারী) বলে স্বীকার করি। অভিষেকের সময় জনের সাধারণ লোকেই রাজচিহ্ন পলাশদণ্ড দেয়।"

"রাজার অভিষেকের উৎসব একটা তামাশা মাত্র। সত্যি সত্যি কি জনের লোকেরা (প্রজারা) রাজার মালিক? না! আর এ কথা খুবই স্পষ্ট, যখন আমি দেখি, রাজা নিজের জনের সঙ্গে একত্রে সকলের সমান হয়ে বসে না, আহার করে না, কাজও করে না। মাদ্র বা গান্ধার জন-পতি কি এ রকম করতে পারত?"

"আমরা যদি তাদের মতো থাকি তা'হলে যে-কোনো শত্রু, যে-কোনো সময় আমাদের হত্যা করবে বা বিষ দিয়ে মেরে ফেলবে।"

"চোর বা অপহারকদেরই এ ভয় হতে পারে। জন-পতি চোর নয়, অপহারকও নয়। বস্তুত তারা জনের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাদের ব্যবহারও সেইরকম —তাই তাদের ভয় নেই। আর রাজাদের কথা আলাদা, তারা জনের অধিকার অপহরণকারী, তাই সব সময়েই জনকে ভয় করে চলতে হয়। রাজাদের রাত্রিবাসের অন্তঃপুরের জন্য, সোনা-দানা রক্ষার জন্য সংগ্রহ করতে হয় ক্রীতদাস। রাজাদের রাজভোগ নিজের পরিশ্রমে অর্জিত নয়, অপরের পরিশ্রম অপহরণ করে তা ভোগ করে!"

"পুত্র! তুমি কি এর জন্য আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছ?"

"আর্য, তা মোটেই নয়! তোমার ঐ আসনে বসলে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আমাকেও তোমার মতো হতে হবে। তাই আমার পিতা দিবোদাসকে আমি দোষী সাব্যস্ত করছি না।"

"তুমি যে পঞ্চাল-জনের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বলছ, তা কি সম্ভব ? তোমাকে বুঝতে হবে, জনের অধিকার অপহারক কেবলমাত্র পঞ্চালরাজ দিবোদাসই নয় ; অপহারকদের মধ্যে আছে সামন্তরা। রাজা বড় হতে পারে কিন্তু জনের সম্মিলিত শক্তির সামনে পঙ্গু। এদিকে আছে সামন্ত ও উগ্র রাজপুত্র (রাজবংশ-জাত সন্তানরা) এবং সেনাপতি ছাড়াও প্রধান সামন্ত হচ্ছে পুরোহিত।"

"হ্যাঁ, পুরোহিতদের ক্ষমতার কথা জানি। জ্যেষ্ঠ পুত্র ছাড়া অন্যান্য পুত্ররা তো রাজপদ পায় না তাই তারা পুরোহিত (ব্রাহ্মণ) হয়। আমার ছোট ভাই প্রতর্দনও হয়ত তাই হবে। রাজা ও পুরোহিতদের মধ্যে এখন রাজবেদী (সিংহাসন) ও যজ্ঞবেদী নিয়ে বাঁটোয়ারা হচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, ভবিষ্যতে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ দুটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গড়ে উঠবে। মাদ্র ও গান্ধার দেশে যুদ্ধ ও যজ্ঞ উভয় কাজ একই লোক করতে পারে, কিন্তু পঞ্চালপুরের যুদ্ধবৃত্তি বধ্র্যশ্ব পৌত্র দিবোদাসের হাতে, আর যজ্ঞ বিশ্বামিত্রের করায়ত্ত। ইতিমধ্যেই জনের অধিকার তিন ভাগে বাঁটোয়ারা হয়েছে। জনের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে রাজা ও পুরোহিতরা ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে, জনের অধিকার হরণের অংশীদার হিসাবে, বৈবাহিক বন্ধনের দ্বারা এক হতে পারে ; কিন্তু এখন এরা আলাদা আলাদা শক্তি হিসাবে গণ্য তাই স্বার্থের সংঘাত সুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পৃথক গোষ্ঠীতে পরিগণিত হতে চলেছে। এই কারণেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সখ্য পুনঃস্থাপনের প্রয়াস দেখা দিয়েছে। জনের সাধারণ মানুষ এই দুই শ্রেণীর বাইরে। আজ এই বিশাল জনের নাম বদলে বিশ্‌ (বিট) বা প্রজা বলা হচ্ছে। কি বিড়ম্বনা দেখ, একদিন যে জন (পিতা) ছিল, তাকে প্রজা (পুত্র) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর্য ! একে কি তুমি প্রবঞ্চনা বলবে না ?"

"পুত্র ! এ ছাড়াও আরো অনেকে আছে যাদের তুমি গণনার মধ্যে ধরনি।"

"হ্যাঁ, আর্য জনের বাইরের প্রজাবৃন্দ, যেমন শিল্পী, ব্যবসায়ী, দাসদাসী। হয়ত এই কারণেই জনকে ক্ষমতাচ্যুত করায় সামন্তরা সফল হয়েছে। অনার্য প্রজারা যখন দেখে যে তাদের শাসক-জনের লোকেরা অন্যের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে তখন তারা খুশীই হয়। আর এই ব্যাপারটাকেই রাজারা ন্যায়বিচার বলে জাহির করে।"

"পুত্র ! তুমি হয়ত ভুল বলছ না ; কিন্তু আমায় বল তো, রাজ্য কার হাতে ছেড়ে দেব ? চোর-অপহারক —সামন্ত ও ব্যবসায়ী এদের সকলকেই কি দেওয়া হবে ? কেননা আর্য-জন ও অনার্য প্রজা যারা সংখ্যায় যথেষ্ট তারা কি রাজ্যশাসন করতে পারবে ? আর এদিকে ধর্ম-সামন্ত ও রাজ-সামন্তরা শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রজাদের ওপর —তাদের গ্রাস করার জন্যে তারা প্রস্তুত হয়েই আছে। মাত্র ছ-সাত পুরুষ আগেই কুরু-পঞ্চাল জনের হাত থেকে ক্ষমতা অপহৃত হয়েছে, জনের শাসনের কথা লোকে এখনও ভুলে যায়নি। সে সময় কোনো দিবোদাসের রাজত্ব ছিল না, তখন এই দেশকে পঞ্চালাঃ

অর্থাৎ সারা পঞ্চালবাসীর দেশ বলা হত, কারণ দেশটা ছিল তাদেরই। কিন্তু আজ আর সেই অবস্থায় ফিরে যাবার পথ নেই।"

"হ্যাঁ, পথে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মতো অনেক কুমীর লুকিয়ে আছে।"

"এতে প্রমাণ হয় যে, আমি পরবশ হয়েছি, কালের গতি বদলাতে পারিনি, কাল কি ঘটবে তাও জানি না। কিন্তু আমি এতেই খুশী যে সুদাসের মতো পুত্র আমারই সন্তান। এক সময় আমিও তরুণ ছিলাম। তখন পর্যন্ত বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের শ্লোক মানুষের জীবনের ওপর এত মায়াজাল ছড়াতে পারেনি। আমি ভাবতাম, রাজা যে দস্যুবৃত্তি করে সেটা কমাতে হবে; কিন্তু নিজের দুর্বলতার জন্যে তা পারিনি। সে সময় তোমার মা-ই ছিল যথাসর্বস্ব। তারপর আমি যখন ভগ্নমনোরথ ও নিরাশ হয়ে পড়লাম তখন এই পুরোহিতরা শুধু নিজেদের কবিতা ও স্তুতিগাথাই নয় নিজেদের কন্যাদের পাঠিয়ে আমাকে জড়িয়ে দিল। আমার অন্তঃপুর শত শত দাসীকন্যায় ভরে গেল —এর তুলনা কেবল ইন্দ্রের সঙ্গেই চলতে পারে। দিবোদাসের এই অধঃপতন থেকে তুমি শিক্ষা নাও, সতর্ক হও এবং যত্নের সঙ্গে চেষ্টা কর। হয়ত তোমার সামনে পথের সন্ধান মিলবে; দস্যুবৃত্তির অবসান সম্ভব হবে, কিন্তু সুদাসের মতো সহৃদয় শাসককে সরিয়ে হৃদয়হীন প্রবঞ্চক, প্রতর্দন-এর মতো শঠের হাতে রাজ্য দিলে পঞ্চালের ভালো হবে না। আমি পিতৃলোকে গিয়েও তোমার সযত্ন চেষ্টা লক্ষ্য করে সুখী হব।"

৪

দিবোদাস দেবলোকে প্রয়াণ করল। সুদাস এখন পঞ্চালের রাজা। ঋষিমণ্ডলী তার চারদিকে ঘুরতে সুরু করল। সুদাস বুঝল, ইন্দ্র বরুণ অগ্নি সোম প্রভৃতি দেবতার নাম নিয়ে এই শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধরা লোকদের কিভাবে অন্ধ বানিয়ে রাখে। তাদের শক্ত খপ্পরের আওতার পরিধি তার জানা ছিল। যাদের উপকার করবে বলে সে ঠিক করেছিল —সেই প্রজারাই তাকে ভুল বুঝল। অতীতের কথা মাঝে মাঝে তার মনে হত —ছিন্নবস্ত্রে, নগ্নপদে বিদেশে ঘুরে বেড়াবার সেই দিনগুলোর কথা। সেদিন তার মনে শান্তি ছিল অনেক বেশী। মুক্ত স্বাধীন সুদাসের হৃদয়ের ব্যথা বোঝবার মতো, তার প্রতি সহানুভূতি অনুভব করার মতো কোনো দরদী তার পাশে ছিল না। পুরোহিত ও ঋষিরা তাদের পৌত্রীদের, আর প্রদেশ সামন্তরা কুমারী মেয়েদের তার অন্তঃপুরে নিয়মিত পাঠাত। কিন্তু সুদাস নিজেকে আগুন-লাগা ঘরে বসে থাকার মতো মনে করত। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে অপেক্ষমানা সেই নীল-নয়নী অপালার কথা সে ভুলতে পারত না।

সুদাস তার সমস্ত প্রজাদেরই —আর্য অনার্য নির্বিশেষে সকলেরই কল্যাণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু তার আগে তার দরকার হল —ঈশ্বরের কৃপার দিকে চেয়ে আছে যে প্রজা-সাধারণ, তাদের কাছে প্রমাণ করা যে, সুদাস ভগবানের করুণা লাভ

করতে সমর্থ। আর এই অনুগ্রহ লাভের একমাত্র উপায় পুরোহিতদের প্রশংসাভাজন হওয়া। শেষ পর্যন্ত পুরোহিতদের কাছ থেকে এই প্রশংসা-বাণী আদায় করার জন্ম তাকে হিরণ্য-স্বর্ণ, পশু-ধান্ত, দাস-দাসী দান করা ছাড়া উপায় ছিল না। এইসবের পরেও চর্বিযুক্ত মাংস এবং সুস্বাদু মদ খাওয়ার পর পুরোহিতরা সিদ্ধান্ত করল, সত্যিই সুদাসের নামের যা অর্থ—অর্থাৎ সুদাতা তা সার্থক। এই সমস্ত চাটুকারেরা সুদাসের বদান্যতা সম্পর্কে অসংখ্য শ্লোক লিখেছিল—আজও সেগুলো ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু কে বলতে পারে, এই সমস্ত স্তুতিবাদের রচয়িতাদের সুদাস কি গভীর ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত! সুদাসের যশোগান অনতিবিলম্বে শুধু উত্তর পঞ্চালে, অর্থাৎ বর্তমান রুহেলখণ্ডে সীমাবদ্ধ রইল না—আরও দূরে ছড়িয়ে পড়ল। নিজের ভোগ-শূন্য জীবন দিয়ে সে যথাসাধ্য সমস্ত প্রজার কল্যাণার্থে কাজ করে চলেছিল।

পিতার মৃত্যুর কয়েক বছর পর তার মাতারও মৃত্যু হল। অভ্যস্ত হয়ে উঠবার আগে যে বেদনা অহোরাত্র তার হৃদয়ে বহ্নিমান ছিল তা আজ যেন বিপজ্জনক দুষ্ট ক্ষতের মতো তাকে পেয়ে বসল। প্রতি মুহূর্তে সে যেন দেখত পেত, অপালা জলভরা চোখ আর কম্প্রমান ঠোঁট দুটি নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমি অপেক্ষা করে থাকব তোমার জন্যে—এই মাদ্রপুরে।' সুদাসের চোখের সমস্ত জলও তার এই জ্বলন্ত চিন্তাকে নেভাতে পারত না। একদিন মৃগয়ার ছলে সে পঞ্চালপুর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

যে পুরাতন গৃহে সে অপালার প্রেমলাভ করেছিল সেটি সেদিনও দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু জেতা বা তার প্রিয় কন্যার দেখা সে পেল না। দু'জনেই তখন গতায়ু হয়েছে। অপালা মাত্র এক বছর আগে মারা গেছে। অপালার যে ভাই নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল, সে পরে ফিরে এসে সপরিবারে বাস করতে সুরু করছে; কিন্তু এই পরিবারের সঙ্গে নতুন করে সম্বন্ধ স্থাপন করবার তার কোনো ইচ্ছা ছিল না। অপালার এক বান্ধবীর সঙ্গে সুদাসের দেখা হল। সে কাঁদতে কাঁদতে সুদাসকে মৃতার কতকগুলো রঙীন পোষাক—ঘাঘরা, শাল, কাঁচুলি এবং ওড়না দেখিয়ে বলল, "আমার বান্ধবী তার শেষ দিনে সুদাসের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে তার জন্যে এখানে অপেক্ষা করে থাকবে।"

সুদাস পোষাকগুলো নিয়ে তার বুকে চেপে ধরল। অপালার দেহের ঘ্রাণ তখনও সেই পোষাকের ভাঁজে ভাঁজে।*

---

* ১৪৪ পুরুষ আগেকার কাহিনী। এই সময় আদি ঋষিরা—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ ঋগ্বেদের শ্লোকসমূহ রচনা করেছিলেন। আর পঞ্চালভূমির রাজন্যবর্গ এইসব আর্য-পুরোহিতদের সাহায্যে পুরাকালের গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মূলে চূড়ান্তভাবে আঘাত হানতে পেরেছিল।

প্রবাহণ

স্থান : পঞ্চাল (উত্তরপ্রদেশ) ।। কাল : ৭০০ খৃষ্টপূর্ব

"একদিকে ঘন নিবিড় সবুজ বন, মহুয়ার মাদক গন্ধ, পাখীর কূজন, অন্যদিকে প্রবাহিণী গঙ্গার স্বচ্ছ ধারা, তীরে আমাদের হাজার হাজার কপিলা-শ্যামা গাভীগুলি চরে বেড়াচ্ছে, আর হুংকার দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাল বলিষ্ঠ বৃষভ। প্রবাহণ! এই মনোরম দৃশ্য দেখে নয়ন তৃপ্ত করা উচিত। তুমি দেখছি দিনরাতই সাম গান (উদ্‌গীথ) গাইছ, অথবা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের মন্ত্র আবৃত্তি করছ।"

"লোপা, তুমি যে চোখ দিয়ে এই দৃশ্য দেখ—আমি তোমার সেই চোখের দিকে তাকিয়েই তৃপ্তি পাই।"

"হুঁ! কথায় তোমার সঙ্গে পারা মুস্কিল—খুব কথা বানাতে পারো। যখন তোমার সহপাঠীদের সঙ্গে মরালের মতো সুর করে পুরনো শ্লোক ও মন্ত্রের পাঠ পড়তে দেখি তখন মনে হয় আমাদের প্রবাহণ স্তন্যপায়ী শিশুই থেকে যাবে।"

"তাই না-কি! প্রবাহণ সম্পর্কে তোমার সত্যিই এই ধারণা?"

"ধারণা যাইহোক, তবে আমার এ ধারণাও আছে যে, প্রবাহণ আমার, আর সব সময়ের জন্যে প্রবাহণ আমারই থাকবে।"

"এই আশা ও বিশ্বাসেই, লোপা, প্রভূত শ্রম ও বিদ্যার্জনের শক্তি পাই। আমি নিজের মনকে জোর করে সংযত করতে অভ্যস্ত। তা না হলে কতবার আমার মন পুরনো গাথা, মন্ত্র, উদ্‌গীথগুলি বার বার মুখস্থ করার হাত থেকে রেহাই পেতে চেয়েছে। মন যখন পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, শরীর যখন অবসন্ন, যখন মনে হয় সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি, সেই সঙ্কট মুহূর্তে লোপার সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত মিলনের আশাই আমায় প্রেরণা জোগায়।"

"আর এই সময়টার জন্য আমিও সর্বদাই অপেক্ষা করে থাকি।"

লোপার পিঙ্গল চোখ দুটির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দূর লক্ষ্যে। হাওয়ায় তার দীর্ঘ স্বর্ণাভ কেশরাশি উড়ছিল। মনে হচ্ছিল লোপা যেন কোন্ সুদূরে হারিয়ে গেছে। প্রবাহণ তার চুলগুলির ওপর আঙুল বুলতে বুলতে বলল, "তোমার তুলনায় নিজেকে আমার বামন মনে হয়।"

"বামন! না গো না, প্রবাহণ।"—বলতে বলতে লোপা তার সুডৌল গাল প্রবাহণের গালের ওপর রেখে বলতে লাগল, "একদিন আমি তোমার ওপর অভিমান করতাম—মনে পড়ে? যেদিন তুমি পিসীমার সঙ্গে এলে আমাদের বাড়ি, আমি আমার শিশু চোখ দিয়ে আর এক আট বছরের বালককে দেখেছিলাম। তখন আমার বয়স তিন কি চার। কিন্তু সেই স্মৃতি সেদিনের শিশু-চিত্তকে রঞ্জিত করতে এতটুকু ভুল করে

না। আজও মনে পড়ছে—এখনো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তোমার সেই স্বর্ণাভ কুঞ্চিত কেশ, টিকোলো নাক, পাতলা রাঙা ঠোঁট, বড় বড় উজ্জল নীল চোখ, আর তপ্ত গৌরবরণ দেহ। আমার কেমন লজ্জা হল। মা তোমাকে আদর করে চুমু খেয়ে বললেন, পুত্র প্রবাহণ, এ তোমার মামাত বোন। ওর লজ্জা হয়েছে, ওর লজ্জা দূর কর।"

"আর আমি তোমার কাছে এগিয়ে গেলাম। তুমি মামীমার সুগন্ধিত কেশরাশির আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেললে।"

"আমি মুখ লুকলেও মা-র চুলের ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম তুমি কি কর। বাড়িতে মা, ও দাসদাসীদের সন্তানেরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাবার বিদ্যাপীঠ তখনও গড়ে ওঠেনি। আমার একলা মনে হত, তাই তোমাকে দেখে কী খুশীই না হয়েছিলাম!"

"তবু তুমি মুখ লুকিয়েছিলে। আমি তোমায় দু'চোখ ভরে দেখছিলাম। আমার শিশুনেত্রে ভালোই দেখাচ্ছিল। কাছে গিয়ে তোমার কাঁধে হাত রাখলাম। তোমার মনে পড়ে কি, মা ও মামীমা কি বলেছিল? দু'জনেই মুচকি হেসে বলে উঠল, 'হে ব্রহ্মা আমাদের সাধ পূর্ণ কর।' তখন সাধ পূর্ণ কর প্রার্থনার মানে বুঝিনি।"

"না প্রবাহণ, আমার মনে পড়ছে না। আমার পক্ষে এইটাই যথেষ্ট যে, আমার কাঁধের ওপর তোমার নরম হাতের স্পর্শ এখনও মনে আছে।"

"আর তুমি সঙ্কোচে একেবারে জড়সড়ো হয়ে গেলে।"

"তুমি আমার হাতটা তোমার হাতের মধ্যে নিয়েছিলে, কিন্তু মুখে শব্দ ছিল না, যেন ঠোঁট দুটো সেলাই করা। তখন মা কি বলেছিল মনে আছে?"

"মামীমার প্রতিটি কথাই মনে আছে, তাঁকে কি আমি কখনও ভুলতে পারি! মা আমাকে গার্গ্য মামার কাছে রেখে ফিরে গেল, কিন্তু মামীমার অপার স্নেহ আমার মায়ের স্থান দখল করেছিল। মামীমাকে আমি কেমন করে ভুলব?" প্রবাহণের চোখে জল ভরে এল, সে লোপার ঠোঁটে চুমু দিয়ে বলল, "লোপা তোমার মতোই মামীমার মুখ ছিল; আমরা দু'জনে এক বিছানায় শুতাম। রাত্রে কতবারই না আমার চোখের পাতা খুলে যেত, কিন্তু মামীমাকে আসতে দেখলেই আবার চোখ বুঁজতাম। যখন মামীমার মৃদু নিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর ঠোঁটের স্পর্শ গালে পেতাম তখন চোখ মেলতাম। মামীমা বলত, 'বৎস জেগে আছ!' তারপর তোমার গালে চুমু খেত, কিন্তু তুমি বেহুঁশ হয়ে ঘুমোতে।"

লোপার চোখও অশ্রুপূর্ণ হয়ে এলো, সে উদাস স্বরে বলল, "মাকে আমি এত কম দেখেছি যে মনেই পড়ে না।"

"হ্যাঁ, তুমি যে কথা বলছিলে। যেদিন প্রথম এই বাড়িতে এলাম সেদিনের কথা। আমাকে তোমার সামনা-সামনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তোমার মা বলল, বৎস! এই তোমার বোন—তুমি ওর সঙ্গে ঘোড়া-ঘোড়া খেল।"

"হ্যাঁ, তুমি আমাকে ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে ডাকলে। আমি মা-র চুলের ভেতর থেকে আমার মুখ বের করলাম। তুমি তারপর ঘোড়া হলে, আর আমি তোমার পিঠে চেপেছিলাম।"

"আর আমি তখনই তোমাকে পিঠে চাপিয়ে বাইরে নিয়ে গেলাম।"

"আমি খুব দুষ্ট ছিলাম, না ?"

"তুমি সব সময়ই ভয়হীন ছিলে, লোপা ! মামার ভয়ে আমি নিজের পড়াশুনায় লেগে থাকতাম আর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তখন তোমার কাছে চলে আসতাম।"

"তোমাকে দেখার জন্যে আমিও তোমার কাছে এসে বসতে লাগলাম।"

"আমার মনে হচ্ছে লোপা, তুমি যদি আমার অর্ধেক পরিশ্রম করতে, তা'হলে মামার শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে পারতে।"

"কিন্তু তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ নয় !" লোপা প্রবাহণের চোখ দুটির দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বলল, "আমি তোমার চেয়ে এগিয়ে যেতে চাই না।"

"কিন্তু তাতে আমি বেশী খুশী হতাম।"

"না, আমাদের দু'জনার আপন আপন পৃথক সত্তা কিছু নেই।"

"লোপা, তুমি আমায় উৎসাহ দিয়েছ আমার শরীরে শক্তি দিয়েছ। পড়া মুখস্থ করতে এবং অন্যকে দিয়ে মুখস্থ করাতে খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ভুলে যেতাম। তুমি আমাকে পাঠগৃহের সেই অন্ধকার থেকে জোর করে টেনে বার করতে, কখনও বা উদ্যানে কখনও বা গঙ্গার ধারে নিয়ে যেতে। এ-সব আমার খুবই ভালো লাগত। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আমি চেয়েছিলাম তিনখানি বেদ ও ব্রাহ্মণের সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে।"

"তোমার সে কাজ তো শেষ হয়েছে। বাবা বলেন, প্রবাহণ এখন আমার সমতুল্য।"

"তা আমিও বুঝতে পারছি। ব্রাহ্মণ্য-বিদ্যা আয়ত্ত করতে আর সামান্যই বাকি কিন্তু বিদ্যা শুধু ব্রাহ্মণ্যত্তেই শেষ হয় না।"

"এই কথা আমিই তোমায় বলতে চাইছিলাম। আচ্ছা, এখনও কি তুমি পলাশ-দণ্ড আর রুক্ষ কেশ নিয়ে চলবে ?"

"কিচ্ছু ভাবতে হবে না লোপা ! পলাশ-দণ্ড এখন ছাড়লেই হল। আর আমার এই ষোল বছরের রুক্ষ চুলগুলিতে অনায়াসে তুমি সুগন্ধি তেল দিতে পার।"

"প্রবাহণ, রুক্ষ চুলের ওপর এত বেশী জোর দেওয়া হয় কেন ? যদি সংযমের কথা বল —তুমি তো আমার ঠোঁটে চুমু খেতে কখনও ছাড়নি।"

"তার কারণ ছোটবেলার অভ্যাস।"

"তা'হলে আচার্যকুলের অন্যান্য ছাত্ররা এ ব্রত কি কঠোরভাবে পালন করে ?"

"হ্যাঁ লোপা, তা না করে কোনো উপায় নেই বলে করে। এ-সব হল সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্ম। সাধারণ মানুষ একে ব্রাহ্মণ কুমারদের কঠিন তপস্যা বলে মনে করে।"

"তাই যদি হয় তবে কুরুরাজ আমার বাবাকে জনপদ, হীরে, সোনা, দাস-দাসী, ঘোড়া, রথ উপঢৌকন দিয়ে চলেছেন কেন? আমাদের অনেক দাসী আছে, আবার কিছুদিন আগে কুরুরাজ আরও তিন জন দাসী পাঠিয়েছেন তাদের তো কোনো কাজই নেই।"

"ওদের বেচে দাও লোপা। ওরা তরুণী। এক-এক জনের জন্ম তিরিশ নিষ্ক (স্বর্ণমুদ্রা) পেয়ে যাবে।"

"আমার আপশোস হয়; আমরা ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত এবং জ্ঞানী, যেহেতু আমাদের জ্ঞানার্জনের সুযোগ আছে। কিন্তু যখন আমি এ-সব ক্রীতদাসদের দেখি তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ ও অন্যান্য দেবতাদের ওপর ক্রুদ্ধ হই। আজ দেবকুল, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, ভৃগু, অঙ্গিরা ও ঋষিদের এবং বাবার মতো আজকের সমস্ত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ মহাশালদের (ধনিক) বিরুদ্ধে আমার ঘৃণা জেগে ওঠে। সর্বত্রই ব্যবসা, দর কষাকষি, লাভ, লোভ। সে দিন কালিদাসীর স্বামীকে বাবা কোশলদেশীয় এক বণিকের হাতে পঞ্চাশ নিষ্কে বেচে দিলেন। কালী আমার কাছে কান্নাকাটি করায় আমি তার হয়ে বাবাকে অনেক বললাম। তিনি বললেন, 'সমস্ত দাসদের ঘরে রেখে দিলে স্থান সঙ্কুলান হবে না। আর যদি বিনা কাজে রাখা হয় তা'হলে ঐ টাকাগুলোও লোকসান।' বিদায়ের পূর্ব রাত্রে তারা স্বামী-স্ত্রী কি কান্নাটাই না কাঁদল। তাদের দু'বছরের সেই মেয়েটি—সকলে যাকে দেখলে বলে বাবার চেহারার সঙ্গে মিল আছে সেই বাচ্চাটাও কি কান্নাটা কাঁদল! কিন্তু কালীর স্বামীকে বেচে দেওয়া হল। যেন সে মানুষ নয়, পশু। ব্রহ্মা যেন তাকে আর তার শত শত প্রজাকে এই জন্মই সৃষ্টি করেছেন। এ আমি মানতে রাজী নই প্রবাহণ! আমি তোমার মতো বেদ মুখস্থ করিনি কিন্তু তা শুনে এই বুঝেছি যে, চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, এই রকম বস্তু বা শক্তির প্রলোভন বা ভয় দেখানো হয়েছে।"

প্রবাহণ লোপার আরক্ত গালটি নিজের চোখের সঙ্গে চেপে বলল, "আমাদের প্রেম, মতভেদ রাখার জন্মই হয়েছে।"

"মতভেদ আমাদের প্রেমকে আরও গাঢ় করেছে।"

"ঠিক বলেছ লোপা! অন্যে যদি এ কথাই বলত তা'হলে আমি রাগ করতাম, কিন্তু সেই কথাগুলিই যখন দেখি যে তোমার মুখ দিয়ে আমার সমস্ত দেবতা, ঋষি এবং আচার্যদের ওপর তীক্ষ্ণ বাণের মতো নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তখন তোমার ও অধরে চুম্বন করতে বার বার ইচ্ছা হয় কেন?"

"তার কারণ হল, আমাদের নিজেদের মধ্যেই দুটো মতের দ্বন্দ্ব চলছে। আমরা এ দ্বন্দ্বের প্রতি সহিষ্ণু, কেননা আমরা একে অপরকে আমাদের অভিন্ন সত্তা বলে মনে করি।"

২

"তুমি তো কখনও শিবির দোশালা, কাশীর চন্দন, সামুদ্রিক মুক্তা দিয়ে নিজেকে বিভূষিতা করনি। এ-সবে তোমার এত উদাসীনতা কেন প্রিয়ে?"

"ওগুলোতে কি আমায় সুন্দর দেখাবে?…"

"আমার কাছে তুমি সর্বদাই সুন্দর।"

"তা'হলে এই বোঝা চাপিয়ে শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? সত্যি বলছি, তুমি যখন একটা ভারী বোঝাকে মুকুট বলে মাথায় পর তখন আমার খুবই খারাপ লাগে।"

"অথচ অন্য মেয়েরা কাপড় গয়নার জন্যে কতই না ঝগড়া করে।"

"আমি সে রকম মেয়ে নই।"

"তুমি হচ্ছ সেই রকম মেয়ে যে পঞ্চাল রাজার হৃদিরাজ্য শাসন করে!"

"আমি প্রবাহণের স্ত্রী, পঞ্চালদের রাণী নই।"

"বেশ তাই প্রিয়তমে! কিন্তু এমন দিনের কথা আমরা কল্পনাও করিনি। আমি যে পঞ্চাল রাজপুত্র—এ কথা মামা গোপন রেখেছিলেন।"

"সে সময় বাবা আর কি করতে পারতেন? পঞ্চাল রাজার শতেক রাণীর মধ্যে পিসীমা অন্যতমা। আর তোমার চেয়ে বয়সে বড় ছিল পঞ্চাল রাজের দশটি ছেলে। তাই কে ভেবেছিল তুমি একদিন পঞ্চাল রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে।"

"আচ্ছা লোপা, এই রাজভবন তোমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না কেন?"

"যেহেতু, গার্গ্য ব্রাহ্মণের প্রাসাদে—যেখানে পড়ানো হত বেদ আর ব্রাহ্মণ্য—আমার ক্লান্তি ও বিরক্তি এসেছিল সেখানেই। আমাদের জন্যে ঐ প্রাসাদ ছিল বটে, কিন্তু ক্রীতদাসদাসীদের জন্যে? আর আমাদের সেই বিদ্যাপীঠের প্রাসাদের তুলনায় এই রাজপ্রাসাদ হাজার গুণে বড়। এই প্রাসাদে একমাত্র তুমি আর আমি ছাড়া বাকি সবাই দাসদাসী। দু'জন অদাসের জন্যে দাসদাসীতে ভরা এই ভবন অ-দাস ভবন হয়ে যায় না। কিন্তু প্রবাহণ আমার খুব আশ্চর্য লাগে তোমার কঠোর হৃদয় দেখে।"

"তাই তো কঠোর বাক্য-বাণ সহ্য করতে পারছি।"

"না, মানুষের এ রকম হওয়া উচিত নয়।"

"আমি শুধু মানুষ হতে চাইনি, চেয়েছিলাম যোগ্য মানুষ হতে! যদিও যোগ্যতা অর্জনের সময় এ কথা এক মুহূর্তের জন্যেও মনে হয়নি যে, আমাকে একদিন এই রাজভবনে আসতে হবে।"

"তোমার অনুশোচনা হচ্ছে না, আমার সঙ্গে প্রেম করার জন্যে?"

"শিশু জন্মমাত্র বিনা আয়াসে মাতৃস্তন পায়—আমিও বিনা প্রয়াসে তোমার প্রেম লাভ করেছি। তোমার ভালোবাসা আমার প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবন, শরীরের অঙ্গ।

আমি সংসারী পুরুষ, তবু আমি তোমার প্রেমের কদর বুঝি। মনের গতি সব সময় এক রকম থাকে না। যখন কোনো অবসাদ আসে, জীবনটা দুর্বিবহ হয়ে দাঁড়ায় তখন তোমার প্রেম ও সুবিচার আমাকে মস্ত সম্বল যোগায়।"

"কিন্তু আমি তোমার যতটা অবলম্বন হতে চাই—তা যে হতে পারছি না। আর এর জন্যে আমি বেদনা বোধ করি, প্রবাহণ!"

"তার কারণ, রাজ্যশাসন করার জন্যেই আমার জন্ম হয়েছিল।"

"কিন্তু একদিন তো তুমি মহাব্রাহ্মণ হতে চেয়েছিলে!"

"তখন আমার জানা ছিল না যে, পঞ্চালপুর রাজভবনের উত্তরাধিকারী আমি।"

"কিন্তু রাজকার্যের বাইরেও যে তুমি হাত দিচ্ছ, এতে তোমার দরকার কি?"

"অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে ব্রহ্মের কল্পনা! লোপা, এটা কিন্তু রাজকার্যের বাইরে নয়। রাজ্যকে অবলম্বন দেওয়ার জন্যেই আমাদের পূর্ব পুরুষরা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে এতটা সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত করেছিল। এই সমস্ত ঋষিরা—ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের নামে জনগণকে রাজাজ্ঞা পালন করতে শেখাত। তখনকার দিনে রাজারা সাধারণের বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে বড় বড় ব্যয়সাধ্য যজ্ঞ করত। আজকাল আমরাও করে থাকি এবং ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিই। এই যজ্ঞ ও পুরোহিতদের মূল্যবান জিনিস দক্ষিণা দেওয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের মনে দেবতাদের অলৌকিক শক্তির ওপর বিশ্বাস সৃষ্টি করাতে চায়, মানুষের মনে এই ধারণা জন্মাতে চায় যে, সুগন্ধিত তণ্ডুল, গোবৎসের নরম মাংসের সূপ, সূক্ষ্ম বস্ত্র, মুক্তার ভূষণ যা কিছু আমরা ব্যবহার করি এ সমস্তই ঈশ্বরের অনুগ্রহ।"

"পুরনো দেবতারাই তো যথেষ্ট, তবে এই নতুন ব্রহ্মের আমদানির প্রয়োজন কি?"

"পুরুষানুক্রমে বহু যুগ ধরে কেউ ইন্দ্র, ব্রহ্মাকে প্রত্যক্ষ দেখেনি। তাই এখন অনেক লোকের মনেই সন্দেহ হতে আরম্ভ করেছে।"

"তা'হলে ব্রহ্ম সম্পর্কে সন্দেহ হবে না কেন?"

"সেই জন্যেই ব্রহ্মের রূপ বর্ণনা আমি এমনভাবে করেছি যে, তাকে প্রত্যক্ষ দেখার কথাই উঠবে না। দেবতারা ছিল সাকার—আমার কল্পিত ব্রহ্ম নিরাকার। নিরাকার তাই যত্রতত্র সর্বত্রই বিরাজমান—তাই তা দেখবার প্রশ্ন ওঠে কি? প্রশ্ন ওঠে শুধু সাকার দেবতাদের সম্পর্কে।"

"তুমি যে নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলছ তাতে উদ্দালক আরুণির মতো ব্রাহ্মণদেরও মতিভ্রম ঘটায়। তোমার মতলবটা কি, তুমি কি প্রজাদের ভ্রমাচ্ছন্ন রাখতে চাও?"

"লোপা! তুমি তো আমায় জান, তোমার কাছে কি-ই বা লুকোতে পারি? এই যে রাজশক্তি একে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখার জন্য এর প্রয়োজন আছে। যারা সন্দেহ করবে তাদের বিদ্যাবুদ্ধিকেই এ দিয়ে খাটো করা যাবে—তাদের নিজেদের জ্ঞান সম্পর্কে

নিজেদেরই সন্দেহ জাগবে। কারণ, যারা দেবতার যজ্ঞ বা পূজায় প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে তারা আমাদের ঘোরতর শত্রু।"

"কিন্তু তুমিও তো বলছ, ব্রহ্ম সত্তাহীন নয় —ব্রহ্মের সত্তা ও দর্শনের কথাও বলছ।"

"সত্তা আছে, কাজেই অনুভব-গ্রাহ্য হওয়া চাই। কিন্তু তা ইন্দ্রিয় দ্বারা নয়, কারণ তা'হলেই সন্দেহবাদীরা ইন্দ্রিয় দ্বারা (চাক্ষুষ) দেখতে চাইবে। তাই আমি বলেছি, ব্রহ্মের দর্শন পেতে হলে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারাই সেটা সম্ভব, আর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় লাভ করতে হলে চাই সাধনা। আর সাধনার যে ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে তাতে মানুষ ছাপান্ন পুরুষ ধরেও বিশ্বাস অটুট রাখতে পারবে —ভ্রমাচ্ছন্ন থাকবে। আমি পুরোহিতদের স্থূল হাতিয়ারকে নিষ্ফলা ভেবেই এ হাতিয়ার আবিষ্কার করেছি। লোপা, তুমি কি কখনও শবরদের পাথর ও তামার হাতিয়ার দেখেছ ?"

"হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের জঙ্গলে গিয়ে দেখেছি।"

"যমুনার ওপারে আমরা গিয়েছিলাম বটে। আচ্ছা শবরদের পাথর ও তামার হাতিয়ার আমাদের কালো লোহার সামনে টিঁকতে পারে ?"

"না, পারে না।"

"পারে না তো! তাই বলছিলাম, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের পুরনো দেবতারা বা ব্রাহ্মণদের যাগ-যজ্ঞ আগেকার বুদ্ধিমানদের যাও বা সন্তুষ্ট করতে পারত এখন তা সন্দেহবাদী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোকদের কাছে ব্যর্থ।"

"তাদের কাছে তোমার সৃষ্ট এই ব্রহ্ম —তাও কিছু না। তুমি ব্রাহ্মণ জ্ঞানীদের ধরে ধরে শিষ্য বানাচ্ছ, তাদের ব্রহ্মজ্ঞান শেখাচ্ছ, অথচ তোমারই ঘরে বসে তোমার কথাকে সরাসরি মিথ্যা বলে মনে করি।"

"কারণ, তুমি আসল ব্যাপারটা আমার আসল রহস্য (উপনিষদ্) জান।"

"ব্রাহ্মণ যদি জ্ঞানীই হবে, তবে কেন তোমার রহস্য তারা জানবে না ?"

"সেটা তো তুমিও দেখতে পাচ্ছ। কোনো ব্রাহ্মণ হয়ত উপনিষদ্ পরীক্ষা করে দেখতে পারে, কিন্তু তারাও আমার উপনিষদ্‌কে আত্মস্বার্থে উপযুক্ত হাতিয়ার বলে মনে করবে। ওদের পৌরোহিত্য ও গুরুগিরির ওপর মানুষের অবিশ্বাস এসে গেছে যার পরিণাম সব রকম দক্ষিণা হতে বঞ্চিত হওয়া। ফলে চড়ার জন্য অশ্বরথ, খাবার জন্য উত্তম খাদ্য, থাকার জন্য প্রাসাদ এবং ভোগের জন্য সুন্দরী দাসী থেকে বঞ্চিত হওয়া।"

"এ তো ব্যবসা।"

"ব্যবসা তো নিশ্চয়ই। আর এতে লোকসানের ভয় নেই। এই জন্যই জ্ঞানী ব্রাহ্মণ সমিধ (যজ্ঞকাষ্ঠ) হাতে আমার কাছে শিষ্য হতে আসে। আর আমিও ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করি।"

"এ অত্যন্ত নিকৃষ্ট চিন্তা, প্রবাহণ !"

"তোমার কথা স্বীকার করি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সব থেকে উপযোগী পন্থা। বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের নৌকা হাজার বছরও কাজ দেয়নি কিন্তু প্রবাহণের নির্মিত নৌকায় দু'হাজার বছর পরও পরধনভোগী রাজা ও সামন্তরা পার হতে পারবে। যজ্ঞরূপী নৌকাকে আমি অদৃঢ় বলে মনে করি, লোপা ! তাই আমি এ দৃঢ় নৌকা নির্মাণ করেছি। এর সাহায্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ মিলিতভাবে ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারবে। কিন্তু, ব্রহ্মের থেকেও বড় হবে আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার, লোপা !"

"কোন আবিষ্কার ?"

"মরে গিয়ে আবার এ পৃথিবীতে ফিরে আসা —পুনর্জন্ম !"

"এ তো সবচেয়ে বড় জালিয়াতি !"

"কিন্তু খুব কার্যকরী পন্থা। একদিকে সামন্ত, ব্রাহ্মণ এবং ব্যবসায়ীদের হাতে অপার ভোগ-রাশি সঞ্চিত হবে, অন্যদিকে সাধারণ প্রজা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আবার এ সব নির্ধনদের, যেমন শিল্পী, কৃষক এবং দাসদাসীদের বিক্ষুব্ধ করার জন্যে কিছু লোক প্রচার স্থুরু করেছে, 'তুমি তোমার শ্রমশক্তি অন্যকে দিয়ে কষ্ট করছ। ওরা তোমাকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, তুমি কষ্ট ও ত্যাগ করলে মরে স্বর্গে যাবে। কিন্তু কেউ স্বর্গে মৃত জীবকে স্থখভোগ করতে দেখেনি।' এরই জবাব হল, এ সংসারে উঁচু-নীচু ভাব, ছোট-বড় জাতি, ধনী নির্ধনের যে প্রভেদ, তা'হল পূর্বজন্মকৃত ফল। আমি এভাবে পূর্বেকার স্থকর্ম-দুষ্কর্মের ফল প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিয়েছি।"

"এভাবে চোরও তার চুরি করা জিনিসকে পূর্বজন্মের রোজগার বলতে পারে।"

"কিন্তু তার জন্য আমরা প্রথম থেকেই দেবতা, ঋষি এবং জনসাধারণের বিশ্বাসের সহায়তা গ্রহণে কৃতকার্য হয়েছি। সে জন্যেই অপহৃত জিনিসকে পূর্বজন্মের রোজগার বলে স্বীকার করা হবে না। বিনা পরিশ্রমলব্ধ ধনকে আমরা প্রথমে দেবতার কৃপায় পাওয়া বস্তু বলে চালাতাম। কিন্তু যখন দেখলাম, দেব-কৃপার ওপর সন্দেহ স্থুরু হয়েছে, তখন আমাদের একটা নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করা প্রয়োজন হল। ব্রাহ্মণদের চিন্তাশক্তিও লোপ পেয়েছে। প্রাচীন ঋষিদের মন্ত্র মুখস্থ করতেই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর কাটিয়ে দেয়, ফলে অন্য কোনো গভীর বিষয় কখন আর চিন্তা করবে !"

"প্রবাহণ ! তুমিও কি মুখস্থ করতে দীর্ঘ সময় এভাবে কাটিয়ে দাওনি ?"

"মাত্র ষোল বছর। চব্বিশ বছর বয়সে আমি ব্রাহ্মণদের বিদ্যা শেষ করে বাইরের সংসারে প্রবেশ করেছিলাম। এখানে আমি পড়াশুনোর প্রচুর স্থযোগ পেয়েছি। রাজ্য শাসনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি জানার পর আমি দেখলাম, ব্রাহ্মণদের নির্মিত পুরনো নৌকা বর্তমানের জন্য অদৃঢ়।"

"তাই তুমি দৃঢ় নৌকা নির্মাণ করেছ?"

"সত্যি কি মিথ্যা সেটা আমার প্রশ্ন নয়; আমার প্রশ্ন হল, কার্যোপযোগিতা নিয়ে। সংসারে ফিরে আসা পুনর্জন্মের কথা আজ নতুন মনে হচ্ছে ঠিকই, আর তুমি এর অন্তর্গূঢ় স্বার্থও জান। কিন্তু, আমার ব্রাহ্মণ চেলারা তো এই নিয়ে এখন থেকেই মাতামাতি সুরু করেছে। পিতরদের এবং দেবতাদের (পিতৃ-যান, দেব-যান) পথ বুঝবার জন্য এখনি মানুষ বার বছর পর্যন্ত গরু চরাতে প্রস্তুত। তুমি আমি থাকব না, কিন্তু এমন সময় আসবে যখন সমস্ত দরিদ্র প্রজা এই পুনর্জন্মের আশায় সারা জীবনের তিক্ততা, কষ্ট এবং অন্যায়কে হাসিমুখে মেনে নেবে। স্বর্গ ও নরক বুঝবার এ কেমন সোজা উপায় আবিষ্কার করেছি, বল তো লোপা?"

"কিন্তু, নিজের স্বার্থের জন্য মানুষকে চির-সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছ।"

"বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রও পেটের দায়ে বেদ রচনা করেছিল, উত্তর পঞ্চালের রাজা দিবোদাসের শবর-দুর্গ অধিকারের পর কবিতা রচিত হয়েছিল। পেটের সংস্থান করা অন্যায় নয়। আমরা যখন হাজার হাজার বছরের জন্য আপন পুত্রপৌত্রাদি, ভাই-বন্ধুদের পেটের সংস্থান করি তখন শাশ্বত যশের ভাগী হই।* প্রবাহণ এমন কাজই করছে, যা পূর্বগামী ঋষিগণও করতে পারেননি—ধর্মের অন্ন ভক্ষণকারী ব্রাহ্মণরাও পারেনি!"

"তুমি অতি নিষ্ঠুর প্রবাহণ!"

"কিন্তু আমি আমার কাজ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছি।"

৩

প্রবাহণের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তার ব্রহ্মবাদ ও পুনর্জন্ম অথবা পিতৃযানবাদ বিজয়দুন্দুভি সিন্ধু থেকে আরম্ভ করে সদানীরা (গণ্ডক) পর্যন্ত জয়ধ্বনি তুলেছিল। যজ্ঞের প্রভাব তখনও কমেনি, কারণ ব্রহ্মজ্ঞানীরা তখনও পর্যন্ত এগুলো করতে বিশেষ উৎসাহ পেত। ক্ষত্রিয় প্রবাহণের আবিষ্কৃত ব্রহ্মবাদে ব্রাহ্মণরা পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিল এবং এই বিদ্যায় কুরু কুলের যাজ্ঞবল্ক্যের খ্যাতি যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়েছিল।

এক সময়ে মন্ত্রের কর্তা এবং যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং ভরদ্বাজের জন্ম যে দেশ দিয়েছিল—সেই কুরু পঞ্চালেই যাজ্ঞবল্ক্য এবং তার সঙ্গী ব্রহ্মবাদী-ব্রহ্মবাদিনীদের জয়-জয়কার হল। ব্রহ্মবাদীদের পরিষদ ক্রমে যজ্ঞের চেয়ে বেশী খ্যাতিসম্পন্ন হয়েছিল। রাজারা রাজসূয় ইত্যাদি যজ্ঞের সঙ্গে একটি করে ব্রহ্মবাদীদের পরিষদ রচনা করত, কখনো বা পরিষদ আলাদা করেও ডাকা হত। তাতে হাজার হাজার গরু ঘোড়া এবং দাসদাসী

* ত্বং তত্নুকথমিন্দ্র বর্হণাকঃ প্রযচ্ছতা সহসা শূর-দর্ষি।
অব গিরের্দাসং শংবরং হন্ প্রাবো দিবোদাসং চিত্রাভিরূতী॥ (ঋগ্বেদ ৬।২৬।২৫)

(বিশেষ করে দাসী, কেননা রাজাদের অন্তঃপুরে প্রতিপালিতাদাসীদের ব্রহ্মবাদীরা বেশী পছন্দ করত) পরিষদের এক এক যুদ্ধ বিজেতাদের পুরস্কার দেওয়া হত।

যাজ্ঞবল্ক্য অনেকগুলি পরিষদে বিজয়ী হয়েছিল। এবার সে বিদেহ (তির্হুত)-এর জনক পরিষদে খুব বড় রকমের একটা জয়লাভ করল, এবং তার শিষ্য সোমশ্রবা হাজার গরু তাকে দান করল। যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহ থেকে আরম্ভ করে কুরু পর্যন্ত সেই গরুগুলিকে হাঁকিয়ে আনার কষ্ট স্বীকার করবে কেন? সেগুলিকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভাগ করে দিল। এ জন্য ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যের প্রচুর খ্যাতি হল। হ্যাঁ, হীরে-মুক্তা-সোনা, দাসদাসী এবং অশ্বরথ—এ সমস্ত অবশ্যই সে নিজের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

ষাট বছর হল প্রবাহণের মৃত্যু হয়েছে তখন যাজ্ঞবল্ক্য জন্মায়নি। কিন্তু একশ' বছর বয়স অতিক্রম করেও লোপা এখনও কর্মক্ষম আছে, পঞ্চালপুরের বাইরে রাজ-উদ্যানে লালিতা আম-কলা-জাম গাছগুলির ছায়ায় থাকতে সে পছন্দ করত। আজীবন সে প্রবাহণের চিন্তাধারার বার বার বিরোধিতা করেছে, কিন্তু এই সুদীর্ঘ ষাট বছরে সে প্রবাহণের দোষগুলো ভুলে গেছে। আজ তার স্মৃতিপটে জেগে রয়েছে—সারা জীবনের প্রেম। বৃদ্ধার চোখের জ্যোতি ম্লান হয়নি। ব্রহ্মবাদীদের ওপর আজও সে খাপ্পা। একদিন পঞ্চালপুরে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী এসে উঠল। রাজোদ্যানের পাশেই গার্গীকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হল। জনকের পরিষদে যাজ্ঞবল্ক্য যেভাবে ধোঁকা দিয়ে তাকে পরাস্ত করেছিল, গার্গী তা ভুলতে পারেনি। 'যদি আর কোনো প্রশ্ন কর তবে তোমার মাথা থাকবে না, গার্গী!'—গার্গী ভেবেছিল ওটা কথার কথা! ও কাজ শুধু উগ্রলোহিত-পাণিরাই (অপরের রক্তে যে হাত রাঙায়) করতে পারে।

গার্গী লোপার পিতৃকুলের মেয়ে। লোপা তার বিশেষ পরিচিতা। যদিও ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে তার মত উল্‌টো। এ-বার যাজ্ঞবল্ক্য তার বিরুদ্ধে যে রকম নীচ অস্ত্র প্রয়োগ করেছে তাতে গার্গী একেবারে রেগে আগুন। তাই যখন তার প্রপিতামহের পিসীমার কাছে এল, তখন তার মনোভাবের নিশ্চয়ই কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। লোপা কাছে এসে গার্গীর কপালে ও চোখে চুমু খেয়ে আলিঙ্গন করে জিজ্ঞেস করল, "শরীর কি রকম আছে?"

গার্গী বলল, "আমি বিদেহ থেকে এসেছি, পিসী!"

"মল্লযুদ্ধ করতে গিয়েছিলি কি মা?"

"হ্যাঁ, মল্লযুদ্ধই হয়েছে পিসীমা। ব্রহ্মবাদীদের পরিষদ মল্লযুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। মল্লযুদ্ধের মতোই ওখানে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছলে-বলে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা হয়।"

"তা'হলে তো কুরু-পঞ্চালের অনেকেই ব্রহ্মবাদী আখড়ায় নেমে থাকবে।"

"কুরু-পঞ্চাল তো এখন ব্রহ্মবাদীদের দুর্গ!"

"আমার সামনেই ব্রহ্মবাদীদের একটি ছোট স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করেছিল প্রবাহণ, আর তাও সৎ উদ্দেশ্যে নয়। আজ তা দাবানল হয়ে সমস্ত কুরু-পঞ্চালদের জ্বালিয়ে এখন বিদেহ পর্যন্ত পৌঁচেছে।"

"পিসীমা আমি তোমার কথার সত্যতা এখন কিছুটা বুঝতে পারছি। বস্তুত, এটা ভোগ অর্জনের একটা প্রশস্ত পথ। বিদেহে যাজ্ঞবল্ক্য লক্ষ-লক্ষ টাকার সম্পত্তি পেয়েছে, অন্য সব ব্রাহ্মণেরাও প্রচুর ধন-রত্ন নিয়ে এসেছে।"

"এ যে যজ্ঞের থেকেও বেশী লাভের ব্যবসা, মা! আমার স্বামী একেই রাজা ও ব্রাহ্মণদের মজবুত নৌকা বলত। তা'হলে যাজ্ঞবল্ক্য জনকের পরিষদে বিজয়ী হল, আর তুমি কিছুই বলতে পারলে না?"

"যদি বলারই কিছু না থাকত তবে গঙ্গায় এত দূর নৌকা পাড়ি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল?"

"নৌকাতে এলে! রাস্তায় চোর-ডাকাত ধরেনি?"

"না পিসীমা! নৌকার সারিতে যোদ্ধারা সঙ্গে থাকে। আমরা ব্রহ্মবাদীরা কখনো এত মূর্খ নই যে, একলা-দোকলা নিজেদের প্রাণ সঙ্কটময় করে পথ চলব।"

"যাজ্ঞবল্ক্য তা'হলে সকলকেই পরাস্ত করেছিল?"

"একে পরাস্ত করা বলে না।"

"কেন?"

"কেন না, প্রশ্নকর্তারা যাজ্ঞবল্ক্যের জবাব শুনে চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়েছে।"

"তুমিও?"

"হ্যাঁ, আমিও। কিন্তু তার কথার ধমকে আমাকে চুপ করতে হয়েছে।"

"কথার ধমকটা আবার কি?"

"ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করে যাজ্ঞবল্ক্যকে এমনভাবে নাস্তানাবুদ করেছিলাম যে তার বেরোবার পথ ছিল না। তখন সে আমাকে এমন কথা বলল, যা আমি কখনও তার কাছে শুনব বলে আশা করিনি!"

"কি কথা গো মেয়ে?"

"সোজাসুজি আমায় ধমক দিয়ে বলল, গার্গী আবার যদি কোনো প্রশ্ন কর, তা'হলে আর তোমার মাথা থাকবে না।"

"তুমি ও রকম হবে সে আশা করনি কিন্তু আমি সব কিছুই আশঙ্কা করেছিলাম, গার্গী! যাজ্ঞবল্ক্য প্রবাহণের উপযুক্ত প্রশিষ্য। প্রবাহণের মিথ্যাবাদকে সে ষোলকলায় পূর্ণ করেছে। তুমি যে আর কোনো প্রশ্ন করনি, সেটা ভালোই করেছ।"

"তুমি কি করে জানলে পিসীমা?"

"নিজের চোখে তোমার কাঁধের ওপর মাথাটা দেখতে পাচ্ছি।"

"তা'হলে পিসীমা, তুমি কি বিশ্বাস করছ যে, আমি যদি আর কোনো প্রশ্ন করতাম, তবে আমার মাথা পড়ে যেত ?"

"নিশ্চয়ই। তবে, যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্ম-বলে নয়, অন্য লোকের মাথা যেভাবে পড়তে দেখা যায়, সেইভাবে।"

"না পিসীমা, তা কি কখনও হতে পারে ?"

"হতে পারে না ? তুই এখনও শিশু আছিস, গার্গী। তুই ভাবিস এ ব্রহ্মবাদ আর কিছুই নয় খালি মনের পাখা মেলে কল্পনা, মনের বিলাস। না, গার্গী —তা নয়। এর পেছনে রাজা-রাজড়াদের, ব্রাহ্মণ ও পরশ্রম-ভোগীদের মস্ত বড় স্বার্থ লুকানো আছে। যে লগ্নে এই ব্রহ্মবাদ জন্মলাভ করেছিল সেই সময় এর জন্মদাতা আমার পাশেই শয়ন করত। যোদ্ধার-হাতে লোহার কৃপাণ যেমন শক্তি যোগায় তেমনি এই ব্রহ্মবাদ রাজসত্তা ও ব্রাহ্মণ্যসত্তাকে দৃঢ় করেছে।"

"পিসীমা, আমি কিন্তু এইভাবে বুঝিনি।"

"তুমি কেন, অনেকেই বোঝেনি। তবে বিদেহরাজ জনক এর রহস্য (উপনিষদ্) বোঝে। আর যাজ্ঞবল্ক্য এটা ভালোই বোঝে —যেমন আমার পতি প্রবাহণ বুঝত। প্রবাহণ কোনো দেবতা, দেবলোক, পিতৃলোক, যজ্ঞ বা ব্রহ্মবাদে নিজে বিশ্বাস করত না। তার অখণ্ড বিশ্বাস ছিল ভোগে, আত্মসুখে। সে নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ভোগেই অর্পণ করেছিল। মরবার তিন দিন আগেও বিশ্বামিত্র কুলের পুরোহিতের স্বর্ণকেশী কন্যা তার রতিগৃহে এসে রাত্রিবাস করেছিল। এদিকে বাঁচবার কোনো আশাই ছিল না, তবু সে বিশ বছরের তরুণী সুন্দরীর সঙ্গে রাত্রিবাস করত।"

"পরিষদে জয়লাভ করে যাজ্ঞবল্ক্য যে সমস্ত গাভী পেয়েছিল তা দান করে দেয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিন্তু বিদেহ রাজার কাছ থেকে পাওয়া সুন্দরী দাসীদের অন্তঃপুরে নিয়ে এসেছে, পিসীমা।"

"আমি তো সেই কথাই বলছিলাম, যাজ্ঞবল্ক্য প্রবাহণের পাকা চেলা। ওর ব্রহ্মবাদ দেখলি তো ? আর তুই দেখছিস দূর থেকে। যদি কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেতিস বেটি, তা'হলে ওদের আসল চরিত্র বুঝতে কোনো মুস্কিল হত না।"

"তবে কি পিসীমা, তুমি সত্যি সত্যিই মনে কর যে, আমি যদি আর কোনো প্রশ্ন করতাম তা'হলে আমার মাথা পড়ে যেত ?"

"নিশ্চয়ই ! কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মতেজে নয়। দুনিয়াতে কত মাথাই না নিঃশব্দে দেহচ্যুত হয়েছে !"

"আমার মাথা ঘুরছে।"

"আজ ? আমার মাথা ঘুরছে তখন থেকে যখন আমার জ্ঞান হয়েছে। সমস্ত ছলনা, খালি কথার কারসাজি। প্রজাদের পরিশ্রমার্জিত ফল বিনা পরিশ্রমে ভোগের পথই হল রাজবাদ, ব্রহ্মবাদ ও যজ্ঞবাদের মূল কথা। এই জালিয়াতি থেকে প্রজাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা নিজেরা সচেতন না হচ্ছে। আর তাদের সচেতন হতে দেওয়া এ স্বার্থবাদীরা মোটেই পছন্দ করে না।"

"মানব হৃদয় কি আমাদের এ প্রবঞ্চনাকে ঘৃণা করতে প্রেরণা দেবে না ?"

"দেবে মা দেবে ! আর আমি একমাত্র সেই আশাতেই বেঁচে আছি।"*

বন্ধুল মল্ল

কাল : ৪৯০ খৃষ্টপূর্ব

পূর্ণ বসন্ত কাল। গাছগুলির পাতা ঝরে গিয়ে নবপল্লবিত হয়েছে। শাল বৃক্ষগুলি তার শ্বেতপুষ্পের সুগন্ধ ছড়িয়ে বনভূমি আমোদিত করছে। সূর্য-কিরণ প্রখর তেজে দীপ্ত হতে এখনও দেরী আছে। শালের গহন বনে শুক্‌নো পাতার ওপর মানুষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। দু'জন তরুণ-তরুণী পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল একটি বড় বল্মীক (উই ঢিপি)। তরুণীর গৌরকান্তি মুখের ওপর কুঞ্চিত পিঙ্গল কেশরাশি চারিদিকে বেপরোয়ার মতো ছড়িয়ে থাকায় সৌন্দর্য যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তরুণ তার বলিষ্ঠ হাতখানি তরুণীর কাঁধের ওপর রেখে বলল, "মল্লিকা ! এই বল্মীক দেখে এত তন্ময় হলে কেন ?"

"দেখ এটা কত উঁচু, প্রায় দুই মানুষ সমান হবে।"

"হ্যাঁ ঠিকই, এটা সাধারণ উই ঢিপির চেয়ে বড়, কিন্তু বল্মীকের উচ্চতা এর চেয়ে বেশী দেখা যায়। তোমার হয়ত মনে হতে পারে বর্ষা সুরু হলে এর থেকে কি সত্যিই আগুন ও ধোঁয়া বেরোয় ?"

"না, ওটা বোধহয় কিংবদন্তী মাত্র। কিন্তু এই পিঁপড়ের মতো ছোট এবং কোমল রক্তমুখী সাদা পোকাগুলি কেমন করে এত বড় বল্মীক তৈরী করল ?"

"মানুষের শরীরের উচ্চতার সঙ্গে যদি তার হাতে-গড়া বাসস্থান মাপা যায় তা'হলে তাও এই রকমই কয়েক গুণ বড় হবে। এ একটা উইপোকার কাজ নয়। শত সহস্র

* আজ থেকে ১০৮ পুরুষ আগের কাহিনী। তখন বৈদিক যুগ শেষ হতে চলেছে ব্রহ্ম-জ্ঞানের রচনা আরম্ভ হয়েছে। এই সময় লোহার ব্যবহার ও উদ্যান রচনা সুরু হয়।

উইপোকা মিলিতভাবে এই কাজ সম্পন্ন করেছে। মানুষও এইভাবেই মিলিত হয়ে নিজের কাজ করে।"

"তাই আমিও ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম যে, এদের নিজের মধ্যে কতই না মিল। এদের আমরা কত ক্ষুদ্র প্রাণী ভেবে থাকি, এরাও শত সহস্র এক সঙ্গে মিলে নিজেদের জন্যে প্রাসাদোপম বাসস্থান নির্মাণ করেছে। আমার দুঃখ হয়, আমাদের মল্লরা এই উইয়ের কাছ থেকে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেনি।"

"মানুষ মিলে-মিশে থাকতে কারুর চাইতে কম যায় না, বরং মানুষ যে আজ শ্রেষ্ঠ প্রাণী হতে পেরেছে তারও কারণ হচ্ছে একতা। আর এই জন্যেই মানুষ আজ এত বড় বড় নগর ও গ্রাম তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে; তাই তাদের জলযান দিগন্তহীন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দ্বীপ-দ্বীপান্তরের ধনরত্ন সংগ্রহ করেছে; আর এই জন্যেই হাতী-গণ্ডার-সিংহ মানুষের কাছে হার মানতে বাধ্য হচ্ছে।"

"কিন্তু মানুষের ঈর্ষা? এই ঈর্ষা যদি মানুষের না থাকত—কত ভালো হত।"

"তুমি মল্লদের ঈর্ষার কথা মনে করে বলছ?"

"হ্যাঁ, তারা যে তোমায় ঈর্ষা করে। আমি কখনো তোমাকে অন্যের নিন্দা বা অপকার করতে দেখিনি, তোমার মধুর ব্যবহারে দাস ও কর্মকাররা পর্যন্ত কত খুশী—তবু বহু সম্ভ্রান্ত মল্ল তোমার প্রতি প্রতিহিংসা পোষণ করে।"

"কারণ, তারা আমায় দেখছে সর্বজনপ্রিয় হতে। আর গণে (প্রজাতন্ত্রে) সর্বজনপ্রিয়কেই লোকে হিংসা করে, সর্বজনপ্রিয়রাই তো গণ-প্রধান বলে গণ্য হয়।"

"কিন্তু তোমার গুণাবলী দেখে তাদের প্রসন্ন হওয়া উচিত। মল্লদের মধ্যে কেউ তক্ষশিলায় এত সম্মান পেয়েছে বলে আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। তারা কি জানে না যে, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ পত্রের পর পত্র পাঠাচ্ছেন তোমাকে আহ্বান করে?"

"আমরা এক সঙ্গে দশ বছর তক্ষশিলায় পড়াশুনা করেছি, তিনি তাই আমাকে স্নেহ করেন এবং আমার গুণগ্রাহী।"

"কুসীনারার মল্লরা নিশ্চয়ই সেটা জানে। মহালিচ্ছবি যখন এখানে এসে তোমার সঙ্গে ছিল তখন কুসীনারার অনেক লোকই তোমার গুণকীর্তন শুনেছে তার কাছে।"

"কিন্তু মল্লিকা! আমার প্রতি তারাই ঈর্ষা করে, যারা আমার গুণের কথা জানে। গুণী এবং সর্বপ্রিয় হওয়াটাই হল প্রজাতন্ত্রের ঈর্ষার বড় কারণ। আমি নিজের জন্যে মোটেই ভাবি না, কিন্তু আমার দুঃখ এই জন্যে যে, এত কষ্ট করে মল্লদের সেবার জন্যে তক্ষশিলাতে শস্ত্র-বিদ্যা শিখেছিলাম, তা কোনো কাজে লাগাতে পারলাম না। আজ যেমন বৈশালীর লিচ্ছবীদের কোশল এবং মগধ নিজেদের সমতুল্য মনে করে, তখন কিন্তু কুসীনারা কোশলরাজকে নিজেদের চেয়ে বড় বলে স্বীকার করত না। আমি

ভেবেছিলাম যে, পাবা অনুপিয়া ও কুসীনারাদি ন'টি মল্লকে আমরা স্নেহবন্ধনে বেঁধে লিচ্ছবিদের মতো নিজেদের একটি সম্মিলিত সুদৃঢ় মল্ল প্রজাতন্ত্র গঠন করব। ন'টি মল্ল যদি পরস্পর মিলিত হত তা'হলে প্রসেনজিৎ আমাদের দিকে চোখ তুলে চাইতেও সাহস করত না। তা আর হল না, এটাই আমার দুঃখ।"

বন্ধুলের গৌরকান্তি ম্লান হওয়াতে মল্লিকার দুঃখ হল, সে তার মনকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবার জন্যে বলল, "প্রিয়তম, তোমার বন্ধুরা শিকারে যাবার জন্যে হয়ত তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে, আর আমিও যেতে চাই। ঘোড়ায় চড়ে যাবে—না পায়ে হেঁটে ?"

"গবয় (নীলগাই) শিকার ঘোড়ায় চড়ে হয় না মল্লিকা, আর হাঁটু পর্যন্ত অন্তর্বাস পরে তিন হাত লম্বা এলোমেলো উত্তরাসঙ্গ উড়িয়ে আর এই রকম উস্কোখুস্কো কাল-নাগিনীর মতো চুল দুলিয়ে কেউ শিকার করতে যায় ?"

"এ-সব বুঝি তোমার ভালো লাগে না ?"

"খারাপ !" বলার সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকার টুকটুকে ঠোঁটে চুম্বন করে বন্ধুল বলতে লাগল, "মল্লিকা নামের সঙ্গেও যার মিল আছে তাকেও আমার খারাপ লাগতে পারে না, কিন্তু শিকার করতে গেলে জঙ্গলে ঝোপের মধ্যে ছুটোছুটি করতে হয় যে।"

"আচ্ছা, তা'হলে তোমার সামনেই বেঁধে ফেলি।" এই বলে মল্লিকা অন্তর্বাস কষে পরল, আর চুলগুলি সামলে খোঁপা বেঁধে বলল, "আমার চাদর দিয়ে পাগড়ী বেঁধে দাও, বন্ধুল !"

পাগড়ী বেঁধে দিয়ে বন্ধুল তার কাঁচুলির ভেতর থেকে উন্নত ক্ষুদ্র-বিম্ব-স্পর্ধী স্তন অর্ধালিঙ্গন করে বলল, "আর এ স্তন ?"

"সব মল্লকুমারীদেরই স্তন হয়।"

"কিন্তু এ কত সুন্দর ?"

"তাতে কি ! কেউ কি এ জিনিস কেড়ে নেবে ?"

"তরুণদের দৃষ্টি পড়বে।"

"এ যে বন্ধুলের তা তারা জানে।"

"না, মল্লিকা ! তোমার আপত্তি না থাকলে আমি চাদর দিয়ে বেঁধে দি।"

"কাপড়ের বাইরে থেকে দেখে কি তোমার তৃপ্তি হচ্ছে না ?"—মল্লিকা মুচকি হেসে বন্ধুলের মুখে চুম্বন করে বলল। বন্ধুল তার কাঁচুলিটা সরিয়ে দিয়ে শুভ্র স্ফটিকশিলার মতো বুকের ওপর সেই আরক্ত সুডৌল স্তন চাদর দিয়ে বেঁধে দিল। মল্লিকা আবার কাঁচুলিটি পরে বলল, "এখন তো তোমার বিপদ কেটে গেছে বন্ধুল ?"

"বন্ধুলের নিজের জিনিসের জন্যে কোনো ভয় নেই প্রিয়ে ! তুমি এখন খুব দ্রুত ছুটলেও ও দুটো বেশী দুলবে না।"

সমস্ত মল্ল তরুণ-তরুণীরা শিকারী বেশে সজ্জিত হয়ে এই তরুণ-যুগলের প্রতীক্ষা করছিল। তারা আসতেই সবাই ধনুক, খড়্গ, ভল্ল বাগিয়ে রওনা হল। নীলগাই-এর মধ্যাহ্ন বিশ্রামের জায়গা তাদের মধ্যে কারো কারো জানা ছিল। তাদের প্রদর্শিত পথ ধরেই মল্লরা চলল। বড় বড় গাছের অল্প পত্রহীন ছায়ার নীচে নীলগাইয়ের একটি দল বসে রোমন্থন করছিল। যূথপতি একটি বড় নীলগাই, খাড়া কাঁন আগু পিছু করে পাহাড়া দিচ্ছিল। মল্লরা দু'দলে ভাগ হয়ে গেল—এক দল হাতিয়ার বাগিয়ে একটি গাছের আড়ালে গিয়ে বসল। অন্য দলটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে জায়গাটি ঘিরবার জন্যে এগোতে লাগল। যেদিক থেকে এই দু'দল মিলবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল সে ধার থেকেই বাতাস আসছিল। নীলগাইটি তখনও তার হরিণের মতো ছোট লেজটি নাড়ছিল, দল দুটি মিলবার আগেই অন্যান্য গাইগুলিও উঠে দাঁড়িয়ে নাক ফুলিয়ে কান সামনের দিক করে চঞ্চল হয়ে সেদিকে দেখতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে পারল যে, তারা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তাই বাতাসের গতির সঙ্গে তারাও ছুটতে লাগল। তখনও পর্যন্ত বিপদ স্বচক্ষে দেখেনি। তাই মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখছিল।

লুকিয়ে থাকা শিকারীদের কাছে এসে একবার তারা পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল, এমন সময় ধনুকের টঙ্কার শোনা গেল। যূথপতি নীলগাইটির ঠিক কলিজা লক্ষ্য করে বন্ধুল অব্যর্থ শরসন্ধান করল। সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকা এবং আরও অনেক বাণ ছুঁড়ল। কিন্তু বন্ধুলের বাণ ব্যর্থ হলে শিকার যে পালাত—সে কথা নিশ্চিত। নীলগাইটি সেখানেই পড়ে গেল। দলের অন্যান্য গরুগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক সেদিক ছুটল, বন্ধুল কাছে গিয়ে দেখল শিকার শেষ নিশ্বাস নিচ্ছে। রক্তের চিহ্ন অনুসরণ করে চলতে চলতে এক ক্রোশ দূরে আর একটি গবয়কে মাটিতে লুটানো অবস্থায় পাওয়া গেল। এই সাফল্যের জন্যে আজকের বনভোজনে আনন্দ-উচ্ছ্বাস বেশী।

কিছু লোক নির্ধূম আগুন প্রজ্বলিত করতে লেগে গেল, আর মল্ল স্ত্রীলোকেরা রান্নার জন্য হাঁড়িপাত্র প্রস্তুত করল। কিছু পুরুষ নীলগাই-এর চামড়া খুলে মাংসখণ্ড কাটতে লাগল। সর্ব প্রথম আগুনে পোড়ানো কলিজা ও সুরা-চষক (মদের পাত্র) সকলের সামনে পরিবেষণ করা হল। মাংস কাটতে বন্ধুলের দু'হাত আটকা ছিল, তাই মল্লিকা নিজের হাতে ওর মুখে মাংস ও মদের পেয়ালা তুলে দিল।

সন্ধ্যা হয়ে এল, তখনও মাংস রান্না শেষ হয়নি। অগ্নিকুণ্ডের পোড়া-কাঠ স্কন্ধাগ্নি (কাঠের গুঁড়ির আগুন) তখনও নিভে যায়নি, তার লাল আভা যথেষ্ট ছিল। সেই রক্তিম সন্ধ্যায় মল্লরা নাচতে ও গাইতে সুরু করল। মল্লিকা, কুসীনারার সুন্দরতমা তরুণী, শিকারীবেশে পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে স্বীয় নৃত্যকৌশল প্রদর্শন করল।

২

কুসীনারার সংস্থাগার (প্রজাতন্ত্রভবনের সভাগৃহ) আজ জনাকীর্ণ। গণসংস্থার (প্রতিনিধি পরিষদের) সকল সদস্য সদস্যশালার মধ্যে উপবিষ্ট। অনেক দর্শনেচ্ছু নর-নারী বাইরের মাঠে দাঁড়িয়েছিল। সদস্যশালার মাথার দিকের একটি উঁচু বেদীতে সভাপতি বসেছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ভন্তে গণ! (পূজ্যগণ) শোন, আজ যে কাজের জন্যে আমরা এই সভায় উপস্থিত হয়েছি, তা আমি সকলের কাছে বলছি। আয়ুষ্মান্ বন্ধুল তক্ষশিলা থেকে যুদ্ধবিদ্যা অর্জন করে মল্লদের গৌরব-বর্ধন করে ফিরে এসেছে। তার অস্ত্র-নৈপুণ্যের কথা কুসীনারার বাইরের লোকও জানে। চার বছর হল সে এখানে এসেছে। আমি গণসংস্থার ছোটখাটো কাজগুলি তাকে করতে দিয়েছি এবং সে প্রত্যেকটি কাজই খুব তৎপরতা ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। গণের এখন উচিত তাকে একটা স্থায়ীপদে নিযুক্ত করা—উপসেনাপতির পদের জন্য আমি তার নাম প্রস্তাব করছি। ভন্তে গণ! শোন, গণের পক্ষ থেকে আয়ুষ্মান্ বন্ধুলকে উপসেনাপতির পদে নিযুক্ত করার প্রস্তাব হচ্ছে। যে এ প্রস্তাবের পক্ষে সে নীরব থাক, আর যে বিরুদ্ধে—সে বলতে পার। ভন্তে গণ! আবার বলছি, আয়ুষ্মান্ বন্ধুলকে গণের পক্ষ থেকে উপসেনা-পতির পদ প্রদান করার প্রস্তাব করছি। যে এতে রাজী আছ সে নীরব থাক আর যার আপত্তি আছে সে বলতে পার। ভন্তে গণ! আমি তৃতীয়বার বলছি, আয়ুষ্মান্ বন্ধুলকে গণসংস্থা সহকারী সেনাপতি নিযুক্ত করার প্রস্তাব করছে। যে আয়ুষ্মান্ এতে রাজী আছ সে নীরব থাক আর যে রাজী নয় সে তার বক্তব্য বলতে পার।"

এমন সময় একজন সদস্য, রোজ মল্ল—চাদর সরিয়ে দিয়ে ডান কাঁধ খালি করে উঠে দাঁড়াল! সভাপতি জিজ্ঞাসা করল, "আয়ুষ্মান্ তুমি কিছু বলতে চাও? ঠিক আছে, তোমার বক্তব্য বল।"

রোজ মল্ল সকলকে সম্বোধন করে বলল, "ভন্তে গণ! আমি আয়ুষ্মান্ বন্ধুলের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ পোষণ করি না। তবে, আমি বিশেষ কোনো কারণে তাকে সহকারী সেনাপতি করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। আমাদের গণের নিয়ম আছে যদি কাউকে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয় তবে তার পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমি তাই মনে করি আয়ুষ্মান্ বন্ধুলের বেলায়ও সে নিয়ম প্রয়োগ করা হোক।"

রোজ মল্ল বলার পরে আরও দু'তিন জন সদস্যও একই কথা বলল। আবার কিছু সদস্য পরীক্ষা গ্রহণের যে কোনো প্রয়োজন নেই তার ওপর বিশেষ জোর দিল। অবশেষে গণপতি বলল, "ভন্তে গণ! শোন, আয়ুষ্মান্ বন্ধুলকে সহকারী সেনাপতি নিযুক্ত করতে গণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ দেখা দিয়েছে। তাই ছন্দ (ভোট) নেওয়া প্রয়োজন।

শলাকা-গ্রহাপক (শলাকা বিতরণকারী) ছন্দ-শলাকা (ভোট গুণবার কাঠি) নিয়ে তোমাদের কাছে যাচ্ছে। তার এক হাতের ডালিতে লাল কাঠি এবং অন্য হাতের ডালিতে কালো কাঠি। লাল কাঠি হল প্রস্তাবের পক্ষে আর কালো কাঠি হল প্রস্তাবের বিপক্ষে। সে আয়ুষ্মান্ রোজ মল্লের পক্ষে অর্থাৎ মূল জ্ঞপ্তির (প্রস্তাব) বিরোধী, সে কালো কাঠি, এবং মূল জ্ঞপ্তির যে পক্ষে —সে লাল কাঠি নেবে।"

শলাকা-গ্রহাপক ছন্দ-শলাকাগুলি নিয়ে একে একে প্রত্যেক সদস্যের কাছে গেল। সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে একটি করে শলাকা নিল; শলাকা-গ্রহাপক ফিরে এলে গণপতি বাকি শলাকাগুলি গণনা করল। দেখা গেল, লাল শলাকা বেশী আর কালো কম। তার অর্থ হল, সদস্যগণ কালো শলাকাই বেশী নিয়েছে।

গণপতি ঘোষণা করল, "ভন্তে গণ! শোন, কালো শলাকা অধিক সংখ্যক সদস্য নিয়েছে। তাই আমি ঘোষণা করছি যে গণ আয়ুষ্মান্ রোজ মল্লের সঙ্গে একমত। এখন তোমরা ঠিক কর আয়ুষ্মান্ বন্ধুলের কিভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে!"

ছন্দ-শলাকা ওঠবার পরে অনেকক্ষণ ধরে তর্ক-বিতর্ক চলল, শেষে ঠিক হল যে, বন্ধুল মল্লকে কাঠের সাতটা খোঁটা এক সঙ্গে তরবারী দিয়ে কাটতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে কুসীনারার স্ত্রী-পুরুষের সমাগমে মাঠ ভরে গেল। মল্লিকাও সেখানে উপস্থিত। সাতটি শক্ত কাঠের খোঁটা পাশাপাশি পুঁতে দেওয়া হল। গণপতি আদেশ করার পর বন্ধুল তরবারি বাগিয়ে নিল। সমস্ত জনমণ্ডলী রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখতে লাগল। বন্ধুল মল্লের সুদৃঢ় হাতে সেই ঋজু দীর্ঘ খড়্গ দেখে লোকে তার সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল। বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল বন্ধুলের তরবারী লোকে উঠতে নামতে দেখল —প্রথম খোঁটা কাটল, তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় এইভাবে ষষ্ঠ খোঁটা কাটবার সময় বন্ধুলের কানে একটা ধাতব শব্দ ভেসে এল। তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল এবং হতাশায় তার তরবারি থেমে রইল। বন্ধুল তাড়াতাড়ি একবার সবগুলি খোঁটার মাথা দেখে নিল। রাগে তার শরীর কাঁপছিল, মুখ লাল হয়ে গেল, কিন্তু সে একদম চুপ করে রইল।

গণপতি ঘোষণা করল যে, সপ্তম-খোঁটার মাথা খণ্ডিত হয়নি। কিন্তু তবু লোকের সহানুভূতি বন্ধুল মল্লের প্রতিই ছিল।

ঘরে ফিরে মল্লিকা বন্ধুলের রক্তিম এবং গম্ভীর চেহারা লক্ষ্য করে তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল। বন্ধুল বলল, "মল্লিকা! আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। এ রকম যে করা হবে তা আমি আশা করিনি।"

"কি হয়েছে প্রিয়?"

"প্রত্যেকটা খোঁটার মধ্যে লোহার শলাকা ছিল। পঞ্চম খোঁটাটা কাটা পর্যন্ত আমি জানতে পারিনি। ষষ্ঠ খোঁটা কাটার পর আমি ঝন্-করে-ওঠা পরিষ্কার একটা শব্দ

শুনতে পাই। আমি ধোঁকাবাজী বুঝতে পারলাম। যদি শব্দটা শুনতে না পেতাম তা'হলে সপ্তম খোঁটাও নিশ্চয় কাটতে পারতাম। কিন্তু শব্দ শোনার পর আমার মন বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ল।"

"এ রকম বিশ্বাসঘাতকতা যারা করেছে তারা খুবই নীচ!"

"কে এ রকম করেছে তা আমি জানতে পারিনি। রোজ মল্লের ওপর আমার কোনো রাগ নেই। কেন না সে উচিত কথাই বলেছিল, আর তার মতের সঙ্গে গণের বেশীরভাগ সদস্য একমত ছিল। কিন্তু আমার দুঃখ ও রাগ হচ্ছে এই জন্যে যে, কুসীনারায় আমাকে স্নেহ করার লোকের এত অভাব!"

"তা'হলে বন্ধুল তুমি কুসীনারার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছ?"

"কুসীনারা আমার মাতৃতুল্য, এ দেশ আমাকে লালন-পালন করে বড় করেছে। কিন্তু এখন আমি আর কুসীনারায় থাকব না।"

"কুসীনারা ছেড়ে চলে যেতে চাও?"

"হ্যাঁ! কারণ, কুসীনারায় এখন বন্ধুল মল্লের কোনো প্রয়োজন নেই।"

"তা'হলে কোথায় যাবে?"

"মল্লিকা, তুমি আমার সঙ্গী হবে?" —উদ্বিগ্ন মুখে বন্ধুল জিজ্ঞাসা করল।

"আমি তোমার ছায়ার মতো, বন্ধুল!" মল্লিকা বন্ধুলের লাল চোখ দুটিতে চুম্বন করল আর মুহূর্তের মধ্যে তার রুক্ষতা বিলীন হয়ে গেল।

"মল্লিকা! তোমার হাত আমাকে দাও।" মল্লিকার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বন্ধুল বলল, "তোমার এ হাত আমার শক্তির উৎস, এ হাত পেলে বন্ধুল যে কোনো জায়গায় নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে।"

"প্রিয়তম! তবে কোথায় যাবে ঠিক করলে এবং কবেই বা যাবে?"

"মুহূর্তকালও আর দেরী করতে চাই না, কেননা খোঁটার মধ্যে লৌহশলাকার খবর গণপতি পাবেই এবং তারপর আবার সে আমার পরীক্ষার দিন ঠিক করবে। কাজেই লোকের উৎসাহ প্রকাশ পাবার আগেই আমাদের যাত্রা করা চাই।"

"অন্যায়ের বিচার হতে কেন দিচ্ছ না?"

"কুসীনারা আমার সম্বন্ধে তার মত প্রকাশ করেছে, মল্লিকা! এখানে আমার প্রয়োজন নেই —অন্তত এ সময়। কুসীনারায় যখন আমার প্রয়োজন হবে, তখন আবার ফিরে আসব।"

সঙ্গে নিয়ে চলার উপযোগী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বন্ধুল এবং মল্লিকা সেই রাতেই কুসীনারা ছেড়ে চলে গেল। দ্বিতীয় দিন অচিরবতীর (রাপ্তী নদীর) তীরে অবস্থিত ব্রাহ্মণদের মল্লগ্রামে (মলাঁও, গোরখপুর) পৌছাল। সেখানে বন্ধুলের একজন

বন্ধুও ছিল, কিন্তু বন্ধুল তার সঙ্গে দেখা করল না। সে গ্রামে গিয়েছিল এই ভেবে যে, সেখান থেকে নৌকাযোগে শ্রাবস্তী (সহেট-মহেট, গোণ্ডা জিলা) চলে যাবে। মল্লগ্রামে শ্রেষ্ঠী সুদত্তের লোক বাস করত ; তার সাহায্যে নৌকা যোগাড় করা সহজ হল।

৩

শ্রাবস্তীর রাজধানীতে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ নিজ সহপাঠী বন্ধুল মল্লকে স্বাগত জানাল। তক্ষশিলায় থাকতেই প্রসেনজিৎ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল যে, 'আমি রাজা হলে, বন্ধুল তোমাকে আমার সেনাপতি হতে হবে।' রাজা হওয়ার পর সে অনেকবার এর জন্যে বন্ধুলকে লিখে জানিয়েছিল, কিন্তু বন্ধুল কোশল-কাশীর মতো সমৃদ্ধশালী এবং বিশাল রাজ্যের সেনাপতি হওয়ার চাইতে স্বীয় জন্মভূমি কুসীনারার গণের একজন সাধারণ উপসেনাপতির মর্যাদাকেই ওপরে স্থান দিয়েছিল। কিন্তু এখন কুসীনারাই তাকে বিতাড়িত করল, তাই প্রসেনজিতের প্রস্তাব শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করতে সে রাজী হল।

বলল, "আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী কিন্তু কয়েকটি শর্ত থাকবে।"

"সানন্দে তা বলতে পার বন্ধু।"

"আমি মল্লপুত্র বোধহয় তা তুমি জান।"

"হ্যাঁ জানি, এবং আমি তোমাকে কখনও মল্লদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলব না।"

"আচ্ছা, আর আমার কোনো শর্ত নেই।"

"মল্লদের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক আছে আমি তা সর্বদাই বজায় রাখতে চাই, বন্ধু! তুমি বোধহয় জান যে, আমার কোনো রাজ্য-বিস্তারের বাসনা নেই। তবে যদি কোনো কারণে মল্লদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, তা'হলে তুমি স্বাধীনভাবে যে কোনো একপক্ষ গ্রহণ করতে পারবে বন্ধু। আমি তোমার জন্যে আর কি করতে পারি?"

"না, মহারাজ! এই যথেষ্ট।"

৪

বন্ধুল মল্ল কোশল সেনাপতি নিযুক্ত হল। প্রসেনজিৎ যে রকম নম্র ও উদ্যমহীন রাজা তাতে তার এ রকম একজন সেনাপতিরই প্রয়োজন ছিল। বাস্তবিকই যদি বন্ধুল মল্লকে সে না পেত তা'হলে হয়ত 'মগধ' এবং 'বৎস' তার রাজ্যের বেশ কিছুটা অংশ অধিকার করে নিত।

শ্রাবস্তী নগরে পৌছাবার কিছুকাল পরে মল্লিকার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পেল। বন্ধুল একদিন জিজ্ঞাসা করল, "প্রিয়ে তোমার কোনো জিনিসের দোহদ্ (সাধ) হলে বল।"

"হ্যাঁ, দোহদ্ হয় প্রিয়তম! কিন্তু সেটা বড় দুষ্কর।"

"বন্ধুল মল্লের পক্ষে কিছুই দুষ্কর নয় মল্লিকা! বল, তোমার কিসের দোহদ্।"

"অভিষেক পুষ্করিণীতে স্নান করতে ইচ্ছা হয়।"

"মল্লদের ?"

"না বৈশালীর লিচ্ছবিদের।"

"ঠিকই বলেছ মল্লিকা ! তোমায় দোহদ্ খুবই দুষ্কর। কিন্তু যত দুষ্করই হোক বন্ধুল মল্ল সেটা পূর্ণ করবেই। কাল সকালে প্রস্তুত থেক, আমরা দু'জনেই রথে যাব।"

পরের দিন পাথেয় নিয়ে, খড়্গ, ধনুক ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়ে দু'জনেই রথে যাত্রা করল। কয়েক সপ্তাহ ধরে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একদিন বন্ধুলের রথ বৈশালীর দ্বারে গিয়ে প্রবেশ করল, যেখানে একদল লিচ্ছবির ঈর্ষার জন্যে বন্ধুলের সহপাঠী মহালি অন্ধ হয়েছিল। মহালি ছিল সেখানকার একজন অধ্যক্ষ। বন্ধুল একবার ভাবল যে মহালির সঙ্গে দেখা করবে, কিন্তু তাতে মল্লিকার দোহদ্-এ বিঘ্ন ঘটতে পারে ভেবে সে নিজের ইচ্ছা দমন করল।

অভিষেক পুষ্করিণীর ঘাটে কড়া পাহারা। সেখানে লিচ্ছবি পুত্রদের জীবনে মাত্র একবারই স্নান করবার (অভিষেক পাবার) সৌভাগ্য ঘটত —তাও আবার যখন তাকে লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্রের ৯৯৯ জন সদস্যের কোনো একটি শূন্যস্থানে নির্বাচিত করা হত তখনই। প্রহরীগণ বাধা দিলে বন্ধুল তাদের চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিল এবং মল্লিকাকে স্নান করিয়ে রথে তুলে খুব তাড়াতাড়ি বৈশালী থেকে বেরিয়ে পড়ল। খবর পেয়ে পাঁচ শ' লিচ্ছবি রথী বন্ধুলের পিছু ধাওয়া করল। মহালি তা শুনে তাদের নিষেধ করল, কিন্তু গর্বিত লিচ্ছবিরা কারুর নিষেধ শোনবার পাত্র ছিল না।

দূরে রথের চাকার শব্দ শুনে মল্লিকা পেছন ফিরে দেখে বলল, "প্রিয়তম ! অনেকগুলি রথ পেছনে তাড়া করে আসছে।"

"প্রিয়ে ! রথগুলি যখন একটি রেখার মতো সোজা আসবে তখন আমাকে বলবে।"

মল্লিকা ঠিক সময় মতোই বলল। প্রাচীন ঐতিহাসিকরা বলেন যে, বন্ধুল তখন সজোরে একটি তীর নিক্ষেপ করেছিল আর সে তীর না-কি পাঁচ শ' লিচ্ছবির কোমরবন্ধ ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। লিচ্ছবিগণ বন্ধুলের কাছে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানাল। বন্ধুল তখন বিনীতভাবে বলল, "আমি তোমাদের মতো মৃত লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করি না।"

"আচ্ছা, অন্তত একবার পরীক্ষা করে দেখ যে আমরা কি রকম মৃত।"

"আমি দু'বার কখনও তীর ব্যয় করি না! যাও, ঘরে ফিরে গিয়ে প্রথমেই প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর এবং তারপর কোমরবন্ধ খুলো" —বলে বন্ধুল মল্ল মল্লিকার হাত থেকে রথের রশি নিল এবং তীরবেগে রথ চালিয়ে লিচ্ছবিদের চোখের আড়ালে চলে গেল।

ঘরে ফিরে কোমরবন্ধ খোলার পর সত্যি-সত্যিই পাঁচ শ' লিচ্ছবি যোদ্ধা মারা গেল।

৫

শ্রাবস্তী জম্বু-দ্বীপের মধ্যে তখন সব চাইতে বড় নগরী ছিল। প্রসেনজিতের রাজ্যে শ্রাবস্তী ছাড়াও সাকেত এবং বারাণসী নামে দুটি মহানগরী ছিল। শ্রাবস্তীর সুদত্ত (অনাথ-পিণ্ডদ), মৃগার এবং সাকেতের অর্জুনের মতো আরও অনেক কোটিপতি ব্যবসায়ী কাশী কোশলের সম্মিলিত রাজ্যে বাস করত। তারা ব্যবসায়ের জন্যে তাম্রলিপ্ত হতে আরম্ভ করে পূর্ব সমুদ্র (বঙ্গোপসাগর) এবং ভরুকচ্ছ (ভরৌচ) ও সুপ্পারক (সোপারা) হয়ে পশ্চিম সমুদ্র (আরব সাগর) দিয়ে সুদূর দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত যেত। ব্রাহ্মণ সামন্তরা (মহাশালেরা) ক্ষত্রিয় সামন্তদের সমতুল্য ছিল না বটে, কিন্তু তবুও সমাজের মধ্যে তারা উচ্চস্থান অধিকার করে ছিল। ঐশ্বর্যে সামন্তরা তাদের কাছে খুবই নগণ্য ছিল। সুদত্ত জেত রাজকুমারের উদ্যান 'জেতবন' অজস্র কার্ষাপণ (মুদ্রা) দিয়ে ক্রয় করেছিল এবং গৌতম বুদ্ধের জন্যে সেখানে জেতবন বিহার তৈরী করেছিল। মৃগারের পুত্র পুন্নবর্ধনের বিবাহে প্রসেনজিৎ নিজে সদলবলে সাকেতে গিয়ে কন্যার পিতা অর্জুন শ্রেষ্ঠীর অতিথি হয়েছিল। অর্জুনের কন্যা তথা মৃগারের পুত্রবধূ বিশাখা নিজের হারের মূল্য দিয়ে সহস্র প্রকোষ্ঠের একটি সাততলা বিশাল বিহার নির্মাণ করে তার নাম রেখেছিল 'পূর্বারাম মৃগার মাতা প্রাসাদ'। দেশ-দেশান্তরের ধন-রত্ন জড় হয়ে এইসব শ্রেষ্ঠীর কাছে আসত।

জৈবলী, উদ্দালক এবং যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিগণ যজ্ঞবাদকে গৌণ, দ্বিতীয় স্থান দিয়েও বাস্তবিক নিস্তারের জন্যে ব্রহ্মবাদের সুদৃঢ় নৌকা নির্মাণ করেছিল। জনকের মতো নৃপতিগণও বড় রকমের পুরস্কার দিয়ে ব্রহ্মসম্বন্ধনীয় শাস্ত্রার্থ-পরিষদ আহ্বান করতে লাগল, আর এগুলির মধ্যে থেকেই বেদের বাইরে চলার পথ প্রশস্ত হল। তখন দেশের মধ্যে স্বতন্ত্র চিন্তাধারার জোয়ার এসেছিল। আর বিচারক (তীর্থঙ্কর) বিচার (মতবাদ) সাধারণ সভায় লোকের নিকট উপস্থিত করত। কোথাও তার স্বরূপ মামুলি উপদেশ (অববাদ্ সুক্ত) রূপে হত, কোথাও কোনো বাদের আহ্বান ঘোষণা রূপে জম্বুর (জাম্) শাখা পুঁতে বেড়াত। প্রবাহণ ছাপ্পান্ন পুরুষকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের অনেকগুলি উপায় উদ্ভাবন করেছিল, যেমন প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস), ধ্যান তপ ইত্যাদি। তখন উপনিষদের শিক্ষার বাইরের আচার্যও নিজ স্বতন্ত্র বিচারের সঙ্গে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) ও ব্রহ্মচর্যের ওপর বিশেষ জোর দিত। অজিত কেশকম্বল একেবারেই জড়বাদী ছিল। সে ভৌতিক (জড়) পদার্থ ছাড়া আত্মা, ঈশ্বরভক্তি, নিত্য-তত্ত্ব অথবা স্বর্গ-নরক-পুনর্জন্মবাদ মানত না, তবুও সে নিজে গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারী ছিল। তখনকার সামন্ত শাসনকর্তার সহানুভূতির পাত্র তো সে ছিলই না, বরং তাদের রোষানলের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেও নিজের জড়বাদকে ধর্মের রূপ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিল। ব্রাহ্মণ-সামন্ত, লৌহিত্য ও পায়াসীর মতো

রাজন্য সামন্তগণ কিন্তু জড়বাদী ছিল। আর তারা তাদের মতবাদের জন্যে এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, জড়বাদকে পরিত্যাগ করা লজ্জাজনক কাজ মনে করত। তবুও তাদের জড়বাদ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল না।

জড়বাদের প্রচার সত্বেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সামন্তগণের ও ধনুকের ব্যবসায়ীদের বেশী আস্থা ছিল গৌতম বুদ্ধের অনাত্মবাদের ওপর —বিশেষত কোশলের। এর বিশেষ একটি কারণ হল যে, গৌতম নিজে কোশলের অন্তর্গত শাক্য গণের (শাক্য-প্রজাতন্ত্র) অধিবাসী ছিল। সেও জড়বাদীদের মতো বলত —আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি নিত্যবস্তু পৃথিবীতে নেই, সর্ব বস্তুই উৎপন্ন হয় এবং অচিরেই বিলীন হয়ে যায়। সংসার কতকগুলি বস্তুর প্রবাহ নয়, বরং ঘটনাবলীর স্রোত। তার প্রচারিত মতবাদ জ্ঞানীরা খুবই যুক্তিসঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী বলে মনে করত। কিন্তু ওই অনাদিবাদে লোক-মর্যাদা, ধনী-গরীব, দাস-স্বামীর প্রভেদ নষ্ট হয়, তাই অজিতের জড়বাদ সামন্ত ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে প্রিয় হতে পারল না। গৌতম বুদ্ধ নিজের অনাত্মবাদ ও জড়বাদের মধ্যে আরও কিছু যোগ করে তার তিক্ততা কিছুটা দূর করল। তার মতে আত্মা নিত্য না হলেও চেতনা-প্রবাহ স্বর্গ কিংবা নরকের মানুষের মধ্যে এক দেহ হতে আর এক দেহে —এক শরীর-প্রবাহ হতে আর এক শরীর প্রবাহে সঞ্চারিত হয়। এ বিচার অনুযায়ী প্রবাহণ রাজার আবিষ্কৃত হাতিয়ার ছিল, আর তার জন্যেই পুনর্জন্মবাদের পুরোপুরি স্থিতির জায়গা হল। যদি গৌতম বুদ্ধ নিছক জড়বাদেরই প্রচার করত তা'হলে নিশ্চয়ই শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, রাজগৃহ, ভদ্রিকার শ্রেষ্ঠীরা অজস্র টাকা ব্যয় করত না এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সামন্তরা ও রাজারা তার পায়ের ধূলি নেবার জন্যে ভীড় করত না। শ্রাবস্তীর উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের গৌতমবুদ্ধের মতবাদে অগাধ বিশ্বাস ছিল। প্রসেনজিতের পাটরাণী মল্লিকা দেবী বৌদ্ধধর্মের প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল। তার নগরস্থিত শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ তার সখী বিশাখা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ পূর্বারামের মতো একটি মহা-বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধদেবকে দান করেছিল। সেনাপতি বন্ধুল মল্লের স্ত্রী পাটরাণী মল্লিকার অত্যন্ত প্রিয় সখী ছিল, তার অনুপ্রেরণায় সেও বুদ্ধের উপদেশাবলী শুনে কিছুদিন পরে বুদ্ধের উপাসিকা হয়ে পড়ল।

মল্লিকার অবস্থা খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল। কোশলের মতো রাজ্যের সেনাপতির ঘর সমৃদ্ধ হওয়াটা স্বাভাবিক। মল্লিকার দশটি বীরপুত্র। তারা প্রত্যেকেই রাজসেনা বাহিনীর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিল। বন্ধুল মল্ল এক যুগ পর্যন্ত রাজার ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর মধ্যে অনেকেই তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্য জনপদের কোনো লোককে এত উচ্চপদে কাজ করতে দেখে তারা পছন্দ করত না। ঈর্ষাপরায়ণ লোকেরা রাজার কাছে তার নামে অপবাদ রটাতে সুরু করল। রাজাও কিছুটা বোকাবুদ্ধির লোক ছিল। তারা রাজার কাছে গিয়ে এই বলে উস্‌কাল যে, বন্ধুল মল্ল রাজাকে নির্বোধ বলে প্রচার করছে।

শেষটায় রাজার কাছে এমন কথাও বলল যে, সেনাপতি রাজ্য কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে। প্রসেনজিতেরও সেটা ঠিক বলে মনে হল। তখন রাজা ও বন্ধুল মল্ল তাদের নিজ নিজ শত্রুদের হাতে খেলতে লাগল।

চিন্তাক্লিষ্ট বন্ধুলকে একদিন মল্লিকা জিজ্ঞেস করল, "প্রিয়! তুমি এত কি ভাবছ?"

"রাজা আমার ওপর সন্দেহ করতে সুরু করেছে।"

"তা'হলে সেনাপতির পদে ইস্তফা দিয়ে চল না কুসীনারা চলে যাই। সেখানে আমাদের জীবিকার্জনের জন্যে কর্মান্ত (ক্ষেত্র) আছে।"

"এর অর্থ হল রাজাকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দেওয়া। দেখছ না, মগধরাজ অজাতশত্রু কতবার কাশী আক্রমণ করল। আমরা একবার তাকে বন্দী করেছিলাম। মহারাজ উদারতা দেখিয়ে রাজকন্যা বজ্রার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু অজাতশত্রু সমগ্র জম্বু দ্বীপের রাজচক্রবর্তী হতে চায়, সে এ বিয়েতে চুপ হওয়ার পাত্র নয়। তার গুপ্তচরে রাজধানী ছেয়ে গেছে। আমাদের অন্য প্রতিবেশী অবন্তিরাজার জামাতা বৎসরাজ উদয়নের উদ্দেশ্যও ভালো নয় —সেও সীমান্তে প্রস্তুত হচ্ছে। এ সময়ে শ্রাবস্তী ছেড়ে চলে যাওয়াটা খুবই কাপুরুষের কাজ মল্লিকা!"

"আর এটা মিত্রদ্রোহের কাজও বটে।"

"মল্লিকা! আমি নিজের কথা চিন্তা করি না। যুদ্ধে অনেক বার আমি মৃত্যু কবলিত হয়েও বেঁচে গিয়েছি। তাই কখনও যদি মৃত্যু আমাকে গ্রাস করে, তা'হলেও সেটা আমার কাছে বড় কথা হবে না।"

পাটরাণী মল্লিকা ছিল মালীর কন্যা। সাধারণ এক মালীর মেয়ে হয়েও নিজের গুণে প্রসেনজিতের পাটরাণী হয়েছিল —কিন্তু সে বেঁচে নেই। থাকলে লোকের কথায় রাজার কান এতটা ভারী হত না। একদিন রাজা সীমান্তে বিদ্রোহ দমনের নাম করে বন্ধুল মল্লের পুত্রদের পাঠিয়ে দিল। তারা জয়লাভ করে যখন ফিরছিল তখন উল্টো খবর দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বন্ধুল মল্লকে পাঠাল। এই চক্রান্তে বন্ধুল আর তার দশ পুত্রই এক জায়গায় প্রাণ দিল। যখন এ ঘটনার সংবাদ মল্লিকার কাছে পৌছাল তখন সে বুদ্ধ ও তার ভিক্ষুসংঘকে ভোজন করাতে যাচ্ছিল। তার তরুণী পুত্রবধূরা খুব ভক্তি সহকারে নানা রকম খাবার তৈরী করেছিল। মল্লিকার হৃদয় দগ্ধ হতে লাগল। কিন্তু সে নিজেকে এতদূর সংযত করল যে, তার চোখ দিয়ে এতটুকু অশ্রুকণা গলিত হওয়া তো দূরের কথা, মুখ পর্যন্ত ম্লান হল না! সে চিঠিটা নিজের আঁচলে বেঁধে সমস্ত সংঘকে ভোজন করাল। ভোজনের পরে বুদ্ধের উপদেশাবলী শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনল। তারপর চিঠিটা পড়ে শোনাল। বন্ধুলের পরিবারে যেন বজ্রপাত হল। মল্লিকার খুবই ধৈর্য, কিন্তু সেই তরুণী বিধবাদের সান্ত্বনা দেওয়া বুদ্ধের পক্ষেও সহজ কাজ ছিল না।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর প্রসেনজিৎ সত্য ঘটনা জানতে পেরে খুবই শোকার্ত হলেন কিন্তু তখন আর কিছু করবার উপায় ছিল না। প্রসেনজিতের মনের সান্ত্বনার জন্য বন্ধুলের ভাগিনেয় দীর্ঘকারায়ণকে নিজের সেনাপতি নিযুক্ত করল।

৬

শীতকাল, কপিলাবাস্তুর আশেপাশের ক্ষেতে গম, ভুট্টা ও হলুদ রঙ-এর সরষে ফলেছে। আজ নগর খুবই সাজানো হয়েছে, কোনো কোনো জায়গায় তোরণ তৈরী হয়েছে, বিশেষ করে সংস্থাগারটিকে বেশী করে সাজানো। তিন দিন কঠোর পরিশ্রমের পরে আজ একটুখানি অবসর পেয়ে কয়েকজন দাস একটি ঘরের কোণে বসে গল্প করছিল।

কাক বলল, "আমাদের দাসেদের জীবন কি কোনো মানুষের জীবন? আমরা মানুষ না হয়ে যদি গরু হয়ে জন্মাতাম তা'হলেও ভালো ছিল। তখন তো আর আমাদের মানুষের মতো অনুভূতি থাকত না।"

"ঠিকই বলেছ কাক! কাল আমার প্রভু দণ্ডপাণি লোহা লাল করে আমার স্ত্রীকে ছ্যাঁকা দিয়েছে।"

"কেন ছ্যাঁকা দিল?"

"কেন করল, সে কথা তার কাছে কে জিজ্ঞাসা করবে? তারা তো দাসদের পতি-পত্নী সম্বন্ধও মানতে রাজি নয়। এ সত্ত্বেও এই দণ্ডপাণি নিজেকে নিগংঠক-শ্রাবক (জৈন) বলে। সে এমনি নিগংঠ যে, মাটির কীট সরাবার জন্যে নিজের কাছে ময়ূরের পাখনা রাখে। দোষের মধ্যে হল যে, আমার মেয়ে কিছুদিন ধরে কঠিন অসুখে ভুগে অজ্ঞান হয়ে পড়লে আমার স্ত্রী সেই সংবাদ আমাকে দিতে এসেছিল। হতভাগী মেয়ে শেষ পর্যন্ত বাঁচল না। তা মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে। সংসারে আমাদের মতোই তো ওকেও বাঁচতে হত! সত্যিই কাক, আমাদের দাসদের কোনো জীবনই নয়! শুধু এই নয়, আমার মনিব বলছিলেন যে, এ ধুমধাম শেষ হলেই আমার স্ত্রীকে বেচে দেবে।"

"তবে ওই কথাই দণ্ডপাণি লোহা দিয়ে দাগিয়েও কি তৃপ্তি পেল না?"

"না ভাই। বার বছর পরে মেয়েটিকে পঞ্চাশ নিষ্কে (স্বর্ণমুদ্রা) বেচে দেওয়ার কথা ছিল। বিশ্বাস কর, আমরা জেনেশুনেই না-কি তার পঞ্চাশ নিষ্ক নষ্ট করে দিয়েছি।"

"এ কথাও স্বীকার করতে হবে, আমাদের দাসদের বাপ মায়ের হৃদয়ও নেই।"

তাদের কথার মাঝে একটি বৃদ্ধ দাস বলল, "আর এও একজন দাসীরই পুত্র, যার সম্বর্ধনার জন্যে এতসব তোড়জোড় হচ্ছে।"

"কে দাদা?"

"এই কোশল রাজকুমার বিদুড়ভ।"

"দাসীর পুত্র?"

"হ্যাঁ, মহানাম শাক্যের সেই বুড়ি দাসীকে জানো না? আমাদের মতো কেলো নয় —নিশ্চয়ই কোনো শাক্যের ঔরস-জাত হবে!"

"তা দাসীর কি তার অভাব, দাদা!"

"হ্যাঁ, ঐ দাসীর পেটে মহানামের একটি মেয়ের জন্ম হয়। তার রঙ খুবই ফর্সা আর দেখতেও খুব সুন্দরী; তাকে যেন শাক্যকন্যা বলেই মনে হত।"

"মনে না হবার কারণ কি? মেয়ে যদি সুন্দরী হয় —তা সে দাসীকন্যা হোক না কেন, মালিক তাদের খুবই যত্নে লালনপালন করে।"

"কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কোনো এক শাক্য কুমারীকে বিয়ে করতে চাইল; কিন্তু শাক্যরা নিজেদের কুলীনশ্রেষ্ঠ মনে করে, তাই তারা কেউই নিজ কন্যাকে রাজার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইল না। কিন্তু পরিষ্কার করে এ কথা বলার জো নেই, পাছে কোশলরাজ রাগ করে —এ ভয়ও ছিল। শেষ পর্যন্ত মহানাম তার দাসী কন্যাকে শাক্যকুমারী বলে পরিচয় দিয়ে প্রসেনজিতের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। সেই বার্ষভ-ক্ষত্রিয়ার পুত্র বিদূডভ রাজকুমার।"

"কিন্তু এখন তো এও শাক্যদের মতোই আমাদের রক্তপিপাসু হবে!"

* * *

বাজনা বাজতে লাগল, শাক্যরা কোশল-রাজকুমারকে মহা ধুমধামের সঙ্গে স্বাগত জানাল, যদিও মনে মনে দাসীপুত্র বলে সকলে তাকে ঘৃণা করত। বিদূডভ নিজ মাতুলকুলের সম্বর্ধনা গ্রহণ করে মাতামহ মহানামের আশীর্বাদ নিয়ে খুশী মনে কপিলাবাস্তু থেকে বিদায় নিল। দাসীপুত্রের পদার্পণে সংস্থাগার অপবিত্র হয়েছিল, তাই তার শুদ্ধির প্রয়োজনে দাসদাসীরা ধুয়ে মুছে শুদ্ধি করতে লেগেছিল। একজন দাস বিদূডভের উদ্দেশ্যে গালি পাড়ছিল। এদিকে বিদূডভের একজন সৈনিক নিজের ভল্ল সংস্থাগারে ফেলে গিয়েছিল, তাই নিতে এসে এই সব কটূক্তি শুনতে পেয়ে সব কথা বিদূডভকে জানাল। সে কপিলাবাস্তু শাক্যহীন করবার প্রতিজ্ঞা করল, আর তা পরবর্তীকালে করেও ছিল। তার ক্রোধের অনুলক্ষ্য ছিল প্রসেনজিৎ, যে তাকে দাসীর গর্ভে জন্ম দিয়েছিল।

দীর্ঘকারায়ণ নিজের মামা ও মামাতো ভাইদের মৃত্যুকে ভুলতে পারল না। অন্য দিকে প্রসেনজিৎ তার সমস্ত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য অধিক মাত্রায় বিশ্বাস ও মধুরতা দেখাতে চাইছিল। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তার বুদ্ধদেবকে স্মরণ হল। কয়েক যোজন দূরে শাক্যদের কোনো এক গ্রামে বুদ্ধদেব অবস্থান করছেন শুনে প্রসেনজিৎ দীর্ঘকারায়ণ সব কিছু সৈন্য নিয়ে সেখানে রওনা হল। বুদ্ধদেবের বাসগৃহে যাবার সময় তার মুকুট, খড়্গ ও অন্যান্য রাজ চিহ্নগুলি কারায়ণের হাতে দিয়েছিল। বিদূডভের সঙ্গে কারায়ণের যোগ ছিল। রাণীকে সেখানে ত্যাগ করে রাজ্যমধ্যে গিয়ে বিদূডভকে রাজা বলে ঘোষণা করল; আর নিজে রওনা হল শ্রাবস্তীর পথে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধের উপদেশ শুনে প্রসেনজিৎ বাইরে এল রাণী তাকে সব কথা বলল। সব শুনে সেখান থেকে প্রসেনজিৎ রাজগৃহ (রাজগীর) গিয়ে নিজের আত্মীয় মগধরাজ অজাতশত্রুর কাছ থেকে পরামর্শ ও সাহায্য নেওয়া ঠিক করল। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘ পথশ্রমে পথিমধ্যেই শরীর অচল হয়ে পড়ল, সন্ধ্যার গোধূলি লগ্নে যখন রাজগৃহে পৌছাল তখন নগরদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। সেই রাত্রে নগর উপান্তে একটি কুটিরে প্রসেনজিতের মৃত্যু হল। সকালে রাণীর বিলাপ শুনে অজাতশত্রু ও বন্ধুরা ছুটে এল, তখন জাঁকজমকের সঙ্গে শবদাহ করা ছাড়া আর কি-ই বা করবার ছিল!

বন্ধুলকে হত্যার এই হল প্রতিশোধ —দাসপ্রথার এই হল পরিণাম।*

নাগদত্ত

কাল : ৩৩৫ খৃষ্টপূর্ব

"বিষ্ণুগুপ্ত! উচিত কাজের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আমরা মানুষ তাই আমাদের কিছু কর্তব্য আছে। আর সেই জন্যে আমাদের উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে খেয়াল রাখা দরকার।"

"কর্তব্য কি ধর্ম নয়?"

"আমি ধর্মকে ছলনা বলে মনে করি। ধর্ম কেবলমাত্র পরস্বাপহারীদের শান্তিতে পরের ধনকে উপভোগের সুযোগ দেয়। ধর্ম কি কখনও গরীব এবং দুর্বলের কোনো খবর রাখে? পৃথিবীতে এমন কোন জাত নেই যারা ধর্ম মানে না। দাসেরাও যে মানুষ— ধর্ম কি তা কখনও স্বীকার করে? দাসেদের কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু স্ত্রী-জাতির প্রতি —তা সে অ-দাস হোক না কেন, ধর্ম কি কখনও ন্যায় করেছে? টাকা হলেই তুমি দু-চার-দশ কিংবা একশ' বিয়ে করতে পার। সেই স্ত্রী দাসী ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না; ধর্ম কিন্তু একে উচিত কাজ বলেই মনে করে। আমি যে কর্তব্যের কথা বলছি সেটা ধর্মজাত কর্তব্য নয়, সুস্থ মানুষের মন যেটাকে কর্তব্য বলে মনে করে।"

---

*আজ থেকে একশ' পুরুষ আগেকার একটি ঐতিহাসিক কাহিনী। এই সময় সামাজিক বৈষম্য খুবই বেড়ে গিয়েছিল। ধনী ব্যবসায়ী-শ্রেণী সমাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল। এই সময়ের মধ্যে জন্মেছেন অনেক পথ প্রদর্শক —যাঁরা নরক থেকে মানুষকে উদ্ধার করে পরলোকের পথ দেখান। কিন্তু যে নরকের অগ্নিকুণ্ড গ্রামে গ্রামে দাউদাউ করে জ্বলছিল তার দিকে সবাই চোখ বুঁজে ছিল।

"তা'হলে আমি বলব যে, প্রয়োজনীয় যা কিছু তাই হল কর্তব্য।"

"তবে তো উচিত-অনুচিতের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকবে না।"

"থাকবে বন্ধু! আমার প্রয়োজনীয় কথার অর্থ শুধু একজনের প্রয়োজন নয়।"

"একটু পরিষ্কার করে বল, বিষ্ণুগুপ্ত!"

"আমাদের এই তক্ষশিলা গান্ধারের কথাই ধর না কেন! আমাদের কাছে নিজ স্বতন্ত্রতা কত প্রিয় এবং সেটা খুব স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু আমাদের দেশ এত ছোট যে তার পক্ষে বড় শত্রুর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। যতদিন পর্যন্ত মাদ্র, পশ্চিম গান্ধারের মতো ছোট ছোট প্রজাতন্ত্রগুলি আমাদের প্রতিবেশী ছিল ততদিন সুখেই ছিলাম। কখনও কখনও যুদ্ধ হত বটে কিন্তু পরিণামে সামান্য কিছু লোকই মরত শুধু। আমাদের স্বাতন্ত্র্য অপহৃত হয়নি। কারণ আরও ছিল, তক্ষশিলা জয় করা—কণ্টকাকীর্ণ রাজ্য জয় করা কারও পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু যখন পার্শবরা (ইরাণী) পশ্চিমের প্রতিবেশী হয়ে দাঁড়াল তখন আমাদের স্বাতন্ত্র্য শুধু তাদের কৃপার ওপর নির্ভর করে রইল। এখন আমাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য আবশ্যক পার্শবদের মতো শক্তিশালী হওয়া।"

"শক্তিশালী হওয়ার জন্য কি করা উচিত?"

"ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রে কাজ হবে না। ছোট-ছোট স্বতন্ত্র জনপদের জায়গায় বিশাল রাজ্য কায়েম করতে হবে।"

"সে বিশাল রাজ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জনপদের কি কোনো স্বাধিকার থাকবে?"

"সকলেই রাজ্যকে আপন বলে মনে করবে।"

"খুবই গোলমালের কথা বিষ্ণুগুপ্ত! দাস কি কখনও প্রভুকে আপন মনে করে?"

"তবে শোন বন্ধু নাগদত্ত, স্থান পাওয়াটা শুধু ইচ্ছা বা খেয়ালের ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে যোগ্যতার ওপর। যদি তক্ষশিলা—গান্ধারদের যোগ্যতা থাকে তবে তারা ওই বিশাল রাজ্যেও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে। তা না হলে সাধারণভাবেই থাকবে।"

"গোলামের স্থান অধিকার করে?"

"কিন্তু বন্ধু! দারয়োশ রাজ্যে পশ্চিম গান্ধাররা যে স্থান পেয়েছে তার থেকে এ গোলাম স্থান অনেক ভালো হবে। আচ্ছা আমার বক্তব্য ছেড়েই দাও। তুমিই বল না, আমাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করার জন্য কি করা উচিত। এ কথা খুবই সত্যি যে, আমাদের মতো ক্ষুদ্র জনপদের পক্ষে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করা দীর্ঘকাল আর সম্ভব নয়।"

"আমি বলব বিষ্ণুগুপ্ত! প্রথমত আমাদের নিজস্ব গণ-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা উচিত যা কোনো রাজার বশ্যতা স্বীকার করবে না। কিন্তু আমি জানি, আমাদের মতো একটি ক্ষুদ্র গণের (রাষ্ট্রের) পক্ষে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের কর্তব্য হল, সমস্ত উত্তরাপথের (গান্ধারের) গণগুলিকে (রাষ্ট্রগুলিকে) সংঘবদ্ধ করা।"

"সে সংঘে প্রত্যেকটি গণ স্বতন্ত্র থাকবে —না, সংঘ সর্বোপরি থাকবে ?"

"গণকে আমি সর্বোচ্চ বলে মনে করি আর সেইভাবেই গান্ধার, মাদ্র, মল্ল এবং শিবি প্রভৃতি গণগুলিরও আপন শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হবে।"

"কেমন করে তা স্বীকার করবে ? শেষ পর্যন্ত তো গণকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সৈন্য রাখতেই হবে, বলি (কর) আদায় করতে হবে।"

"গণ (প্রজাতন্ত্র) যেমন তার কাজ সাধারণ মানুষের দ্বারা পরিচালনা করে, তেমনি সংঘ তার কাজ চালাবে গণগুলির সাহায্যে।"

"গণের মধ্যে প্রথম থেকেই আমরা এক জনের (গোষ্ঠী) এক রক্তের পরিবার হিসাবে বাস করে আসছি। আর অনাদিকাল থেকে এই পরিবার অর্থাৎ গণকে মেনে চলতে অভ্যস্ত। কিন্তু গণগুলির মিলিত সংঘ একটি নতুন জিনিস। এখানে রক্তের কোনো সম্বন্ধ নেই, বরং এদের মধ্যে অনাদিকাল হতে চলে আসছে রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ ক্ষেত্রে কেমন করে আমরা সবাইকে দিয়ে সংঘের নিয়ম-কানুন স্বীকার করাতে সক্ষম হব ? বন্ধু ! তুমি যদি এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে দেখতে তা'হলে আর তুমি এ কথা বলতে না। যদি বাধ্য করা হয়, তা'হলে সংঘের কথা না হয় ধরলাম যে গণগুলি মেনে নেবে, কিন্তু বাধ্য করাবার শক্তি আসবে কোত্থেকে ?"

"আমি মনে করি যে, সে শক্তি ওরই মধ্যে থেকে সৃষ্টি করা উচিত।"

"আমিও মনে করি যে গণগুলির ভেতর থেকে যদি সে শক্তি সৃষ্টি হত তা'হলে খুবই ভালো হত। কিন্তু পার্শবদের কাছে বারবার মার খেয়ে বুঝেছি যে, শক্তি ভিতর থেকে সৃষ্টি হবে না। তাই আমাদের প্রয়োজন, অন্য উপায়ে সে শক্তি সৃষ্টি করা।"

"রাজাকে মেনে নিয়েও ?"

"শুধু তক্ষশিলা নয়। তক্ষশিলা গান্ধারের মতো জনপদগুলির জন্য একজন রাজা অর্থাৎ রাজচক্রবর্তীকেও স্বীকার করে নিলে কোনো ক্ষতি নেই।"

"তা'হলে পার্শব দারয়োশকেই বা কেন রাজা বলে মেনে নাও না ?"

"পার্শব দারয়োশ যে আমাদের লোক নয় তা তুমি নিজেও ভালোভাবেই জানো। আমরা জম্বুদ্বীপের লোক।"

"আচ্ছা, তা'হলে নন্দকে স্বীকার করে নাও।"

"আমরা যদি উত্তরাপথের সব গণগুলিকে সংঘবদ্ধ করতে না পারি, তা'হলে নন্দকে স্বীকার করে নিতে আপত্তি করা উচিত নয়। পশ্চিম গান্ধারদের মতো দারয়োশের অধীন হওয়া ভালো —না নিজেদের জম্বুদ্বীপের চক্রবর্তীর অধীনতা স্বীকার করা ভালো ?"

"বিষ্ণুগুপ্ত তুমি এখনও রাজ-শাসিত দেশ দেখনি, যদি দেখতে তা'হলে বুঝতে যে, সেখানে সাধারণ লোকেরও দাসদের অপেক্ষা বেশী অধিকার নেই।"

"স্বীকার করছি। আমি পশ্চিম গান্ধার ছাড়া আর কোথাও যাইনি ; কিন্তু দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা আমার খুবই আছে। আমি লেখাপড়া শেষ করে পর্যটনে বার হব। বিদেশী দাসত্বের হাত থেকে বাঁচতে হলে ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেঙে ফেলা সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারে না। পোরাস আর দারয়োশদের সফলতার এই হল চাবিকাঠি।"

"তারা কতটা সাফল্য লাভ করেছে তা আমি কাছে থেকে দেখেছি।"

"কাছে থেকে ?"

"হ্যাঁ, আমি প্রাচীতে মগধ পর্যন্ত দেখেছি। আর নন্দের রাজত্ব, যা আমাদের পূর্ব গান্ধারের (তক্ষশিলা) তুলনায় নরক, তাও দেখেছি। গরীবদের দাবিয়ে দেওয়ার শক্তি তার আছে এবং মেহনতকারী কৃষক, শিল্পী ও দাসেরা যে তাতে কত নিপীড়িত তার বর্ণনা করা যায় না।"

"এ সবের কারণ হল নন্দের রাজ্যে তক্ষশিলার মতো কোনো স্বাভিমানী স্বতন্ত্রতাপ্রেমী গণ (প্রজাতন্ত্র) সম্মিলিত হয়নি।"

"সম্মিলিত হয়েছে, বিষ্ণুগুপ্ত ! লিচ্ছবিদের গণ গান্ধার থেকেও শক্তিশালী ছিল, কিন্তু এখন বৈশালী মগধের চরণদাসী আর লিচ্ছবিরা মগধ-শিকারীদের জবরদস্ত ডালকুত্তা। বৈশালীতে দেখবে, দেশটা উজাড় হয়ে যাচ্ছে ; গত দেড়শ' বছরের মধ্যে জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশও এখন অবশিষ্ট নেই। শতাব্দী ধরে অর্জিত স্বতন্ত্রতা, স্বাভিমানী ভাব —এ সব এখন মগধ রাজার সৈন্য বানাবার কাজে লাগানো হচ্ছে। একবার বড় রাজ্যের হাতে নিজেকে অর্পণ করলে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া বড় মুস্কিলের ব্যাপার।"

"বন্ধু নাগদত্ত ! আমিও একদিন এই মতই পোষণ করতাম, কিন্তু এখন আমি মনে করি যে, ছোট ছোট গণের যুগ আর নেই। আর বড় গণ (প্রজাতন্ত্র) ও সংঘ গড়ে তোলবার চিন্তা স্বপ্নমাত্র। যুগের প্রয়োজনকেই মেনে চলা উচিত। কিন্তু তুমি কি পশ্চিমে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছ ?"

"হ্যাঁ, প্রথমে পার্শবদের দেশ। আমাদের মতো তাদেরও গণ আছে, তাই নিজের চোখে দেখতে চাই যে কিভাবে তারা মহান্ দারয়োশ ও তার বংশধরদের উদ্দেশ্য সফল হতে দেয়নি।"

"আর আমিও যাচ্ছি ! প্রাচ্যকে দেখব। দেখব যে, সমস্ত জম্বুদ্বীপকে একত্রিত করার শক্তি মগধের আছে কি নেই। চল, আমরা পড়া শেষ করে ধনার্জন ও পরিবারপোষণ করা যায় এমন জায়গায় গিয়ে কাজ করি। বন্ধু, তুমি আয়ুর্বেদশাস্ত্র পড়ে বৈদ্য হয়ে ভালোই করেছ, কেন না কোথাও গিয়ে থাকবার পক্ষে এ খুবই লাভজনক বিদ্যা। আমি জানি না বলে এখন অনুতাপ হচ্ছে।"

"তুমি ওর চেয়েও লাভজনক জ্যোতিষ বিদ্যা এবং সামুদ্রিক তন্ত্রমন্ত্র জানো।"

"মিত্র ! তুমি তো জানো, এ বিদ্যা স্রেফ ফাঁকিবাজী ।"

"কিন্তু বিষ্ণুগুপ্ত, এই বিদ্যা সত্য কি মিথ্যা তাতে চাণক্যের কি যায় আসে !"

ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে খেলাধূলা ও পড়াশুনার সাথী —তক্ষশিলার নাগদত্ত কাপ্য এবং বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্যের বিদ্যার্থী জীবনের এই শেষ দেখা। একাধিকবার তক্ষশিলা পার্শবদের হস্তগত হয়েছিল, আর তার স্বাধীনতা বাঁচাবার জন্য দু'জনই নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

২

চারিদিক বৃক্ষ-বনস্পতিবিহীন, ছোট ছোট নগ্ন পাহাড়। সেখানে সবুজের আশায় চোখ পিপাসার্ত হয়ে উঠছিল। পাহাড়ের মাঝখানটায় বিস্তীর্ণ উপত্যকা —তার মধ্যেও কচিৎ কোথাও জল এবং বনস্পতির চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। এই উপত্যকার ধারে ধারে সার্থের (ক্যারাভ্যান) রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে সর্বদা লোক যাওয়া-আসা করত। আর সার্থ এবং তার পশুদের আরামের জন্য পান্থশালা নির্মিত হয়েছিল। আশপাশের অবস্থা দেখে এ রকম আশা করা যেত না যে এই পান্থশালায় সমস্ত সুখ-সুবিধা আছে। এই মরুভূমিতে এত জিনিস কোথা থেকে আসে তা জানা যায়নি। এই পর্বতের মধ্যে একাধিক পান্থশালা ছিল ; তাদের কোনোটা সাধারণ রাজকর্মচারীদের জন্য, কোনোটা সৈনিকদের আবাসস্থল, কিছু ব্যবসায়ীদের জন্য, আর একটা থাকত বাদশাহ্‌দের পান্থ-প্রাসাদ হিসেবে। সেখানে শাহ্ আর তাঁর ক্ষত্রপরা বিশ্রাম করত।

আজ বাদশাহী পান্থ-প্রাসাদে কেউ এসেছে। পান্থশালার আস্তাবলে ঘোড়া বাঁধা, আঙ্গিনায় অনেক দাস-কর্মচারী। কিন্তু সকলের চেহারায় ঔদাস্যের ভাব ফুটে উঠছিল। এত লোকের সমাগমেও পান্থ-প্রাসাদ আশ্চর্য রকমের নীরবতায় মগ্ন। এমন সময় দরজা দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে তিনজন রাজকর্মচারী বেরিয়ে এল এবং তারা সাধারণ পান্থশালার মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাদের বহু মূল্যের বস্ত্র ও আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা দেখার সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকেরা ভয় ও সম্মানের সঙ্গে একধারে সরে দাঁড়াল। সেখানে কোনো বৈদ্য আছে কিনা তারা প্রশ্ন করল। অবশেষে সাধারণ পান্থশালার খবর পাওয়া গেল যে, সেখানে একজন হিন্দু বৈদ্য আছে।

এখানে এমনিতেই বৃষ্টি কম তাতে বর্ষাঋতু অনেক আগেই শেষ হয়েছে। মনাক্কা, বাদাম, আঙুর, খরমুজের মতো ফল সস্তায় বিক্রী হচ্ছিল। রাজকর্মচারীটি যখন বৈদ্যের নিকট গেল তখন সে একটি বড় খরমুজ কাটছিল। তার আশপাশে তারই মতো ভিক্ষুকের বেশে আরও অনেকে বসে ছিল, তাদের সামনেও খরমুজ। রাজকর্মচারীকে দেখেই অন্যান্যরা ভয়ার্ত হয়ে সরে দাঁড়াল।

একজন বলল, "প্রভু ! ইনি হিন্দু বৈদ্য।"

বৈত্যের ময়লা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে রাজকর্মচারীর মুখে একটু বিরক্তি প্রকাশ পেল। পুনরায় সে তার চেহারার প্রতি তাকাল। তার চেহারা ওই কাপড়ের সঙ্গে মানাচ্ছিল না। তার মুখে ভয় ও দৈন্যের লেশমাত্র নেই। তার নীল চোখের দীপ্তি রাজকর্মচারীটিকে প্রভাবিত করল। তার ললাটের কুঞ্চিত ভাব বিলীন হয়ে গেল। সে কিছুটা শিষ্ট স্বরে প্রশ্ন করল, "তুমি বৈত্য ?"

"হ্যাঁ।"

"কোথাকার ?"

"তক্ষশিলার।"

তক্ষশিলার নাম শুনে রাজকর্মচারী আরও নম্র হয়ে বলল, "আমাদের বক্ষু-সোগ্দের ক্ষত্রপের স্ত্রী শাহানশাহের বোনের অসুখ। তুমি তার চিকিৎসা করতে পারবে ?"

"কেন পারব না, আমি তো বৈত্য।"

"কিন্তু, তোমার এই পোশাকে ?"

"পোশাক তো আর চিকিৎসা করবে না, চিকিৎসা করব আমি।"

"কিন্তু, এ খুব বেশী ময়লা।"

"আজ আমার এগুলি বদলাবারই কথা। এক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা কর"—বলে বৈত্য পরিহিত বস্ত্রের চেয়ে পরিষ্কার একটি পশমের চোগা পরল, এবং হাতে ঔষধের মোড়ক ভর্তি একটি চামড়ার থলি নিয়ে রাজকর্মচারীর সঙ্গে চলল।

বাদশাহী পান্থশালার অঙ্গনে গাধার বিষ্ঠা কিংবা ভিখারী ঠগদের কোনো আস্তানা ছিল না। সেখানকার সব জায়গাই পরিষ্কার। ওপরে যাওয়ার সিঁড়িতে নানা রঙের গাল্‌চে বিছানো, সিঁড়ির দু'দিকটায় সুন্দর কারুকার্য করা এবং ঘরের মেঝেতে মহামূল্যবান ফরাস বিছানো। দরজায় দ্বিধাবিভক্ত সূক্ষ্ম পর্দা ঝোলানো, তার পাশে মার্বেল পাথরের মূর্তির মতো অনেক সুন্দরী নীরবে দাঁড়িয়ে। দরজায় গিয়ে রাজকর্মচারী বৈত্যকে দাঁড়াবার জন্য ইশারা করল এবং একটি সুন্দরীর কানে কানে কিছু বলল। সে খুব আস্তে আস্তে দরজা খুলল। ভিতরকার পর্দার জন্য সেখানটায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তরুণী ফিরে এল এবং বৈত্যকে তার সঙ্গে যেতে বলল।

ঘরের ভিতরে ঢুকতেই মধুর সুগন্ধের সুরভি বৈত্যের নাকে এল। ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে সে ঘরের চারিদিকে তাকাল। গৃহসজ্জার নিপুণতায় সূক্ষ্ম রুচির পরিচয় বহন করছিল। ফরাস, পর্দা, মসনদ, দীপদানী, চিত্র এবং মূর্তিগুলি সবই এ রকম ভাবে সাজানো ছিল যে, বৈত্য ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। সম্মুখে একটি গদীর ওপর দেওয়ালের পাশে তু'তিনটি মসনদ ছিল, তার একটিতে একজন মাঝারি বয়সের স্থূলকায় পুরুষ বসে। তার আকর্ণবিস্তৃত গোঁফে শাদা রঙ ধরেছে। তার পিঙ্গল চোখে রাত্রি জাগরণ ও তীব্র দুশ্চিন্তার ছাপ। তার

কাছে এক অনুপম সুন্দরী রমণী উপবিষ্ট যার রঙ শুধু মাখনের মতোই নয়, মাখনের চেয়েও অধিক কোমল বলে মনে হচ্ছিল। তার কপোলের ওপরটা ছিল হাল্‌কা লাল কিন্তু এখন তা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। পাতলা ঠোঁটের সঙ্গে শুক চঞ্চুরই উপমা দেওয়া যায়। ধনুকের মতো বাঁকা ক্ষীণ ভ্রূ-যুগল সোনালী ; তায় দীর্ঘ পক্ষ্মবিশিষ্ট নীল চোখ বিষণ্ণ ও আরক্তিম। কেশদাম সুবর্ণ সূক্ষ্ম জালে সজ্জিত। সোনালী ভেলভেটের কাঁচুলি ও লাল শালোয়ার তার অঙ্গাবরণ। সেই অনিন্দ্যকান্তি অঙ্গে মণিমুক্তার অলঙ্কার বাহুল্য মনে হচ্ছিল। এ দু'জন ছাড়াও ঘরের ভেতর আরও অনেক সুন্দরী দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের চেহারা ও বিনীতভাব দেখে বৈদ্য বুঝতে পারল যে, এরা সবাই ক্ষত্রপের অন্তঃপুর-পরিচারিকা। পুরুষ বলতে সেখানে শুধু ক্ষত্রপই ছিল। সে একবার বৈদ্যের মাথা হতে পা পর্যন্ত দেখল কিন্তু তার নীল নেত্রের দিকে তাকিয়ে ক্ষত্রপের বুঝতে অসুবিধা হল না যে, যদি আমি আমার পোশাক একে পরিয়ে দিই তা'হলে এই পশুর্পুরীর (পর্সগোলীস) সুন্দরতম তরুণদের মধ্যে তাকেও একজন বলে গণ্য করা যাবে।

ক্ষত্রপ বিনীতভাবে বলল, "তুমি তক্ষশিলার বৈদ্য ?"

"হ্যাঁ, মহাক্ষত্রপ !"

"আমার স্ত্রীর খুব অসুখ। কাল থেকে অবস্থা অত্যন্ত খারাপের দিকে। আমার নিজের দু'জন বৈদ্যের ঔষধের কোনো ফলই দেখা যাচ্ছে না।"

"আমি ক্ষত্রপের স্ত্রীকে দেখবার পর বৈদ্যদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"তারা এখানে উপস্থিত আছে। আচ্ছা, তবে চল —ভেতরে যাই।"

শ্বেতপাথরের দেওয়াল থেকে যেমনি শ্বেত পর্দাটা সরিয়ে দেওয়া হল, তখনই ভেতরে যাবার রাস্তা দেখা গেল! ক্ষত্রপ এবং ষোড়শী আগে আগে —বৈদ্য তাদের পেছনে পেছনে চলল। ভিতরে হাতীর দাঁতের পায়াওয়ালা একটি পালঙ্কে বিছানা, তার ওপর ফেনসদৃশ কোমল সাদা শয্যার ওপর রোগিণী শুয়ে ছিল। তার শরীর শ্বেত কদলী-মৃগচর্মের আবরণে ঢাকা শুধুমাত্র চিবুকের উপরিভাগ খোলা। ক্ষত্রপকে আসতে দেখে পরিচারিকা সরে দাঁড়াল। বৈদ্য কাছে গিয়ে দেখল, রোগিণীর চেহারার সঙ্গে ষোড়শীর চেহারায় অবিকল মিল কিন্তু তার তরুণ সৌন্দর্যের স্থলে রোগিণীর ভেতর প্রৌঢ়াবস্থার প্রভাব এবং তার ওপর আবার দীর্ঘ রোগভোগের ঝড়-ঝাপটার চিহ্ন। তার লাল টুকটুকে ঠোঁট এখন ফিকে, পরিপুষ্ট গাল বসে গিয়েছে। চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। ক্ষত্রপ মুখ কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "অফ্‌শা !"

রোগিণী একটুখানি চেয়েই আবার চোখ বন্ধ করল।

বৈদ্য বলল, "আংশিক মূর্চ্ছা।" সে তার হাত বের করে নাড়ী দেখল —বড় কষ্টে নাড়ী পেল। শরীর প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল।

ক্ষত্রপ, বৈদ্যের মুখ গম্ভীর হতে দেখল। বৈদ্য একটু ভেবে বলল, "একটুখানি দ্রাক্ষা সুরা চাই, যত বেশী পুরনো হয় ততই ভালো।"

ক্ষত্রপের নিকট এর অভাব ছিল না। রক্তের মতো লাল পুরনো দ্রাক্ষা সুরায় পরিপূর্ণ শুভ্র কাঁচের ঘড়া নিয়ে আসা হল—আর তার সঙ্গে এল মণিমুক্তা খচিত সোনার চষক (পেয়ালা)। বৈদ্য একটি পুঁটলী খুলল এবং ডান হাতের আঙুলের বড় নখ দিয়ে এক রত্তি ওষুধ বের করে রোগিণীকে হাঁ করাতে বলল। হাঁ করাতে ক্ষত্রপের বেশী কষ্ট হল না। সে ঔষধ মুখের ভেতর ঢেলে দিয়ে এক ঢোক সুরা মুখে ঢেলে দিল, রোগীকে গিলতে দেখে বৈদ্য সন্তুষ্ট হয়ে ক্ষত্রপকে বলল, "এখন আমি বাইরে মহাক্ষত্রপের বৈদ্যদের সঙ্গে দেখা করতে চাই, কিছুক্ষণ পরে মহাক্ষত্রপানী চোখ মেলবেন তখন আমার কাছে থাকা প্রয়োজন।" বৈদ্য অন্য ঘরে পার্শব বৈদ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করল। রোগিণী সোগ্দ (পার্শব) থেকে আসার সময় যে জ্বর নিয়ে এসেছিল, তখন হতে আজ পর্যন্ত অবস্থা পার্শব বৈদ্যরা বর্ণনা করল। এই সময় পরিচারিকা এসে সংবাদ দিল যে প্রভুপত্নী মহাক্ষত্রপকে ডাকছেন। মহাক্ষত্রপের চেহারার ওপর দিয়ে নতুন আশার ঝলক বয়ে গেল। বৈদ্যকে সঙ্গে করে ভেতরে গেল। ক্ষত্রপানীর চোখ সম্পূর্ণ খোলা—তার চেহারায় জীবনের স্পন্দন দেখা যাচ্ছিল।

ক্ষত্রপানী ধীর সংযত স্বরে বলল, "আমি বুঝতে পারছি, তুমি খুবই কষ্ট করছ। আমি যে ভালো হয়ে উঠব তাই বলবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি।"

ক্ষত্রপ বলল, "এ কথা আমাকে এ হিন্দু বৈদ্যও বলেছিল।"

আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে ক্ষত্রপানী বলল, "হিন্দু বৈদ্য শুনেছে—কি আমার অসুখ; আমার অসুখ কি সেরে গেছে বৈদ্য?"

"হ্যাঁ, অসুখ সেরে গেছে, কিন্তু মহাক্ষত্রপানী! একটু বিশ্রাম নিতে হবে। আমি ভাবছি যে কত তাড়াতাড়ি আপনাকে পশুপুরী যাওয়ার উপযুক্ত করে তোলা যায়; আমার নিকট অভূতপূর্ব রসায়ন আছে, হিন্দুদের রসায়ন আপনাকে দিচ্ছি। একটু একটু দ্রাক্ষা এবং ডালিমের রস দিয়ে খেতে হবে।"

"বৈদ্য! তুমি রোগ চেন, অন্যরা তো গাধার চেয়ে গাধা! তোমার নির্দেশ মতোই চলব। রোশনা!"

ষোড়শী সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "মা।"

"বেটি! তোমার চোখের জল মুছে ফেল। ওই হাকিমগুলো আমাকে মেরে ফেলত। কিন্তু এখন আর কোনো চিন্তা নেই। হিন্দু বৈদ্যকে অহুর মজদা পাঠিয়েছেন। এঁর যেন কোনো কষ্ট না হয়। বৈদ্য আমাকে যা খেতে বলবে তা তুমি নিজ হাতে আমাকে দিও।"

বৈদ্য রোশনাকে কয়েকটি কথা বলে বাইরে চলে গেল। ক্ষত্রপের চেহারা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বৈদ্য কিছু ঔষধ ভূর্জপত্রের টুকরোয় বেঁধে ক্ষত্রপের নিকট দিয়ে যখন নিজে পান্থশালায় ফিরে যেতে চাইল তখন ক্ষত্রপ বলল, "আমাদের সঙ্গেই তুমি থাক।"

"কিন্তু আমি দরবারে থাকবার পদ্ধতি জানি না।"

"তবুও মানুষের-সঙ্গে থাকার আচার-ব্যবহার তুমি ভালোই জানো। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার।"

"আমি থাকলে আপনার পরিচারিকাদের কষ্ট হবে।"

"আমি একদম আলাদা একটি ঘর তোমাকে দিচ্ছি। তুমি কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব।"

"মহাক্ষত্রপানীর জন্য আর কোনো চিন্তার কারণ নেই। হাকিমরা অসুখ ঠিকমতো নির্ধারণ করতে পারেনি। আমি আর দু'ঘণ্টা পরে এলে বাঁচবার কোনো আশা ছিল না। কিন্তু এখন তাঁর অসুখ সেরে গেছে।"

ক্ষত্রপের আগ্রহের জন্য বৈদ্য বাদশাহী পান্থশালায় থাকতে রাজী হল।

ক্ষত্রপানী চতুর্থ দিন থেকে উঠে বসতে লাগল এবং তার চেহারার ম্লানতা খুব তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যেতে লাগল। সবচেয়ে প্রসন্ন হল রোশনা। দ্বিতীয় দিন সে ক্ষত্রপের দেওয়া তার নিজের মহামূল্য দু'বছরের চোগাটি (পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড) এনে বৈদ্যকে দিল। আজকের এই চোগা, সোনালী কোমর বন্ধনী আর স্বর্ণখচিত পাদুকায় সজ্জিত নাগদত্তের সঙ্গে সেদিনের সেই খরমুজ-খাওয়া লোকটির মিল ছিল না।

ক্ষত্রপানী এখন লঘু আহার গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। ষষ্ঠ দিনের সন্ধ্যাবেলা সে বৈদ্যকে ডেকে পাঠাল। বৈদ্যকে মহাক্ষত্রপানী কাছে এলে বসতে বলল এবং বসার পরে বলল, "বৈদ্য! আমি তোমার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ। এই নির্জন পথিমধ্যে মজদা তোমাকে আমায় বাঁচাবার জন্য পাঠিয়েছেন। তোমার জন্মস্থান কোথায়?"

"তক্ষশিলা।"

"তক্ষশিলা! খুব প্রসিদ্ধ নগর, বিদ্যার জন্য বিখ্যাত। তুমি তার রত্ন!"

"না, আমি সেখানকার একজন সাধারণ নতুন বৈদ্য।"

"কিন্তু তারুণ্য গুণের বৈরী নয়। তোমার নাম কি বৈদ্যরাজ?"

"না .দত্ত কাপ্য।"

"পুরো নাম বলা আমার পক্ষে কষ্টকর। নাগ বলাই যথেষ্ট, কেমন?"

"যথেষ্ট, মহাক্ষত্রপানী!"

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"এখন তো যাচ্ছি পশুর্পুরী (পর্সপোলীস)।"

"তারপর ?"

"পথ চলার অভিপ্রায়েই আমি ঘর ছেড়ে যাত্রা করেছি।"

"আমিও পর্শুপুরী যাচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গেই চল। আমি সব রকমে তোমার তদারক করব ; রোশনা তুমি নিজে বৈদ্যরাজের আরামের ব্যবস্থা কর। দাসরা মোটেই যত্ন করে না।"

"আমি নিজেই দেখব, মা! সোফিয়াকে আমি এ কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।"

"যে সোফিয়া যবনীকে আমার ভাই এখানে আমার জন্যে পাঠিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ, মা! তোমার তো কোনো কাজ ছিল না এবং মেয়েটিকে বেশ চালাক বলে মনে হচ্ছে তাই আমি তাকেই লাগিয়ে দিয়েছি।"

"তা'হলে বৈদ্যরাজ, আমার সঙ্গে পর্শুপুরী যেতে হবে, আমি তোমার ইচ্ছার প্রতিকূল কিছু করব না কিন্তু আমি চাই তুমি আমার পরিবারের বৈদ্য হয়ে থাক।"

নাগদত্ত কিছুক্ষণ বসে থেকে নিজ কাজে চলে গেল।

৩

পৃথিবীর এত বড় বিশাল রাজ্যের রাজধানী যে এ রকম নগ্ন বৃক্ষ-বনস্পতিবিহীন পাহাড়ে, প্রাকৃতিক দীনতায় বিজড়িত তা নাগদত্ত কল্পনাও করেনি। একদা পর্শুপুরী মহানগরী ছিল, রাজপ্রাসাদের বিশাল সমুজ্জ্বল পাষাণ-স্তম্ভ, তার গগনস্পর্শী শিখর দেখলেই শাহানশাহী প্রতিপত্তি বুঝতে পারা যায়। নগরের সমৃদ্ধিও তদনুরূপ। কিন্তু এ সবই মনুষ্য নির্মিত। প্রকৃতি নিজে তাকে অত্যন্ত দরিদ্র করে তৈরী করেছিল।

পর্শুপুরী এবং শাহানশাহী বৈভব দেখার জন্য শাহানশাহার বোন অফ্‌শার আশ্রয়ের চেয়ে ভালো সুযোগ মিলবে না। ক্ষত্রপানী পর্শুপুরী পৌছে নাগদত্তের আরামের প্রতি বিশেষ নজর দিলেন এবং যখন তিনি তার পারিশ্রমিক দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন তখন বৈদ্য সোফিয়াকে চেয়ে নিল। তখনও সোফিয়ার ভাঙাভাঙা পার্শি ভাষা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু নাগদত্ত এ কথা জানত যে, ওই চকিত চোখের ভেতর তীক্ষ্ণ প্রতিভা লুকিয়ে আছে। যখন সে তার হল —অর্থাৎ দাসী হিসাবে সে যখন নাগদত্তের কাছে এল, নাগদত্ত তাকে দাসী বলে মনে করল না। আস্তে আস্তে তার ভাষার সঙ্গে আরো বেশী পরিচিত হতে লাগল। নাগদত্ত নিজে যবনী (গ্রীক) লিপি শিখল এবং সোফিয়া তার চেয়ে বেশী পরিশ্রম করে এথেনীয় শেখাতে লাগল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে সে তাতে সফল হল। একদিন সোফিয়া তরুণ বৈদ্যের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, "ভাগ্য কিংবা সুযোগ —যাই বল না কেন, আমি কি কোনোদিনও আশা করতে পেরেছি যে, তোমার মতো কোমল স্বভাবের প্রভুর দাসী হতে পারব!"

"না, সোফিয়া! তুমি যদি ক্ষত্রপানীর সঙ্গে থাকতে তবে বোধহয় বেশী আরামে

থাকতে পেতে। কিন্তু সোফিয়া! তুমি আমাকে প্রভু বলো না। দাসপ্রথার কথা শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে।"

"কিন্তু আমি যে তোমার দাসী।"

"তুমি দাসী নও। আমি ক্ষত্রপ-দম্পতিকে বলে দিয়েছি যে, সোফিয়াকে আমি দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করলাম।"

"তা'হলে এখন আর আমি দাসী নই!"

"না, তুমি এখন আমার মতোই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এবং এখন তুমি যেখানে যেতে চাইবে আমি তোমায় সেখানে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করব।"

"কিন্তু, যদি তোমার কাছেই থাকতে চাই, তা'হলে তাড়িয়ে দেবে না তো?"

"সম্পূর্ণভাবে সেটা তোমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।"

"দাসত্ব মানুষকে কতই না খর্ব করে? পিতৃগৃহে আমি আমাদের দাসদের দেখেছি, তারা আমোদ-প্রমোদ করত; কিন্তু আমি কখনও বুঝতে পারিনি যে তাদের হাসির মধ্যে এত ব্যথা লুকিয়ে ছিল। আমি যখন নিজে দাসী হলাম তখন অনুভব করলাম—দাসত্ব কি রকম নরক!"

"তুমি কেমন করে দাসী হলে, সোফী? যদি কষ্ট না হয় তবে বল।"

"আমার বাবা এথেন্স নগরের একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক ছিলেন। যখন ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ আমাদের নগর জয় করল, তখন বাবা পরিবারের লোকদের নিয়ে নৌকায় করে এশিয়ায় পালিয়ে এলেন। আমরা মনে করেছিলাম যে সেখানে আশ্রয় পাব, কিন্তু যে নগরে গিয়ে আমরা অবতরণ করলাম, কয়েক মাস বাদেই পার্শবরা তার ওপর আক্রমণ করল। নগরের পতন হল, আর পালানো-দৌড়ানোর মধ্যে কে কোথায় গিয়েছে, কত নাগরিককে পার্শবরা বন্দী করেছে জানি না। আমি দেখলাম, আমি সেই বন্দীদের একজন। আমি সুন্দরী ছিলাম, তার ওপর বয়সে তরুণী বলে তারা আমাকে সেনাপতির নিকট পাঠিয়ে দিল। সেনাপতির নিকট হতে বাদশার কাছে এলাম। বাদশার নিকট আমার মতো শত শত তরুণী ছিল, সে নিজের বোন আসছে শুনে আমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিল। যদিও আমি দাসী, কিন্তু নিজের রূপের জন্য খাস মহলের দাসী ছিলাম। তার জন্যই আমার অনুভূতি সাধারণ দাসীদের মতো হতে পারেনি, তবুও আমি জানি যে এর কি যাতনা! আমারও মনে হত যে আমি মানবী নয়।"

"তা'হলে সোফী, তোমার বাবার সঙ্গে আর দেখা হয়নি?"

"এখনও তিনি বেঁচে আছেন বলে আমার মনে হয় না। এখন তো আমি হাওয়ায় ওড়ানো শুকনো ঝড়ো-পাতা। প্রিয় এথেন্স নগর ধ্বংস হয়ে গেছে, বাবা যদি এখনও জীবিত থাকেন তা'হলেও আমাদের মিলনের স্থান কোথায়?"

"এথেন্স কি মহানগরী, সোফিয়া ?"

"একদিন ছিল! কিন্তু এখন তা ধ্বংসপ্রাপ্ত ; আমাদের যে 'গণ' একদিন মহান্ দারয়োশদের কঠোর শিক্ষা দিয়েছিল তাকে ক্ষুদ্র ফিলিপ মাথা নত করতে বাধ্য করেছে।"

"কেন এমন হল সোফিয়া ?"

"পার্শবদের অনেক আক্রমণের প্রতিকার করেও এথেন্সের কিছু মনীষীদের মাথায় খেয়াল চাপল যে, যতদিন পর্যন্ত আমরা পার্শবদের তুল্য একটি বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করতে পারছি ততদিন আমাদের নিস্তার নেই।"

"আহা, তক্ষশিলা! তুমিও বিষ্ণুগুপ্তের মতো লোক সৃষ্টি করেছ!"

"তক্ষশিলা, বিষ্ণুগুপ্ত —এ সব কি, নাগ!"

"তক্ষশিলা আমার জন্মভূমি, আমাদের 'গণ'ও মহান্ দারয়োশ এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের অনেকবার মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু আমার সহপাঠী বিষ্ণুগুপ্ত এখন সেই কথাই বলছে যা একদিন ফিলিপের সাহায্যকারী এথেন্সের নাগরিকরা বলেছিল।"

"তক্ষশিলাও কি আমাদের এথেন্সের মতো 'গণ' ?"

"হ্যাঁ, ওইরূপ 'গণ'! আর আমাদের তক্ষশিলায় কেউ দাস নেই, সেখানকার জমিতে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই অ-দাস হয়ে যায়।"

"আহা, করুণাময়ী তক্ষশিলা! তাই নাগ, আমি প্রথম দিন থেকেই দেখছি যে দাসদের সঙ্গে ব্যবহার করতে তুমি জান না।"

"আর আমি কখনও তা তোমাকে জানতেও দেব না। আমি বিষ্ণুগুপ্তকে বলেছি যে, যদি তুমি মগধকে তক্ষশিলা গ্রাস করতে সাহায্য কর তা'হলে তক্ষশিলার পবিত্র ভূমি দাসত্বের কলঙ্ক-মুক্ত থাকবে না!"

"মগধ কি নাগ!"

"হিন্দের (হিন্দুস্থানের) ম্যাসিডোনিয়া —তক্ষশিলার পূর্বে এক বিশাল হিন্দুরাজ্য। পার্শবদের আক্রমণ আমরা প্রতিরোধ করে আসছি, কিন্তু জিতে জিতেও আমরা দুর্বল এবং হারার মতো হয়ে গেছি। বস্তুত তক্ষশিলা একা পার্শব শাহানশাহের মোকাবিলা করতে পারে না, কিন্তু আমি এর প্রতিরোধের একমাত্র প্রতিকার হিসাবে বলেছি, নিজেদের সমস্ত গণগুলিকে সংঘবদ্ধ হতে।"

"কিন্তু নাগ! আমাদের দেশে এও করে দেখা হয়েছে। আমাদের মতো হেল্লা জাতিকে দিয়ে 'গণ-সংঘ' তৈরী করে পার্শবদের মোকাবিলা করেছে কিন্তু সে সংঘ স্থায়ী হতে পারল না। 'গণ-সংঘের' মধ্যে নিজ নিজ গণের স্বতন্ত্রতার ওপর এত নজর যে, সেখানে সংঘকে স্থান ছেড়ে দিতে কেউ রাজি নয়।"

"তা'হলে কি আমিই ভুল প্রমাণিত হব এবং বিষ্ণুগুপ্ত সঠিক !"

"বিষ্ণুগুপ্ত কি সংঘের সফলতা দেখতে পায় না ?"

"হ্যাঁ। সে বলে, আমাদের শত্রু যতটা শক্তিশালী তাতে তার মোকাবিলা করা গণগুলির সংঘ দিয়ে হতে পারে না। অনেকগুলি গণের সীমা নষ্ট করে যদি একটি মহান্ 'গণ' তৈরী করা যায় তবে হয়ত সম্ভব হতে পারে, কিন্তু 'গণ' এ কথা স্বীকার করতে রাজী হবে না।"

"হয়ত তোমার বন্ধু ঠিকই বলেছে, নাগ ! কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত এথেন্সের স্বতন্ত্রতা ছেড়ে দেবার কথা মনে আসতে দিইনি।"

"তা'হলে সোফিয়া ! 'গণ' হয়েও এথেন্স কেন এ দাসত্বকে স্বীকার করল ?"

"নিজের পতন শীঘ্র ডেকে আনার জন্য। ধনীর লোভের জন্যেই দাস-প্রথার প্রভাব বাড়ল এবং আস্তে আস্তে মালিকের চেয়ে দাসদের সংখ্যা বেড়ে গেল।"

"এখানে পার্শবদের ভেতর সব চেয়ে কোন প্রথা খারাপ বলে মনে হয় ?"

"দাসত্ব, যা আমাদের ওখানেও ছিল। আর বাদশা এবং ধনীদের অন্তঃপুর।"

"তোমাদের ওখানে এ রকম হয় না ?"

"আমাদের ওখানে ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপও একাধিক বিয়ে করতে পারে না। এখানে তো ছোট রাজকর্মচারীও বহু বিবাহ করে।"

"আমাদের দেশেও একাধিক বিয়ে দেখা যায়, যদিও তার সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু আমি একে স্ত্রীজাতির দাসত্বের নিদর্শন বলে মনে করতাম। এথেন্স যদি দাসত্ব-প্রথা চালু করে থাকে তবে তক্ষশিলাও বহুবিবাহ প্রথা চালু রেখে সেই একই অন্যায় করেছে।"

"আর অল্পসংখ্যক ঘরেই সম্পদ জমা হওয়া ?"

"আমি বিষ্ণুগুপ্তকে বলেছিলাম, 'গণ'-এ এত ধনরত্ন থাকতেও কেন অন্যের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে না। তুমি রাজার মতো জলের ন্যায় ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিতে পার না। এখানে তো তুমি দেখছ সোফী ! মূল্যবান মৃগচর্ম, মণি, মুক্তা ইত্যাদি বস্তুর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার। এ গোলাপী গাল, এ প্রবালী অধর একবার মনেও করে না যে, এগুলি উৎপন্ন করতে কত সহস্র লোক না খেয়ে মরেছে ! আমাদের ঘরের পড়ে যাওয়া জল নিয়েই সমুদ্রের জলরাশি। মাটিতে যারা সোনা ফলায় তারা মরছে না খেয়ে, আর সোনাকে যারা মাটি করে দেয় তারা খাবার নষ্ট করছে। আমি যতবার বাদশার কাছে গিয়েছি —প্রত্যেকবারই ফেরবার সময় আমার মাথা ধরেছে ! আমি সমস্ত সমৃদ্ধির ভেতর শীতে জমে, গরমে জল হয়ে মরবার মানুষ ওই কর্মকারদের দুঃখের নিশ্বাস ফেলতে শুনি, আমাকে সতর্ক করে যাওয়া তাদের লাল মদিরা প্রজাদের রক্ত রূপে দেখা যাচ্ছে। পশুপুরীতে আমার তিক্ততা এসেছে তাই তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাতে চাই !"

"কোথায় যেতে চাইছ নাগ ?"

"প্রথমে তোমার মতামত জানতে চাই।"

"কোথায় আমি বলব !"

"যবন-লোক (গ্রীস) ?"

"খুব ভালো হয়।"

"তবে সেদিকেই যাব।"

"কিন্তু, রাস্তায় আবার আমাকে কেউ যদি কেড়ে নেয় এবং তারপর নাগের মতো ত্রাণকর্তা যদি না পাই !" সোফিয়ার কণ্ঠস্বর খুবই নরম, তার সুন্দর আয়ত নয়ন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

নাগদত্ত তার কানের ওপর ঝুলে-পড়া সোনালী চুলগুলিকে স্পর্শ করে বলল, "আমি তার উপায় ঠিক করে রেখেছি কিন্তু তার জন্যে তোমারও সম্মতি প্রয়োজন।"

"কি ?"

"ক্ষত্রপ, ক্ষত্রপানী এবং শাহানশাহার নিকট হতে আমার জন্য চিঠি নিয়ে নেব যে, এ শাহানশাহার সম্মানিত হিন্দু বৈদ্য।"

"তা'হলে আর আমাকে কেউ কেড়ে নেবে না ?"

"আর যদি তুমি পৃথিবীসুদ্ধ লোককে দেখাবার জন্য বৈদ্যের স্ত্রী হতে চাও, তা'হলে চিঠিতে তোমার নামও লিখিয়ে নেব।"

সোফিয়া ছল-ছল চোখে নাগদত্তের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, "নাগ ! তুমি কত উদার, তোমার মনের গভীরতা তুমি জানাতে চেষ্টা কর না। তুমি কত সুন্দর, কিন্তু তুমি কখনও এখানে তোমার প্রতি আকৃষ্টা পুষ্পরাগ এবং নীলিমা চোখে দেখনি ? নাগ ! রোশনা কতবার আমার কাছে তোমার জন্য প্রেম নিবেদন করেছে ! তার কোন এক আধমরা ভাই আছে তাই তার বাপ-মা চায় রোশনাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে, কিন্তু সে চায় তোমাকে।"

"ভালোই হয়েছে যে আমি জানিনি, জানলে অস্বীকার করতে হত। সোফিয়া ! আমি প্রাসাদপোষিতাদের জন্য নয়। আমি বোধহয় কারুর জন্যেই নয়। আমার সঙ্গে যে প্রেম করবে তার সুখ-নিদ্রার সুযোগ ঘটবে না। কিন্তু যদি তুমি চাও তবে শাহানশাহার চিঠিতে তোমার নাম নিজ স্ত্রী বলে লিখিয়ে নেব। যবন দেশে যদি তোমার কোনো প্রিয়পাত্র জুটে যায় তা'হলে তোমাকে নিজের পথ দেখতে হবে।"

৪

বৈদ্য নাগদত্তের সব জায়গা থেকেই ডাক আসত। সে হিন্দু বৈদ্য পার্শব শাহানশাহ দারয়োশের একদা চিকিৎসক ছিল, আর তার চিকিৎসা ছিল অদ্ভুত রকমের।

পঞ্চপুরীতে থাকাকালীন সে যবন-ভাষা শিখেছিল, তার ওপর সোফিয়া তার সহচারিণী। সে ম্যাসিডোনিয়া ঘুরে দেখল এবং ফিলিপের পুত্র অলিকসুন্দরের গুরু আরিস্টোটলের সঙ্গে পরিচিত হল।

নাগদত্ত নিজেও একজন দার্শনিক কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে আরিস্টোটলের শাহানশাহী তত্ত্বের সঙ্গে তার মতভেদ ছিল। তবুও সে আরিস্টোটলের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখিয়ে ম্যাসিডোনিয়া থেকে বিদায় নিল। আরিস্টোটলের যে চিন্তাধারা তার পছন্দ হয়েছিল তা হল, সত্যের পরীক্ষার জন্য বুদ্ধি নয়, জাগতিক পদার্থেরই প্রয়োজন। আরিস্টোটল প্রয়োগ-প্রমাণিত বস্তুকে উচ্চে স্থান দিত। নাগদত্তের আফসোস ছিল এ জন্য যে, ভারতীয় দার্শনিকরা সত্যকে মন থেকে সৃষ্টি করতে চায়। নাগদত্ত অরস্তুর শিষ্য মনস্বীর অনেক প্রশংসা তার গুরুর মুখে শুনেছে এবং সে নিজেও কতবার তার বিষয়ে কথাবার্তা বলেছে। সেই তরুণের মধ্যে শুধুমাত্র অসাধারণ শৌর্যই ছিল না ছিল অসাধারণ বিচারশক্তিও। নাগদত্ত এথেন্স গিয়ে ফিরে আসার জন্য আরিস্টোটলের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিল, কিন্তু যবন দার্শনিকের সঙ্গে এই তার শেষ দেখা, তা সে কি করে জানবে!

বীরের জননী, গণতন্ত্রের বিজয়ধ্বজাধারিণী এথেন্স নগরে সে ততটাই শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে উপস্থিত হল যতটা যে তক্ষশিলার জন্য করত। নগর পুনরায় উর্বর হয়েছিল কিন্তু সোফিয়া বলল যে, এখন আর সেই পুরনো এথেন্স নেই। বেনস্ জুপিটারের মন্দির এখনও অমর কারুকার্যের সুন্দর কীর্তিতে অলঙ্কৃত। কিন্তু সোফিয়া একদিন এথেন্স নাগরিকদের প্রাণে যে উৎসাহ, যে জীবন-স্পন্দন দেখেছিল আজ আর তা নেই।

সোফিয়ার বাবার জমির ওপর তৈরী ঘরের মালিক একজন ম্যাসিডোনিয়ার ব্যবসায়ী। সে ঘর দেখে সোফিয়া এতদূর উদ্বিগ্ন হল যে, সে নিজেই তার স্বভাব-গাম্ভীর্যের বিরুদ্ধাচরণ করল। কিন্তু, সে কথা কম বলত। কখনও তার চোখ অশ্রুজলে ভরে যেত আবার কখনও সে পাথরের মূর্তির মতো হয়ে থাকত। নাগদত্ত বুঝতে পারল যে, নিজের প্রিয় বাল্যস্থানের ঐ রকম অবস্থা দেখে তার মনে বিকার জন্মেছে। শেষটায় সোফিয়ার মর্মান্তিক শোকচ্ছায়া নাগদত্তকেও আচ্ছন্ন করে ফেলল।

যখন সোফিয়া প্রকৃতিস্থ হল তখন সে একদম বদলে গেল। নিজের সাজ-সজ্জার ওপর তার কখনও বিশেষ খেয়াল ছিল না। কিন্তু এখন সে গণতন্ত্রী এথেন্সের তরুণীদের মতো নিজের খোলা সোনালী চুলগুলিকে ফুলের মালা দিয়ে খোঁপা বাঁধতে লাগল। তার শরীরের ওপর যবন-সুন্দরীদের পা পর্যন্ত ঝোলানো বিশেষ পছন্দ-করা সুন্দর কঞ্চুক এবং পায়ে অনেকগুলি ফিতা-যুক্ত স্যাণ্ডেল পরল। তার সুন্দর সাদা কপাল, লাল টুকটুকে ঠোঁটের তারুণ্যে—সৌন্দর্য এবং স্বাস্থ্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল। নাগদত্ত আশ্চর্য হল না বরং অপার আনন্দ লাভ করল।

এ ব্যাপারে নাগদত্ত একদিন প্রশ্ন করায় সোফিয়া বলল, "প্রিয় নাগ! আমি এতদিন পর্যন্ত জীবনটাকে একমাত্র শোক এবং অতীত চিন্তার বস্তু বলে মনে করে এসেছি কিন্তু এখন সে ধারণা আমার ভুল বলে মনে হচ্ছে। জীবন সম্বন্ধে এ রকম একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী জীবনের মূল্যকে কমিয়ে দেয় এবং কার্য-ক্ষমতাকেও দুর্বল করে ফেলে। নাগ! শেষ পর্যন্ত তুমিও তক্ষশিলার ভবিষ্যতের জন্য কম চিন্তা করছ না, তবে তুমি মাথা ঠাণ্ডা রেখেই উপায় উদ্ভাবনের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছ।"

"সোফী! তোমাকে এতটা আনন্দিত দেখে আমি খুবই খুশী।"

"কেন আনন্দ হবে না, আমি এথেন্সে ফিরে এসে নিজের প্রিয়কে খুঁজে পেয়েছি।"

নাগদত্ত হর্ষোল্লাসে পুলকিত হয়ে বলল, "খুবই আনন্দের কথা যে, তুমি এতদিন পরে নিজের প্রিয়কে ফিরে পেয়েছ।"

"নাগ! আমি দেখছি যে তুমি মানুষ নও, দেবতাদের চেয়েও বড়, ঈর্ষা তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না।"

"ঈর্ষা! ঈর্ষার এখানে প্রয়োজন কি? সোফী! আমি কি তোমাকে যবন দেশে পৌছে দেবার দায়িত্ব নিইনি? আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি সেখানে গিয়ে তোমার প্রিয়কে খুঁজে নিও?"

"হ্যা, তা বলেছিলে।"

"তোমার এ অস্বাভাবিক আনন্দ দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে, তুমি নিশ্চয়ই অসাধারণ কোনো প্রিয় বস্তু পেয়েছ।"

"তোমার মনে করাটা ঠিকই নাগ!"

"তা'হলে তোমার প্রিয়তমকে এখানে নিমন্ত্রণ করবার কিংবা যদি সে এখানে না আসতে পারে তবে সেখানে গিয়ে দেখা করবার অনুমতি আমাকে দাও।"

"কিন্তু, তুমি এতটা উতলা হচ্ছ কেন?"

"সত্যিই কি আমি অস্থির হচ্ছি? তুমি ভুল বলছ না?" নাগদত্ত নিজেকে সামলিয়ে নিতে চেষ্টা করল।

সোফিয়ার ভয় হতে লাগল যে পাছে সে অশ্রু সম্বরণ করতে না পারে। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "দেখা করতে পার কিন্তু তোমাকে এথেন্সের তরুণের বেশ ধারণ করতে হবে।"

"বেশ, কাল তুমি যে নতুন স্যাণ্ডেল কিনে এনেছ আমি তা পরে নেব।"

"যাও, পরে এস, ইতিমধ্যে আমি আমার প্রিয়তমের জন্য মালা নিয়ে নিচ্ছি—লিদিয়া তার জন্যে মালা গাঁথছে।"

"বেশ"—বলে নাগদত্ত অন্য ঘরে চলে গেল। সোফিয়া বৈঠকখানার বড় আয়নার

সামনে দাঁড়াল। সে নিজের কাপড় এবং ফুলের ভূষণের ওপর একবার হাত বুলাল, আর একগাছা মালা আয়নার পিছনে রেখে আস্তে করে ঘরের দরজায় গিয়ে বলল, "নাগ! দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমার প্রিয়তম আবার কোনো প্রমোদশালায় চলে না যায়!"

"তাড়াতাড়ি করছি, সোফী।"

"আমি সাহায্য করব?"

"সে তোমার দয়া।"

নাগদত্ত নতুন স্যাণ্ডেল পরল। নাগদত্তের মুখের দিকে চাইতে সোফিয়ার সাহস হল না। সে তার হাত ধরে বলল, "প্রথমে আয়নায় নিজের নতুন পোশাক দেখে নাও।"

"তুমি তো দেখে দিয়েছ সোফী! সেটাই ভালো। বিনীত পোশাকই প্রয়োজন।"

"হ্যাঁ, আমার তো বিনীত-পোশাক বলেই মনে হচ্ছে কিন্তু একবার দেখে নেওয়াটা মন্দ নয়।" সোফিয়া নাগদত্তকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল, নাগদত্ত তার নিজের পোশাক দেখতে লাগল। তখন সোফিয়া মালা বের করে বলল, "এ মালা আমি প্রিয়তমের জন্য তৈরী করেছি।"

"বেশ সুন্দর মালা সোফী!"

"জানি না, তার কি রকম লাগবে—তার ধূসর চুলে লাল টুকটুকে গোলাপ মালা।"

"সুন্দর দেখাবে।"

"তোমার মাথার ওপর রেখে একটু দেখব?"

"সেটা তোমার ইচ্ছা। আমারও চুল ধূসর।"

"তাই তো পরীক্ষা করে নিতে চাই।" মালা নাগদত্তের মাথার ওপর রেখে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তা'হলে তুমি আজ আমার প্রিয়তমকে দেখতে চাও নাগ? এখুনি দেখতে চাও তো এই দেখ।"

আয়নায় নাগদত্তের প্রতিবিম্ব পড়ল। সোফিয়া জলভরা চোখে বলল, "এই আমার প্রিয়তম!" আর পরক্ষণেই নিজের বাহুপাশে নাগদত্তকে বেঁধে তার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট মিলিয়ে দিল। নাগদত্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। সোফিয়া তখন ঠোঁট সরিয়ে নিজের কপোল নাগদত্তের কপোলের সঙ্গে মিলিয়ে বলল, "আমার প্রিয়তম!"

"সোফী! আমি নিজেকে তোমার যোগ্য বলে মনে করি না।"

"নিজেকে আমি জানি। নাগ, এখন থেকে আমৃত্যু তোমার সঙ্গেই থাকব।"

নাগদত্তের অশ্রুর বাঁধ ভেঙে পড়ল, সে বলল, "মৃত্যু পর্যন্ত!"

৫

সলামীসের উপসাগর, যেখানটায় যবন নৌ-সৈন্যরা পার্শবদের বড় একটা যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। নাগদত্তের খুবই ইচ্ছা ছিল সেটা দেখার। দু'জনেই পথ চলছিল। নাগদত্ত

নিজের ভেতর নতুন উৎসাহ পাচ্ছিল এবং আস্তে আস্তে তার মন তক্ষশিলার দিকে ধাবিত হচ্ছিল। যখন দু'জনে রাস্তায় একটি গাছের নীচে বিশ্রাম করছিল তখন সোফিয়া বলল, "নাগ! ফিলিপ মারা গেছে, অলিকসুন্দর ম্যাসিডোনিয়ার রাজা হয়েছে আর সে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী তৈরী করছে।"

"হ্যাঁ, সে সমস্ত যবন সাগরের (ভূমধ্য) পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকার করতে চাইছে। তার মধ্যে পূর্ব এবং দক্ষিণ (মিশর) অঞ্চল তো পার্শবদের হাতে।"

"তার মানে হল যে, সে পার্শবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়।"

"আর এইভাবে গণতন্ত্রী যবনদের নিকট হতে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠায় সাহায্য নিয়ে এক ঢিলে দু'পাখী মারতে চায় সোফিয়া! শাহানশাহের যবন সাগর থেকে হটে যেতে হবে যদি স্বাধীনতা-প্রেমী যবনগণকে রাজভক্ত করানো সম্ভব হয়।"

"এ সবই আরিস্টোটলের শিক্ষা যা, তার সাহস বাড়াল!"

"দার্শনিক আরিস্টোটল!"

"হ্যাঁ, আর তার গুরু প্লেটো একটি আদর্শ 'গণ'-এর কল্পনা করেছিল কিন্তু সেও তাতে সাধারণ জনতাকে রাখতে চেয়েছিল। আরিস্টোটল আদর্শ গণের জায়গায় আদর্শ রাজচক্রবর্তীর কল্পনা করে। কি জানি এই যবন-চক্রবর্তী পার্শব-শাহানশাহকে পরাজিত করে কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে।"

"একবার পা বাড়িয়ে দিলে—তাকে আর থামানো ক্ষমতার বাইরে সোফী! আর সেখানে আমার সহ পাঠী বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্যও মগধের রাজচক্রবর্তীর সন্ধানে বেরিয়েছে।"

"যবন এবং হিন্দু চক্রবর্তীদের সিন্ধুতীরে মিলন হবে না-কি?"

"হবে, প্রথম কিংবা দ্বিতীয় পুরুষে। কিন্তু পৃথিবী তখন কত ছোট হয়ে যাবে!"

সমুদ্র তীর হতে তারা নৌকায় করে সলামীসের দিকে রওনা হল। সমুদ্র শান্ত, বাতাস একেবারেই বন্ধ। সোফী এবং নাগদত্ত দু'জনেই বিগত শতাব্দীর ইতিহাস রচয়িতা সমুদ্রকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে দেখছিল। এই সমুদ্রই পার্শবদের নৌবাহিনীকে ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিল। অনেক দূর চলে যাওয়ার পর খুব বড় তুফান উঠল। দু'জনেরই মনে হল, যেন বিগত শতকের ঐতিহাসিক তুফান কিন্তু তখনই তাদের দৃষ্টি ভয়ভীত নৌকারোহীদের ওপর পড়ল। আর দেখল যে পাল ছিঁড়ে গেছে এবং নৌকা ডুবছে।

সোফিয়া নাগদত্তকে নিজের বাহুপাশে বেঁধে বুকে বুক মিলিয়ে রইল। হাসি মুখে সে বলল, "মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গে থাকব।"

"হ্যাঁ, মৃত্যু পর্যন্ত"—বলে নাগদত্ত সোফিয়ার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট মিলিয়ে দিল আর দু'জনেই দু'জনের বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হল!

পর মুহূর্তে নৌকা উল্টে গেল—সত্যিই মৃত্যু পর্যন্ত সাথী হয়ে রইল তারা!

প্রভা

কাল : ৫০ খৃষ্টপূর্ব

সাকেত কখনও কোনো রাজার রাজধানীতে পরিণত হয়নি। বুদ্ধের সমসাময়িক কোশল-রাজ প্রসেনজিতের একটি রাজপ্রাসাদ এখানে ছিল, কিন্তু রাজধানী ছিল ছয় যোজন দূরে অবস্থিত শ্রাবস্তীতে (সহেট-মহেট)। প্রসেনজিতের জামাতা অজাতশত্রু কোশলের স্বাধীনতা হরণ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবস্তীরও সৌভাগ্য বিলুপ্ত হল। অতীতে সরযূতটে অবস্থিত সাকেত পূর্ব (প্রাচী) থেকে উত্তরের (পাঞ্জাব) যোগাযোগ পথে অবস্থিত থাকায় শুধু জলপথের বাণিজ্যের জন্যই নয়, স্থলপথের বাণিজ্যেরও এক বড় কেন্দ্র ছিল। বহুদিন পর্যন্ত তার এই অবস্থা অটুট ছিল। বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্যের শিষ্য মৌর্য মগধ রাজ্যকে প্রথমে তক্ষশিলা পর্যন্ত, পরে যবনরাজ সেলুকাসকে পরাজিত করে হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে সুদূর পশ্চিমে হিরাত এবং আমুদরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও তার মৌর্যবংশের শাসনেও সাকেত বাণিজ্য কেন্দ্রের বেশী কিছু ছিল না। মৌর্যবংশ-ধ্বংসকারী সেনাপতি পুষ্যমিত্র প্রথমে সাকেতকে রাজধানীর মর্যাদা দিয়েছিল, কিন্তু তাও সম্ভবত পাটলীপুত্রের প্রাধান্যকে ক্ষুণ্ণ করে নয়। পুষ্যমিত্র অথবা তার শুঙ্গবংশের শাসনকালে বাল্মীকি যখন রামায়ণ রচনা করেন, তখন অযোধ্যার নাম প্রচারিত হল। এইভাবেই সাকেত অযোধ্যা বলে পরিচিত হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অশ্বঘোষ বাল্মীকির কাব্যের রসাস্বাদন করেছিলেন। কালিদাস যেমন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আশ্রিত কবি ছিলেন, তেমনি বাল্মীকিও যদি কখনও শুঙ্গবংশের আশ্রিত কবি থেকে থাকেন অথবা কালিদাস যেমন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এবং কুমারগুপ্ত এই দুই পিতা-পুত্রকে তাঁর 'রঘুবংশ'-এ রঘু এবং 'কুমারসম্ভব'-এ কুমার রূপে চিত্রিত করেছেন, তেমনি বাল্মীকি যদি শুঙ্গবংশের রাজধানীর মহিমাকে উন্নীত করবার জন্যই বৌদ্ধ জাতকের দশরথের রাজধানীকে বারাণসী থেকে সরিয়ে সাকেত বা অযোধ্যায় এনে থাকেন এবং শুঙ্গসম্রাট পুষ্যমিত্র বা অগ্নিমিত্রকেই রামরূপে মহিমান্বিত করে থাকেন —তবে বিস্ময়ের কিছু নেই।

সেনাপতি পুষ্যমিত্র আপন প্রভুকে হত্যা করে সমগ্র মৌর্য সাম্রাজ্যকে অধিকার করতে সমর্থ হয়নি। সারা পাঞ্জাব যবনরাজ মিনান্দরের দখলে চলে গেল ; এবং পুষ্যমিত্রের পুরোহিত ব্রাহ্মণ পতঞ্জলির বিবরণ অনুযায়ী একবার মিনান্দর সাকেতও অধিকার করেছিল। এ থেকে বোঝা যায়, পুষ্যমিত্রের শাসনকালের সূচনাতেও সাকেতের বিশেষ একটা মাহাত্ম্য ছিল না এবং পতঞ্জলি-পুষ্যমিত্রের সময়ে এই নগরের নাম সাকেতই ছিল —অযোধ্যা নয়।

পুষ্যমিত্র, পতঞ্জলি এবং মিনান্দরের সময় থেকে আমরা আরও দু'শ' বছর পিছিয়ে আসছি। এই সময়েও সাকেতে বড় বড় শ্রেষ্ঠী বসবাস করত। লক্ষ্মীর বসতির ফলে

সরস্বতীরও অন্নবিস্তর আগমন হতে লাগল এবং ধর্ম ও ব্রাহ্মণেরা স্বভাবতঃই এসে পড়ল। এইসব ব্রাহ্মণদের মধ্যে ধন-বিদ্যা সম্পন্ন একটি কুল ছিল। এই কুলাধিপতির নাম মুছে গিয়েছে কালের প্রবাহে, কিন্তু কুলাধিপত্নীর নাম অমর করে রেখেছে তার পুত্র। এই ব্রাহ্মণীর নাম স্বর্ণাক্ষী, তার চোখ ছিল সোনার মতো কাঁচাহলুদ রঙ-এর। তৎকালে কাঁচাহলুদ রঙ বা নীল রঙ-এর চোখ সারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় জাতের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যেত এবং কাঁচাহলুদ রঙ-এর চোখ থাকা কোনো দোষের ছিল না। ব্রাহ্মণী স্বর্ণাক্ষীর এক পুত্র তার মতোই স্বর্ণনেত্র এবং পিঙ্গল কেশধারী ছিল। তার গায়ের রঙ ছিল মায়ের মতোই স্বগৌর।

২

সময়টা বসন্তকাল। আমের মঞ্জরী চারিদিকে আপন সুগন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বৃক্ষরাজি পুরনো পত্রসমূহ ত্যাগ করে নতুন পত্রাবলীতে ভূষিত হয়েছে। চৈত্রের শুক্লানবমী তিথি। সাকেতের নর-নারী সন্তরণ প্রতিযোগিতার জন্য সরযূতীরে সমাবিষ্ট হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে সাকেতবাসীরা বসন্তোৎসব পালন করে। এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় তরুণ-তরুণী উভয়েই একঘাটে নগ্নদেহে অংশগ্রহণ করে। তরুণীদের মধ্যে বহুসংখ্যক কর্পূরশ্বেত যবনী (গ্রীক-নারী) ছিল, যাদের সুন্দর-সুডৌল দেহ যবন শিল্পীর নির্মিত অনুপম মর্মর মূর্তির অনুরূপ।

আর ছিল সোনালী বা পীত কেশধারিণী স্বর্ণাক্ষী ব্রাহ্মণকুমারীগণ, সৌন্দর্যের দিক থেকে তারা যবনীদের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। এ ছাড়া ছিল ভ্রমরকৃষ্ণ কেশবিশিষ্টা ধূসরবর্ণা বহুসংখ্যক বৈশ্য তরুণী, তাদের তারুণ্যের মাদকতাও কম আকর্ষণীয় ছিল না। আজকের দিনে সাকেতের প্রতিটি কোণ থেকে কৌমার্যরূপরাশি সরযূতীরে এসে উপস্থিত হয়েছে। তরুণীদের মতো নানা কুলের তরুণেরাও গাত্রাবরণ উন্মোচন করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তাদের ব্যায়ামপুষ্ট সুডৌল সুন্দর দেহ কর্পূরশ্বেত, ধূসর প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের। তরুণ-তরুণীদের সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য আজকের এই প্রতিযোগিতা মহোৎসবের চেয়ে বড় আর কোনো উৎসবেরই অনুষ্ঠান হত না। প্রতি বছর এই উৎসবের ভিতর দিয়ে কতজনেই না স্বয়ম্বরা হয়ে উঠত। বাপ মায়েরা এ বিষয়ে তরুণ-তরুণীদের উৎসাহিতই করতেন। তখনকার দিনে এটাই ছিল সর্বজনমান্য শিষ্টাচার।

নৌকা থেকে প্রতিযোগী তরুণ-তরুণীরা সরযূর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সরযূর নীল জলে কেশরাশিকে জলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে দু'হাতে জল কেটে কেটে এগিয়ে যেতে লাগল। এদের কাছে কাছে থেকে বহু ক্ষুদ্র নৌকা চলছে। নৌকার আরোহীরা প্রতিযোগী তরুণ-তরুণীদের উৎসাহ দিচ্ছে বা কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে নৌকায় তুলে নিচ্ছে।

হাজার হাজার সন্তরণকারীর মধ্যে কারও পক্ষে ক্লান্ত হয়ে হার স্বীকার করাই স্বাভাবিক ছিল। সকল প্রতিযোগীই সর্বাগ্রে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। নদীতটে পৌঁছবার যখন কিছুটা বাকী, তখন বহু প্রতিযোগীই শিথিল হয়ে পড়তে লাগল। শেষে দু'জন প্রতিযোগী—একজনের কেশরাশি পিঙ্গল, অপর জনের পাণ্ডুশ্বেত, সবার আগে যাবার চেষ্টা করছে দেখা গেল। নৌকারোহীরা রুদ্ধশ্বাসে তাদের দেখতে লাগল। পিঙ্গল এবং পাণ্ডুশ্বেতকেশী দু'জনেই সকলের আগে গিয়ে সমগতিতে পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করেছে। তীরের দিকে আরও এগিয়ে গেল তারা—সকলেই ভাবছিল, এদের ভেতর থেকে কেউ একজন আগে বেরিয়ে যাবে; কিন্তু দেখল দু'জনের গতিই সমান। নৌকা-রোহীদের মধ্যে কেউ কেউ এ-ও শুনল যে, ওদের মধ্যে একজন অপরকে আগে যাবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে।

দু'জনে এক সঙ্গেই তীরে এসে পৌঁছাল। এদের মধ্যে একজন তরুণ, অপরটি তরুণী। উপস্থিত সকলেই হর্ষধ্বনি করে অভিনন্দন জানাল। ওরা দু'জন আপন আপন পোশাক পরে নিল। দর্শকরা সোৎসাহে পুষ্পবর্ষণ করছে, তরুণ-তরুণী দু'জন পরস্পরকে কাছ থেকে দেখছিল। উপস্থিত সকলে তাদের শুধু সন্তরণ কৌশলেরই নয়, সৌন্দর্যেরও প্রশংসা করতে লাগল।

কে একজন প্রশ্ন করল, "কুমারীকে তো আমি চিনি, কিন্তু কে এই তরুণ সৌম্য?"

"সুবর্ণাক্ষীপুত্র অশ্বঘোষের নাম শোনোনি?"

"না, আমি নিজেদের পুরোহিত কুলকেই শুধু জানি। আমরা হলাম ব্যবসায়ী, এত খবর রাখবার ফুরসৎ কোথায়?"

তৃতীয়, জন বলল, "আরে সাকেত থেকে অশ্বঘোষের বিদ্যার খ্যাতি দূর-দূরান্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, সমস্ত বেদ এবং সকল বিদ্যাতেই পারদর্শী।"

প্রথম, "কিন্তু ওর বয়স তো চব্বিশের বেশী হবে না।"

তৃতীয়, "হ্যাঁ, ওই রকমই হবে। এর কবিতা লোকে সুর করে পড়ে আর গায়।"

দ্বিতীয়, জন জিজ্ঞেস করল, "এই কি সেই কবি অশ্বঘোষ, যার প্রেমগীতি আমাদের তরুণ-তরুণীদের মুখে মুখে ফেরে?"

তৃতীয়, "হ্যাঁ, এই সেই অশ্বঘোষ। কিন্তু কুমারীর কি নাম সৌম্য?"

প্রথম, "সাকেতে আমাদের যবন-কুল-প্রমুখ এবং কোশলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী দত্তমিত্রের পুত্রী প্রভা।"

দ্বিতীয়, "তাই বল! এ রকম সৌন্দর্য খুব কমই দেখা যায়। দেহের গড়নে কত কোমল মনে হয়, অথচ সাঁতারে কি পটু!"

প্রথম, "এর মা-বাপ দু'জনেরই চমৎকার স্বাস্থ্য, দু'জনেরই বেশ বলিষ্ঠ দেহ।"

নগরোদ্যানে গিয়ে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে সকলের কাছে এই দুই প্রতিযোগীর পরিচয় দেওয়া হল, এবং দু'জনে লজ্জাবনত মুখে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হল।

৩

সাকেতের পুষ্পোদ্যান ছিল পুষ্যমিত্রের শাসনের স্মারক। এর নির্মাণ কাজে সেনাপতি প্রচুর অর্থ এবং শ্রম নিয়োগ করেছিলেন। যদিও এখন পুষ্যমিত্র বংশের শাসন আর নেই, সাকেতও অন্য কোনো রাজার রাজধানীতে পরিণত হয়নি, তবু নিগমকে (নগর-সভা) সাকেতের গৌরব মনে করে সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে, যেমন রাখা ছিল দু'শ' বছর আগে পুষ্যমিত্রের শাসনকালে। উদ্যানের মধ্যস্থলে এক পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর স্বচ্ছ নীল জলে নানা বর্ণের পদ্ম ফুটে থাকত এবং হংসমিথুনের দল সাঁতার কেটে ফিরত, চারিদিকে শ্বেতপাথরের বাঁধানো ঘাট যার সোপানশ্রেণী স্ফটিকের মতোই স্বচ্ছ। সরোবরের ধার ঘেঁষে সবুজ দূর্বাচ্ছাদিত প্রশস্ত তটভূমি। এর ওপর কোথাও গোলাপ, জুঁই, বেল ইত্যাদি ফুলের কেয়ারি, আবার কোথাও তমাল, বকুল, অশোক বৃক্ষের ছায়া, আবার কোথাও বা লতাগুল্মে ঘেরা কুমার-কুমারীগণের ক্রীড়াক্ষেত্র। উদ্যান মধ্যে মাটি, পাথর আর সবুজে আচ্ছাদিত কয়েকটি মনোরম ক্রীড়া পাহাড়। উদ্যানের কোনো কোনো জায়গায় ফোয়ারা থেকে ঝরণা-ধারায় জল উৎসারিত হচ্ছে।

অপরাহ্ণে এক লতাগুল্মের কাছে সাকেতের তরুণ-তরুণীদিগের ভিড়, কিন্তু চারিদিকে নীরবতা। সকলেই লতাগুল্মের দিকে কান পেতে ছিল, আর লতাগুল্মের ভিতরে শিলাচ্ছাদিত আসনে বসে সেই তরুণ, এক মাস আগে সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যে এক তরুণীর সঙ্গে যুগ্মবিজয়ী হয়েছিল। তার দেহে মসৃণ সূক্ষ্ম কাপড়ের পোশাক, দীর্ঘ পিঙ্গল কেশরাশি মাথায় জটার আকারে বাঁধা, হাতে বীণা —তরুণের আঙুল স্বচ্ছন্দ গতিতে মনোহর সুর সৃষ্টি করে চলেছে। অর্ধমুদ্রিত নয়নে স্বরচিত গীত গেয়ে চলেছে তরুণ, 'বসন্ত-কোকিলের' গীত সংস্কৃতে গেয়ে শেষ করল। সংস্কৃতের পরে প্রাকৃত ভাষায় গীত গাওয়ার তাগিদ ছিল, কারণ গায়ক-কবি জানে, তার শ্রোতাদের মধ্যে প্রাকৃত প্রেমিকের সংখ্যাই বেশী। কবি নিজের নবরচিত 'উর্বশী-বিয়োগ' গেয়ে শোনাল —উর্বশী লয়প্রাপ্ত হয়ে গেল আর পুরূরবা উর্বশীকে অপ্সরা (জলবিহারিণী) বলে ডাকতে ডাকতে পর্বত, সরোবর, বন, সকল জায়গায় খুঁজে ফিরতে লাগল। অপ্সরার দর্শন সে পেল না, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে এল। গানে পুরূরবার অশ্রুবর্ষণের সময় গায়কেরও চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল এবং সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীও অভিভূত হয়ে পড়ল সেই গান শুনে।

সঙ্গীত শেষ হবার পর এক এক করে সবাই চলে যেতে লাগল। অশ্বঘোষ বাইরে এলে কিছু তরুণ-তরুণী তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তার মধ্যে আর্দ্র আরক্ত-নয়না প্রভাও ছিল। একজন তরুণ এগিয়ে এসে বলল, "মহাকবি!"

"মহাকবি! আমি যে কবিই নই সৌম্য!"

"আমাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দাও কবি। সাকেতে আমাদের যবনদের একটি ছোট নাট্যশালা রয়েছে।"

"নাচের জন্য? আমারও নাচের সখ আছে।"

"নাচের জন্যেই শুধু নয়, ওখানে আমরা অভিনয়ও করে থাকি।"

"অভিনয়!"

"হ্যাঁ কবি, কিন্তু যবন-রীতির অভিনয়ে এক বিশেষত্ব আছে। তাদের অভিনয়ে বিভিন্ন স্থান-কালের পরিচায়ক বড় বড় চিত্রপট থাকে, আর সমস্ত ঘটনাকেই বাস্তবের রূপে দেখাবার চেষ্টা করা হয়।"

"কি পরিতাপের কথা, সৌম্য! সাকেতে জন্মগ্রহণ করেও আমি এমন অভিনয় এখনও দেখলাম না!"

"আমাদের অভিনয়ের দর্শক এখানকার যবন-পরিবার এবং কিছু ইষ্ট মিত্র—এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এ জন্য বহু সাকেতবাসী যবন-অভিনয় ..."

"নাটক বলা উচিত, সৌম্য!"

"হ্যাঁ, যবন-নাটক। আজ আমরা এক নাটক মঞ্চস্থ করব। আমাদের ইচ্ছা তুমিও আমাদের নাটক দেখ।"

"নিশ্চয়ই। তোমাদের মতো মিত্রমণ্ডলীর অসীম অনুগ্রহ।"

অশ্বঘোষ ওদের সঙ্গে চলল। নাট্যশালায় মঞ্চের কাছে তাকে বসতে দেওয়া হল। অভিনয় হচ্ছিল কোনো এক যবন বিয়োগান্ত নাটক প্রাকৃত ভাষায়, যবন কুলপুত্র-পুত্রীগণ বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছিল। অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণের পোষাক-পরিচ্ছদও ছিল যবন-দেশীয়দের মতো। বিভিন্ন দৃশ্যপট যবনরীতি অনুযায়ী অঙ্কিত ছিল। নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছিল অশ্বঘোষের পরিচিতা প্রভা। তার অভিনয় কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। অভিনয়ের মাঝে বিরতির সময় পূর্বপরিচিত যবন তরুণ 'উর্বশী-বিয়োগ' গানের অনুরোধ জানাল। কোনো রকম আপত্তি না করে বীণা হাতে অশ্বঘোষ রঙ্গমঞ্চের ওপর উঠে এল। তারপর স্বরচিত গানের গভীরতায় নিজে কাঁদল অপরকেও কাঁদাল। নাটক শেষ হয়ে যাবার পর সমস্ত অভিনেতা, কুমার-কুমারীদের সঙ্গে কবির পরিচয় করানো হল। অশ্বঘোষ বলল, "সাকেতে থেকেও আমি এই অনুপম কলা সম্বন্ধে অজ্ঞ রয়ে গেছি। মিত্রমণ্ডলীর কাছে আমি অসীম কৃতজ্ঞ যে, তোমরা আমাকে এক অজ্ঞাত প্রভালোক দর্শন করালে।"

'প্রভালোক' কথাটি উচ্চারণ করার সময় কয়েকজন-তরুণী প্রভার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল। অশ্বঘোষ পুনরায় বলল, "আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। তোমরা যেমন

আজ যবন-নাটকের প্রাকৃত রূপান্তর অভিনয় করলে—মনে হয়, চেষ্টা করলে আমরা স্বদেশের কথা নিয়ে চমৎকার নাটক চরনা করতে পারি।"

"আমাদেরও পূর্ণ আস্থা আছে কবি, তুমি ইচ্ছা করলে মূল যবন-নাটক থেকেও ভালো নাটক রচনা করতে পার।"

"এতটা বল না, সৌম্য! যবন-নাট্যকারদের শিষ্য হওয়ার যোগ্যতাই যথেষ্ট, আমি তাই চেষ্টা করব। আচ্ছা আমি যদি 'উর্বশী-বিয়োগ' নিয়ে নাটক লিখি?"

"তা'হলে আমরা তার অভিনয়ও করতে প্রস্তুত, কিন্তু পুরূরবার ভূমিকায় তোমাকেই অভিনয় করতে হবে।"

"আমার আপত্তি নেই; সামান্য অভ্যাস করলে তেমন মন্দ অভিনয় করব না।"

"আমরা চিত্রপটও তৈরী করিয়ে নেব।"

"চিত্রপটের ওপর আমাদের পুরূরবার দেশের দৃশ্য অঙ্কিত করতে হবে। চিত্র অঙ্কন আমিও কিছু কিছু করি। সময় পেলে আমিও সাহায্য করতে পারব।"

"তোমার নির্দেশ মতো দৃশ্যাঙ্কন করা হবে। পাত্র-পাত্রীর বেশভূষা সম্বন্ধেও তোমাকেই নির্দেশ দিতে হবে, সৌম্য!"

"আর পাত্র-পাত্রী নির্বাচন?"

"পাত্র-পাত্রী তো এখনই ঠিক করা যাবে না, সৌম্য! তবে তাদের সংখ্যা কম রাখতে হবে।"

"কত রাখা উচিত?"

"ষোলো থেকে কুড়ি জন আমরা অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারব।"

"আমি ষোলো পর্যন্তই রাখার চেষ্টা করব।"

"পুরূরবা তো তুমিই সাজবে, সৌম্য! আর উর্বশী-চরিত্র আমাদের প্রভাকে দিয়ে কেমন হবে? আজ তো তুমি তার অভিনয় দেখলে।"

"আমার অনভ্যস্ত চোখে নিখুঁত মনে হয়েছে অভিনয়।"

"তা'হলে প্রভাকেই উর্বশী হতে হবে। আমাদের দলে যাকে যে কাজ দেওয়া হবে তাকে তাই করতে হয়।"

প্রভার চোখ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু দলপতি তরুণের "কি প্রভা?" বলার পর প্রভা সংযত হয়ে জবাব দিল, "আচ্ছা।"

৪

অশ্বঘোষ, যবন-তরুণ বুদ্ধপ্রিয়ের সঙ্গে কয়েকটি যবন নাটকের প্রাকৃত রূপান্তর পড়ল এবং তাদের কলাকৌশল নিয়ে আলাপ-আলোচনা করল। যবন কলাবিদ্যাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে নাটকের চিত্রপট সমূহের সে নামকরণ করল যবনিকা। সংস্কৃত, প্রাকৃত,

গদ্যপদ্য দু'রকমভাবেই লিখল সে। এই সময় প্রাকৃত ও সংস্কৃতের এতটা আবেদন ছিল যে, সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোতে তা অনায়াসবোধ্য ছিল। এই 'উর্বশী-বিয়োগ' হল প্রথম ভারতীয় নাটক এবং অশ্বঘোষ প্রথম ভারতীয় নাট্যকার। এটাই কবির প্রথম প্রয়াস, তবু তা পরবর্তী 'রাষ্ট্রপাল', 'সারিপুত্ত' ইত্যাদি নাটক থেকে কম সুন্দর হয়নি।

রঙ্গমঞ্চ তৈরীর সময়, অভিনয় অভ্যাসকালে খাওয়া-দাওয়ার কথাও মনে থাকত না তরুণ কবির। এই সময়গুলোই সে জীবনের সুন্দরতম সময় বলে মনে করত। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রভা আর সে পরস্পরের সঙ্গ লাভ করত। সাঁতারের প্রতিযোগিতার দিন তাদের হৃদয়ে যে প্রেমবীজ রোপিত হয়েছিল এখন তাই অঙ্কুরিত হতে থাকল ধীরে ধীরে। যবন তরুণ-তরুণীগণ অশ্বঘোষকে আত্মীয়র মতোই দেখত কাজেই এ ব্যাপারে সহায়ক হওয়াই তারা সৌভাগ্য মনে করত। একদিন অশ্বঘোষ নাট্যশালার বাইরে অবস্থিত ক্ষুদ্র উদ্যানে এসে একটা আসনের ওপরে বসল। এই সময় প্রভাও সেখানে এসে হাজির হল। প্রভা তার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে বলল, 'উর্বশী-বিয়োগ' রচনা করবার সময় তোমার মনে কে ছিল কবি ?"

"উর্বশী আর পুরূরবার কাহিনী।"

"কাহিনী তো আমিও জানি, কিন্তু উর্বশীকে অপ্সরা রূপে তুমি বার-বার সম্বোধন করছিলে কেন !"

"উর্বশী যে অপ্সরাই ছিল, প্রভা !"

"তা ছাড়া তুমি উর্বশীর বিয়োগের পর নদী, সরোবর, পর্বত, বন সব জায়গাতে পুরূরবাকে বিহ্বল অন্বেষণকারীরূপে চিত্রিত করেছ।"

"পুরূরবার ঐ অবস্থায় ওটাই স্বাভাবিক ছিল।"

"সব শেষে 'উর্বশী-বিয়োগ'-এর গায়ক লতাকুঞ্জে বসে অশ্রুধারাকে বীণার মতো গীতসঙ্গী করে নিয়েছিল কেন ?"

"গায়ক ও অভিনেতার এমনি তন্ময়ভাব এসে যাওয়াই স্বাভাবিক, প্রভা !"

"উঁহু, তুমি আমাকে সত্যি কথাটাই বলতে চাইছ না।"

"কেন, তোমার কি মনে হয় ?"

"আমার মনে হয়, তুমি পুরাণের কোনো উর্বশীর গান রচনা করনি।"

"তবে ?"

"তোমার উর্বশী হচ্ছে—উর-বশী (হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী), আর সেই অপ্সরা ছিল—অপ অর্থাৎ সরযূর জল, সরা অর্থে সন্তরণকারিণী।"

"তারপর ?"

"তোমার উর্বশীকে পুরূরবা হিমালয়ের মতো পর্বত বা কোনো বনভূমি, নদী, সরোবর,

এ সবে খুঁজে ফেরেনি, তোমার পুরূরবা উর্বশীকে খুঁজে ফিরছিল সাকেতের সরযূ নদীতে, পুষ্পোদ্যানের ভিতরকার সরোবরে, আর লতাগুল্মের ভিতরে।”

“তারপর?”

“পুরাণোল্লিখিত কোনো পুরূরবার দুঃখে বিগলিত হয়ে তোমার চোখের জল ঝরেনি, জল ঝরেছিল তোমার নিজেরই তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করতে।”

“এ-বারে আমিও একটা কথা বলব প্রভা?”

“বল, এতক্ষণ তো আমিই অনর্গল বকে গেলাম।”

“সেদিন লতাকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় আমি তোমার এই মনোহর নীল নয়ন দুটি আমার চেয়েও আরক্ত এবং সিক্ত দেখেছিলাম।”

“তোমার গান দিয়ে আমাকে কাঁদিয়েছিলে কবি।”

“আর তোমার বিরহ আমাকে গীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।”

“কিন্তু কবি, তোমার গানের উর্বশী ছিল পাষাণী! অন্তত তুমি সেইভাবেই তাকে চিত্রিত করেছিলে।”

“তার কারণ, আমি নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম।”

“কি ভেবে?”

“আমার মনে হয়েছিল এই অচিরপ্রভাকে (বিদ্যুৎ) আমি আর কখনও দেখবার সৌভাগ্য লাভ করব না —সে কবেই হয়ত ভুলে গেছে আমাকে।”

“তুমি এতটা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলে কবি?”

“যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মবিশ্বাসের অন্য কোনো অবলম্বন না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নিজেকে নিঃস্ব ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না প্রভা।”

“তুমি শুধু সাকেতেরই নও, এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের মহিমান্বিত কবি। সাকেতের সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিজেতা বীর তুমি। তোমার বিদ্যার খ্যাতি সাকেতবাসীর মুখে মুখে। আর তোমার সম্পর্কে তরুণীদের মনোভাব বলতে গেলে বলতে হয়, সাকেতের সুন্দরীগণ তোমাকে চোখের মণি করে রাখতে চায়।”

“কিন্তু ও সবে কি হবে? আমার কাছে আমার উর্বশীই সবটুকু। সেই সন্তরণ প্রতিযোগিতার পর যখন দু'সপ্তাহ তার দেখা পেলাম না, তখন আমার মনে হতে লাগল যেন এ জীবনের কোনো মূল্য নেই। সত্যি বলছি, আমার হৃদয়কে এত দুর্বল হয়ে পড়তে আর কখনও দেখিনি। আর এক সপ্তাহ যদি তোমাকে দেখতে না পেতাম তা'হলে কি যে করে বসতাম বলতে পারি না।”

“এত স্বার্থপর হয়ো না। তুমি তোমার দেশের এক অমর কবি। দেশ তোমার কাছে কত আশা রাখে। তুমি কি জানো, তোমার এই ‘উর্বশী-বিয়োগ’ নাটকের কত খ্যাতি?”

"আমি তো কিছুই শুনিনি।"

"গত সপ্তাহে এক ব্যবসায়ী ভরুকচ্ছ (ভড়োচ) থেকে এখানে এসেছিল। ভরুকচ্ছে যবন নাগরিকেরা বহু সংখ্যায় বাস করে। আমরা সাকেতের যবনরা তো হিন্দু বনে গেছি, কিন্তু ভরুকচ্ছবাসী যবনেরা আপন ভাষা বিস্মৃত হয়নি। যবন দেশগুলো থেকে ভরুকচ্ছতে ব্যবসায়ী এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের আগমন হয়ে থাকে। আমার এই বন্ধুটি যবন-সাহিত্যে পণ্ডিত, সে তোমার এই নাটকের অনুলিপি পড়ে শ্রেষ্ঠ দুই যবন-নাট্যকার এম্‌পীদোকল এবং য়ুরোপিদ্‌-এর প্রতিভার সঙ্গে তোমার তুলনা করেছে। সে এই নাটকের অনুলিপি নিয়ে গেছে। ভরুকচ্ছ থেকে মিশরে অনবরতই জলপোত যাতায়াত করে। এইসব কথা যখন আমার কানে এল, তখন অসীম গর্বে আমার বুক ভরে উঠল।"

"তোমার হৃদয়ের এই গর্বটুকুই আমার জীবনসর্বস্ব, প্রভা!"

"তোমার নিজের মূল্য তুমি জানো না, কবি।"

"আমার এই মূল্যের উৎস তুমিই প্রভা! আর এখন তা আমার অজানা নেই।"

"না না, এটা উচিত নয়। প্রভার প্রেমিক অশ্বঘোষ আর মহান্ কবি অশ্বঘোষকে পৃথক দৃষ্টিতে দেখাই তোমার কর্তব্য। প্রভার প্রেমিক অশ্বঘোষের জন্য যা কিছু চাও কর, কিন্তু মহান্ কবিকে এর অনেক উর্ধ্বে উঠতে হবে, সমগ্র বিশ্বের দরবারে তার প্রতিভাকে ছড়িয়ে দিতে হবে।"

"তুমি যেমন বলবে আমি সেইভাবেই চলব প্রভা।"

"নিজেকে এত বড় সৌভাগ্যশালিনী রূপে কখনই কল্পনা করতে পারিনি।"

"কেন?"

"মনে হত, তুমি আমাকে ভুলে গিয়ে থাকবে।"

"এত সাধারণ ছিলে তুমি?"

"তোমার সামনে তাই ছিলাম, এখনও আছি।"

"তোমাকে দেখেই কবিতার এক নতুন উৎসের সন্ধান পেলাম আমি। আমার কবিতায় এখন নতুন প্রেরণা, নতুন আনন্দ। 'উর্বশী-বিয়োগ' গীত আর নাটক দুই-ই তোমার প্রেরণায় প্রাণবন্ত। নাটককে আমি স্বদেশের নিজস্ব বস্তুরূপে গড়ে তুলছি প্রভা! কিন্তু তুমি কেন ভাবলে যে, আমি তোমাকে ভুলে যাব?"

"কোনো দিক থেকেই আমি নিজেকে তোমার উপযুক্ত ভাবতে পারিনি। তারপর যখন তোমার গুণাবলীর পরিচয় পেলাম তখন তোমার আশা একেবারেই ত্যাগ করলাম। সাকেতের সুন্দরীদের শুধু তোমার নামেই উন্মাদ হয়ে উঠতে দেখতাম—এ থেকেও নিশ্চয়ই আশা করবার কিছু ছিল না। তা'ছাড়া শুনেছিলাম তুমি উচ্চ কুলের ব্রাহ্মণ। যদিও আমি ব্রাহ্মণকুলের পরবর্তী উচ্চকুলজাত যবন-রাজপুত্রের কন্যা, তবু যে ব্রাহ্মণকুল

মাতা-পিতা থেকে সাত পুরুষ ঊর্ধ্ব পর্যন্ত সম্পর্কিতের খোঁজ-খবর না নিয়ে বিয়ে করে না, তারা কি করে আমাদের প্রেমকে স্বাগত জানাবে ?"

"বড় দুঃখের বিষয় প্রভা, অশ্বঘোষ তোমায় এইভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল।"

"তা'হলে তুমি···" প্রভা বলতে বলতে থেমে গেল।

প্রভার অশ্রুপূর্ণ নয়ন চুম্বন করে, তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে অশ্বঘোষ বলল, "অশ্বঘোষ চিরদিন তোমারই থাকবে প্রভা। তুমি আর তাকে পর ভাবতে পারবে না।"

প্রভার দুই চোখ বেয়ে টস্-টস্ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, আর অশ্বঘোষ তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে সেই জল মুছিয়ে দিতে থাকল।

'উর্বশী-বিয়োগ' একাধিকবার অতি চমৎকারভাবে অভিনীত হল। সাকেতের সমস্ত সম্ভ্রান্ত নর-নারী এই নাটকের অভিনয় দেখল। এর আগে তারা কোনোদিন ভাবতেই পারেনি যে, নাট্যকলা এত পূর্ণ, অভিনয় এত উচ্চশ্রেণীর হতে পারে। শেষ দৃশ্যে যবনিকা পতনের পর কয়েকবারই অশ্বঘোষ মঞ্চে উঠে বলেছে, 'আমি এই নাটকের সব কিছুই যবন রঙ্গমঞ্চ থেকে সংগ্রহ করেছি'; কিন্তু তার নাটক এতটা স্বদেশী প্রভাবাপন্ন ছিল যে, কেউই তার কোনোখানে বিদেশীয়ানার এতটুকুও গন্ধ পায়নি।

অশ্বঘোষের সংস্কৃত ও প্রাকৃত গীত এবং কবিতা সাকেত এবং কোশলের সীমা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু নাটক ছড়িয়ে পড়ল আরও অনেক দূর পর্যন্ত। উজ্জয়িনী, দশপুর, সুপ্পারক, ভরুকচ্ছ, শাকলা (শিয়ালকোট), তক্ষশিলা, পাটলিপুত্র ইত্যাদি মহানগরীর যেখানে বহুল সংখ্যায় যবনরা বসবাস করত এবং তাদের নাট্যশালা ছিল সে সব জায়গায় অশ্বঘোষের নাটক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। রাজা-রাজড়া, ব্যবসায়ী সকলের দ্বারা সমানভাবে সমাদৃত হল সেইসব নাটক।

৫

রঙ্গমঞ্চে অশ্বঘোষের অভিনয় এবং যবন কন্যার সঙ্গে তার প্রেমের ব্যাপার অশ্বঘোষের পিতা-মাতার কাছে অজানা থাকবার কথা নয়। কথাটা শুনে অশ্বঘোষের পিতা রীতি-মতো চিন্তিত হলেন এবং সুবর্ণাক্ষীকেও বুঝিয়ে বললেন। মাতা যখন পুত্রকে বললেন যে, আমাদের ব্রাহ্মণকুলের পক্ষে এমন সম্বন্ধ করা অধর্ম, তখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমগ্র শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অশ্বঘোষ মাতাকে পুরাণ থেকে ঋষিদের আচরণের শত শত প্রমাণ দিল (যার থেকে কিছু অংশ পরে সে নিজের 'বজ্রচ্ছেদিকা'য় লিপিবদ্ধ করেছে—যা বজ্রচ্ছেদিকোপ-নিষদ্ নামে উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে)।

সব শুনে মা বললেন, "এ সব ঠিকই বাবা, কিন্তু আজকের ব্রাহ্মণেরা এই পুরাণোক্ত আচরণকে মানতে চায় না।"

"তা'হলে ব্রাহ্মণদের জন্য আমি এক নতুন সদাচার উপস্থিত করব।"

মা অশ্বঘোষের যুক্তিসমূহতে সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না, কিন্তু যখন সে বলে বসল যে, প্রভার আর আমার জীবন কখনও স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে পারে না, তখন তিনি পুত্রের পক্ষে মত দিয়ে বললেন, "তুইই আমার যথাসর্বস্ব বাবা।"

অশ্বঘোষ একদিন প্রভাকে মা'র কাছে পাঠিয়ে দিল। মা তার রূপ আর গুণের পরিচয় পেয়ে এবং তার বিনম্র স্বভাবে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু অশ্বঘোষের পিতা একে স্বীকার করে নিতে পারছিলেন না।

তিনি একদিন অশ্বঘোষকে ডেকে বললেন, "পুত্র, আমাদের শ্রোত্রিয়দের শ্রেষ্ঠ হল ব্রাহ্মণকুল। পঞ্চাশ পুরুষ থেকে শুধু কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যারাই আমাদের ঘরে বধূ রূপে আসছে। আজ যদি তুমি প্রভাকে বিবাহ কর তো আমরা এবং আমাদের পরবর্তী বংশধরেরা চিরকালের জন্য সমাজে জাতিভ্রষ্ট হয়ে থাকব।"

অশ্বঘোষের পক্ষে প্রভাকে ত্যাগ করা একেবারেই অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার বুঝে অশ্বঘোষের পিতা প্রভার পিতামাতার কাছে গিয়ে অনুনয়-বিনয় করলেন, কিন্তু তাঁদের কিছুই করবার ছিল না। পরিশেষে তিনি প্রভার কাছেই তাঁর নিবেদন পেশ করলেন। প্রভা বলল, "আমি অশ্বঘোষের কাছে আপনার কথা বলব।"

৬

প্রভা আর অশ্বঘোষ পরস্পরের অভিন্ন সাথী। কি সরযূতীর, কি পুষ্পোদ্যান, কি নৃত্যশালা নাট্যশালা, কিম্বা অপর কোনো জায়গায় একজন থাকলে আর একজনও থাকবেই। সূর্যের প্রভার মতোই প্রভা অশ্বঘোষের হৃদয়-পদ্মকে বিকাশিত করে রেখেছে। রূপালী চাঁদের আলোয় প্রায়ই তারা সরযূতীরে যেত। সেখানে তারা জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করত। এমনি এক জ্যোৎস্নালোকে একদিন সরযূর কালো জলের ধারে শ্বেত শিলাসনে বসে অশ্বঘোষ আপন মানসপটে প্রভার চিত্র অঙ্কন করছিল। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "প্রভা তুমিই আমার কবিতা, তোমারই প্রেরণা পেয়ে আমি 'উর্বশী-বিয়োগ' লিখেছি। তোমার রূপরাশি আমাকে বহু সুন্দর কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করবে। কবিতা হল অন্তরের অভিব্যক্তি, বাইরের জিনিস নয়; কিন্তু বাইরের অভিব্যক্তিই যে অন্তরে বিকাশিত হয় এ তত্ত্ব তুমিই আমাকে শিখিয়েছ।"

অশ্বঘোষের কথা শুনতে শুনতে প্রভা সেই শীতল শিলাসনের ওপর শুয়ে পড়ল। অশ্বঘোষ সযত্নে তার মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিল। ওপর দিকে তাকিয়ে আয়ত দৃষ্টি মেলে প্রভা অশ্বঘোষের শ্রীমণ্ডিত মুখখানা দেখতে লাগল। অশ্বঘোষের কথা শেষ হলে প্রভা বলল, "তোমার সব কথাই আমি মেনে নিতে রাজী। সাকার-সৌন্দর্য থেকে প্রেরণা না পেলে কাব্য কখনও পূর্ণ রূপে বিকাশিত হতে পারে না। আমি তোমার কাব্যের মূর্তিময় প্রকাশ, আবার আমিই বিকাশিত করছি তোমার অন্তরের কাব্যরূপকে। কিন্তু

কবিতা তো শুধু আমার সৌন্দর্যের কথা নয়। সে দিন আমি বলেছিলাম, তোমার ভিতরে দু'জন অশ্বঘোষকেই উপলব্ধি করতে হবে। আবার দুয়ের মধ্যে মহান্ যুগকবি অশ্বঘোষকেই মুখ্য হয়ে উঠতে হবে। কারণ, সে শুধু একটি ব্যক্তির নয়, সমগ্র বিশ্বজনের সে প্রতিনিধি। কালকারামের সেই বিদ্বান্ ভিক্ষুর কথা মনে আছে? পরশু যাঁকে' আমরা দু'জনে দেখতে গিয়েছিলাম?"

"অদ্ভুত মেধাবী মনে হয় তাঁকে।"

"ঠিকই, আর বহু দেশও ঘুরেছেন। তাঁর জন্ম মিশরের সেকেন্দ্রিয়া নগরে।"

"তা আমি শুনেছি; কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারি না প্রভা, যবনরা কেন বৌদ্ধধর্মকে মেনে চলে!"

"কারণ, বৌদ্ধধর্ম যবনদের স্বতন্ত্র প্রকৃতি এবং স্বাধীন মনোবৃত্তির অনুকূল।"

"কিন্তু বৌদ্ধধর্ম তো সকলকেই বৈরাগী, তপস্বী এবং ভিক্ষুতে পরিণত করে!"

"বৌদ্ধদের মধ্যে গৃহী অপেক্ষা ভিক্ষুর সংখ্যা অনেক কম এবং বৌদ্ধ গৃহী গার্হস্থ্য জীবনের রসগ্রহণে কারও অপেক্ষাই পশ্চাৎপদ নয়।"

"এই দেশে আরও কত ধর্ম প্রচলিত রয়েছে, বৌদ্ধধর্মের প্রতিই যবনদের এত পক্ষপাতিত্ব কেন? এ কথাও ঠিক বুঝতে পারি না।"

"এখানে বৌদ্ধধর্মই সবচেয়ে উদার। আমাদের পূর্বজগণ যখন ভারতে এল, তখন সকলেই ম্লেচ্ছ বলে তাদের ঘৃণা করত। আমি কিন্তু আক্রমণকারী যবনদের কথা বলছি না, এখানে যারা বসতি স্থাপনকল্পে এসেছিল বা ব্যবসার সূত্রে যাতায়াত করত, তাদের সম্বন্ধেও এই মনোভাব ছিল। কিন্তু বৌদ্ধরা তাদের মোটেই ঘৃণা করত না। যবনেরা বস্তুত নিজ দেশেও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র অশোকের সময় বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু যবনদের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের ধর্মরক্ষিত এ দেশে এসে ভিক্ষু হননি, মিশরের বিহারেই তিনি ভিক্ষু হয়েছিলেন।"

"আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই প্রভা।"

"নিশ্চয়ই দেখা করবে। তিনি তোমাকে আরও গভীর দার্শনিক তত্ত্ব বলতে পারবেন—শুধু বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধেই নয়, যবন-দর্শন সম্বন্ধেও।"

"যবনদের ভিতরও দার্শনিক রয়েছেন?"

"অনেক মহান্ দার্শনিক আছেন, যাঁদের বিষয়ে ভদন্ত ধর্মরক্ষিত তোমাকে বলতে পারবেন। কিন্তু বৌদ্ধ-দর্শনের কথা শুনে প্রভার প্রতি যেন তোমার বৈরাগ্য না আসে প্রিয়তম।" —এই বলে প্রভা আপন বাহুপাশে অশ্বঘোষকে বেঁধে ফেলল।

"কালকারামের কিছু কিছু কথা আমার কাছেও খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। ভাবছিলাম, যদি আমাদের সমগ্র দেশ কালকারামের মতো হত!"

প্রভা বলল, "না প্রিয়তম, আমাকে ছেড়ে তুমি কালকারামে চলে যেও না।"

"প্রাণ থাকতে তোমাকে ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব প্রিয়ে! আমি বলছিলাম ওখানকার ভেদ-ভাব-শূন্যতার সম্বন্ধে। ওখানে যবন ধর্মরক্ষিত, পারশী সুমনের দেশ-দেশান্তরের বিদ্বান্ ভিক্ষু বাস করেন আর আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত সমস্ত কুলের ভিক্ষুরাও বাস করেন। সবাই এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন, এক সঙ্গেই জ্ঞানার্জনে সমাবিষ্ট হন। কালকারামের সেই কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধ ভিক্ষুর নাম কি প্রভা?"

"মহাস্থবির ধর্মসেন। সাকেতের সমস্ত বিহারবাসী ভিক্ষুদের প্রধান।"

"শুনেছি, চণ্ডাল কুলে তাঁর জন্ম। অথচ আমার আপন কাকা ভিক্ষু শুভগুপ্ত তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে প্রণাম করেন। ভেবে দেখ, কোথায় এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ কুলজাত বিদ্বান্ শুভগুপ্ত, আর কোথায় চণ্ডালপুত্র ধর্মসেন!"

"কিন্তু মহাস্থবির ধর্মসেনও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী।"

"আমি ব্রাহ্মণ্যধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি, প্রভা!......"

"বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সমুদ্র আখ্যা দিয়েছেন, যিনিই এই সঙ্ঘে যোগ দেন তিনিই তাঁর নাম-রূপ ছেড়ে সমুদ্রে বিলীন হয়ে যান।"

"বৌদ্ধ গৃহীরাও কেন এমনি করে না?"

"বৌদ্ধ গৃহীরা দেশের অন্যান্য গৃহী লোকদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে পারে না। তা'ছাড়া তাদের ঘাড়ে পারিবারিক বোঝাও থাকে।"

"আমার তো মনে হয়, কালকারামের ভিক্ষুদের মতো নগর এবং গ্রামের সমস্ত লোক যদি জাতিভেদ শূন্য, বর্ণভেদ শূন্য হয় তবে খুবই ভালো।"

"একটা কথা তোমাকে আমি বলিনি প্রিয়তম। তোমার পিতা একদিন আমার সামনে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, প্রভা, অশ্বঘোষকে তুমি মুক্তি দাও।"

"যেন তুমি মুক্তি দিলেই তিনি তাঁর পুত্রকে ফিরে পাবেন! তুমি কি বললে?"

"আমি বলেছিলাম, আপনার কথা আমি অশ্বঘোষের কাছে বলব।"

"আর তাই আজ বললে তুমি। ব্রাহ্মণদের পাষণ্ডতাকে আমি অসীম ঘৃণা করি—ঘৃণায় আমার সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। তারা বলে বেড়ায়, আমরা বেদ-শাস্ত্রকে অনুসরণ করি, কিন্তু বহু পরিশ্রম এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে সমগ্র ব্রাহ্মণ্য-বিদ্যা অধ্যয়ন করেও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না, কি তারা অনুসরণ করে। পুরাণের কোনো ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করলে বলবে—আজকাল এ সবের প্রচলন নেই। হয় যুক্তির পথে চল, নয় তো ঋষিবাক্য অনুসরণ কর! পুরাতন বেদনীতি যদি কেউ ভঙ্গ করে, তবেই না নতুন রীতি প্রবর্তিত হয়। ভণ্ড, কাপুরুষ, স্বার্থপররা পুষ্ট বাছুরের মাংস আর মোটা দক্ষিণা পেলেই খুশী। আশ্রয়দাতা রাজা এবং সামন্তগণ যাতে প্রসন্ন হয় সেই কাজেই এরা সদা প্রস্তুত।"

"দরিদ্র হলে কাউকেও নিজেদের ধর্মে স্থান দেয় না এরা…"

"হ্যাঁ, অন্যান্য দেশ থেকে আগত যবন, শক, আভীর ইত্যাদি জাতিসমূহকে এরা ক্ষত্রিয় বলে রাজপুত্র বলে স্বীকার করে নিয়েছে, কারণ, তাদের হাতে ক্ষমতা এবং অর্থ ছিল। তাদের কাছ থেকে এরা মোটা-মোটা দক্ষিণা পেত। কিন্তু স্বদেশের শূদ্র, চণ্ডালদের চিরতরে দাস করেই রেখেছে এরা। যে ধর্ম মানুষের হৃদয়কে উদার করে তুলতে পারে না, যে ধর্মের বিকাশ শুধু টাকার থলি বা শাসন-ক্ষমতার অপেক্ষায় পড়ে থাকে, আমি তাকে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কজনক মনে করি। জগৎ পরিবর্তনশীল ; ব্রাহ্মণদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ থেকে আজকের গ্রন্থাবলী পর্যন্ত সমস্ত পড়ে তাদের আচার ব্যবহারেও পরিষ্কার পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি! কিন্তু এদের সঙ্গে কথা বল, দেখবে এরা সমস্ত কিছুকেই শাশ্বত সনাতন প্রতিপন্ন করতে চাইছে। একে এক ধরনের জড়তাই আখ্যা দেওয়া যায় প্রভা।"

"তোমার এই সমস্ত বিষোদ্গারের কারণ আমি নই তো!"

"কারণ হওয়া তো প্রশংসারই কথা প্রভা! তুমি আমার কবিতায় নতুন প্রাণ, নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছ। আমার অন্তর্দৃষ্টিতেও নতুন প্রাণ, নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করে তুমি আমার উপকার করেছ। এতদিন ভাবতাম যে, জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আমি আরোহণ করেছি, এই মিথ্যা দম্ভের সহজ স্বীকৃতি হল ব্রাহ্মণকুল। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, জ্ঞানসমুদ্রের পরিধি ব্রাহ্মণদের শ্রুতি আর তাদের তাল এবং ভূর্জপত্রের পুঁথিতেই সীমাবদ্ধ নয়, সে এ সবের চেয়ে অনেক বিশাল।"

"আমি সামান্য এক নারী মাত্র।"

"সামান্য নারী বলেই যদি কেউ তাকে নীচ বলে, তবে সে আমার ঘৃণার পাত্র।"

"যবনকুলে নারীদের সম্মান অন্যদের চেয়ে বেশী। যদি কেউ নিঃসন্তান থেকে মরেও যায় তবু এক স্ত্রী বর্তমানে সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে না।"

"আর এই ব্রাহ্মণেরা শত শত বিবাহ করে বেড়ায় শুধু দক্ষিণা লাভের আশায়, ছিঃ! কোনো যবন যে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে মানে না এতে আমি খুব খুশী।"

"বৌদ্ধ হলেও পূজাপাঠের জন্য আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা আসে।"

"স্বার্থরক্ষার জন্য যবনদের যখন ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করেছে, তখন দক্ষিণার আশায় এটুকুই বা করবে না কেন!"

"আমি কি তোমার ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার ভেঙে দেবার কারণ হয়ে দাঁড়ালাম?"

"তাতে মন্দ কিছু হয়নি। ব্রাহ্মণত্বের দম্ভ যদি তোমার আমার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় তো সে দম্ভ আমার কাছে ঘৃণার বস্তু।"

"তুমি আমাকে এত ভালোবাস জেনে বড় সুখী হলাম।"

"তোমার প্রেমে বঞ্চিত থাকলে অশ্বঘোষ এক নিষ্প্রাণ জড়পিণ্ডে পরিণত হবে।"

"তা'হলে আমার প্রেমের পুরস্কার, বরদান করতে পার তুমি ?"

"ঐ প্রেমটুকু বাদে আর সব কিছু ছেড়ে দিতে পারি।"

"আমার প্রেম যদি অমর অশ্বঘোষ, মহান্ যুগকবি অশ্বঘোষকে এতটুকুও নীচে নামিয়ে থাকে, তবে ধিক্ আমার সে প্রেম।"

"পরিষ্কার করে বল প্রিয়ে !"

"প্রেমের পথে আমি বাধা সৃষ্টি করতে চাই না, কিন্তু আমি তাকে তোমার অমর প্রতিভার সহায়ক রূপে দেখতে চাই। তাই বলছিলাম আমি যদি না থাকি…"

তড়িতাহতের মতো উঠে অশ্বঘোষ প্রভাকে দৃঢ়ভাবে বুকে চেপে ধরল, তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে প্রভা দেখল যে, সে কাঁদছে। কিছুটা শান্ত হলে প্রভা বললে, "শোন আমার প্রেম তোমার কাছে বড় জিনিসের প্রত্যাশা রাখে, সেটা তোমাকে দিতে হবে।"

"তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই প্রিয়ে।"

"কিন্তু তুমি আমার কথা শেষ করতে দাওনি…"

"তুমি যে বজ্রবাক্য উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলে !"

"কিন্তু এই বজ্রবাক্য শাশ্বত অশ্বঘোষের হিতকল্পে উচ্চারন তো করতেই হবে। আমার প্রেম চায়, মহান্ কবি অশ্বঘোষের আপন অমর কবি-প্রতিভার মতো প্রভার প্রেমকেও যেন অমর বলে মনে করে, তাকে যেন শুধু প্রভার রক্ত-মাংসের দেহ দিয়ে বিচার না করে। অমর অশ্বঘোষের প্রভা শাশ্বত তরুণী, শাশ্বত সুন্দরী। শুধু এইটুকুই আমি তোমাকে দিয়ে উপলব্ধি করাতে চাই।"

"তা'হলে মূর্তিময়ী প্রভার বদলে কল্পলোকের প্রভা আমার সামনে থাকবে ?"

"আমি উভয়কেই মূর্তিময়ী মনে করি, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, দু'জনের মধ্যে একজন এক শ' অথবা পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাকবে আর অন্যজন থাকবে চিরজীবী হয়ে। তোমার প্রভা তোমার 'উর্বশী-বিয়োগ'-এ অমর হয়ে থাকবে কিন্তু আমার প্রেমকে অমর করে রাখতে হলে তোমাকে অমর অশ্বঘোষের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। রাত অনেক হয়ে গেছে, সরযুর-জল যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, আমাদেরও ঘরে ফেরা উচিত।"

"অমর প্রভার একটি চিত্র আমি আমার মানসপটে অঙ্কিত করে নিলাম।"

"শুধু এইটুকুই আমি চাই প্রিয়তম" —এই বলে রেশমের মতো কোমল কেশপাশ অশ্বঘোষের কপোলতলে বুলিয়ে দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল প্রভা।

৭

প্রশস্ত এক অঙ্গনের চারিদিকে বারান্দা এবং পিছনে চারতলা এক অট্টালিকা। বারান্দায় ভিজে কাপড় শুকোচ্ছে। অঙ্গনের এক কোণে একটি কুয়া এবং স্নানের ঘর। অঙ্গনের

অন্যান্য স্থানে বহু রকমের গাছপালা, তার মধ্যে একটি অশ্বত্থ গাছ। গাছের মূলে বাঁধানো বেদী আর একটু দূরে পাথরের দেওয়াল। দেওয়ালের ওপর সহস্র দীপ রাখবার স্থান। হাঁটু গেড়ে বসে এই সুন্দর বৃক্ষ বন্দনা করে প্রভা বলল, "প্রিয়, এ হচ্ছে সেই জাতের বৃক্ষ যার নীচে বসে সিদ্ধার্থ গৌতম আপন সাধনা, আপন চিন্তার দ্বারা মনকে ভ্রান্তিমুক্ত করে বোধপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সেই থেকে এ গাছ বুদ্ধের নামে খ্যাত হয়েছে। সেই পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করে আমি এই বৃক্ষের সামনে মাথা নত করি।"

"আপন সাধনা, আপন চিন্তার দ্বারা মনকে ভ্রান্তিমুক্ত করে বৌধিক মার্গ অর্জনের প্রতীক! এ রকম প্রতীককে পূজা করা উচিত প্রিয়ে! এ রকম প্রতীকের পূজা আপন সাধনায় আত্ম-বিজয়েরই পূজা।"

এরপর দু'জনেই ভদন্ত ধর্মরক্ষিতের কাছে গেল। তিনি অঙ্গনের এক বকুল বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট ছিলেন। নবপুষ্পিত ফুলের মধুর সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছিল। বৌদ্ধ উপাসিকার ন্যায় প্রভা পঞ্চপ্রতিষ্ঠিত হয়ে (হাঁটু গেড়ে বসে, হাতের পাতা এবং কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে) তাঁকে বন্দনা করল। অশ্বঘোষ দণ্ডায়মান অবস্থাতেই শ্রদ্ধা নিবেদন করল। তারপর দু'জনে মাটির ওপর রক্ষিত চর্মাসনে বসে পড়ল। সাধারণ শিষ্টাচারের কথাবার্তার পর অশ্বঘোষ দর্শনের কথা তুলল। ধর্মরক্ষিত বললেন, "ব্রাহ্মণকুমার, বৌদ্ধধর্মে দর্শনকেও বন্ধন এবং দৃঢ়বন্ধন (দৃষ্টিসংযোজন) বলা হয়েছে।"

"তবে কি বৌদ্ধধর্মে দর্শনের কোনো স্থান নেই, ভদন্ত ?"

"বুদ্ধের ধর্মই দর্শনময়; কিন্তু বুদ্ধ একে নদী পার হবার ভেলা মনে করতেন।"

"কি বললেন, ভেলা মনে করতেন ?"

"হ্যাঁ, খেয়াবিহীন নদী পার হতে হলে লোক ভেলার সাহায্যে পার হয়। কিন্তু পার হবার পর সেই ভেলা মাথায় করে নিয়ে যায় না।"

"আপন ধর্মের সপক্ষে যে পুরুষ উচ্চকণ্ঠে এত বড় কথা বলবার স্পর্ধা রাখেন, তিনি নিশ্চয়ই সত্যের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করেছেন। ভদন্ত, বুদ্ধের দর্শন থেকে এমন কিছু বলুন যাতে আমরা নিজেদের চলার সঠিক পথ খুঁজে নিতে পারি।"

"অনাত্মবাদ, কুমার! ব্রাহ্মণেরা আত্মাকেই নিত্য, ধ্রুব, এবং শাশ্বত বলে মনে করে। কিন্তু বুদ্ধ জগতের ভিতর-বাহির কোথাও এমন কোনো নিত্য, ধ্রুব বা শাশ্বত তত্ত্বকে স্বীকার করেন না। এ জন্যই তাঁর দর্শনকে অনাত্মবাদ, অর্থাৎ অবিরাম উৎপত্তি আর বিনাশের সংঘর্ষে যে অনিত্যতা তারই দর্শন বলা হয়।"

"এই একটা বাণীই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ভদন্ত! ধর্ম এবং অনাত্মবাদ ভেলার ন্যায়, এই বাণী প্রচার করেছেন যে বুদ্ধ—তাঁকে শত শত অশ্বঘোষ প্রণাম জানাচ্ছে। অশ্বঘোষ যা খুঁজে মরছিল, তা সে পেয়ে গেছে। আমি নিজের ভিতরে এমনই এক চিন্তালহরী

অনুভব করছিলাম কিন্তু রূপ দেবার মতো ভাষা এর আগে আমি খুঁজে পাইনি। লোকে বুদ্ধের শিক্ষাকে যথাযথ পালন করলে পৃথিবীর রূপ আজ বদলে যেত।"

"ঠিকই বলেছ কুমার! আমাদের যবন দেশগুলোতে মহান্ দার্শনিকগণ জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁদের ভিতর পিথাগোরাস এবং হেরাক্লিটাস ছিলেন ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক আর সক্রেটিস্, প্লেটো, দেমোক্রেটাস, আরিস্টোটল্ —এঁরা জন্মগ্রহণ করেন কিছুকাল পরে। এইসব যবন দার্শনিকদের সকলেই ছিলেন অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি। কিন্তু একমাত্র হেরাক্লিটাস ছাড়া আর কেউই শাশ্বতবাদ, নিত্যবাদের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। বর্তমান সম্বন্ধে তাদের মোহ ছিল বড় বেশী। তার কারণ, ভবিষ্যৎকে তাঁরা বর্তমানের নাগপাশে বেঁধে রাখতে চাইতেন। হেরাক্লিটাস অবশ্য বুদ্ধের মতোই, জগৎকে এক মুহূর্তের জন্যও স্থির, অচঞ্চল বলে স্বীকার করতেন না, বুদ্ধের মতোই চির-চলমান বলে তিনি জগৎকে মনে করতেন —কিন্তু এর পেছনে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ।"

"দর্শন-বিচারে ব্যক্তিগত স্বার্থ!"

"উদর নামক জিনিসটি সকলেরই আছে কুমার! হেরাক্লিটাসের সময়ে আমাদের এথেন্স নগরে গণ-শাসন ছিল, অর্থাৎ এথেন্স কোনো রাজার অধীন রাজ্য ছিল না। প্রথমে হেরাক্লিটাসদের পরিবারের মতো বড় বড় সামন্ত পরিবারেরা গণ-শাসনের কর্ণধার ছিলেন। পরে তাঁদের হটিয়ে দিয়ে ব্যবসায়ী-শেঠরা শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। হেরাক্লিটাস এতে মোটেই খুশী হননি, তিনি পরিবর্তন চেয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু এগিয়ে চলার পথে নয়, পিছনে ফিরবার জন্যে।"

"পরিবর্তন আমাদের চাই, কিন্তু সেটা এগিয়ে যাবার জন্য, পিছিয়ে পড়ার জন্য নয়— আমার মনে হয় ভদন্ত, অতীত চিরকালই মৃত।"

"খুবই খাটি কথা! বুদ্ধ পরিবর্তন চাইতেন উন্নততর জগৎ প্রতিষ্ঠার জন্য। এই ভবিষ্যৎ জগতের প্রতীক হিসাবে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে সংগঠিত করেছেন। যেখানে জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ নেই, উঁচু-নীচুর ভেদ নেই। যেখানে সকলেই সমান, যেখানে সবাইকেই সমান শ্রম করতে হবে। তুমি আমাদের মহাস্থবির ধর্মসেনকে বাইরে ঝাড়ু হাতে কাজ করতে দেখেছ?"

"ঐ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধটি?"

"হ্যাঁ, উনিই আমাদের ভেতরে শ্রেষ্ঠ, আমরা প্রতিদিন পঙ্ক-প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁকে বন্দনা করি। সমগ্র কোশল দেশের ভিক্ষুসঙ্ঘগুলির উনিই নায়ক।"

"শুনেছি, উনি না-কি চণ্ডাল কুলজাত?"

"ভিক্ষুসঙ্ঘ কুলবিচার করে না, কুমার। তারা বিচার করে গুণের। নিজ বিদ্যা এবং গুণের জোরেই আজ উনি আমাদের নায়ক, আমাদের পিতা। শুধু নিজের পেট ভরানো

মতো সামান্য ভিক্ষাও যদি তিনি লাভ করেন, তবু সঙ্গীদের ভাগ না দিয়ে কখনই তা গ্রহণ করেন না তিনি এবং এই হল বুদ্ধের শিক্ষা। পরিধেয় তিন খণ্ড কাপড়, মাটির তৈরী এক ভিক্ষাপাত্র, একটি সূচ, জল পান করবার একটি পাত্র, একটি চিরুণী আর এক কোমর বন্ধনী —এই কয়টি জিনিস ছাড়া আমাদের আর সব কিছু সঙ্ঘের সাধারণ সম্পত্তি। এই বাড়ি, বাগান, মঞ্চ, বেদী —সবই সঙ্ঘের সম্পত্তি। আমাদের কোনো কোনো বিহারে যে জমি রয়েছে, তাও সঙ্ঘেরই। কাউকে ভিক্ষুসঙ্ঘে গ্রহণ করতে হলে সঙ্ঘ বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তা করে, কিন্তু একবার যে সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হয়েছে, ভিক্ষুতে পরিণত হয়েছে, সে সঙ্ঘের আর সবারই সমান।"

"সারা দেশটাই যদি এমনই এক সঙ্ঘে পরিণত হত!"

"সে কি করে হবে কুমার? রাজা বা ধনীর দল কেন অন্যকে তাদের সমান হতে দেবে! ভিক্ষুরা একবার একজন দাসকে সঙ্ঘে ঢুকিয়েছিল। সঙ্ঘে আসবার পরই সে আর দাস রইল না, হয়ে গেল সকলের সমান। কিন্তু এরপরই তার প্রভু এসে হল্লা সুরু করে দেয়। রাজা নিজে হাজার হাজার দাসের প্রভু। তিনিই বা তাঁর সম্পত্তির ওপর এ ধরনের হস্তক্ষেপ সহ্য করবেন কেন? এ সবের বিরুদ্ধে কি আর করতে পারি, কাজেই নির্দেশ দিতে হল, কোনো দাসকে আর সঙ্ঘের ভিতর নেওয়া হবে না। অসাম্যের বিশাল সমুদ্রের মাঝে আমাদের সঙ্ঘ এক ক্ষুদ্র দ্বীপমাত্র। দারিদ্র্য এবং দাসত্ব যতদিন অটুট থাকবে, ততদিন আমাদের সঙ্ঘগুলিকে নিরাপদ মনে করা চলে না।"

৮

শরতের পূর্ণিমা। সন্ধ্যা থেকেই চাঁদের আলো পূর্ব দিগন্ত থেকে উঠে আসছে। অস্তমিত সূর্যের লাল আভা যেমন নীল দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, চাঁদের শীতল রূপালী আলোও তেমনি নীল আকাশকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। আজকাল অশ্বঘোষ বেশীরভাগ সময়ই প্রভাদের বাড়ি থাকে। দু'জনে ছাদের ওপর বসেছিল, প্রভা বলে উঠল, "সরযূর তরঙ্গ-লহরী আমাকে ডাকছে প্রিয়তম! সেই লহরী, যা তোমাকে প্রথম আমার কাছে টেনে এনেছিল এবং প্রথম প্রেমডোরে আমরা বাঁধা পড়েছিলাম। সে দিনটি দু'বছর আগের, কিন্তু আজও মনে হয় যেন গতকালের ঘটনা। কত চাঁদনী-রাতই না আমরা সরযূতীরে কাটিয়েছি, কি মধুর ছিল সেইসব রাতগুলো! আজও তেমনি মধুযামিনী প্রিয়ে! চল, আমরা সরযূতীরে যাই।" দু'জনে চলতে লাগল। নদী এখান থেকে দূরে। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত বালুকারাশির ওপর দিয়ে অনেক দূর হাঁটল তারা। প্রভা তার চটি জোড়া আগেই হাতে তুলে নিয়েছে, পায়ের নীচে কোমল বালুকারাশির সুখস্পর্শ অনুভব করতে লাগল। দু'হাতে অশ্বঘোষের কটি বেষ্টন করে প্রভা বলল, "সরযূ-সৈকতে এই বায়ুর স্পর্শ কি অপূর্ব, না প্রিয়তম?"

"হ্যাঁ, পায়ের নীচে বেশ চমৎকার সুড়সুড়ি দেয়!"

"এক অদ্ভুত অনুভূতি না? রোমাঞ্চ লাগে যেন!"

"আমি কতবার ভেবেছি, আমরা দু'জনে পালিয়ে যাই! চলে যাই সেই দেশে যেখানে আমাদের প্রেমকে ঈর্ষা করার কেউ থাকবে না। যেখানে তুমি আমাকে প্রেরণা জোগাবে আর আমি রচনা করব সুন্দর গীত। তারপর বীণা বাজিয়ে সেই গীত এক সঙ্গে গাইব দু'জনে। এখানে এমন রাত্রে আমার বীণা তো সঙ্গে আনতে পারি না প্রভা, লোক জমে যাবে। আর তাদের মধ্যে হয়ত দেখব বহু ঈর্ষাকলুষিত নয়ন!"

"মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, যদি আমি না থাকি···"

প্রভাকে দৃঢ়ভাবে বুকে চেপে ধরে অশ্বঘোষ বলল, "না না প্রিয়ে, কখনই তা হতে পারে না, আমরা এমনই এক সঙ্গে চিরদিন থাকব।"

"অন্য কিছু ভেবে আমি এ কথা বলছিলাম প্রিয়তম। ধর, তুমি মারা গেলে আমি একা থেকে গেলাম। জগতে এ রকম ঘটনা ঘটে তো নিশ্চয়ই।"

"ঘটে!"

"তোমার মৃত্যুর কথায় তো অধীর হয়ে উঠলে না তুমি! তোমার অবর্তমানে আমার ওপরেই শুধু শোকের পাহাড় ভেঙে পড়বে—এই ভেবে, না?"

"তুমি এমন নিষ্ঠুর কথা শোনাচ্ছ কেন প্রভা!"

অশ্বঘোষের অধর চুম্বন করে প্রভা বলল, "জীবনে পূর্ণিমাই শুধু নয়, জীবনে অমানিশারও আগমন হয়। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাইছিলাম, একের অবর্তমানে অপরের কর্তব্য কি। তুমি না থাকলে আমি কি করব জানো?"

মাথা নীচু করে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে অশ্বঘোষ বলল, "বল।"

"নিজের জীবনকে কিছুতেই শেষ করে দেব না আমি। ভগবান বুদ্ধ আত্মহত্যাকে পাপপূর্ণ মূর্খের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। তুমি তো দেখেছ, ইতিমধ্যেই বীণার ওপর কতটা দখল আমার এসে গেছে।"

"অনেকখানি প্রভা! কতবার তোমার হাতে বীণা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গান গেয়েছি আমি।"

"হ্যাঁ, কোনোদিন হয়ত নশ্বর অশ্বঘোষ বিলীন হয়ে যাবে আমার দৃষ্টি থেকে, কিন্তু আমি যুগ-যুগান্তরের অমর কবি অশ্বঘোষের আরাধনা করে চলব। তোমারই বীণায় তোমার রচিত গান গাইব। জীবনভোর গান গেয়ে ফিরব দেশে-বিদেশে, যতদিন না আমাদের যুগ্ম জীবনপ্রবাহ অন্য কোনো দেশকালে এসে সাকার-সম্মিলনের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমি না থাকলে তুমি কি করবে?"

কথাগুলো শুনে অশ্বঘোষের অন্তস্তল থেকে সুরু করে সারা দেহ কেঁপে উঠল থরথর

করে, প্রভা অনুভব করল সে কম্পন। কথা বলবার চেষ্টা করল অশ্বঘোষ, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে তার, চোখে জল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "জীবনে এমন দিন সত্যিই বড় সাংঘাতিক, কিন্তু আমিও আত্মহত্যা করব না প্রভা। তোমার প্রেমের প্রেরণা আমার হৃদয়ে যে গানের সঞ্চার করবে, তাই আমি গেয়ে চলব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আমি যে তোমারই অমর অশ্বঘোষ।"

"সরযূর-ধারা ঘুমিয়ে পড়েছে প্রিয়তম, চল আমরা এবার ঘরে ফিরি।"

৯

গ্রীষ্মকাল। মাতা সুবর্ণাক্ষী রোগে পড়লেন। অশ্বঘোষ দিনরাত মায়ের কাছে থাকে। দিনের বেলা প্রভাও থাকে। চিকিৎসায় কোনো ফল হল না, সুবর্ণাক্ষীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠল। আর এক পূর্ণিমার রাত এসে গেল, রূপালী চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। এই চাঁদের আলোতেই সুবর্ণাক্ষী ছাদের ওপর যেতে চাইলেন। তাঁর পালঙ্ক উঠল সেখানে। তাঁর কঙ্কালসার শরীর দেখে অশ্বঘোষের হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠতে লাগল। ধীরে স্পষ্ট কণ্ঠে মা বললেন, "কি সুন্দর জ্যোৎস্না!"

অশ্বঘোষের কানে প্রভার কথা বেজে উঠল, 'সরযূর তরঙ্গ-লহরী আমাকে ডাকছে।' বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল অশ্বঘোষের। মা আবার বললেন, "প্রভা কোথায় বাবা?"

"তাদের বাড়িতে মা, সন্ধ্যা পর্যন্ত তো এখানেই ছিল।"

"প্রভা! মা আমার! ওকে তুই কখনও ভুলিস না বাবা···" কথা শেষ হবার আগেই একটা কাশির দমকে সুবর্ণাক্ষীর দেহ নিশ্চল হয়ে গেল। সুবর্ণাক্ষী গত হলেন। সুবর্ণাক্ষী পুত্রের বুক ফেটে হাহাকার উঠল। রাত দিন সমানে কাঁদল সে।

পরদিন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত মায়ের দাহকর্মেই কেটে গেল। তারপর প্রভার কথা মনে পড়ল। সে দত্তমিত্রের বাড়িতে গেল। প্রভার মা-বাবা ভেবেছিলেন, সে অশ্বঘোষের কাছেই গেছে। গত রাত্রের আঘাতেই অশ্বঘোষের হৃদয় জর্জরিত হয়ে উঠেছিল, এখন সে আরও অধীর হয়ে পড়ল। অশ্বঘোষ প্রভার শয়নকক্ষে ঢুকল। সব জিনিসই ঠিকমতো সাজানো রয়েছে। শয্যার ওপর থেকে সাদা চাদরটা টেনে তুলল সে, সেখানে দেখতে পেল নিজের একখানা ছবি। ছবিখানা তৈরী করিয়েছিল প্রভা এক নবাগত যবন চিত্রকরকে দিয়ে। এই ছবির জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও অশ্বঘোষকে বহু সময় স্থির হয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। ছবির ওপর একটি ম্লান জুঁই ফুলের মালা। ছবির নীচে প্রভার মুদ্রাঙ্কিত তালপত্র-লেখ রয়েছে। অশ্বঘোষ চিঠিখানা তুলে নিল। সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল সেটা। সুতোর বাঁধুনি আটকাবার জন্য যে কালো মাটি লাগানো হয়েছিল তা তখনও ভালো করে শুকোয়নি। সুতো কেটে চিঠি খুলতেই প্রভার সুন্দর হস্তাক্ষরে লম্বা পাতার ওপর লেখা পাঁচটি পংক্তি জলজল করে উঠল—

"প্রিয়তম, প্রভা বিদায় নিয়ে যাচ্ছে, সরযূর জলরাশি আমায় ডাক দিয়েছে, তাই আমি চলেছি। আমার প্রেমের প্রতিদানে তুমি একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলে মনে আছে? প্রভার চির-তারুণ্য, শাশ্বত সৌন্দর্য আমি রেখে যাচ্ছি তোমার কাছে। পাকাচুল, ভাঙাদাঁত লোলচর্ম প্রভাকে আর তোমায় দেখতে হবে না। আমার প্রেম, আমার এই অবিনশ্বর যৌবন তোমাকে প্রেরণা জুগিয়ে চলবে। এই প্রেরণাকে তুমি হেলায় নষ্ট কর না, প্রিয়তম। এ কথা ভেব না, আমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের তিরস্কারের ভয়ে আত্মহত্যা করছি। শুধু তোমাকে কাব্য-প্রেরণা জোগাবার জন্যেই আমি এই পথে আমার অক্ষুণ্ণ যৌবনকে তোমার কাছে রেখে গেলাম। প্রিয়তম, প্রভা তার কল্পনায় তোমাকে শেষ আলিঙ্গন আর চুম্বন দিয়ে যাচ্ছে।"

বারে বারে চোখের জল মুছে চিঠিখানা পড়ল অশ্বঘোষ। শেষে চিঠিখানা তার হাত থেকে পড়ে গেল। খাটের ওপর বসে পড়ল সে। সব কিছুই যেন শূন্য হয়ে গেছে তার। তন্ময় হয়ে সে যেন হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হবার প্রতীক্ষা করতে লাগল। মর্মর মূর্তির মতো শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। বহুক্ষণ পর প্রভার বাবা-মা ঘরে এসে ঢুকলেন। অশ্বঘোষের এই অবস্থা দেখে বড়ই শঙ্কিত হয়ে পড়লেন তাঁরা। তারপর চিঠিখানা তুলে পাঠ করলেন। প্রভার মা তীব্র আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। দত্তমিত্রের চোখ থেকে নীরব অশ্রুধারা নেমে এল। অশ্বঘোষ তাকিয়ে রইল তেমনি স্থির শূন্য দৃষ্টি মেলে। বহুক্ষণ পর্যন্ত তাকে এই অবস্থায় দেখার পর প্রভার মা-বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে এল, অশ্বঘোষ বসে রয়েছে সেই একই অবস্থায়। চোখের জল শুকিয়ে গেল। তার হৃদয়ের ভিতরটাও পাথর হয়ে গেছে যেন। এইভাবে বসে থাকতে থাকতে অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সকলে প্রভার মা এসে দেখলেন, অশ্বঘোষ প্রকৃতিস্থ হয়ে কি যেন চিন্তা করছে বসে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ?"

"সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছি মা। প্রভা যে কাজ আমাকে সঁপে দিয়ে গেছে এ-বারে আমি তাই সম্পন্ন করব। আমি বুঝতাম না, কিন্তু প্রভা জানত; সে আমার কর্তব্য বলে দিয়ে গেছে।—আত্মহত্যা নয় মা, প্রভা আত্মদান করে গেছে। এ কথা ঠিকই যে, এই আত্মদানকে আমি আত্মহত্যা বলে প্রচার করতে পারি, কিন্তু এত অকৃতজ্ঞ আমি হতে পারব না।"

প্রভার মা তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছ বাবা?"

"ভদন্ত ধর্মরক্ষিতের সঙ্গে দেখা করতে, আর সরযূকে দেখতেও বটে।"

"ভদন্ত ধর্মরক্ষিত নীচেই বসে আছেন। আর সরযূ দেখতে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।" কথা বলতে বলতে গলা ধরে গেল তাঁর।

নীচে গিয়ে ধর্মরক্ষিতকে পঞ্চপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বন্দনা করে অশ্বঘোষ বলল, "ভদন্ত, এ-বারে আমাকে সঙ্ঘে গ্রহণ করুন।"

"বৎস, তোমার শোক নিদারুণ।"

"শোকের তাড়নায় আমি বলছি না, প্রভা ... জন্য আমাকে তৈরী করে গিয়েছে।"

"তা'হলেও তোমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, সঙ্ঘ এত তাড়াতাড়ি তোমাকে গ্রহণ করবে না।"

"প্রতীক্ষা আমি করব ভদন্ত, কিন্তু সঙ্ঘের আশ্রয়ে থেকে।"

"প্রথমে তোমার পিতার কাছ থেকে সম্মতি আনতে হবে। মাতা-পিতার সম্মতি ছাড়া সঙ্ঘ কাউকে ভিক্ষু হিসাবে গ্রহণ করে না।"

"তা'হলে আমি অনুমতি নিয়েই আসব।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এল অশ্বঘোষ। প্রভার মা তার সুস্থ মস্তিষ্কের কথাবার্তা শোনার পরও শঙ্কিত হয়েই ছিলেন, তাই তিনিও পিছে পিছে এলেন। নৌকা করে সরযূর জলে সারা দিন দু'জনে খোঁজার পরও কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না প্রভার। পরের দিন আরও এগিয়ে গিয়ে খোঁজ হল, কিন্তু কোথাও কিছু নেই।

বাড়ি গিয়ে অশ্বঘোষ পিতার কাছে ভিক্ষু হওয়ার জন্য অনুমতি চাইল, কিন্তু একমাত্র পুত্রকে কি করে তিনি অনুমতি দেবেন এ পথে যাবার জন্য! অশ্বঘোষ বলল, "মা আর প্রভার শোকে অস্থির হয়ে আমি এ পথ গ্রহণ করতে যাচ্ছি না বাবা। নিজের জীবনে আমি যে কর্মধারা গ্রহণ করছি, এটাই তার রাস্তা। তুমি দেখছ না আমার কণ্ঠস্বরে, আমার আচরণে কোথাও চিত্তবিকারের এতটুকু লক্ষণ নেই। আমি আর একটা কথাই শুধু বলব —যদি আমাকে জীবিত দেখতে চাও তবে সম্মতি দাও পিতা।"

"কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাববার সময় দাও..."

"আমি সাতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী পিতা।"

পরের দিন চোখের জলে ভেসে অশ্বঘোষকে ভিক্ষু হবার সম্মতি দিলেন তিনি।

সাকেতের আর্য সর্বাস্তিবাদ সঙ্ঘ অশ্বঘোষকে ভিক্ষুরূপে গ্রহণ করল। মহাস্থবির ধর্মসেন হলেন অশ্বঘোষের উপাধ্যায় এবং ভদন্ত ধর্মরক্ষিত হলেন তার আচার্য। নৌকাযোগে ভদন্ত ধর্মরক্ষিতের পাটলিপুত্র যাবার কথা ছিল, তাঁর সঙ্গে অশ্বঘোষও সাকেত ত্যাগ করল।

১০

পাটলিপুত্রস্থ অশোকারামে (মঠ) ভিক্ষু অশ্বঘোষের দশ বছর কেটে গেল। বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধদর্শন এবং যবন-দর্শন সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন করল সে। মগধের মহাসঙ্ঘের বিদ্বান্ মণ্ডলীতে অশ্বঘোষের স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। এই সময় পশ্চিম থেকে শক সম্রাট কণিষ্ক পূর্বাঞ্চল জয় করবার জন্য পাটলিপুত্রে এসে উপস্থিত হল। পাটলিপুত্র এবং মগধ

এই সময় বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রতি কণিষ্কের ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। গান্ধারে নিয়ে যাবার জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘ থেকে একজন বিদ্বান্ ব্যক্তিকে চেয়ে পাঠাল কণিষ্ক। সঙ্ঘ অশ্বঘোষকে পাঠিয়ে দিল।

রাজধানী পুরুষপুর (পেশোয়ার) গিয়ে অশ্বঘোষ দেখল, সেখানে শক, যবন, তুরস্ক, পারশী তথা ভারতীয় সংস্কৃতির একত্র সমাবেশ। যবন নাট্যকলাকে অশ্বঘোষ আগেই ভারতীয় সাহিত্যে স্থান দিয়েছিল। যবন-দর্শনের গভীর অনুশীলনের পর, তার বহু বিশেষত্ব, বিশ্লেষণ-শৈলী এবং অনুকূল তত্ত্বসমূহকে নিয়ে ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে বৌদ্ধদর্শনকে সে সমৃদ্ধ করে তোলে। বৌদ্ধদের যবন-দর্শন গ্রহণ করবার পথও প্রশস্ত করে দেয় অশ্বঘোষ। তার পরে অপরাপর ভারতীয় দার্শনিকেরাও এই চেষ্টা করেছে এবং বৈশেষিক আর ন্যায়ের পথে সকলের আগে আগে চলেছে। পরমাণু, সামান্য দ্রব্যগুণ, অবয়বী ইত্যাদি তত্ত্ব এরা যবনদের নিকট থেকেই গ্রহণ করেছে।

অশ্বঘোষের হৃদয়কে বিশাল করে দিয়েছিল প্রভা, কাজেই তার কাছে আত্মপর ভেদ ছিল না। প্রভার প্রেরণায় সে বহু কাব্য আর নাটক লেখে। তার অনেক কিছুই আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও প্রকৃতি তার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল, তাই উনিশ শত বছর পরে মধ্য এশিয়ার মহাবালুকারাশি গোবী অশ্বঘোষের 'সারিপুত্ত' প্রকরণকে (নাটক) মানুষের হাতে তুলে দেয় [জর্মন ভারত-তাত্ত্বিক অধ্যাপক লুডার্স ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সারিপুত্ত প্রকরণ নাটকের তালপত্রে লিখিত খণ্ডিত পুথি আবিষ্কার করেন]। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ-চরিত' আর 'সৌন্দরানন্দ' দুই অমর কাব্য।

প্রভার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তাকে যথাযথভাবেই পালন করেছিল সে এবং প্রভার অম্লান সৌন্দর্যরাশি তার কাব্যকে সুন্দরতম করে তুলেছিল। জন্মভূমি সাকেত এবং মাতা সুবর্ণাক্ষীকে কখনও সে বিস্মৃত হয়নি। আপন গ্রন্থসমূহে সর্বদাই নিজের নাম লিখত 'সাকেতবাসী আর্য-সুবর্ণাক্ষী পুত্র অশ্বঘোষ'।

সুপর্ণ যৌধেয়

কাল : ৪২০ খৃষ্টাব্দ

আমার ভাগ্যচক্র যেন কেমন! কখনও এক জায়গায় স্থির থাকতে পারিনি। সংসার তরঙ্গ আমাকে সর্বদা চঞ্চল এবং বিহ্বল করে রেখেছে। জীবনে মধুর দিনও এসেছে যদিও তিক্ত দিনগুলোর তুলনায় সংখ্যায় কম আর পরিবর্তন তো যেন বর্ষাশেষে বাদলা দিনের মতো, বৃষ্টি আর রৌদ্রে লুকোচুরি। জানি না, এই পরিবর্তনের চক্র কেন ঘুরছে।

পশ্চিম উত্তরাপথ গান্ধারে এখনও মধুপর্কে বাছুরের মাংস দেওয়া হয়। কিন্তু মধ্যদেশে (উত্তরপ্রদেশ, বিহার) গোমাংসের নাম করা পাপ, এখানে গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমি বুঝে উঠতে পারি না, একই ধর্মে এত বৈপরীত্য কেন! এক জায়গার অধর্ম কি অপর জায়গায় ধর্ম রূপে চলতে থাকবে; অথবা এক জায়গার পরিবর্তন আগে সাধিত হয়েছে, অন্যত্র পরে তার অনুকরণ করবে?

অবন্তীর (মালবা) এক গ্রামে শিপ্রা নদীতটে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আমার কুলের লোকেরা নিজেদের পরিব্রাজক বলে, যদিও এদের আপন ক্ষেত-খামার, ঘর-বাড়ি রয়ে গেছে এবং সেগুলো আপন স্কন্ধে বহন করে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া চলে না। আমাদের কুলের লোকেদের দেহের গড়ন এবং রঙ ও রূপ গ্রামের অন্যান্য লোকজন থেকে কিছুটা পৃথক। আমরা অধিকতর দীর্ঘ, গৌর এবং সেই সঙ্গে আমাদের উৎকর্ষ অন্যদের কাছে ছিল অসহ্য। আমার মা গ্রামের স্ত্রীলোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ছিলেন, তাঁর সুগৌর মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে-পড়া বাদামী চুলে—বড়ই সুন্দর লাগত। আমাদের পরিবারের লোক নিজেদের ব্রাহ্মণ বলত, কিন্তু আমি লক্ষ্য করতাম গ্রামের লোকের তাতে সন্দেহ রয়ে গেছে। সন্দেহের কারণও ছিল। এইস্থানে ব্রাহ্মণদের ভিতর সুরাপান মহাপাপ বলে গণ্য হত, কিন্তু আমাদের গৃহে তা বরাবর তৈরী হত এবং পান করা হত। উচ্চকুলে স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত নাচ-গান এখানে অশ্রুতপূর্ব, কিন্তু আমাদের কুলের সাতটি পরিবার—যারা একই বংশজাত, সন্ধ্যা হলেই খোলা জায়গায় এক সঙ্গে মিলিত হতাম। শৈশবে আমি ভাবতাম, সকল জায়গাতেই এই একই নিয়ম, কিন্তু গ্রামের অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে তাদের বিদ্রূপ বাক্যে বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাদের অদ্ভুত ধরনের মানুষ বলে মনে করে এবং আমাদের কৌলীন্যকে স্বীকার করলেও ব্রাহ্মণত্বকে সন্দেহ করে। আমাদের গ্রামখানা বেশ বড়, দোকান এবং ব্যবসায়ীদের বাড়িঘরও ছিল। গ্রামে কিছু নাগর পরিবার ছিল, লোকে তাদের বেনে বলত, কিন্তু তারা আমাদের মতোই নিজেদের ব্রাহ্মণ বলত। কিছু নাগর-কন্যা বিবাহসূত্রে আমাদের কুলে এসেছিল, গ্রামের লোকেদের আমাদের ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার না করবার এটাও একটা কারণ। তাদের বক্তব্য, ব্রাহ্মণের পান-ভোজন-বিবাহ রীতি অবহেলা করে আমরা কি করে ব্রাহ্মণ থাকতে পারি? আমার খেলার সাথী ছেলেদের যদি কখনও আমার ওপর রাগ হত তবে আমাকে 'জুঝওয়া' বলে অবজ্ঞায় নাক সিঁটকাত। এ সম্বন্ধে মাকে আমি অনেকবার প্রশ্ন করেছি, কিন্তু তিনি আমার প্রশ্নকে বরাবর এড়িয়ে গিয়েছেন।

দশ বছর বয়স হল আমার, গ্রামের এক ব্রাহ্মণ গুরুর পাঠশালায় পড়তে যেতে লাগলাম। আমার সহপাঠীরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ—লোকের কথা অনুসারে সকলেই খাঁটি ব্রাহ্মণ। এরা ছাড়া আমি এবং অপর দুই নাগর বিদ্যার্থী ছিলাম। সহপাঠীরা

আমাদের আধা-ব্রাহ্মণ বলে ডাকত। বিদ্যার্থীগণের মধ্যে আমি সবচেয়ে তীক্ষ্ণধী ছিলাম এবং আমার প্রতি গুরুর বিশেষ স্নেহ ছিল। আমাদের কুলের স্বভাব আমার মধ্যেও ছিল, এবং কারও কথা সহ্য না করে তার সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতাম। একদিন আমার এক সহপাঠী বিদ্রূপ করে বলল, "ব্রাহ্মণ হয়েছে, জুঝওয়া কোথাকার!" আমার কাকার শ্যালকপুত্র আমার পক্ষ নিতে এসেছিল, তাকেও বলল, "যবন কোথাকার, নাগর ব্রাহ্মণ হয়েছে!" শৈশবে ছোট ছেলেদের এমনি খোঁটা দিতে শুনেছি, কিন্তু তখনও সে সব আমাকে এত তীব্রভাবে আঘাত করেনি, অথবা ওতে এত কিছু ভাববারও অবকাশ হয়নি! আমরা তিনজন ছাড়া পাঠশালায় আরও ত্রিশজন বিদ্যার্থী এবং চারজন বিদ্যার্থিনীও ছিল। এরা দেখতে আমাদের মতো ফর্সা বা দীর্ঘকায় নয়, তবু তারা এমন ভাব দেখাত যেন আমরা তাদের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর মানুষ!

সেদিন ঘরে ফিরে এলে আমাকে বড়ই বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। আমার শুষ্ক অধর দেখে মা আমার মুখ-চুম্বন করে বললেন, "আজ এত বিমর্ষ কেন তুই?"

মা অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করাতে আমি বললাম, "মা, আমাদের কুলে কি এমন দোষ আছে, যে জন্য লোকে আমাদের ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে চায় না?"

"পুত্র, আমরা পরদেশী ব্রাহ্মণ, এ জন্য তারা ও রকম ভাবে।"

"শুধু ব্রাহ্মণ নয় মা, অব্রাহ্মণেরাও আমাদের ব্রাহ্মণত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে।"

"ব্রাহ্মণেরা বলে বলেই অন্যেরাও বলে।"

"আমাদের যজমানীও নেই; অন্য ব্রাহ্মণেরা পুরোহিতগিরি করে, ব্রাহ্মণ-ভোজনে যায়, আমাদের কুলে তাও দেখা যায় না। এ ছাড়া অন্য ব্রাহ্মণেরা তো আমাদের সঙ্গে পংক্তি ভোজনেও সম্মত হয় না। যদি এর কারণ জানো তবে বল মা।"

মা আমাকে অনেক বোঝাল কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। আমার চিত্ত যখন এমন চঞ্চল, সে সময় আমার নাগর সহপাঠী এবং আত্মীয়দের আমার প্রতি সহানুভূতি ছিল। অথবা বলা যায়, আমরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম।

২

আরও কিছুকাল অতিবাহিত হল। আমি তের বছরের হয়ে উঠলাম এবং পাঠশালার শিক্ষা প্রায় সমাপ্ত হয়ে এল। বেদ, ঋগ্বেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত এবং কিছু কাব্যও আমি পড়েছিলাম। আমার প্রতি গুরুদেবের স্নেহ ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তাঁর কন্যা বিদ্যা আমার চেয়ে বয়েসে ছোট ছিল। পাঠ মুখস্থ করতে আমি তাকে সাহায্য করতাম। গুরুদেব এবং গুরুপত্নীর ব্যবহার দেখে বিদ্যাও আমাকে খুব মান্য করত, আমাকে 'ভাই-সুপর্ণ' বলে ডাকত। গুরু পরিবারে আমার কখনও দুঃসময় আসেনি, কারণ গুরুপত্নীর স্নেহ আমার কাছে মায়ের সমানই ছিল।

এই সময়ে আবার একদিন এক সহপাঠী আমাকে 'ঝুমওয়া' বলে বিদ্রূপ করল সম্পূর্ণ অকারণেই। নিজেকে আমি তখন সকল দিক থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। লেখা-পড়ায় আমি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ছিলাম বলে সহপাঠীদের ঈর্ষা হত, এ ছাড়া বিদ্রূপের আর কোনো কারণ ছিল না। আমার প্রকৃতি গম্ভীর হয়ে উঠছিল। মন যে উত্তেজিত হত না, তা নয় কিন্তু আমি ধীরে ধীরে নিজেকে সংযত করতে শিখেছিলাম। আমার ঠাকুর্দার বয়স সত্তর বছরের ওপর। বহুবার আমি তাঁর কাছে দেশ-বিদেশের যুদ্ধ-অশান্তির কাহিনী শুনেছি। এও শুনেছিলাম যে, তিনিই প্রথমে, আপন ভাই-এর সঙ্গে এই গ্রামে আসেন। ঠাকুর্দার কাছ থেকে আপন কুল সম্বন্ধে আসল কথা জানতে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প হলাম।

গ্রামের পূর্বদিকে আমাদের আমবাগান ছিল। যথেষ্ট আম ফলেছিল সেখানে, যদিও পাকতে তখনও দেরী। সোনাদাসী ইতিমধ্যেই সেখানে নিজের ডেরা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। শুনেছি, আমার ঠাকুর্দা যখন গ্রামে এলেন তখন সোনাকে তিনি কোনো দক্ষিণদেশীয় ব্যাপারীর কাছ থেকে চল্লিশ রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে কিনেছিলেন। ঐ সময় দক্ষিণ-দেশ থেকে বহু ব্যবসায়ী বিক্রয় করবার উদ্দেশ্যে দাস-দাসীদের সঙ্গে করে নিয়ে আসত। সোনা তখন যুবতী ছিল, না হলে দাসীরা কখনই অত মহার্ঘ হয় না। সোনার দেহের কালো চামড়া ঢিলে হয়ে পড়েছিল, মুখমণ্ডল কুঞ্চিত বলিরেখায় ভরে গিয়েছিল, কিন্তু লোকে বলে, একদিন সে সুন্দরী ছিল। সে ছিল ঠাকুর্দার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ; বিশেষ করে যখন নিরালায় শুধু দু'জনে একত্রে থাকত। লোকে অবশ্য এই ঘনিষ্ঠতার অন্য অর্থ করত। বিপত্নীক স্বাস্থ্যবান এক প্রৌঢ় ব্যক্তির ওপর সে সন্দেহ খুবই স্বাভাবিক। সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর্দা বাগানে যেতেন, একদিন আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। ঠাকুর্দা আপন মেধাবী পৌত্রকে বড়ই স্নেহ করতেন। কথা বলতে বলতে আমি এক সময় বললাম, "দাদু, আমি তোমার কাছ থেকে আমাদের কুল সম্বন্ধে সত্যি কথা জানতে চাই, কেন লোকে আমাদের খাঁটি ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে না, কেন 'ঝুমওয়া' বলে বিদ্রূপ করে? মাকে আমি কতবার জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু তিনি আমাকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলতে চান না।"

"এ কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছ ভাই?"

"বিশেষ প্রয়োজন আছে দাদু। যদি আমি আসল কথা সঠিকভাবে জানতে পারি, তবে নিজ কুলের অপমানের প্রতিকার করতে পারব। ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে আমি এখন অনেক কিছু পড়ে ফেলেছি দাদু। আমার এতখানি বিদ্যাবল আছে যে, নিজের কুলের সম্মান আমি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব।"

"সে কথা আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু ভাই, তোমার মা বেচারীও আমার কুল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না। কাজেই, সে যে কিছু বলতে চায় না—এমন ভেব না। পৃথিবীতে আমাদের কুলের স্থিতি এখন নাগদত্তের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। আমাদের বিবাহ

ইত্যাদি ওদের সঙ্গেই হয়। অবন্তী এবং লাট-এ (গুজরাট) ওদের সংখ্যাও অনেক, এ জন্য ওদের সঙ্গেই আমাদের ডুবতে-ভাসতে হয়। তোমার বংশ যৌধেয় অপেক্ষা নাগরদের সঙ্গেই অধিক সম্পর্কিত।"

"যৌধেয় কি দাদু ?"

"আমাদের কুলের নাম ভাই। এই জন্যেই লোকে আমাদের 'জুঝওয়া' বলে।"

"যৌধেয়রা কি ব্রাহ্মণ ছিল না দাদু ?"

"ব্রাহ্মণের চেয়েও শুদ্ধ আর্য ছিল।"

"কিন্তু ব্রাহ্মণ তো নয় !"

"এর উত্তরে এক কথায় 'হ্যাঁ' কি 'না' বলার চেয়ে তোমাকে যৌধেয়দের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়াই ভালো। যৌধেয়রা শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী হিমালয় থেকে মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসী এবং সমগ্র যৌধেয় পরিবারই এই অঞ্চলের অধিকারী ছিল।"

"সমগ্র যৌধেয় পরিবার ?"

"হ্যাঁ, তাদের কোনো একজন রাজা ছিল না, তাদের রাজ্যকে গণরাজ্য বলা হত। গণ বা পঞ্চায়েতই সকল রাজকার্য চালাত। তারা এক রাজার শাসনাধীন রাজত্বের অত্যন্ত বিরোধী ছিল।"

"এমন-রাজ্যের কথা তো কোনোদিন শুনিনি দাদু ?"

"কিন্তু এমন দেশই ছিল ভাই। আমার কাছে যৌধেয় গণরাজ্যের তিনটি মুদ্রা আছে, আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। দেশ ছেড়ে আসবার সময় তাঁর সঙ্গে যে মুদ্রা ছিল, এগুলো তারই এক অংশ।"

"তুমি যৌধেয়দের দেশেই জন্মেছিলে দাদু ?"

"আমার বাবা-মাকে যখন দেশ ছাড়তে হল, আমি তখন দশ বছরের। আমার দু'জন বড় ভাইও ছিল, যাদের বংশধরদের তুমি এখানে দেখছ।"

"দেশ কেন ছাড়তে হল দাদু ?"

"পুরাকাল থেকে ও জায়গা যৌধেয়দেরই ছিল। বহু প্রতাপশালী রাজা —মৌর্য, যবন, কেউই রাজকর আদায় করা ছাড়া আমাদের গণরাজ্যকে কোনো আঘাত করেনি। চন্দ্রগুপ্ত, যিনি নিজেকে বিক্রমাদিত্য বলেন, এবং উজ্জয়িনীতে যাঁর দরবার বসে, সেই চন্দ্রগুপ্তের পূর্বপুরুষ গুপ্তবংশ যখন সিংহাসনে বসল, তখন তারা যৌধেয়দের উচ্ছেদ করল। যৌধেয়রা প্রতাপশালী সম্রাটকে কিছু কর দিত, কিন্তু সম্রাট তাতে খুশী হলেন না। তিনি বললেন, 'আমি এখানে উপরিক (গভর্নর) নিযুক্ত করব। এখানে আমার নিজের কুমারামাত্য (কমিশনার) থাকবে। আমি আমার সমগ্র রাজ্য যেভাবে শাসন করি, এখানেও তেমনি করব।' আমাদের গণ-নায়কগণ অনেক করে বোঝাল যে, যৌধেয়রা

অনাদিকাল থেকে গণ-শাসন ছাড়া অপর কোনো শাসন জানে না ; কিন্তু ক্ষমতামদমত্ত রাজা সে কথা মানবে কেন ? অবশেষে যৌধেয়রা আপন ইষ্ট গণদেবীর সামনে শপথ গ্রহণ করে তরবারি ধরল। বহুবার তারা গুপ্ত-সেনানীকে মেরে হটিয়ে দিল। যৌধেয়দের তুলনায় চার-পাঁচ গুণ বেশী সৈন্য নিয়েও গুপ্তসেনানীরা টিঁকতে পারত না। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র থেকে মরু অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সমগ্র সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যৌধেয়রা কতক্ষণ আপনাদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পারে ? গুপ্তদের সৈন্যেরা আমাদের শহর-গ্রাম সমস্ত ধ্বংস করে দিল, নারীদের নৃশংসভাবে হত্যা করল। আমাদের লোকেরা ত্রিশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়েছিল। বেশী কর দিতেও তারা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু চেয়েছিল, তাদের গণ-শাসন ব্যবস্থা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।"

"সেই গণ-শাসন কেমন ছিল দাদু ?"

"সেই শাসনে প্রত্যেকটি যৌধেয় মাথা উঁচু করে চলত, কারও সমানে দীনতা প্রকাশ করতে তারা জানত না। যুদ্ধ তাদের কাছে একটা খেলাবিশেষ ছিল। এই জন্যই তাদের বংশের নাম যৌধেয় হয়েছে!"

"আমাদের মতো আরও কোনো যৌধেয় পরিবার এমনি রয়ে যায়নি ?"

"হ্যাঁ আছে —হাওয়ায় উড়ে-যাওয়া শুকনো পাতার মতো ছড়িয়ে।"

"আর আমাদের মতো কেউ নাগর-বংশের সঙ্গে মিলে-মিশে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েনি ? তা'ছাড়া আমরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলি কেন দাদু ?"

"সে আরও প্রাচীন কথা ভাই। প্রথমে সর্বত্রই গণরাজ্য ছিল —রাজা বলে কিছুই ছিল না। সে সময় ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের মাঝে কোনো প্রভেদ ছিল না।"

"ব্রহ্ম-ক্ষত্র একই বর্ণ ছিল দাদু ?"

"হ্যাঁ, যখন প্রয়োজন হত লোকে পূজা-পাঠ করত, এবং প্রয়োজন মতো অস্ত্র ধরত। কিন্তু পরে বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ এরা এসে বর্ণবিভাগ সুরু করল।"

"ঠিক কথা, তাই তো এক পিতার দুই পুত্রের মধ্যে কেউ রন্তিদেবের মতো ক্ষত্রিয়, কেউ গৌরিবীতির মতো ব্রাহ্মণ ঋষি হতে লাগলেন।"

"এমন কথা কোথাও কেউ লিখেছে ভাই ?"

"হ্যাঁ দাদু, বেদ এবং ইতিহাসে এমন কথা পাওয়া যায়। সংকৃতি ঋষির ঐ দুই পুত্র ছিল। আরও কত বিচিত্র কথা পুরাণে পাওয়া যায়, যে-সব কথা আজকালকার লোকে বিশ্বাস করে না। চর্মণবতীর (চম্বল) তীরে দশপুর দেখেছ দাদু ?"

"হ্যাঁ, অবন্তী (মালবা) কতবার গিয়েছি; ওখানেই তো ? সেখানে আত্মীয়-স্বজনের বিয়ে উপলক্ষে কতবার না আমি গিয়েছি। ওখানে অনেক ঘর নাগর আছে, আর তাদের ভিতর অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী আছে।"

"এই দশপুর রন্তিদেবের রাজধানী ছিল। আর চর্মণবতী নাম কি করে হল সে এক আশ্চর্য কাহিনী। ব্রাহ্মণ সংকৃতির পুত্র, কিন্তু নিজে ক্ষত্রিয় রাজা রন্তিদেব অতিথিসেবার জন্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল। সত্যযুগের ষোলো জন মহান্ রাজার মধ্যে একজন। রন্তিদেবের ভোজনশালার জন্য প্রতিদিন দু'হাজার করে গরু মারা হত। তাদের চামড়া রসুইখানায় রাখা হত। তা থেকে যে রস গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ত তাতে এক নদীর সৃষ্টি হয়। চর্ম থেকে উৎপত্তি বলে তার নাম চর্মণবতী।" *

"বৎস, এ সব কি সত্যিই পুরাণে লেখা আছে?"

"হ্যাঁ দাদু, মহাভারতে পরিষ্কার লেখা আছে?"

"মহাভারতে, অর্থাৎ পঞ্চম বেদে? গোমাংস ভক্ষণ!"

"রন্তিদেবের ওখানে অতিথিদের খাওয়ার জন্য এই গোমাংস রন্ধনের কাজে দু'হাজার পাচক নিযুক্ত ছিল। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ অতিথিদের সংখ্যাও এত বেড়ে উঠত যে, মাংস কম পড়ে যাওয়ার ভয়ে পাচকরা, মাংসের বদলে ঝোল বেশী করে নেবার অনুরোধ জানাত। মহাভারতেই আছে—

তত্র স্ম সূদাঃ ক্রোশান্তি সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলা
সূপং ভূয়িষ্ঠমশ্নীধ্বং নাদ্য মাংসং যথা পুরা॥"

"ব্রাহ্মণেরা গোমাংস খেত, কি বলছ ভাই?"

"মহাভারত হচ্ছে পঞ্চম বেদ —তাতে কি মিথ্যা লেখা হতে পারে দাদু!"

"দুনিয়া কি এত ওলোট-পালোট হয়ে গেল?"

"উল্টে-পাল্টেই যায় দাদু, তবু নিজেদের খাঁটি ব্রাহ্মণ বলা এই সব দিবান্ধরা সকলের চোখেই ধুলো দিতে চায়। আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের পূর্বজ যৌধেয়রা ব্রাহ্মণদের এই ছলাকৌশল ছড়াবার আগের যুগের ধর্ম এবং রীতিনীতি মেনে চলত।"

"হ্যাঁ, আর তারা কখনও ব্রাহ্মণকে নিজেদের চেয়ে উঁচু মনে করত না।"

"এখানে এসে তুমি পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রের বিয়ে মাননীয় ব্রাহ্মণদের ছেড়ে নাগরদের সঙ্গে দিলে কেন?"

"দুটো কারণ ছিল। একে তো এই সব ব্রাহ্মণেরা আমাদের কুল সম্বন্ধে সন্দেহ করত; কিন্তু তাতে অবশ্য কিছু যেত-আসত না, ইচ্ছে করলে আমরা খাঁটি ব্রাহ্মণ কন্যাকেই বিবাহ করতে পারতাম। নাগরদের সঙ্গে আমরা এই জন্যেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলাম

* রাজ্ঞো মহানসে পূর্ব রন্তিদেবস্য বৈ দ্বিজ
অহন্যহনি বধ্যেতে দ্বে সহস্রে গবাং তথা॥
—বনপর্ব ২০৮।৮

মহানদী চর্মারাশেরুৎক্লেদাত সংসৃজে যতঃ
ততশ্চর্ম ণ্বতীত্যেবং বিখ্যাতা সা মহানদী॥
—শান্তিপর্ব ১৯।২৩

যে, তারাও আমাদের মতো অতি গৌরবর্ণ এবং ব্রাহ্মণেরা স্বীকার না করা সত্ত্বেও আমাদের মতোই তারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে থাকে।"

"নাগর কারা দাদু?"

"ব্রাহ্মণ। শুধু ব্রাহ্মণ বললেই তো লোকে মানবে না, তারা জিজ্ঞাসা করবে কোথাকার ব্রাহ্মণ, কি গোত্র। আমাদের কুটুম্ব নাগররা নগরে বাস করত, এই জন্যই এঁরা নিজেদের নাগর ব্রাহ্মণ বলতে আরম্ভ করে। আমরা যেমন নিজেদের যৌধেয় ব্রাহ্মণ বলে থাকি।"

"কিন্তু তাদের প্রকৃত পরিচয় কি, দাদু?"

"সমুদ্র তীরের যবন। এদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বদলে বৌদ্ধধর্মকে মেনে চলে। উজ্জয়িনী গেলে এ সব বোঝা যাবে। এমনও বহু নাগর আছে, যারা পরিষ্কারভাবে নিজেদের যবন বলে থাকে। ব্রাহ্মণরা এদের ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করাবার জন্যে অনেক পীড়াপীড়ি করেছে।"

"তা'হলে বর্ণ এবং জাতি-ব্যবস্থা এই মানা এবং মানিয়ে নেবার ওপরেই চলছে?"

"দেখে-শুনে তো সেই রকমই মনে হয় ভাই।"

৩

আমি এখন বিশ বছরের তরুণ, গ্রামের পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করে উজ্জয়িনীর বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষার্থী হলাম। আমার মায়ের পিতামহের পরিবার উজ্জয়িনীর এক ধনাঢ্য নাগরিক। তারা আগ্রহ করে আমাকে নিজেদের কাছে রেখেছে। আমার মতো বিদ্যার্থীর কাছে বিশাল পৃথিবীকে দেখবার গবাক্ষ-পথ হল এই উজ্জয়িনী। আমি কালিদাসের নাম শুনেছিলাম এবং তাঁর কিছু কিছু কবিতা আমি পূর্বেই পড়েছিলাম। কিন্তু এখানে এসে কিছুদিন সেই মহান্ কবির কাছে পড়বার সৌভাগ্য লাভ করলাম। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের দরবারে কবি কালিদাসের অত্যন্ত সম্মান। এ জন্য তিনি প্রায়ই উজ্জয়িনীতেই উপস্থিত থাকতেন। কবিগুরুর সম্বন্ধে আমার মনে অনেক গর্ব ছিল, কিন্তু রাজার প্রতি কালিদাসের দাস-মনোবৃত্তি আমার বড়ই খারাপ লাগত। এই সময় কবি 'কুমারসম্ভব' লিখছিলেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন, "বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্তকেই আমি এখানে শঙ্করপুত্র কুমার কার্তিকেয় নামে অমরতা প্রদান করতে চাই।"

এ সব আলোচনায় আমার নিঃসঙ্কোচ কটাক্ষ অত্যন্ত তীব্র হলেও কবি বিরূপ হতেন না। আমি একদিন বললাম, "আচার্য, আপনার কাব্য-প্রতিভার রাজ্য অনন্তকালের জন্য আর চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্তের রাজত্ব শুধু তাঁদের জীবনকাল পর্যন্ত, তবে আপনি কেন নিজেকে রাজার সামনে এত অকিঞ্চন করে রাখেন!"

"বিক্রমাদিত্য বস্তুত ধর্ম সংস্থাপক, সুপর্ণ! উনি হুনদের হাত থেকে ভারতভূমিকে মুক্ত করেছেন।"

"কিন্তু উত্তরাপথ (পাঞ্জাব) এবং কাশ্মীরে এখনও হূনেরা আছে, আচার্য ! "

"বহু অঞ্চল থেকেই তারা বিতাড়িত হয়েছে ।"

"এমনিভাবেই এক রাজা অপরকে বিতাড়িত করে নিজ রাজ্য বিস্তৃত করে ।"

"কিন্তু গুপ্তবংশ গো-ব্রাহ্মণের রক্ষক ।"

"আচার্য, মূঢ় ব্যক্তিদের ধোঁকা দেবার মতো এই সব কথা আমি আপনার মুখ থেকে শুনব আশা করি না। আপনি জানেন, আমাদের পূর্বজ ঋষিরা গো-রক্ষা করতেন গো-ভক্ষনের জন্য । 'মেঘদূত'-এ আপনিই চর্মণবতীকে গো-হত্যা থেকে উদ্ভূত রন্তিদেবের কীর্তি বলে বর্ণনা করেছেন—

"ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিম্ ॥"

"তুমি ধৃষ্ট সুপর্ণ, যদিও তুমি আমার প্রিয় শিষ্য !"

"আপনার তিরস্কার শুনতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু আমি এটা সহ্য করতে রাজী নই যে আমার গুরু গণতন্ত্র-হত্যাকারী গুপ্তরাজার সামনে চাটুকারের মতো পড়ে থাকবেন ।"

"তুমি ওদের গণতন্ত্র-হত্যাকারী বলছ কেন সুপর্ণ ?"

"হ্যাঁ নন্দ, মৌর্য, শক আর হূনেরাও যে পাপ করেনি এই গুপ্তরা তাও করেছে। ভারতভূমি থেকে এরা, গণ-রাজ্যের নাম মুছে দিয়েছে ।"

"গণ-রাজ্য এ যুগের অনুকূল নয় সুপর্ণ। যদি সমুদ্রগুপ্ত এইসব গণ-রাজ্যকে কায়েম রাখতেন, তবে তিনি হূন এবং অপরাপর প্রবল শত্রুদের পরাস্ত করতে পারতেন না ।"

"সফলতা ! নিজ রাজ্য কায়েম করবার ! দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য হবার ! কিন্তু চাণক্যের বিশ্ববিশ্রুত বুদ্ধির সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত মৌর্য-সাম্রাজ্যও বেশী দিন টেঁকেনি। বিক্রমাদিত্য আর কুমারগুপ্তও যাবৎচন্দ্রদিবাকর শাসন করবে না। কিন্তু এরা যে গণ-শাসনের চিহ্ন পর্যন্ত মুছে দিয়েছে তা কোন ধর্মকর্মের জন্য ? অনাদিকাল থেকে চলে আসা গণ-রাজ্যের গণ-শাসনকে উচ্ছেদ করা কি অধর্মের কাজ নয় ?"

"কিন্তু রাজা বিষ্ণুর অংশবিশেষ ।"

"কুমারগুপ্ত নিজের সঙ্গে ময়ূরের চিত্র অঙ্কিত করবে এবং আগামী দিনের কোনো কবি তাকে কুমারের অবতার বলবে। এই ধোঁকাবাজী, এই বিকৃতি কিসের জন্যে ? সুস্বাদু, সুগন্ধ চাল, আর মধুর মাংসস্তূপের জন্যে, রাষ্ট্রের সমস্ত সুন্দরীকে আপন প্রমোদপুরে ঢোকাবার জন্যে, কৃষি আর শিল্পকর্মে নিষ্পেষিত মানুষের কষ্টোপার্জিত অর্থ আপন ভোগসুখে জলের মতো খরচ করবার জন্যে ? আর এ জন্য আপনি গুপ্তদের ধর্ম-সংস্থাপক বলছেন ! বিষ্ণু ? হ্যাঁ, গুপ্তরা নিজেদের বৈষ্ণব বলে প্রচার করছে। ব্রাহ্মণেরা তাদের বিষ্ণুর অংশ বানাচ্ছে। মুদ্রার ওপর লক্ষ্মীর মূর্তি অঙ্কিত করা হচ্ছে। বিষ্ণুর মূর্তি আর

মন্দির তৈরীর জন্যে প্রজাদের ভাতে মেরে, তাদের সর্বস্ব লুট করে প্রচুর টাকা খরচ করা হচ্ছে এই আশায় যে, গুপ্তবংশের রাজত্ব অনন্তকাল ধরে কায়েম থাকবে।"

"এ সব তুমি কি বলছ সুপর্ণ! রাজার বিরুদ্ধে এত কঠোর কথা কেন বলছ?"

"হ্যাঁ আচার্য আজ আপনার সামনে বলছি, কোনোদিন পরমভট্টারক মহারাজের সামনেও বলব। জীবিতাবস্থায় আমার পক্ষে এই ধোঁকাবাজী বরদাস্ত করা মুস্কিল। তবে এ ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু আমি চাই আপনিও অশ্বঘোষের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন।"

"আমি নিছক কবি; অশ্বঘোষ কবি এবং মহাপুরুষ দুই-ই ছিলেন। তাঁর কাছে সংসারের সুখভোগের কোনো মূল্য ছিল না, আমি চাই বিক্রমাদিত্যের প্রমোদশালার সুন্দরীদের মতো সুন্দরী, চাই রক্তবর্ণ দ্রাক্ষাসুরা, চাই প্রাসাদ এবং পরিচারক। আমি কেমন করে অশ্বঘোষ হতে পারি? আমার 'রঘুবংশ'-এ ছদ্মনামে আমি গুপ্তবংশেরই প্রশংসা করেছি, যাতে প্রসন্ন হয়ে বিক্রমাদিত্য এই প্রাসাদ দিয়েছেন, কাঞ্চনমালার মতো যবনসুন্দরী আমাকে প্রদান করেছেন—পনেরো বছর আমার সঙ্গে থেকে ও যে আমাকে তার সোনালী কেশ-পাশে বেঁধে রেখেছে। আমি এখন 'কুমারসম্ভব' রচনা করছি, দেখ এ কাব্য আরও কত কি এনে দেয় আমার হাতে।"

"আমি বিশ্বাস করি না আচার্য, আপনি যদি 'বুদ্ধ-চরিত' এবং 'সৌন্দরানন্দ' লিখতেন তবে আপনাকে বুভুক্ষায় মরতে হত বা সর্বোতোভাবে ভোগসুখ থেকে বঞ্চিত হতেন। এ আপনার ভুল ধারণা, যে, রাজার স্তুতি না করলে আপনার জীবন সম্পূর্ণ নিরস হয়ে যাবে। আগামী দিনের কবিদের জন্য আপনি অত্যন্ত কু-উদাহরণ রেখে যাচ্ছেন। সকলেই কবি কালিদাসকে অনুকরণের নামে নিজেদের দোষ ঢাকতে চাইবে।"

"মহৎ কাব্যও আমি রচনা করব।"

"কিন্তু এমন কিছুই লিখবেন না যাতে গুপ্তদের ভ্রষ্টাচার লোকে জানতে পারে।"

"সে আমার দ্বারা হবে না সুপর্ণ, আমি বড় নরম হয়ে পড়েছি।"

"রাজানুষ্ঠিত সকল পাপের সপক্ষে ধর্মের দোহাই তো দেবেন?"

"তারও প্রয়োজন আছে। এ ছাড়া রাজশক্তি দৃঢ় হতে পারে না, বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্রও এ ধরনের কাজ করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন।"

"বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্রও কবি কালিদাসের মতো প্রাসাদ এবং সুন্দরীর লোভে এই পাপ-পথে পা বাড়িয়েছিলেন।"

"সুপর্ণ, পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াও শুনলাম, যুদ্ধবিদ্যাও তুমি আয়ত্ত করেছ, যদি তোমার সম্মতি থাকে তবে মহারাজাধিরাজকে বলি। তোমাকে কুমারামাত্য বা সেনানায়কের পদে অভিষিক্ত দেখলে খুশী হব আমি, মহারাজাও খুশী হবেন।"

"আমি কারও কাছেই নিজেকে বিক্রয় করব না আচার্য।"

"আচ্ছা, রাজপুরোহিতের মধ্যে একটা স্থান যদি পাও ?"

"ব্রাহ্মণদের স্বার্থপরতায় আমার ঘৃণা ধরে গেছে।"

"কি করবে তা'হলে ?"

"আপাতত আরও বিদ্যার্জনের আমার বাসনা।"

৪

উজ্জয়িনীতে অবস্থানকালে আমি শুধু নিজের জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত করবার সুযোগই পাইনি, সেই সঙ্গে বিস্তৃত এই সংসারকে জানবার সুযোগও হয়েছে। সেখানে থাকতে, কাছে থেকে আমি দেখেছি, কেমন করে ব্রাহ্মণেরা রাজার কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের বিক্রয় করে দেয়। এমন একটা সময় ছিল যখন অপরে স্বীকার না করলেও ব্রাহ্মণত্বের গর্ব আমার প্রবল ছিল। গ্রাম ছেড়ে আসবার পর আমি খাঁটি যবনদের দেখলাম, যারা প্রায়ই ভরুকচ্ছ থেকে উজ্জয়িনী আসত। সেখানে তাদের বড় বড় পণ্যশালা ছিল, আমি বহু শক, আভীর পরিবারে গিয়েছি, যাদের পূর্ব পুরুষেরা এক শতাব্দী আগেও উজ্জয়িনী, লাট (গুজরাট) এবং সৌরাষ্ট্রের শাসক মহাক্ষত্রপ ছিল। পাকা নারঙ্গী রঙ-এর গাল, রোমহীন মুখমণ্ডল এবং গোলাকার আঁখিযুক্ত হুনদেরও আমি দেখেছি —যুদ্ধে অত্যন্ত নিপুণ, কিন্তু অন্যদিকে তেমন প্রতিভা নেই। এইসব রকমারি মানুষজন দেখবার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হল বৌদ্ধবিহার (মঠ), যা একাধিক সংখ্যায় উজ্জয়িনীর বহির্দেশে রয়েছে। আমার মাতুল-কুলের লোকেরা বৌদ্ধ ছিলেন, আর বহু নাগর-ভিক্ষু এইসব মঠে থাকতেন। এ জন্য আমাকে প্রায়ই সেখানে যেতে হত। ভরুকচ্ছতেও আমি একবার গিয়েছিলাম।

পুথি-পাঠ সমাপ্ত করে আমি দেশভ্রমণের সাহায্যে আমার জ্ঞান প্রসারিত করতে চাইলাম। এই সময় আমি জানতে পারলাম যে, বিদর্ভে অচিন্ত্যবিহার (অজন্তা) নামে এক প্রসিদ্ধ বিহার আছে সেখানে পৃথিবীর সকল দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এসে থাকেন। আমি সেখানে গেলাম।

এতদিন পর্যন্ত আমি যেখানেই গিয়েছি, আমার সঙ্গে প্রচুর সম্বল এবং সঙ্গী নিয়ে গিয়েছি। এই প্রথম বার আমি নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় বেরিয়ে পড়লাম। পথে চোর-ডাকাতের ভয় ছিল না ; গুপ্তদের এই ব্যবস্থার প্রশংসাই করতে হবে। কিন্তু গুপ্তশাসন কি দেশের প্রত্যেক পরিবারকে এতই সমৃদ্ধশালী করে রেখেছে যে, বাটপাড়ি, রাহাজানি সম্পূর্ণ উঠে গেল ? গুপ্তরাজেরা কর আদায়ের ব্যাপারে পূর্বতন সকল শাসককেই হার মানিয়েছে। রাজপ্রাসাদ তৈরীর কাজে কখনও এত অর্থ ব্যয়িত হয়নি। পাহাড়, নদী, সরোবর এমন কি সমুদ্রকে সশরীরে উঠিয়ে এনে এরা আপন সুরম্য প্রাসাদের সংলগ্ন করে রাখবার প্রয়াস পেয়েছে। এদের ক্রীড়া-উদ্যান সত্যিকারের বনের মতোই মনোরম। এখানে পিঞ্জরে আবদ্ধ হিংস্র পশু আর খোলা জায়গায় হরিণের দল ঘুরে

বেড়ায়। ক্রীড়াপর্বতে স্বাভাবিক পার্বত্য বন-উপবন, জলপ্রপাত তৈরী করা হয়েছে। সরোবরের সঙ্গে যুক্ত কৃত্রিম জলস্রোতের ওপর সেতু আর নৌকার বহর দেখা যায়। হাতির দাঁত, সোনা, রূপা নানা রকম রেশমী বস্ত্র এবং মহার্ঘ গালিচায় প্রাসাদের অন্তর্দেশ সজ্জিত রয়েছে। প্রাসাদকে সজ্জিত করতে চিত্রকর তার তুলির সৌন্দর্য সবটুকুই ঢেলে দিয়েছে। ভাস্কর তার মর্মর এবং ধাতু-নির্মিত মূর্তি সুন্দর রূপে বিন্যাস করেছে। বিদেশী যাত্রী এবং রাজদূতের মুখে আমি এই সব চিত্র এবং মূর্তির ভূরি ভূরি প্রশংসা শুনেছি, যাতে সত্যিই আমার শির গর্বোন্নত হয়ে উঠেছে। কিন্তু যখন আমি ক্ষুদ্র গ্রামের পর্ণ কুটিরের অবস্থা দেখি, তখন উজ্জয়িনীর এই সব প্রাসাদ আমার দেহের রক্ত চঞ্চল করে তোলে! মনে হয়েছে, গ্রামের এই দারিদ্র্যের কারণ এইসব প্রাসাদ।

গ্রামের নিপুণ শিল্পীরা নানা রকমের জিনিস তৈরী করে থাকে। স্ত্রীলোকেরা মিহি সুতা কেটে এবং তন্তুবায়রা তা দিয়ে সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করে। স্বর্ণকার, লৌহকার, চর্মকার আপন আপন শিল্প দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। রাজপ্রাসাদে কলাচাতুর্যময় আসবাব-পত্রের নির্মাতারা এদেরই আত্মীয়স্বজন। কিন্তু যখন আমি এদের দেহ এবং বাসগৃহের অবস্থা দেখেছি তখন বুঝতে পারি, এদেরই হস্তনির্মিত দ্রব্যসম্ভার এদের কাছে স্বপ্নমায়া স্বরূপ। এদের তৈরী শিল্প সামগ্রী গ্রাম থেকে নগর-শহরের সৌধ, প্রাসাদে চলে যায়। আবার সেখান থেকে অনেকে পশ্চিম সমুদ্রতীরে ভরুকচ্ছ, আদিতীর্থ হয়ে পারস্য বা মিশরের পথ ধরে, অথবা পূর্ব সমুদ্রতীরে তাম্রলিপ্ত হয়ে যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ পৌঁছে যায়। ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য এত শক্তিশালী কোনোদিনই হয়নি,এবং আপন পণ্যের বিনিময়ে সমুদ্রপারের লক্ষ্মীও এত বেশী কখনও ভারতে আসেনি, কিন্তু এতে লাভ কার? সকলের চেয়ে বেশী গুপ্তরাজাদের, তারা সকল পণ্যের ওপর অত্যধিক শুল্ক আদায় করে; তারপর সামন্ত প্রভুদের মধ্যে যারা বড় বড় রাজপদ বা জায়গীরের অধিকারী, তারা কারিগর এবং ব্যবসাদার দু'য়ের কাছে থেকেই লাভের অঙ্ক লোটে। ব্যবসাদারদের নাম সবশেষে করলেও এই তারাও লুণ্ঠন-কর্মে নেহাত ছোট অংশীদার নয়। এদের সবাইকে দেখে আমার কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে, গ্রামের কৃষক এবং কারিগরেরা এত গরীব কেন, এবং ছোট-বড় রাজপথ সমূহকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য গুপ্তরাজাদের এত তৎপরতাই বা কেন? গ্রামে দারিদ্র্য আছে ঠিকই, তবে শহরের মতো হৃদয়-বিদারক দৃশ্য গ্রামে কমই দেখা যায়। এখানে পশুর মতো ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য দাসদাসীর হাট বসে না, ওদের নগ্ন শরীরে চাবুকের দাগ চোখে পড়ে না। আমার গুরু কালিদাস কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, পূর্বজন্মের কর্মফলস্বরূপ লোকে দাস হয়। যেদিন তাঁর মুখে আমি এই কথা শুনি সেইদিনই পূর্বজন্ম সম্বন্ধে আমার সমস্ত বিশ্বাস উবে গেল। গুপ্তরাজারা যেভাবে ধর্মকে সকল রকমে আপন অস্তিত্ব দৃঢ় করবার কাজে লাগিয়েছে, তাতে এখন সকল চিন্তাশীল

লোকের মনেই এই অবিশ্বাস আসা স্বাভাবিক। কিন্তু যখন আমি সাধারণ প্রজাদের দেখতাম, তাদের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন মনে হত —কেন ? সম্ভবত তারা নিজেদের অসহায় মনে করত। গ্রামবাসীরা শুধু আপন গ্রামের খোঁজ-খবরটুকু রাখত —গ্রামের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ জমির জন্য তারা যে ভাবে লড়াই করত সম্ভবত কুমারগুপ্তও নিজের কোনো প্রদেশের জন্য এত বিক্রমের সঙ্গে লড়তে পারত না। কিন্তু গ্রামের সীমার বাইরে যাই ঘটে থাক, এরা তার কোনো খোঁজ রাখত না। একটি গ্রামের ঘটনা আমার মনে আছে। সেখানে প্রায় চল্লিশটি কুটির ছিল, সবই খড়ের ছাউনি। গরমের দিনে উন্থুন থেকে একটা ঘরে আগুন লেগে যায়। সারা গ্রামের লোক জল নিয়ে সেই ঘরের দিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু একটি ঘরের এক দম্পতি ঘড়ায় জল ভরে আপন ঘরের কাছে বসে রইল। সৌভাগ্য-বশত গ্রামে এমন গৃহ ঐ একটিই ছিল, না হলে গ্রামের একটা ঘরও সেদিন রক্ষা পেত না। সে সময় আমার যৌধেয় গণ-রাজ্যের কথা মনে পড়ে গেল, যেখানে রাষ্ট্রের সকল লোক আপন রাষ্ট্রের জন্য জীবন-মরণ পণ করতেও কুণ্ঠিত হত না। এমনিতেই তো সমুদ্র-গুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্তের দিগ্বিজয়ের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু সে শুধু দাসের মতো অপরের লাভের জন্য —স্বাধীন মানুষের মতো নিজের এবং নিজ নিজ জনগণের হিতার্থে নয়।

জনসাধারণের মধ্যে মাত্র একশ' বছরের এই গুপ্তশাসনের প্রভাব লক্ষ্য করে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। আমি ভেবে দেখলাম, যদি এমন শাসন-ব্যবস্থা কয়েক শতাব্দী ধরে চলে, তবে এই দেশ সম্পূর্ণভাবে দাসের দেশে পরিণত হবে। যারা শুধু আপন রাজার জন্যই লড়তে-মরতে জানবে, যাদের মন থেকে এ চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে যে, সব মানুষেরই কিছু অধিকার আছে।

অচিন্ত্যবিহার বড়ই রমণীয়। অর্ধচন্দ্রাকার নদীপ্রবাহ হরিৎবসনা পাহাড়ী উপত্যকার পাশ কেটে বয়ে চলেছে। এই ক্ষুদ্র অথচ সদানীরা পাহাড়ী নদীর বামতটে অবস্থিত পাহাড় কেটে শিল্পীরা কত গুহাময় সুন্দর মন্দির, নিবাসস্থল এবং সভাগৃহ তৈরী করেছে। এই সব গুহাভ্যন্তরেও রাজপ্রাসাদের মতো চিত্র মূর্তি ইত্যাদি সজ্জিত —যদিও তা বহু পুরুষের পরিশ্রমের ফলে এবং সম্ভবত আগামী কয়েক শত পুরুষের জন্য। চিন্ত্য-বিহারের ভিত্তি-চিত্র সুন্দর, মর্মর-শিল্প সুন্দর। কিন্তু এগুলো গুপ্ত রাজপ্রাসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারে না, আর সে জন্য আমাকে তত আকর্ষণও করে না। হ্যাঁ, আমার কাছে আকর্ষণ ছিল এখানকার ভিক্ষুমণ্ডলী। দেশ-দেশান্তরের লোক প্রেমভাবে এক হয়ে এক পরিবারের মতো বাস করছে। এখানে আমি সুদূর চীনের ভিক্ষুদের দেখেছি, পারসিক এবং যবন ভিক্ষুদের দেখেছি, সিংহল, যব এবং সুবর্ণদ্বীপের লোকও এখানে যথেষ্ট রয়েছে। চম্পাদ্বীপ, কম্বোজদ্বীপের নাম আমি এখানে এসেই শুনলাম এবং তাদের

প্রাণবান অধিবাসীদের স্বচক্ষে দেখলাম ; কপিসা, উদ্যান, তুষার এবং কুচা-র কাষায়ধারী পীতকায় ভিক্ষুদেরও এখানে দেখলাম ; বাহিরের দেশগুলো সম্বন্ধে জানবার আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। যদি এই সব বিদেশী ভিক্ষুদের পৃথক পৃথক সময়ে পেতাম, তবে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি এক একটি বছর কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু এক সঙ্গে এত অধিক সংখ্যায় সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর মধ্যে —বিপুল বৈভবের মাঝে পড়া দরিদ্রনিধির মতোই আমি নিজেকে অসহায় মনে করতে লাগলাম !

আমি দিঙ্‌নাগের নাম শুনেছিলাম। কালিদাস নিজে গুপ্তরাজ, রাজতন্ত্র এবং তাদের পরম-সহায়ক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। আর কি অভিপ্রায় থেকে তা ছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। দিঙ্‌নাগকে তিনি তাঁর পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করতেন। বলতেন, 'এই দ্রাবিড় নাস্তিকের সমনে শুধু বিষ্ণু নয়, তেত্রিশকোটি দেবতারই সিংহাসন টলে ওটে। রাজা ও ব্রাহ্মণের স্বার্থরক্ষার জন্য ধর্মের নামে আমি যা কিছু কূটকৌশল বের করি, তার রহস্য তার কাছে অজ্ঞাত থাকে না। মুস্কিল এই যে, বৃদ্ধ বসুবন্ধুর মতো গুরু সে পেয়েছিল।' বসুবন্ধুকে কালিদাস জ্ঞানবারিধি বলতেন। ভদন্ত বসুবন্ধু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজধানী অযোধ্যায় বছর কয়েক কাটিয়েছিলেন— রাজদরবারী হয়ে নয়, স্বাধীন, সম্মানিত গুরুর মর্যাদা নিয়ে। পরে গুপ্তদের নীচতায় নিরাশ হয়ে আপন জন্মভূমি পুরুষপুরে চলে যান।

লৌহ-তীর অথবা খড়্গ নয়, তার চেয়েও তীক্ষ্ণ জ্ঞান এবং তর্কের অস্ত্র বিতরণ করবার ব্রত দিঙ্‌নাগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলেই চোখের সামনে ব্রাহ্মণত্বের সমস্ত মায়াজাল তাসের ঘরের মতো ধ্বসে পড়ে। আমি ছয় মাস অচিন্ত্যবিহারে ছিলাম। প্রতিদিন দিঙ্‌নাগের মুখ থেকে তাঁর সর্বব্যাপী উপদেশাবলী শুনতাম। দিঙ্‌নাগের মতো গুরু পাওয়ায় আমার গর্বের শেষ ছিল না। তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত গভীর, আর বাক্য ছিল জলন্ত অঙ্গারের মতো। সংসারের বিস্তীর্ণ মায়াজাল দেখে আমার মতোই তিনিও ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠতেন।

একদিন তিনি বলেছিলেন "সুপর্ণ প্রজ্ঞাশক্তির সহায়তায় হয়ত কিছু করা যেত, কিন্তু জনসাধারণ এখন পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূর চলে গেছে। তথাগত জাতিবর্ণ-ভেদ উঠিয়ে দেওয়ার জন্য অতীব প্রয়াস করেছিলেন দেশের বাইরে থেকে যবন, শক, গুর্জর আভীর —যারাই আসত, ব্রাহ্মণরা তাদের ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণা করত। কিন্তু তথাগতের সঙ্ঘ তাদের মানুষ বলেই স্বীকার করে নিত। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মনে হয়েছিল, এ দেশ থেকে জাতিভেদ প্রথা মুছে যাবে কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য যে গুপ্ত সম্রাটরা এখন ব্রাহ্মণদের খপ্পরে এসে গেছে। গুপ্তরা যখন প্রথম ক্ষমতায় এল, তখন ব্রাহ্মণরা তাদের ম্লেচ্ছ বলত। কিন্তু কালিদাস তাদের গৌরব বর্ধনের জন্য 'রঘুবংশ' এবং 'কুমারসম্ভব' লিখলেন। গুপ্তরা আপন রাজবংশকে

অনন্তকাল কায়েম রাখবার চিন্তায় পাগল হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণরা তাদের এই আশায় ইন্ধন যোগাচ্ছে কিন্তু ভদন্ত বসুবন্ধু এমন কোনো আশা তাদের দিলেন না। তিনি লিচ্ছবী গণতন্ত্রের আদর্শে ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুগামী ছিলেন। ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। তারা জানে, সারা দেশের বৌদ্ধরা গোমাংস খায়। এই জন্য ব্রাহ্মণরা ভারতে গোমাংস বর্জন, গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার আন্দোলন সুরু করে। বৌদ্ধরা জাতিবর্ণ ভেদ তুলে দিতে চায়। ব্রাহ্মণেরা তাই বর্ণবহির্ভূত যবন, শক ইত্যাদিকে উচ্চবর্ণে অভিষিক্ত করতে থাকে। এই ফাঁদ এত জটিল যে, অনেক বৌদ্ধ-গৃহস্থ এতে জড়িয়ে আছে। এইভাবে প্রজাদের শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে তারা রাজশক্তি এবং ব্রাহ্মণ-শক্তিকে দৃঢ় করতে চায়। কিন্তু এর পরিণাম আত্মঘাতী হবে সুপর্ণ, কারণ দাসেদের শক্তির ওপর ভিত্তি করে কোনো রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে পারে না।”

আমি আপন যৌধেয়কুলের আত্মোৎসর্গের কাহিনী বলাতে আচার্যের হৃদয় অভিভূত হয়ে গেল। যখন আমি যৌধেয় গণকে পুনরুজ্জীবিত করবার আপন ইচ্ছা তাঁর সামনে প্রকাশ করলাম, তখন তিনি বললেন, “আমার শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ তোমার সঙ্গে রইল। উদ্যোগী পুরুষসিংহের কোনো বিঘ্ন-বাধাকে ভয় করা উচিত নয়।”

তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আমি চলছি যৌধেয় রাজ্যাভিমুখে। তাদের মৃত গণ-রাজ্যকে পুনরায় উদ্ধার করব, না-হলে বালুতটে অঙ্কিত পদচিহ্নের মতো মিলিয়ে যাব।

দুর্মুখ

কাল : ৩৬০ খৃষ্টাব্দ

আমার নাম হর্ষবর্ধন, শীলাদিত্য বা সদাচারের সূর্য আমার উপাধি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজে বিক্রমাদিত্য (পরাক্রমের সূর্য) উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ; আমি এই নম্র উপাধি গ্রহণ করেছি। বিক্রমে অপরকে দমন করে রাখার, অপরকে জয় করার চিন্তা পেয়ে বসে : শীল-সদাচারে কাউকেও দাবিয়ে রাখার বা কারও ওপর অত্যাচার করার চিন্তা মনে আসে না। গুপ্তরা নিজেদের পরম বৈষ্ণব বলত। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধন —যাঁকে গৌড়-শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করে তারুণ্যেই হত্যা করে এবং যাঁকে স্মরণ করে আজও আমার হৃদয় অধীর হয়ে ওঠে —পরম সৌগত (পরম বৌদ্ধ) ছিলেন তিনি। সুগত (বুদ্ধ) যেমন ক্ষমা-মূর্তি ছিলেন, তিনিও তেমনি ! নিজেকে সর্বদা তাঁর চরণসেবী মনে করেও আমি পরম মাহেশ্বর অর্থাৎ শৈব হওয়া পছন্দ করেছি। কিন্তু শৈব হলেও আমার হৃদয়ে বুদ্ধভক্তি প্রবল, শুধু এই ভারতেই নয়, ভারতের বহির্জগৎও এ কথা জানে।

আমি, আমার রাজ্যের সকল ধর্মকেই সম্মান করেছি—প্রজারঞ্জনের জন্যই শুধু নয়, আপন শীল (সদাচার) সংরক্ষণের জন্যেও। প্রতি পঞ্চম বৎসরে আমি রাজকার্যের উদ্বৃত্ত ধন প্রয়াগে ত্রিবেণী তীরে ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের মধ্যে বণ্টন করতাম। এ থেকেও প্রমাণিত হবে, আমি সকল ধর্মের সমান সমৃদ্ধি কামনা করেছি। এ কথা সত্য যে, আমি সমুদ্রগুপ্তের মতো দিগ্বিজয়ের জন্য যাত্রা করেছিলাম কিন্তু সে এই শীলাদিত্য নাম ধারণ করার পূর্বে। তাই বলে এই কথা ভাববেন না যে, যদি দক্ষিণাপথের রাজা পুলকেশীর বিরুদ্ধে আমি অসফল না হতাম তবে বিক্রমাদিত্যের মতোই কোনো পদবী আমিও ধারণ করতাম। আমি সারা ভারতের সম্রাট হয়েও, চন্দ্রগুপ্ত নয়—অশোকের কলিঙ্গবিজয়ের মতো পশ্চাত্তাপ করে শীলতা দ্বারা মানুষকে জয় করতাম—আমার প্রকৃতি এমনই বিনয়নম্র ও কোমল।

রাজ্য গ্রহণ করতেও আমি অস্বীকার করেছিলাম, কারণ স্থাণ্বীশ্বরপতি মহারাজ প্রভাকরবর্ধনের পুত্র, কান্যকুব্জাধিপতি পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ রাজ্যবর্ধনের অনুজ হয়ে, আমি শুধু রাজ্যভোগ দেখে নয়, নিজে ভোগ করে তার অসারতা উপলব্ধি করেছি। যদি ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধের ক্ষত্রিয়োচিত শুভবুদ্ধি মনে জাগ্রত না হত তবে সম্ভবত কান্যকুব্জের সিংহাসনে আমি বসতাম না। এর ফলে আমার বোন রাজ্যশ্রীর প্রতিপক্ষ মৌখরি বংশ এই রাজ্যের শাসক হত। আর বস্তুত আমার ভ্রাতার পূর্বে, গুপ্তরা চলে যাবার পর তারাই রাজ্যশাসন করত। এ সব আমি এই জন্যই বলছি যে, আমার পরবর্তীরা যাতে বুঝতে পারে যে, হর্ষ স্বার্থান্ধ হয়ে নিজ মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করেনি। আমার দুঃখ হয় আমার দরবারী মোসাহেবরা (রাজা মোসাহেবদের সঙ্গ ছাড়তে পারে না, এই বড় মুস্কিল) আমাকেও সমুদ্রগুপ্ত এবং চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রঙে রাঙিয়ে তুলতে চায়; কিন্তু এতে তারা আমার প্রতি খুবই অন্যায় অবিচার করেছে।

আমি রাজ্য গ্রহণ করেছি শুধু শীলতা এবং ধর্মপালনের জন্যে। বিদ্যা দানকে আমি শ্রেষ্ঠদান বলে মনে করেছি, এ জন্যে গুপ্তদের সময় থেকে চলে আসা ক্রমবর্দ্ধমান নালন্দার সমৃদ্ধিকে আমি আরও বাড়িয়ে তুলেছি, যাতে দশ সহস্র দেশী-বিদেশী পণ্ডিত এবং বিদ্যার্থী সর্ববিধ সুযোগ সহ সেখানে বিদ্যাধ্যয়ন করার সুবিধা লাভ করে। বিদ্বানের সম্মান লাভ করা আমার কাছে সব চেয়ে সন্তোষদায়ক, এ জন্য আমি চীনের বিদ্বান্ ভিক্ষু হুয়েন সাঙকে সমস্ত অন্তর দিয়ে সম্মানিত করেছি। বাণের অপূর্ব কাব্যপ্রতিভা দেখে আমি তাকে লাম্পট্যের পথ থেকে সরিয়ে এনে সুপথে চালনা করতে চেয়েছি, যদিও সে বেশী ওপরে উঠতে পারেনি—শুধু চাটুকার কবি হিসাবেই রয়ে গেছে। কিন্তু মগধের এক ছোট অখ্যাত গ্রাম থেকে নিয়ে এসে তাকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করার প্রয়াস আমার বিদ্যানুরাগেরই পরিচায়ক।

আমি চেয়েছিলাম সকলেই আপন-আপন ধর্ম পালন করুক। স্ব-ধর্মের পথেই চলা উচিত কারণ এতে সংসারে শান্তি এবং সমৃদ্ধি বিরাজ করে এবং স্বর্গের সৃষ্টি হয়। সকল বর্ণের লোক নিজ নিজ বর্ণধর্ম পালন করুক, সকল আশ্রমের লোক আপন আশ্রম পালন করুক, সকল ধর্মমত আপন শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অনুযায়ী পূজা-পাঠ করুক —এ জন্য আমি সদা প্রযত্নশীল ছিলাম।

কামরূপ থেকে সৌরাষ্ট্র এবং বিন্ধ্য থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত নিজ রাজ্যে আমি ন্যায়রাজ্য স্থাপন করেছি। আমার অধিকারীরা (অফিসার) যাতে প্রজাবৃন্দের ওপর জুলুম করতে না পারে, এ জন্য আমি স্বয়ং চক্রভ্রমণে বের হতাম।

এমনই এক পর্যটনে ব্রাহ্মণ বাণ আমার আহ্বানে আমার কাছে এসেছিল। আমি জানি, সে আমার কীর্তির মহিমা কীর্তন করতেই চেয়েছিল। কিন্তু আমার পর্যটনের সময়েও আমার রাজৈশ্বর্য আড়ম্বরের যে বর্ণনা সে লিপিবদ্ধ করেছে তা আমার নয়, কোনো বিক্রমাদিত্যের দরবারের হতে পারে। গোপনে গোপনে সে আমার জীবনী (হর্ষচরিত) লিখছিল। ব্যাপারটা আমি একদিন জানতে পেরে তাকে প্রশ্ন করলাম। লিখিত অংশ সে আমাকে দেখিয়েছিল, দেখে আমি খুব অসন্তুষ্ট হলাম এবং তিরস্কারও করলাম। যার পরিণামে সে আর তত উৎসাহের সঙ্গে লিখে যেতে পারল না। তার লেখা 'কাদম্বরী' আমার অপেক্ষাকৃত পছন্দ হয়েছিল। যদিও তাতে রাজদরবার, অন্তঃপুর, পরিচারক পরিচারিকা, প্রাসাদ, ভোগবিলাস ইত্যাদির এমন বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল যাতে লোকের অযথা ভ্রম হয় যে, এই সমগ্র বর্ণনা আমারই রাজদরবারের। আমার রাণীদের মধ্যে পারস্য কন্যার সঙ্গেই আমার গভীর প্রণয় ছিল। সে নৌশেরওয়াঁর নাতনিই শুধু নয়, উপরন্তু আপন রূপ ও গুণের দ্বারা যে কোনো পুরুষকে সে মোহাচ্ছন্ন করতে পারত! বাণ তাকেই মহাশ্বেতা বলে বর্ণনা করেছিল। আমার সৌরাষ্ট্রী রাণীর যৌবন পেরিয়ে এসেছিল, তাকে খুশী রাখবার জন্য আমি তার আবাসস্থল সজ্জিত করতে কিছুটা বিশেষ আয়োজন করেছিলাম। একেই বাণ 'কাদম্বরী' এবং তার নিবাস রূপে অঙ্কিত করল। বাণের রচনার এই দুটি বিষয় ছাড়া বাকি সমস্ত বিষয় মোটেই আমার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, অথবা অত্যন্ত অতিশয়োক্তিপূর্ণ।

আমার অন্তিম সময়ে অনুভব করছি, বাণ আমার হিতৈষী বলে প্রমাণিত হবে না। বাণের 'হর্ষচরিত' শুধু নয়, 'কাদম্বরী'তেও রাজ্য আর তার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, লোকে সে সব আমার বিষয়ে বর্ণনা বলেই ধরবে। 'নাগানন্দ' 'রত্নাবলী' এবং 'প্রিয়দর্শিকা' নাটককে আমার নামে লিখে সে তো আরও অনর্থ করেছে। লোকে বলবে, কীর্তির জন্য লালায়িত হয়ে আমি অপরের রচনা টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি। বিশ্বাস করুন, বহুকাল পরে এই বিষয়টা আমি জানতে পেরেছি যখন হাজার হাজার বিদ্যার্থী

আমার নামে এই গ্রন্থাবলী পড়ে ফেলেছে এবং অনেকবার এগুলো অভিনীতও হয়ে গেছে। আমি আপন প্রজাদের সুখী দেখতে চেয়েছিসাম, তা আমি দেখেছি। নিজের রাজ্য শান্ত এবং নিরাপদ দেখতে চেয়েছিলাম, সে সাধও পূর্ণ হয়েছে। আমার প্রজারা সোনা বোঝাই করে নিশ্চিন্তে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় যেতে পারছে।

আমার কুল সম্বন্ধে এখনই লোকে বলতে সুরু করেছে যে, এটা না-কি বেণেদের কুল। সম্পূর্ণ ভুল কথা। আমি বৈশ্য-ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-বেণে নই। এক সময় আমাদের শাতবাহন কুলের হাতে সমগ্র ভারতের শাসনভার ছিল। শাতবাহন রাজ্যের ধ্বংসের পর আমাদের প্রজাগণ গোদাবরী তীরস্থিত প্রতিষ্ঠানপুর (পেঠন) ছেড়ে স্থান্বীশ্বর (থানেশ্বর) চলে আসে। শাতবাহন (শালিবাহন) বংশ কখনও বেণে ছিল না, সমস্ত জগৎ এ কথা জানে, শক ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে তাদের বিবাহাদি হত। রাজাদের যা কুল-লক্ষণ তার বিরোধী কিছু ছিল না। আমার প্রিয়া মহাশ্বেতাও পারসীক রাজবংশোদ্ভূতা।

২

আমার নাম বাণ। বহু কাব্য নাটক আমি লিখেছি। সাহিত্যের কষ্টি পাথরেই লোকে আমাকে কষে দেখতে চাইবে, এই জন্য আমাকে কয়েকটি কথা লিখে রেখে যেতে হচ্ছে, কারণ আমি জানি, বর্তমান রাজবংশের সময় পর্যন্ত এই লেখা প্রকাশিত হবে না। আমি এগুলো নিরাপদে রাখবার ব্যবস্থা করেছি। আমার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ মানুষের ভুল ধারণার হাত থেকে রেহাই পাব যদি তারা আমার প্রসিদ্ধ পুস্তকাবলী পড়বার আগে এই লেখাটা পড়ার সুযোগ পায়।

রাজা হর্ষ একদিন সারা সভার মাঝে আমাকে ভুজঙ্গ লম্পট বলে বসলেন —আর এর ফলে লোকে আমায় ভুল বুঝতে পারে। আমি ছিলাম ধনী পিতার আদুরে ছেলে। ভাস ও কালিদাসের রচনাবলী পড়ে আমার মন রঙীন হয়ে উঠেছিল। আমার রূপ, যৌবন ছিল; আর ছিল দেশভ্রমণের সখও। আমি চেয়েছিলাম যৌবনের 'আনন্দ' উপভোগ করতে; অবশ্য ইচ্ছা করলে পিতার ন্যায় ঘরে বসেই সেটা করতে পারতাম। কিন্তু আমার কাছে তা ভণ্ডামী বলে মনে হল! ভেতরে যখন লালসা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে তখন নিজেকে জিতেন্দ্রিয়, সংযমী মহাত্মা রূপে প্রকট করতে আমার খুবই খারাপ লাগত। সারা জীবন আমি এ সব পছন্দ করিনি। জীবনে যা কিছু করেছি সব সামনা-সামনি। আমার বাবা অবশ্য একবারই সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন —নিজের অসবর্ণ পুত্রকে স্বীকার করে, কিন্তু তাকেও তারুণ্যের পাপ বলে গণ্য করা যায়।

আমি বুঝেছিলাম, যৌবনের আনন্দ যা আমি উপভোগ করতে চাই, নিজের জন্মভূমিতে থেকে সেটা সম্ভব নয়। সকল জাতি ও কুলের লোক ক্ষেপে উঠবে, আর পৈতৃক ধন সম্পত্তিও খোয়াতে হবে। আমার মাথায় এক বিচিত্র পরিকল্পনা এল। আমি নিজে

এক নাট্য-মণ্ডলী গঠন করলাম, মগধের বাইরে গিয়ে। আমার এক গুণী ও কলাকুশলী তরুণ বন্ধু সেখানে ছিল। মূর্খ, ধূর্ত ও চাটুকার বন্ধু আমি কোনোদিন পছন্দ করি না। আমার নাট্য-মণ্ডলীতে অনেক সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে এসেছিলাম, এদের সকলেই বারবনিতা ছিল না। 'রত্নাবলী' 'প্রিয়দর্শিকা' প্রভৃতি নাটক এই নাট্য-মণ্ডলীতে অভিনয় করবার জন্যে লিখলাম। তারুণ্যের আনন্দের সঙ্গে আমি শিল্পকলার মিলন ঘটালাম, আর তা দেখে সহৃদয় দর্শকেরা আমার প্রশংসাই করত। জীবনের আনন্দ আমি উপভোগ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে 'রত্নাবলী' 'প্রিয়দর্শিকা' ইত্যাদি আপনাদের সামনে উপস্থিত করলাম। যারা শুধু নিজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক আনন্দ পূরণ করবার জন্যই সব কিছু করে, তারা ভোগী। লোকে বলবে, রাজা হর্ষকে তোষামোদ করার জন্যেই আপন নাটকসমূহ তার নামে প্রকাশ করেছি। কিন্তু তারা জানে না, যে-সময় প্রবাসে বসে এইসব নাটক লিখি তখন হর্ষকে আমি শুধু নামেই জানতাম। সে সময় আমি এও জানতাম না যে, আগামী দিনে হর্ষ আমাকে আমন্ত্রণ করে তার দরবারী কবি করে রাখবে। আত্মগোপনের তাগিদে —শুধু নিজেকে গোপন করার জন্যেই এইসব নাটকের রচয়িতা হিসাবে আমি হর্ষের নাম দিয়েছি। এইসব নাটক যারা পড়ে, তারা এর মূল্য জানে। এগুলো সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। আমার দর্শকগণের মধ্যে গুণীজন থাকত বহুল সংখ্যায়। দলে দলে আসত পণ্ডিত, রাজা, কলাবিদ্। যদি তারা প্রকৃত নাট্যকারের নাম জানতে পারত, তা'হলে আমি আর নাট্য-মণ্ডলীর সূত্রধার হয়ে থাকতে পারতাম না, সকলেই মহাকবি বাণের পশ্চাদ্ধাবন করতে সুরু করত। কামরূপ থেকে সিন্ধু এবং হিমালয় থেকে সিংহলের অনুরাধাপুর পর্যন্ত —হর্ষ ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল রাজ-দরবারেই নাটক অভিনয় করেছি। ভেবে দেখুন, যদি কামরূপেশ্বর, সিংহলেশ্বর বা কুণ্ডলেশ্বরের গোচরীভূত হত যে, আমিই নাটক রচনাকারী মহাকবি বাণভট্ট তবে আমার পর্যটন, আমার আনন্দোপভোগের কি দশা হত? আমি কোনো রাজার দরবারী কবি হয়ে থাকতে চাইনি। হর্ষের রাজ্যে যদি আমার জন্মভূমি না হত, তবে তার দরবারী কবিও হতাম না, পিতার সম্পত্তিই আমার কাছে যথেষ্ট ছিল।

হর্ষের বর্ণনা অনুসারে আপনাদের মনে হতে পারে যে, আমি একজন গণিকাসক্ত লম্পট। বস্তুত আমার নাট্য-মণ্ডলীর মধ্যে গণিকাদের স্থান খুবই নগণ্য। তবু যারা এসেছিল, তারা তাদের নৃত্য-গীত-অভিনয়কলার সৌষ্ঠব গুণেই এসেছিল, এখানে তার উৎকর্ষের চর্চা হত। আমার সময় নাট্যগগনের তারকারা আসত ভিন্ন পথ ধরে। ভাবীকালে কি হবে জানি না, কিন্তু আমার সময় দেশের সব তরুণীরা —তা সে ব্রাহ্মণ কন্যা বা বেণিয়ার মেয়ে হোক না কেন, রাজা ও সামন্তবর্গের সম্পত্তি বলে গণ্য হত।

আমার পিসীমাকে মগধের এক সামন্ত বলপূর্বক নিয়ে গিয়েছিল। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পিসীর আয়ুও শেষ হল বলা চলে। পিসীমা ফিরে এলেন আমাদের ঘরে। আমার

প্রতি তাঁর অশেষ স্নেহ ছিল। আমি কোনোদিনই তাঁর সামন্ত-সম্বন্ধের ওপর কটাক্ষ করিনি। আর এই অবলার দোষ কি? সুন্দরী তরুণীদের প্রথম অধিকারী হত মুষ্টিমেয় সামন্ত। আর সুন্দরী তরুণীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল তা নয়। সামন্ত রাজারা ছলে বলে কৌশলে যুবতীদের পাওয়ার চেষ্টা করত। পতির কাছে যাওয়ার পূর্ব রাত্রে কোথাও কোথাও সামন্তদের সঙ্গে রাত্রিবাস করতে হত; কারণ এরা যে তাদেরই সম্পত্তি! সাধারন লোকে একে ধর্ম-মর্যাদা মনে করত।

ব্রাহ্মণ ও বেণিয়ারা আপন কন্যা, পত্নী ও বোনেদের ডুলিতে করে এক রাত্রের জন্যে রাজান্তঃপুরে পৌঁছে দিত। ডুলি না পাঠাবার অর্থ ই ছিল, সর্বনাশ ডেকে আনা। আর মেয়ে পছন্দ হলে তো কথাই ছিল না, রাজান্তঃপুরের প্রমোদগৃহে রাখা হত স্থায়ীভাবে। তারা যে রাণী হত, তা মনে করার কারণ নেই, পরিচারিকার সম্মান কপালে জুটত। রাণী হওয়ার সৌভাগ্য শুধু রাজকুমারী এবং সামন্তকুমারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্তঃপুরের এই হাজার হাজার তরুণীর অধিকাংশই এমন ছিল, যারা মাত্র এক রাতের জন্যে রাজা অথবা সামন্তের সঙ্গলাভ করেছে। এই হতভাগিনী নারীদের যৌবন কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে সেটা একবার ভেবে দেখুন? আমার নাট্যমণ্ডলীর অভিনেত্রীরা আসত এইসব অন্তঃপুরের প্রমোদাগার থেকেই কিন্তু পালিয়ে বা চুপিচুপি নয়। ভালোই বলুন আর মন্দই বলুন, রাজা ও সামন্তবর্গকে কথার জালে নিজের পক্ষে টেনে আনতে আমি ছিলাম সিদ্ধবাক্। অবশ্য রাজনীতি আমার বিষয়ভূত ছিল না, আমায় তারিফ করে যে শত-শত পত্র পাঠাত রাজা ও সামন্তরা সেগুলো আজও সাক্ষী হয়ে আছে। যখন কলা সম্বন্ধে প্রশংসায় এরা পঞ্চমুখ হত, আমি তখন বিলাপ করতে সুরু করতাম। বলতাম, "কি করব বলুন! কলাকুশলী তরুণী থাকা সত্বেও পাওয়া যায় না।"

"থাকা সত্বেও পাওয়া যায় না?"

"একবার চুম্বন, পরে আলিঙ্গন বা এক রাতের শয্যাসঙ্গনী করার পর যেখানে হাজার হাজার তরুণীকে অন্তঃপুরে বন্দিনী করে রাখা হয়, সেখানে কলাকুশলী তরুণী পাওয়া যাবে কেমন করে?"

"ঠিকই বলেছ, আচার্য! আমিও অনুভব করছি, কিন্তু একবার অন্তঃপুরে গ্রহণ করার পর এদের আমি বের করে দিই কি করে?"

তারপর আমি তাদের পথ বাতলে দিতাম। রাজকন্যা, সামন্তকন্যা ও রাজান্তঃপুরিকা-গণের জন্য নাচগান অপরিহার্য। আহার ও পানীয়ের মতো এ সব তাদের প্রয়োজন। আমার দলের চতুর নারীদের আমি পাঠিয়ে দিতাম। রাজা নিজেই কলাশিক্ষার জন্য আপন অন্তঃপুরিকাদের উৎসাহিত করতেন। যাকে গ্রহণ করা আমার প্রয়োজন মনে হত তার কাছে অন্তঃপুরের দুঃখকষ্ট এবং কলাবিদের জীবনের আনন্দের বিশদভাবে বর্ণনা করা

হত। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও শোনানো হত যে, নটীদের সম্মান রাজান্তঃপুরে কত বেশী, তারা কুশলী নটী হতে পারলে ভবিষ্যতে সে সুযোগও আছে! এ সব বলার পর অনেক তরুণীর পক্ষেই সম্মত হওয়া স্বাভাবিক ছিল যদিও আমি তাদের ভেতর থেকে যোগ্যতমাকেই বাছাই করে নিতাম। জীবনে মাত্র একটি রাত সম্ভোগের জন্য যেখানে রাজারা হাজার হাজার তরুণীকে অবরোধ করে রাখে, সেখানে অন্তঃপুরে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ করেও কিছু বন্ধ করা যায় না —বুড়ো কঞ্চুকী ব্রাহ্মণ তাদের তারুণ্যের আনন্দ রোধ করতেও পারে না।

আমি যখন বিধবাদের 'সতী' হওয়ার বিরোধিতা করলাম তখন ভণ্ড শিরোমণি ব্রাহ্মণ এবং রাজারা মহা সোরগোল তুলল। তারা প্রচার করতে লাগল, আমি ভ্রূণ-হত্যা এবং বিধবা-বিবাহের প্রচলন করতে চাই। ভ্রূণ-হত্যা আমি একেবারেই সমর্থন করি না কিন্তু এখানে এ কথা স্বীকার করতে আমার এইটুকু দ্বিধা নেই যে, আমি বিধবা-বিবাহ সম্পূর্ণ সমর্থন করি। প্রাক্ গুপ্তশাসনে আমাদের শ্রোত্রিয়গণ যেখানে গোমাংস বিনা কোনো আতিথ্যকে স্বীকার করতে চাইতেন না, সেখানে এখন গোমাংস ভক্ষণকে ধর্মবিরুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। যেখানে আমাদের ঋষিগণ বিধবাদের জন্য দেবর —দ্বিতীয় বর, সম্পূর্ণ ধর্মসঙ্গত বলে মনে করতেন এবং কোনো ব্রাহ্মণী বা ক্ষত্রিয়া বিধবা-তরুণী ছয় মাস বা এক বছরের অধিক পতিবিধুরা থাকতে পারত না, সেখানে বিধবা-বিবাহকে এখন ধর্মবিরুদ্ধ বলে গণ্য করা হচ্ছে! গুপ্তরাজবংশের যুগেই এই জঞ্জালের —এই নতুন (হিন্দু) ধর্মের গোড়াপত্তন হয়, আর এর প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য আপন পাটরাণী করে রেখেছিলেন নিজেরই বড় ভাই রামগুপ্তর সধবা স্ত্রীকে।

তরুণী বিধবাদের স্ত্রী হিসাবে রাখতে চাইলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও আটকাতে পারেন না আর কোন মুখেই বা আটকাবেন যখন স্ব-স্ব পত্নী বর্তমান থাকতেও তাঁরা নিজেরাই পরস্ত্রীর পিছনে ছুটতে দ্বিধা করেননি! তরুণীদের বিধবা করে রাখার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ভ্রূণ-হত্যা, কারণ সন্তান সৃষ্টি করে তাকে পালন করার অর্থই হল বিধবা-বিবাহ স্বীকার করে নেওয়া —যা থেকে লোকে রেহাই পেতে চায়। এই ভয়ে এখন ব্রাহ্মণ এবং সামন্তরা কৌলীন্য সিদ্ধ করার এক নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছে। সে হল বিধবাদের জীবন্ত দগ্ধ করা। স্ত্রীলোকদের এইভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মারাকে এই সব লোক মহাপুণ্য বলে প্রচার করে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ তরুণীকে বলপূর্বক অগ্নিসাৎ করতে দেখেও যে দেবতাদের হৃদয় বিগলিত হয় না, তারা হয় পাথরের গড়া, নয়ত তাদের অস্তিত্বই নেই। এরা বলে বেড়ায় স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছায় সতী হয়। ধূর্ত, ভণ্ড, নরাধম! এত মিথ্যা কেন? এই সব রাজান্তঃপুরের শত শত স্ত্রীলোক, যারা পুরুষের সঙ্গ হয়ত সারা জীবনে একবার পেয়েছে —যাদের তোমরা আগুনে পুড়িয়ে সতী বানাচ্ছ, তাদের মধ্যে- ক'জন

আছে যাদের ঐ নরপশুদের সঙ্গে এতটুকু প্রণয় ছিল? আজীবনের জন্য যারা বন্দী করে রেখেছিল—তাদের সঙ্গে প্রেম! আর ওদের বিয়োগে পাগল হয়ে আগুনে ঝাঁপ দেবার যে এক-আধটি দৃষ্টান্ত রয়েছে, সে পাগলামীও দু'চার দিনে প্রশমিত করা যেতে পারে। আত্মহত্যা ধর্ম! রসাতলে যাক ভণ্ড পুরোহিত আর রাজাদের ধর্ম। প্রয়াগের অক্ষয়বট থেকে যমুনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করাকে এরা ধর্ম আখ্যা দিয়েছে, যার ফলে প্রতি বছর এমনি হাজার হাজার পাগল মৃত্যুবরণ করে 'স্বর্গ'-এ উপস্থিত হচ্ছে। কেদারখণ্ডের সৎপথে গিয়ে তুষারে জমে যাওয়াকে এরা ধর্ম আখ্যা দিয়েছে, যার ফলে প্রতি বছর শত সহস্র মানুষ সৎপথের শৈত্যে 'স্বর্গ'-যাত্রা করছে! এ সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে আমি ঠিকমতো প্রতিবাদ করতে পারিনি কারণ আমাকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে, রাজার আশ্রয়ে থাকতে হত। রাজার আশ্রিত হয়েছি, কিন্তু নিজে থেকে এই আশ্রয় গ্রহণ করিনি। আমার নিজের যে সম্পত্তি ছিল তাতে সংযত ভোগপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারতাম। আমার সময়ের রাজা এবং ব্রাহ্মণদের চেয়ে আমি অনেক বেশী সংযমী হতে পারতাম। হর্ষ এবং অপর রাজগণের মতো আমি লক্ষ সুন্দরী উপভোগকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিনি। খুব বেশী হলে একশ' সুন্দরী আছে যাদের সঙ্গে কোনো না কোনো সময়ে আমার প্রণয় হয়েছিল। কিন্তু আমার বাড়িঘর, সম্পত্তি সব কিছুই হর্ষের রাজ্যে অবস্থিত। যখন তার কাছ থেকে দূতের পর দূত আসতে লাগল, তখন কি করে আমি তার দরবারে যেতে অস্বীকার করি? হ্যাঁ, আমিও যদি অশ্বঘোষ হতাম, সংসার সম্বন্ধে উদাসীন থাকতাম তা'হলে হর্ষের কোনো পরোয়া করতাম না।

হর্ষের সম্বন্ধে যদি আমার গোপন মতামত জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি বলব যে, তার সময়ে সে মন্দ লোক বা মন্দ রাজা ছিল না। আপন ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে তার অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল। ভাইয়ের জন্য যদি 'সতী' হওয়ার বিধান ধর্মনায়কগণ দিত অথবা তার সামান্য ইঙ্গিত করত, তবে সেও তাই করে বসত। কিন্তু তার মধ্যে অনেক দোষও ছিল, এবং সব চেয়ে বড় দোষ ছিল মিথ্যা ঠাট দেখানো—প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সে-সম্বন্ধে নিস্পৃহ দেখাত; সুন্দরীদের সম্বন্ধে কামনা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে কামনা রহিত বলে জাহির করত। যশোস্পৃহা সত্ত্বেও যশ থেকে দূরে থাকার প্রয়াস পেত। হর্ষকে না জানিয়ে আপন নাটকসমূহকে 'নিপুণ কবি হর্ষ' এই নামে আমি নিজের লেখা নাটককে কেন প্রসিদ্ধ হতে দিয়েছি সে সম্বন্ধে আগেই বলেছি। কিন্তু হর্ষের সঙ্গে পরিচয় এবং রাতদিনের সঙ্গ লাভের পরও সে কখনও আমাকে বলেনি, 'বাণ, এখন এই নাটকগুলিকে তোমার নামেই প্রচারিত হতে দাও।' এ কাজ তার পক্ষে একেবারেই সহজ ছিল। তার অধীন সামন্ত-দরবারে শুধু একবার 'শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবি' এই জায়গায় 'শ্রীবাণো নিপুণঃ কবিঃ' এই নামে নাটকের অভিনয় করালেই হত।

জগৎ যেমন রয়েছে তাকে ঠিক তেমনিভাবে চিত্রিত করায় আমার আগ্রহ। আমি বারোটি বছর যদি পর্যটনে না কাটাতাম, তবে সম্ভবত এই আগ্রহ জন্মাত না, জন্মালেও আমি সেটা চরিতার্থ করতে পারতাম না। আমি যেখানে অচ্ছোদ সরোবরের বর্ণনা দিয়েছি, সেখানে হিমালয় পর্বতের এক সুন্দর দৃশ্য আমার মানসপটে ছিল। কাদম্বরী-ভবনের বর্ণনায় হিমালয়ের দৃশ্য ছিল। বিন্ধ্যাটবীতে নিজেরই দেখা এক বৃদ্ধ দ্রাবিড় ধার্মিককে আমি বসিয়েছি। কিন্তু শুধু এইটুকু চিত্রণে আমি আমার লেখনীকে বিশ্রাম দিতে চাইনি। রাজন্যবর্গের প্রাসাদ, অন্তঃপুর এবং তাদের ধন-দৌলতের চিত্রণ আমি আমার গ্রন্থে করেছি; কিন্তু আমি পর্ণকুটির এবং তার দুঃখদুর্দশাপূর্ণ জীবনকে চিত্রিত করতে পারিনি, যদি করতাম তবে ঐ সব রাজপ্রাসাদ এবং রাজসম্পদভোগীদের ওপর এমন গভীর কালিমা লেপন করতে হত যে, প্রতি পঞ্চম বছরে প্রয়াগে রাজকোষ —ভুল বলা হল, উদ্‌বৃত্তকোষ উজাড়-করা হর্ষ আমাকে শুধু লম্পট উপাধি দিয়েই সন্তুষ্ট থাকত না।

৩

আমাকে লোকে দুর্মুখ বলে, কেন না কটুসত্য বলা আমার অভ্যাস। আমাদের সময়ে আরও কটুসত্য বলার লোক যখন-তখন দেখা যেত; কিন্তু তারা সে সব কথা বলত পাগলামীর ছলে, যার ফলে অনেকেই তাদের সত্যিকারের পাগল মনে করত এবং অনেকে মনে করত শ্রীপর্বত থেকে আগত কোনো অদ্ভুত সিদ্ধপুরুষ বলে। আমিও এই শ্রীপর্বতের যুগে এক খাসা সিদ্ধপুরুষ সাজতে পারতাম; আর তা'হলে আমার নাম দুর্মুখ হত না। কিন্তু এই লোকবঞ্চনা আমার কাম্য নয়। লোকবঞ্চনার কথা মনে করেই আমি নালন্দা ছেড়েছি, না হলে আমিও সেখানকার পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত হয়ে যেতাম। সেখানে এক ব্যক্তিকে আমি অন্ধকার রাত্রিতে জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করতে দেখেছিলাম; কিন্তু এও দেখেছিলাম, কি রকমভাবে তাঁর শত্রুমিত্র সকলেই তাঁর পিছনে লেগেছে। সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনাদের হয়ত কৌতূহল জেগে থাকবে। তিনি তার্কিক শ্রেষ্ঠ, নালন্দার হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে একমাত্র পুরুষ-সিংহ ধর্মকীর্তি। নালন্দায় বসে ডঙ্কানিনাদে তিনি বলেছিলেন, বুদ্ধির ওপর পুথিকে স্থান দেওয়া, ঈশ্বরকে সংসারের কর্তা মনে করা, ধর্মপালনের ইচ্ছা, জন্ম-জাতির অভিমান, পাপক্ষয় করার জন্য শরীরকে সন্তপ্ত করা— বিবেচনাহীন জড়ত্বের পঞ্চলক্ষণ এগুলি।*

ধর্মকীর্তিকে আমি বলেছিলাম, "আচার্য, আপনার অস্ত্র তীক্ষ্ণ, কিন্তু এত বেশী সূক্ষ্ম হয়ে গেছে যে, লোকের নজরেই পড়বে না।"

* বেদপ্রামাণ্যং কস্যচিৎকর্তৃবাদঃ স্নানে ধর্মেচ্ছা জাতিবাদাবলেপঃ।
সন্তাপারম্ভঃ পাপহানায় চেতি ধ্বস্তপ্রজ্ঞানাং পঞ্চলিঙ্গানি জাড্যে॥ —প্রমাণবার্তিক

ধর্মকীর্তি বললেন, "আমার অস্ত্রের দুর্বলতার কথা আমি নিজেও বুঝি। আমি যাকে ধ্বংস করতে চাই তার জন্য আমাকে সব কিছু ত্যাগ করে চোখ-ঝল্‌সানো প্রচণ্ড অস্ত্র ধারণ করতে হবে। নালন্দার মহাস্থবির (সন্ত-মহন্ত) ইতিমধ্যেই আমার ওপর অসন্তুষ্ট। তুমি কি মনে কর একটি বিদ্যার্থী লাভেও আমি সমর্থ হতে পারব, যদি আমি বলতে আরম্ভ করি —নালন্দা এক প্রহসন বিশেষ! এখানে এমন সব বিদ্যার্থী আসে, যারা বিশাল জগৎকে আলোকিত করতে পারে না, যারা আপন জ্ঞানালোকে অজ্ঞ-স্বল্পজ্ঞদের চোখেই শুধু ধাঁধার সৃষ্টি করতে পারে! শীলাদিত্য প্রদত্ত গ্রাম থেকে যারা সুগন্ধি চাল, মশলা, ঘি, খেজুর ইত্যাদি পায় তারা তার ভোগ-শিকাররূপী প্রজা-সাধারণকে বিদ্রোহী হওয়ার শিক্ষা কেমন করে দেবে ?"

"আচার্য, এই অন্ধকার থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো পথ কি পেয়েছেন ?"

"পথ ? সকল রোগেরই মহৌষধ আছে, সকল রকম বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ারও কোনো না কোনো পথ আছে কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রি থেকে উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা অথবা বৈতরণীর সেতু একদিনে তৈরী হতে পারে না বন্ধু! কারণ এর নির্মাণকারীর সংখ্যা অ কম এবং অপরদিকে অন্ধকারের দুর্ভেদ্যতা অত্যন্ত প্রবল।"

"তা'হলে কি হতাশ হয়ে বসে পড়তে হবে ?"

"বসে পড়াটা লোকবঞ্চনা থেকে ভালো। দেখছ না, যাদের পথ-প্রদর্শক হওয়া উচিত তারাই কি রকম প্রবঞ্চক ? আর এই অবস্থা শুধু মাত্র এই দেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই। সিংহল, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, কম্বোজদ্বীপ, চম্পাদ্বীপ, চীন, তুষার, (মধ্য এশিয়া) পারস্য— কোন জায়গার বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থী নালন্দায় নেই ? এদের সঙ্গে আলোচনা করলেই বোঝা যায় যে দুনিয়া অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে গেছে —ধিগ্‌ ব্যাপকং তমঃ !"

জ্বলন্ত শব্দাঙ্গার নিক্ষেপ করে ধর্মকীর্তি এই ঘোর তমসাকে দূর করার প্রচণ্ড চেষ্টা করেন ; কিন্তু তৎকালে এর থেকে কোনো সুফল ফলতে আমি দেখিনি। আমি একাই উজ্জ্বল দীপযষ্টি বহন করে চলতে কৃতসঙ্কল্প হলাম। এর একটা ফল এই হল যে, আমি দুর্মুখ বনে গেলাম। এখানে এ কথা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, আপন রসনার ব্যবহারে আমাকেও রাজসত্তার ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ না-করা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হত, না হলে দুর্মুখের মুখ দশ দিনেই বন্ধ করে দেওয়া হত! তা সত্ত্বেও নিজেকে বাঁচিয়ে কখনও কখনও আমি বহু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতাম

মরণের পর মুক্তি এবং নির্বাণ-প্রাপ্তির যে-কথা তোমরা বল, কি অর্থ আছে তার ? যে লক্ষ লক্ষ দাসকে পশুর ন্যায় আবদ্ধ রেখে ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে, তাদের কেন মুক্ত করার চেষ্টা কর না ? প্রয়াগের মেলায় একবার রাজা শীলাদিত্যকে আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম, "মহারাজ, আপনি যে বড় বড় বিত্তশালী মঠ এবং ব্রাহ্মণদের মাঝে প্রতি পঞ্চম বৎসরে

এত ধন-দৌলত বিতরণ করছেন, সেগুলি যদি দাসদাসীদের মুক্ত করার কাজে লাগাতেন, তা'হলে কি তাতে কম পুণ্যের কাজ হত ?"

অন্য সময় আলোচনা করার কথা বলে শীলাদিত্য এ প্রশ্ন এড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই 'অন্য সময়'ও আমি খুঁজে বের করলাম। রাজার ভগ্নী ভিক্ষুণী জোর করেই সে সুযোগ সৃষ্টি করে দিল। রাজ্যশ্রীর সামনে আমি দাসদাসীদের নরক-যন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরলাম। তার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। তারপর যখন আমি বললাম যে, অর্থ দিয়ে এই সনাতন বংশপরম্পরায় বন্দী মানুষের মুক্তি দান করা সবচেয়ে পুণ্যের কাজ, তখনই সে কথা তার মনে ধরে গেল। বেচারী সরল-হৃদয়া স্ত্রীলোক, দাসত্বের আবরণে লুক্কায়িত বড় বড় স্বার্থের কথা সে কি জানে ? সে কি করে জানবে যে, যেদিন মাটিকে স্বর্গে পরিণত করা যাবে, আকাশের স্বর্গ সেদিন হেলে পড়বে ! আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-নরক কায়েম রাখার জন্য, তাদের নামে লাভের কারবার চালানোর জন্য —পৃথিবীতে স্বর্গ-নরক, রাজা-ভিখারী, দাস-স্বামীর প্রয়োজন হয়।

রাজা নির্জনে বসে আলোচনা করল। প্রথমে সে বলল, "একবার অর্থব্যয় করে তাদের আমি মুক্ত করতে পারি, কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে সে মুক্তি বিকিয়ে যাবে।"

"ভবিষ্যতের জন্য মানুষের ক্রয়-বিক্রয় দণ্ডনীয় করে দিন।"

এরপর সে চুপ করে ভাবতে লাগল। আমি তার সামনে 'নাগানন্দের' নাগের দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম, যে অপরের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে চেয়েছিল। 'নাগানন্দ' হর্ষরাজের সৃষ্ট নাটক বলে কথিত, সুতরাং কি জবাব দেবে সে ? শেষকালে সে জানল যে, দাসদাসীদের মুক্ত করায় সে ততটা কীর্তিলাভের আশা রাখে না, যতটা রাখে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের ঝুলি ভরায় বা বড় বড় মঠ মন্দির নির্মাণে। এইদিন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, সে শীলাদিত্য নয় —শীলান্ধকার।

বেচারা শীলাদিত্যকেই বা আমি কেন দোষ দিই ? আজকাল কুলীন নাগরিক হওয়ার লক্ষণই হল যে, সকলেই পরস্পরকে বঞ্চনা করে চলেছে। পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধকালীন রীতিনীতির কথা পাঠ করে আমি জেনেছি, পূর্বে মদ্যপান জলপানেরই সামিল ছিল। মদ্যপান না করাকে সে সময় উপবাস-ব্রত বলে মনে করা হত। আজকাল ব্রাহ্মণেরা মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছে এবং প্রকাশ্যে মদ্য পান করায় শাস্তি পেতে হয়। এ সবের পরিণাম কি ? দেবতার নামে সিদ্ধি-সাধনার নামে লুকিয়ে ভৈরবীচক্র চলেছে। ব্রহ্মচর্য নিয়ে মহা সোরগোল সুরু হয়েছে, কিন্তু পরিণাম ? ভৈরবীচক্রে আপন-পর সকল স্ত্রী ভোগাধিকারভুক্ত। এর চেয়েও জঘন্য ব্যাপার, দেবতার বরদানের নামে সেখানে মাতা-ভগ্নী-কন্যা পর্যন্ত ভোগাধিকারভুক্ত হয়ে উঠেছে। আর পরিব্রাজক, ভিক্ষু এদের আখড়াগুলি অপ্রাকৃতিক ব্যভিচারের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে।

যদি সত্যিই এই জগৎকে দেখাশোনার কেউ থাকত, তবে এই বঞ্চনা, এই অন্ধকার এক মুহূর্তের জন্যও সে বরদাস্ত করত না।

৪

একবার আমি কামরূপ গিয়েছিলাম। সেখানকার রাজা নালন্দার ভক্ত এবং মহাযানের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। আমি বলেছিলাম, "মহাযাত্রী বোধিসত্ত্বের ব্রতকে আপনি মান্য করেন, যে ব্রতে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একটিও প্রাণী বন্দী হয়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাণ আমার কাম্য নয়। মহারাজ আপনার রাজ্যে অনেক চণ্ডাল আছে, যারা দণ্ড হাতে নিয়ে নগরে আসে আর রাস্তায় আওয়াজ করতে করতে যায়। তারা লোককে সচেতন করে দেয়, যাতে তাদের ছোঁয়া লেগে কেউ যেন অস্পৃশ্য না হয়। তারা হাতে করে পাত্র বয়ে নিয়ে চলে, যাতে তাদের অপবিত্র থুতু নগরের পবিত্র মাটিতে না পড়ে। কুকুরকে স্পর্শ করলে মানুষ অপবিত্র হয় না, তার বিষ্ঠাও নগরকে চিরদূষিত করে রাখে না। তবে কি চণ্ডালেরা কুকুরের চেয়েও অধম?"

"কুকুরের চেয়ে অধম নয়। এদের মধ্যেও জীবন-প্রবাহ নিহিত আছে, যা বিকাশিত হয়ে বৌদ্ধিক উৎকর্ষে পৌছাতে পারে।"

"তা'হলে রাজ্যে ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করে দিন না যে, আজ থেকে কোনো চণ্ডালকে নগরে আসতে দণ্ড অথবা পিক্‌দানী বয়ে আনতে হবে না?"

"এ আমার শক্তির অতীত; সমাজ-ব্যবস্থা এমনভাবেই রচিত হয়েছে।"

"বোধিসত্ত্বের ধর্মে—মহামানবের কি এই ব্যবস্থা?"

"কিন্তু এখানকার সকল প্রজা তো মহামন্ত্র অনুসরণ করে চলে না।"

"গ্রামে, শহরে সর্বত্র আমি ত্রিরত্নের জয়দুন্দুভি বেজে উঠতে দেখেছি।"

"হ্যাঁ, কথা তো ভালোই। যেদিন আমি এ কথা ঘোষণা করব, সেই দিনই আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা আমার বিরুদ্ধে এই বলে তুফান সৃষ্টি করবে যে, সনাতন কাল থেকে চলে-আসা এক সেতুকে আমি উড়িয়ে দিচ্ছি।"

"বোধিসত্ত্ব-জীবনের মহিমা সম্বন্ধে অহর্নিশ যে উপদেশ প্রচারিত হচ্ছে, কারও ওপর কোনো প্রভাবই কি তার পড়েনি? আমি বিশ্বাস করি মহারাজ, নিশ্চয় এর প্রভাব পড়েছে, এবং যদি বোধিসত্ত্বের ন্যায় আপনি আপনার সমস্ত কিছু ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হন, তবে আপনাকে অনুসরণ করে চলার পথিকও পাওয়া যাবে।"

"রাজ্যের ভিতরকার প্রশ্নই শুধু নয়, পরমভট্টারকদেবও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠবেন।"

"শীলাদিত্য! যে 'নাগানন্দ' নাটকে বোধিসত্ত্বের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করেছে?"

"হ্যাঁ, প্রচলিত লোকাচার উঠিয়ে দেওয়া তাঁরও ক্ষমতাধীন নয়।"

"এমন কথা যদি তথাগত, যদি আর্য অশ্বঘোষ অথবা নাগার্জুন মনে করতেন?"

"তাঁদের সাহস ছিল ; তবু রীতি বর্জন করে তাঁরাও বেশী দূর যেতে পারেননি।"

"বেশীদূর নয়, অল্প দূরই আপনি চলুন মহারাজ, কিছুদূর আপনি অগ্রসর হন।"

"আপনি কি আমাকে নিজ মুখ দিয়ে কাপুরুষ বলিয়ে ছাড়বেন ?"

"কাপুরুষ বলছি না। কিন্তু শুনুন, ধর্ম আমাদের কাছে এক নাগপাশ বিশেষ !"

"আমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করলে আমি 'হ্যাঁ' বলব, রসনাকে জিজ্ঞাসা করলে সে পরিষ্কার 'না' বলবে অথবা একেবারেই মৌনব্রত ধারণ করবে।"

* * *

ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আমার ঘৃণা ধরে গেছে ! বস্তুত কামরূপ নৃপতির মতো বহু সদন্তঃকরণ লোককে কাপুরুষ রূপে সৃষ্টি করার অপরাধ এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের। যে দিন এই ধর্ম এ দেশ থেকে উঠে যাবে, সেদিন পৃথিবীর এক গুরুতর কলঙ্ক ঘুচে যাবে। নালন্দায় এসে বিদেশী ভিক্ষুদের কাছে আমি শুনেছি, তাদের দেশে ব্রাহ্মণের ন্যায় কোনো সর্বশক্তিমান ধর্মনায়কের জাতি নেই। তাদের কথায় বুঝেছি যে, কেন সেই সব দেশে দণ্ড এবং মৃৎপাত্র বহনকারী চণ্ডালের দেখা পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণেরা আমাদের দেশে মানুষকে ছোট বড় জাতে এমনভাবে ভাগ করে দিয়েছে যে, কেউই নিজের চেয়ে নীচু জাতের লোকের সঙ্গে মিশতে প্রস্তুত নয়। এদের ধর্ম আর জ্ঞান নিছক রাহুকেতুর ছায়া বিশেষ।

নালন্দায় দেশদেশান্তরের বিচিত্র সংবাদ পাওয়া যেত এ জন্য আমি দু-এক বছর নানা দেশ পর্যটন করে পুনরায় ছয় মাসের জন্য নালন্দায় চলে যেতাম। একবার এক পারসিক ভিক্ষু বলেছিলেন যে, তাঁর দেশে কিছুকাল পূর্বে মজদ্‌ক নামে এক বিদ্বান্ ছিলেন, যিনি এক প্রকারের সঙ্ঘবাদের (যতদূর পর্যন্ত সম্পত্তির প্রশ্ন রয়েছে) প্রচার করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্ঘবাদ এখন শুধু বিনয়পিটকে পঠনীয় বস্তু মাত্র। আজ বড় বড় বৈয়ক্তিক (পৌদ্গলিক) সম্পত্তি ভোগকারী ভিক্ষু রয়েছে। আচার্য মজদ্‌ক ব্রহ্মচর্য এবং ভিক্ষুবাদ মানতেন না। তিনি মানুষের স্বাভাবিক জীবন —প্রেমিক-প্রেমিকা, পুত্র-পৌত্রের জীবনকেই শুধু স্বীকার করতেন ; কিন্তু বলতেন সকল পাপের মূল হল 'আমি' এবং 'আমার'। তিনি বলেছিলেন, 'সম্পত্তি স্বতন্ত্র হওয়া উচিত নয়, সকলে যুক্তভাবে অর্জন করবে এবং যুক্তভাবে ভোগ করবে। পতি-পত্নী সম্পর্কও স্বতন্ত্র হওয়া উচিত নয়, প্রেম স্বেচ্ছানুযায়ী চলবে এবং সন্তান সকলের সম্মিলিত সম্পত্তি বলে গণ্য হবে'। জীবে দয়া এবং সংযমের শিক্ষাও তিনি দিতেন। তাঁর মতবাদ আমার কাছে সুন্দর মনে হল। আমি যখন শুনলাম যে, মজদ্‌ক এবং তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুচরকে মেরে এক পারসিক রাজা —নোলেরিওয়াঁ, ন্যায়মূর্তি উপাধি ধারণ করেছে, তখন বুঝতে পারলাম, যতদিন পর্যন্ত রাজা থাকবে যতদিন তাদের দান-পুণ্যের সাহায্যে বেঁচে থাকা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ থাকবে, ততদিন পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হতে পারে না।

চক্রপাণি

কাল : ১২০০ খৃষ্টাব্দ

এই সময় কনৌজ ভারতের সবচেয়ে বড় সমৃদ্ধ নগর ছিল —তার জমকালো হাট-বাট, চৌরাস্তায়। মিষ্টান্ন, সুগন্ধি তৈল, অলঙ্কার এবং অন্যান্য বহুবিধ জিনিসের জন্য সারা ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল কনৌজ। ছ'শ বছর ধরে মৌখরি, বৈশ্য, প্রতিহার, গহড়বার মতো ভারতের তদানীন্তন সর্বোচ্চ রাজবংশগুলোর রাজধানী থাকার ফলে তার প্রতি শ্রদ্ধার ভাবও লোকের মনে সঞ্জাত হয়েছিল। সেই কারণে হিন্দুরা নিজেদের পদবীর সঙ্গে কনৌজ শব্দটি জুড়ে নিত। তাই আজও ব্রাহ্মণ, আহীর, কাঁদু ইত্যাদি বহু জাতির মধ্যে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ, কান্যকুব্জ আহীর ইত্যাদি দেখা যায়। পদবীর আগে কনৌজ শব্দটি যোগ হলে হিন্দুদের মধ্যে কুলজ মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। হর্ষবর্ধনের সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত জগতে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে, কিন্তু তখনকার চেয়ে এখন ভারতীয় মনোরাজ্যে অধিকতর কূপমণ্ডূকতা এসে বাসা বেঁধেছে।

হর্ষবর্ধনের সময়ে আরবে এক নতুন ধর্ম —ইস্‌লাম জন্মলাভ করে। সেই সময় কে বলতে পেরেছিল, ইসলামের সংস্থাপকের মৃত্যুর (৬২২ খৃঃ) একশ' বছরের মধ্যেই এই ধর্ম সিন্ধু থেকে স্পেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে! এতদিন জাতি এবং রাজার নামে দেশবিজয়ের কথাই শোনা গিয়েছিল, এ-বার ধর্মের নামে দেশ জয়ের কথা প্রথম শোনা গেল। আপন শিকার-সমূহকে সতর্ক হবার সুযোগও সে দিল না এবং তাদের একের পর এক গ্রাস করে ফেললে। সাসানিগণের (ইরাণীগণের) শক্তিশালী সাম্রাজ্য আরবদের স্পর্শমাত্র কাগজের নৌকার ন্যায় গলে পড়ল, এবং ইস্‌লাম সংস্থাপকের মৃত্যুর পর দুই শতাব্দী পার হতে না হতে ইস্‌লামী রাজ্যের ধ্বজা পামীরের ওপর উড়তে লাগল।

ইস্‌লাম প্রথমে সমগ্র দুনিয়াকে আপন আরবী উপজাতিগুলোর বিস্তৃত-রূপে রূপায়িত করতে চেয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে উপজাতির সরলতা, সাম্যভাব ও ভ্রাতৃত্বকে আপন অনুগামীগণের মধ্যে জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছিল। এই সময় থেকে তিন হাজার বছর পূর্বেই বৈদিক আর্যভাষীদের পূর্বজগণ এই অবস্থাকে অতিক্রম করে এসেছে। অতিবাহিত যুগের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। এই জন্য যেমন ইস্‌লাম তার উপজাতিসমূহের পরবর্তী ধাপে অবস্থিত সামন্তযুগের সংস্পর্শে এসেছে এবং তার তরবারির সামনে আক্রান্তের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বিলীন হয়ে গেছে, তেমনি ঐ সংস্পর্শে এসেই ইস্‌লামী সমাজের উপজাতীয়তার স্বরূপও বিনষ্ট হয়ে গেছে। ইস্‌লামের প্রধান শাসককে বহুকাল পর্যন্ত কেবল তার সংস্থাপকের খলিফা —উত্তরাধিকারী বলা হত। বস্তুত সে সুলতান —নিরঙ্কুশ রাজা হওয়া সত্ত্বেও। এখন অবশ্য নামে নিজেদের সুলতান বলে জাহির করার মতো অনেকেই এসে জড় হয়েছে। এদের কাছে ইস্‌লামের উপজাতীয়তা, তার সরলতা বা ভ্রাতৃভাবের

বিশেষ কোনো মূল্য নেই। নতুন অঞ্চল জয় করতে প্রয়োজন হত অস্ত্রচালনাকারী সৈন্যের, এবং অস্ত্রচালনাকারীরা এই সময় সবাই আরব জাতের ছিল না। এইসব সৈন্যদের সুলতানের নামে লড়াই করার জন্য উৎসাহিত করা যেত না, এ জন্য স্বর্গস্থিত নানা প্রলোভনের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব আনন্দের ভাগও তাদের দেওয়া হত। লুটের মাল এবং বন্দীদের ওপর তাদের অধিকার ছিল, নব-জয়লব্ধ ভূমিতে বসতি করার স্বত্ব তাদের ছিল, পূর্বতন অত্যাচারী, প্রভুকুলের কবল থেকে মুক্তি পাবার, এমন কি তাদের অস্তিত্বকেও বিলুপ্ত করে দেবারও অধিকার ছিল। বিজেতার ধ্বজাকে আপনজ্ঞানে সগর্বে বয়ে নিয়ে চলার মতো এত সৈন্য বিজিতদের ভিতর থেকে কেউ কখনও লাভ করেনি। —যারা আক্রান্তদের ভিতর থেকেই নিজেদের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম, তাদের সম্মুখীন হওয়া সহজ কাজ নয়।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর একশ' বছরও কাটেনি এমন সময় সিন্ধু ইস্‌লাম শাসনে চলে গেল। বারাণসী থেকে সোমনাথ (গুজরাট) পর্যন্ত সারা ভারত ইস্‌লামী অস্ত্রের স্পর্শ অনুভব করতে লাগল। এই নতুন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন কর্মপদ্ধতির, কিন্তু হিন্দুরা নিজেদের পুরনো পথ পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না। সমগ্র দেশকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার বদলে ভারতের সৈন্যবাহিনী তৈরী হল একমাত্র রাজপুতদের (প্রাচীন ক্ষত্রিয় এবং এদের সঙ্গে বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ শক, যবন, গুর্জর ইত্যাদি) নিয়ে। আবার অন্তর্বৈরিতা থেকে এরা মুক্ত ছিল না এবং রাজবংশগুলোর মধ্যে নতুন-পুরাতন শত্রুতার জন্য শেষ পর্যন্তও তারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ইস্‌লামী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হতে পারল না।

২

"মহারাজ কোনো চিন্তা করবেন না। সিদ্ধগুরু এমন সাধনা সুরু করেছেন যাতে তুর্কসেনা শুক্‌নো পাতার মতো হাওয়ায় উড়ে যাবে।"

"আমার ওপর গুরু মিত্রপাদের (জগন্মিত্রানন্দ) কি অসীম করুণা! আমার বা আমার পরিবারের যখনই কোনো সঙ্কট এসেছে, গুরুমহারাজ দিব্যবলে রক্ষা করেছেন।"

"মহারাজ, সিদ্ধগুরু হিমালয়ের ওপারে ভোট দেশ থেকে কান্যকুব্জের সঙ্কট দেখতে পেয়েছেন, এই জন্যই তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।"

"কি অপার করুণা!"

"বলেছেন, তারিণী (তারাদেবী) মহারাজের সহায়তা করবেন। তুর্কীদের সম্বন্ধে আপনি কিছু ভাববেন না।"

"তারা মায়ের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। তারিণী, বরাভয়দায়িনী! ম্লেচ্ছদের হাত থেকে রক্ষা কর মা।"

বৃদ্ধ মহারাজ জয়চন্দ্র ইন্দ্রভবনতুল্য আপন রাজপ্রাসাদে এক কর্পূরশ্বেত সিংহাসনে বসে রয়েছেন। চারজন সুন্দরী তরুণী রাণী তাঁর পাশে বসে, এদের গৌর মুখমণ্ডল থেকে ভ্রমরের চেয়েও কালো চুলের রাশ টেনে পিছনের দিকে খোঁপা করে বাঁধা। চূড়ামণি, কর্ণফুল, অঙ্গদ, কঙ্কণ, চন্দ্রহার, মুক্তাহার, কটিকিঙ্কিনী, নূপুর ইত্যাদি নানা ,অলঙ্কারের ভার এদের দেহের ওজন অপেক্ষা বেশী। পরণে সূক্ষ্ম শাড়ি কাঁচুলী, কিন্তু বেশ বোঝা যায়, দেহ আবৃত করার জন্য এগুলো পরা হয়নি, হয়েছে দেহ-সৌষ্ঠব সুপ্রকট করে তুলে ধরার জন্যেই! কাঁচুলী ভেদ করে স্তনের স্ফীতি এবং অরুণিমা সুন্দর রূপে পরিস্ফুট। নীচে নাভি পর্যন্ত সমগ্র উদর অনাচ্ছাদিত; উরু জঙ্ঘার আকৃতি ও বর্ণ পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। চুলের সুগন্ধি তৈল এবং নব প্রস্ফুটিত জুঁই ফুলের মালার সুগন্ধে সমগ্র পুরী আমোদিত। রাণীরা ছাড়াও পঁচিশ জনের বেশী তরুণী পরিচারিকা রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ চামর, কেউ মোরছল বা ব্যজন দোলাচ্ছে। কারও হাতে পানদান, কারও হাতে আয়না ও চিরুণী, কারও হাতে সুগন্ধ জলের ঝারি, কারও হাতে কাঁচের সুরাপত্র ও সোনার পেয়ালা, আবার কারও হাতে সাপের চামড়ার মতো মসৃণ কোমল তোয়ালে। কেউ কেউ মৃদঙ্গ, মুরজ, বীণা, বেণু ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে রয়েছে, কেউ বা স্বর্ণদণ্ড হাতে এখানে সেখানে টহল দিচ্ছে। রাজা জয়চন্দ্র এবং আগন্তুক মিত্রপাদের শিষ্য শুভাকর ছাড়া এখানে আর সবাই মহিলা, সবাই সুন্দরী ও তরুণী। মহারাজের নিকট বিদায় নিয়ে ভিক্ষু চলে গেল। রাজা এবং রাণীরা উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন।

এখন শুধু নারীময় জগৎ। জয়চন্দ্র বৃদ্ধ, কিন্তু তাঁর আধপাকা লম্বা চুল মাঝখান দিয়ে ভাগ করে যেভাবে পিছনের দিকে নিয়ে বাঁধা, বিরাট গোঁফ যে রকম যত্নসহকারে আঁচড়ানো, বস্ত্রালঙ্কারে তাঁর দেহ যেভাবে সজ্জিত, তাতে মনে হয়, তিনি যৌবনকে অনবসিত বলেই মনে করেন। মহারাজের ইঙ্গিতে এক পরিচারিকা তাঁর সামনে ঝুঁকে মদের পেয়ালা এগিয়ে দিল, এবং জনৈকা রাণী সেই পেয়ালা মহারাজের সামনে তুলে ধরল। পেয়ালাটি রাণীর ঠোঁটে লাগিয়ে তিনি বললেন, "তোমার উচ্ছিষ্ট না হলে আমি কেমন করে পান করব?" এরপর তাঁর প্রিয়তমা রাণীরা একে একে প্রসাদ দিল তাঁকে। মহারাজের মুখাবয়ব থেকে তুর্কীদের চিন্তা বিদূরিত হয়ে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। রাজার স্থূল দেহ মসনদের ওপর ঢলে পড়ল এবং কোনো রাণীকে তাঁর এপাশে কোনো রাণীকে ওপাশে টেনে তিনি বসালেন। কারও কোলে মাথা রাখলেন, কারও বুকের ওপর হাত রাখলেন। মদের পেয়ালা চলতে লাগল; কামোদ্দীপক হাসি-ঠাট্টাও চলতে থাকল। রাণীদের নাচের আদেশ দিলেন মহারাজা। বিম্বস্তনা, কলস নিতম্বিনী সুন্দরীরা ঘাঘরা পরে ঘুঙুর পায়ে নাচের জন্য উঠে দাঁড়াল। বীণা এবং মৃদঙ্গ ধ্বনিত হতে লাগল। মৃদু গানের তালে তালে নাচ সুরু হল। একটা গান শেষ হলে রাজা সুন্দরীদের নগ্ন-নৃত্যের

আদেশ দিলেন। নর্তকীরা বেশভূষা সব খুলে ফেলল, রইল শুধু পায়ের নূপুর। রাণী এবং তরুণী পরিচারিকাদের সঙ্গে আলিঙ্গন, চুম্বন এবং হাস্য পরিহাস চলতে লাগল। নর্তকীদের মধ্যে যার নগ্নদেহ মহারাজকে আকর্ষণ করল, সে-ই এসে বসতে লাগল মহারাজের পাশে, অন্য একজন নগ্নিকা তার স্থান পূরণ করল। আরও লাল হয়ে উঠল মহারাজের চোখ, কণ্ঠস্বরে সুরা প্রভাব বিস্তার করল; মহারাজ গান ধরলেন—

'ধ্—ধত্—তে—রি তো-তোর্-র্ তু—তুর্—কী—ঈ—॥ আ—া—ম্-মার ইন্—ন্—দর্-ও পুর্—র্—ঈ—তে—তে কো—কো—ওন্ শ্—শালা—আ—স্—সে॥ স—স্—সব্ জোর্‌সে ন্—না—া—চো।'

সকল রাণী আপন আপন বস্ত্রালঙ্কার খুলে ফেলল। ওদের তরুণ সুন্দর দেহের ওপর ঘনস্থূল কবরী রাজার পছন্দ হল না। কবরী খুলে ফেলতে বললেন তিনি, সব ক'জনের মাথা থেকে কালনাগিনীর মতো দীর্ঘ বেণী নিতম্বের ওপর আছড়ে পড়ল। মহারাজকে স্বয়ং কঞ্চুক খুলতে দেখে তাঁর পরিধেয় বস্ত্র খুলে দিল তরুণীরা। তাঁর লোলচর্ম শীর্ণ চিবুক, কাঁচা-পাকা গোঁফ, প্রসূতির স্তনের মতো ঝুলে পড়া বুক, মহাকুম্ভের মতো উদর এবং শীর্ণ ঢিলে চর্মাবৃত উরু এবং জঙ্ঘা আর কর্কশ লোমশ বাহু সাধারণ তরুণীরাও ঘৃণা না করে পারে না, কিন্তু এখানে এদের দেহ প্রাণ সবই এই বৃদ্ধের হাতে। কেউ তাঁর দন্তহীন ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল, কেউ বা তাঁর দেহে আপন স্তনদ্বয় পীড়িত করতে লাগল, আবার কেউ তাঁর লোমশ বাহু নিজের কাঁধে বা গালে বুলিয়ে দিতে লাগল। কামোদ্দীপক গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ সুরু হল, রাণী এবং পরিচারিকাদের মাঝে দাঁড়িয়ে মহারাজও তাঁর বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলেন।

৩

"এস কবি কুল-তিলক।" —বলে রাজা এক আধাবয়সী পুরুষকে আসন দেখিয়ে দিলেন এবং সে বসবার পর বড় দু'খিলি পান সসম্মানে এগিয়ে দিলেন।

কবির বয়স পঞ্চাশের ওপর, কিন্তু তাঁর সুন্দর সুগৌর মুখমণ্ডলে অতীত যৌবনের ছাপ স্পষ্ট। গোঁফের রঙ কালো, পরণে শাদা ধুতি এবং শাদা চাদর ছাড়াও তাঁর গলায় সুন্দর এক রুদ্রাক্ষের মালা এবং কপালে ভস্মাঙ্কিত চন্দ্রাকার তিলক। সোনার পাতে মোড়া সুগন্ধি পান মুখে দিয়ে কবি বলল, "দেব, যাত্রা কুশলেই সাঙ্গ হয়েছে? শরীর সুস্থ ছিল? রাত্তিরে আরামেই ঘুমিয়েছেন তো?"

"আমি এখন পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েছি কবি-পুঙ্গব।"

"মহারাজ, কবি শ্রীহর্ষকে আপনি খুব ব্যঙ্গ করলেন যাহোক।"

"পুঙ্গব তো ব্যঙ্গ নয়, প্রশংসাসূচক কথা।"

"পুঙ্গব বলদকেই বলে, মহারাজ।"

"জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠকেও পুঙ্গব বলে।"

"আমি তো একে বলদ অর্থেই গ্রহণ করি।"

"এবং আমি শ্রেষ্ঠ অর্থে। আর তা'ছাড়া, তোমার মতো অন্তরঙ্গ ইয়ারের সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না করা গেলে, কার সঙ্গে করা যাবে কি?"

"কিন্তু সে তো দরবারে বসে নয়, মহারাজ।" নীচু গলায় শ্রীহর্ষ বলল.

কবির হাত ধরে দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে ক্রীড়া-উদ্যানের দিকে চললেন জয়চন্দ্র। গ্রীষ্ম সুরু হয়েছে —মনোরম বাতাস, সবুজ রঙয়ের গাছগুলোকে আন্দোলিত করছে। দীঘির সোপানের ওপর অবস্থিত শুভ্র শিলাসনে বসে পাশের আসনে কবিকে বসতে বললেন রাজা, এবং তারপর বাক্যালাপ আরম্ভ করলেন। "রাত্তিরের কথা তুমি কি জিজ্ঞেস করছিলে কবি? আমি এখন বেশ অনুভব করছি যে, আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি।"

"কেন?"

"উলঙ্গ সুন্দরীরাও আমার কাম জাগাতে পারছে না।"

"তা'হলে তো আপনি পুরো যোগী হয়ে পড়েছেন, মহারাজ!"

"এই যোগীর কাছে থেকে এই ষোল হাজার সুন্দরী কি করবে?"

"বিলিয়ে দিন মহারাজ, নেবার মতো লোক অনেক জুটে যাবে; অথবা গঙ্গাতীরে জলকুশ দিয়ে ব্রাহ্মণদের দান করে দিন —সর্বেষামেব দানানাং ভার্যাদানং বিশিষ্যতে!"

"তাই করতে হবে। বৈদ্যরাজ চক্রপাণির বাজীকরণ নিষ্ফল হয়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র তোমার কাব্যরসের আশাতেই আছি।"

"নগ্ন-সৌন্দর্য-রস যেখানে কিছু করতে পারেনি, কাব্যরস সেখানে কি করবে মহারাজ? তা'ছাড়া আপনি এখন ষাটের ওপরে চলে এসেছেন।"

"আমি কনৌজে আসার পর দু'মাস কেটে গেছে, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে এতদিন দেখা করনি কেন?"

"চৈত্রের নবরাত্রিতে আমি ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনীর চরণ দর্শনে গিয়েছিলাম।"

"ঐ পথেই তো আমার নৌকা এসেছে, যদি জানতাম তা'হলে ডেকে নিতাম।"

"অথবা ওখানে নেমে কুমারী-পূজায় ব্যাপৃত হয়ে যেতেন।"

"তা'হলে কবিবর, তুমিও কুমারী-পূজার জন্যই ওখানে যাওনি তো!"

"মহারাজ, আমি ভগবতীর উপাসক —শাক্ত।"

"কিন্তু তুমি যেভাবে রাম-সীতার বন্দনা কর, তাতে মনে হয় যেন খাঁটি বৈষ্ণব।"

"অন্তঃ শাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভামধ্যে চ বৈষ্ণবাঃ।"

"সভামধ্যে তুমি বৈষ্ণব তা'হলে?"

"হতেই হয় মহারাজ! আপনার মতো অন্ধের জিভ টেনে ধরতে তো পারি না।"

"ধন্য হে তুমি বহুরূপী !"

"শুধু এইটুকুই নয় মহারাজ, আমি বুদ্ধকেও আমার আরাধ্য করে নিয়েছি।"

"সুগত —ভগবান তথাগতকেও ?"

"ভগবান !"

"হ্যাঁ, কিন্তু এখানে বসে ও নাম শুনলে আমারও চক্ষুলজ্জা হয় !"

"মহারাজ, শাক্তদের সুবিধার জন্য সুগতের পূজা সরল করে দিয়েছি বজ্রযান রূপে।"

"ঠিক বলেছ বন্ধু, এই জন্যেই তো তাকে সহজিয়া বলা হয়।"

"এই সহজিয়া সিদ্ধগণের দোহা এবং গানে কোনো কবিত্বের স্ফুরণ আমি দেখতে পাই না ; কিন্তু পঞ্চ ম-কার (মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন) প্রচার করে যতটা জন-কল্যাণ এঁরা করেছেন, তার জন্য আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।"

"কিন্তু আমার পক্ষে এখন আর এই পঞ্চ ম-কারের উপাসনা করা দুষ্কর।"

"বজ্রযানের সঙ্গে নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শন —একেবারে যেন সোনায় সোহাগা।"

"তোমার কাব্যরস তো তবু চেখে দেখতে পারি, যদিও ওতেও কখনও কখনও মাথা ঘুরে যায় ; কিন্তু এই দর্শনশাস্ত্র যেন পর্বতপ্রমাণ বোঝা হয়ে মাথায় চেপে বসে।"

"তা'হলেও মহারাজ, নাগার্জুনের দর্শন বহু মিথ্যা ধারণা দূর করে।"

"কিন্তু তুমি তো বেদান্ত-বিশারদ কবি !"

"আমার গ্রন্থকে আমি বেদান্ত বলেই প্রসিদ্ধ করে নিয়েছি মহারাজ, কিন্তু 'খণ্ডন-খণ্ড খাদ্য'-তে নাগার্জুনের চরণধূলিকেই বিতরণ করেছি সর্বত্র।"

"মনে তো থাকবেই না, তবু বল শুনি নাগার্জুনের মূল কথা কি ?"

"সিদ্ধরাজ মিত্রপাদ তো নাগার্জুনের দর্শনেই বিশ্বাস করেন।"

"আমার দীক্ষাগুরু ?"

"হ্যাঁ। নাগার্জুন বলেন —পাপ-পুণ্য, আচার-দুরাচার সবই কল্পনা, জগতের সত্তা-অসত্তা কিছুই প্রমাণ করা যায় না। স্বর্গ-নরক, বন্ধন-মোক্ষ সবই ভ্রম। পূজা, উপাসনা এগুলো মূর্খ লোকদের বঞ্চনা করার জন্য; দেবদেবী সম্বন্ধে লোকোত্তর সব ধারণাই অলীক।"

"আমিও তো এই দর্শনকে অনুসরণ করেই জীবন কাটিয়েছি কবি !"

"সকলেই কাটায় মহারাজ, মূর্খেরাই শুধু নগদ ছেড়ে ধারের পেছনে ছোটে !"

"কিন্তু এখন যে আমার নগদকে সামনে ফেলে রেখে শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হয় বন্ধু ! কিন্তু তোমার এখনও বয়স পেরোয়নি বলেই মনে হয়।"

"আপনার চেয়ে আমি আট বছরের ছোট, তা'ছাড়া একটির বেশী বিয়েও করিনি।"

"বেশী বিয়ে করলে বিয়ের পাকেই ক্লান্ত হয়ে মারা পড়ে মানুষ !"

"আমার ঘরে একটি মাত্র ব্রাহ্মণীই আছে মহারাজ।"

"এবং তোমার ধারণা যে, সমগ্র দুনিয়া তাই বিশ্বাস করবে—কবি শ্রীহর্ষ সেই দাঁতভাঙা একটি বুড়ির প্রতি একান্ত অনুরক্ত !"

"বিশ্বাস করবে এবং করছেও মহারাজ ! আমার গ্রন্থে আমি আমার সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের কথা লিখেছি।"

"তোমাদের মাধ্যমিক দর্শনে তা'হলে ব্রহ্ম এবং তাঁর সাক্ষাৎকারের স্থানও আছে ?"

"কিসের স্থান ওতে নেই মহারাজ !"

"প্রজাদের দৃষ্টি চিরকালের মতো অন্ধ করে রাখতে হবে তাই সব রকমের সাক্ষাৎকারের কথা তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার !"

"ধর্মের ওপর থেকে আপনার বিশ্বাস তবে উবে গেল মহারাজ ?"

"সে আমি জানি না, আমি বুঝতেই পারি না, কখন বিশ্বাস আসে কখন চলে যায়। তোমাদের মতো ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণদের আচার-উপদেশ দেখে-শুনে মন স্থির করাই আমার পক্ষে মুস্কিল। আমি শুধু এইটুকু বুঝি, দান-পুণ্য, দেবালয়-সুগতালয় নির্মাণ ইত্যাদি যা খুশী ধর্মে বলে তা কর ; কিন্তু জীবনের নগদ সম্পদকে হাত থেকে চলে যেতে দিও না।"

প্রেম এবং ধর্ম থেকে এঁদের আলোচনা রাজকার্যে এসে পড়ল। শ্রীহর্ষ বললেন, "মহারাজ কি পৃথ্বিরাজকে সাহায্য করতে সত্যিই অস্বীকার করেছেন ?"

"তাকে সাহায্য করার কি দরকার আমার ? নিজে গায়ে পড়ে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই বাধিয়েছে সে, নিজেই ভুগবে তার ফল !"

"আমারও সেই মত মহারাজ, চক্রপানি মিছিমিছি ফালতু বিরক্ত করছে।"

"তার কাজ হল চিকিৎসা করা। সেখানেও সে কিছুই করে উঠতে পারছে না। তিনবার আমি বাজীকরন চিকিৎসা করিয়েছি, কিন্তু সবই বিফলে গেছে। এখন উনি এসেছেন রাজকার্যে পরামর্শ দিতে !"

"ও একটা নিরেট মূর্খ, অনর্থক ওকে মাথায় তুলে রেখেছেন যুবরাজ।"

৪

"ঠিক বলেছেন বৈদ্যরাজ ! গহড়বারের মূলে ঘুণ ধরাতে আরম্ভ করেছে শ্রীহর্ষ। বাবাকে সে অন্ধ কামুক বানিয়ে রেখেছে।"

"বিশ বছর আমি কান্যকুব্জের রাজবৈদ্য, আমার ওষুধের কিছু গুণ অন্তত আছে।"

"সে গুণের কথা সারা দুনিয়া জানে বৈদ্যরাজ।"

"কিন্তু বাজীকরণের ব্যাপারে মহারাজ খুশী নন। অতিকামুক পুরুষের তারুণ্যকে কতদিন পর্যন্ত জীইয়ে রাখা যায় কুমার ? এই জন্যই আহার-বিহারে সংযম অভ্যাস করার কথা লেখা হয়েছে। আমি তো মহারাজকে বলেছি যে, আমাকে মল্লগ্রাম (মাল়াঁও—গোরক্ষপুর) গিয়ে থাকতে দিন। কিন্তু উনি তাতেও রাজী নন।"

"বাবার দোষে আমাকে ছেড়ে যাবেন না বৈদ্যরাজ। গহড়বারের যা কিছু আশা-ভরসা সবটাই আপনার ওপর।"

"আমাকে দিয়ে কিছু হবে না কুমার, হবে হরিশ্চন্দ্রকে দিয়ে। গহড়বার বংশে যদি জয়চন্দ্রের জায়গায় হরিশ্চন্দ্র থাকতেন তো কত ভালো হত। চন্দ্রদেবের সিংহাসনে হরিশ্চন্দ্রেরই প্রয়োজন ছিল।"

"অথবা যদি শ্রীহর্ষের জায়গায় বৈদ্যরাজ চক্রপাণি জয়চন্দ্রের প্রাণের বন্ধু হতেন! কিন্তু গহড়বার সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আপনাকে থাকতেই হবে বৈদ্যরাজ।"

"অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও অস্তে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত কুমার। কিন্তু শুধু গহড়বার সূর্য অস্ত যাবে না, হিন্দুদের সূর্যও অস্ত যাবে। আমরা মল্লগ্রামের ব্রাহ্মণেরা শুধু শাস্ত্র ও ধর্মাচরণেই অভিজ্ঞ নই, অসি চালনাতেও আমরা দক্ষ। এই জন্য আমরাও তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই কুমার।"

"নিজের জামাইকে সাহায্য করতেও আমার পিতা রাজী নন। পৃথ্বিরাজ আমার আপন ভগ্নীপতি। তার সঙ্গে সংযুক্তার প্রণয় ছিল এবং নিজের ইচ্ছাতেই সংযুক্তা চলে গিয়েছিল। এতে বাবার অখুশী হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?"

"পৃথ্বিরাজ বীর, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।"

"ঠিক কথা। বীরত্বের জন্যই তুর্কী সুলতানের সঙ্গে লড়তে পারছে। না হলে আমাদের এই কান্যকুব্জের তুলনায় কতটুকু তার রাজ্য? সুলতানকে সে যদি শুধু পথ ছেড়ে দিত, সুলতান তাকে পুরস্কৃত করত। সুলতানের দৃষ্টি তো দিল্লীর ওপর নয়, কান্যকুব্জের ওপর। দু-শ' বছর থেকে ভারতের সব চেয়ে বড় রাজ্য কনৌজ। কিন্তু তাঁকে বোঝাবে কে? বুঝবার মতো বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসে আছেন বাবা।"

"এ সময় যদি তিনি যুবরাজের হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দিতেন!"

"আমার একবার মনে হয়েছিল বৈদ্যরাজ, যে বাবাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিই কিন্তু আপনার শিক্ষার কথা মনে পড়ে গেল। বিশ বছর ধরে আপনার দেওয়া প্রতিটি শিক্ষা আমার কাছে হিতকারী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই জন্যেই তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারিনি আমি।"

"কান্যকুব্জের সিংহাসন জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে কুমার। সামান্য ভুল পদক্ষেপেই সমগ্র ইমারত ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। পিতাপুত্রের কলহের সময় এখন নয়।"

"এখন কি করা যায় বৈদ্যরাজ? আমাদের সমস্ত সেনাপতি ও সেনানায়কেরা ভীরু এবং অযোগ্য। তরুণ সেনানায়কদের মধ্যে অবশ্য যোগ্য এবং সাহসী কিছু লোক আছে, কিন্তু বুড়োরা পথ বন্ধ করে বসে আছে। মন্ত্রীদেরও ঐ একই অবস্থা, তারা রাজার প্রশস্তি গাওয়াকেই শুধু আপন কর্তব্য বলে জ্ঞান করে।"

"রাজান্তঃপুরে মেয়ে-বোনকে পাঠিয়ে যারা পদলাভ করে তাদের এই অবস্থাই হয়। কিন্তু অতীত নয়, ভবিষ্যতের চিন্তাই আমাদের করতে হবে এখন।"

"আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে সমস্ত হিন্দু তরুণের হাতে অস্ত্র তুলে দিতাম।"

"কিন্তু এ হল বংশানুক্রমিক ত্রুটি, যাতে শুধু রাজপুত্রকেই যুদ্ধের অধিকারী করে রাখা হয়েছে। মহাভারতে দ্রোণ এবং কৃপের মতো ব্রাহ্মণরাও যুদ্ধ করেছে; কিন্তু পরে শুধু এক জাতির..."

"এই জাত-বেজাতের ব্যাপারটাও আমাদের সামনে এক বিরাট বাধা।"

"সবচেয়ে বড় বাধা, কুমার। পূর্বজগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত সৎকাজের জন্য গর্বানুভব করা এক জিনিস কিন্তু চিরদিনের জন্য হিন্দুদের সহস্রভাগে ভাগ করে রাখা মহাপাপ।"

"এর ফল এখন ভুগতে হচ্ছে। কাবুল এখন আর হিন্দুদের হাতে নেই, লাহোরও গেছে, এ-বার দিল্লীর পালা।"

"আজ যদি আমরা পৃথ্বিরাজের সঙ্গে এক হয়ে যুদ্ধ করতে পারতাম?"

"উঃ, কি দুর্ভাগ্য, বৈদ্যরাজ!"

"দুর্ভাগ্যের বোঝা ভারী হয়ে আমাদের নৌকা ডুবতে যাচ্ছে কিন্তু মোহাচ্ছন্ন আমরা! কিছুটা বোঝা নামিয়ে দিয়ে নৌকা হাল্কা করতে চাইছি না।"

"ধর্ম থেকে অজীর্ণ হয়েছে, বৈদ্যরাজ।"

"ধর্মের ক্ষয়রোগ! কি অত্যাচারই না আমরা করেছি? কোটি-কোটি বিধবাকে প্রতি বছর আগুনে পুড়িয়েছি। নর-নারীকে নিয়ে পশুর মতো বেচা-কেনা করেছি। দেবালয় এবং বিহারে সোনা-চাঁদি আর হীরামোতির বাহার বসিয়ে ম্লেচ্ছ লুণ্ঠনকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি, আর শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার সময় আত্মকলহে ডুবে থেকেছি। আপন ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করার জন্য প্রজাদের শ্রমার্জিত সম্পদকে নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠন করেছি আমরা।"

"শুধু লালসা নয় বৈদ্যরাজ, উন্মত্ততা। নিজের কাম-সুখ চরিতার্থ করতে প্রিয়তমা সহৃদয়া একজন স্ত্রী-ই যথেষ্ট, আর ইন্দ্রিয় লোলুপতাকে প্রশমিত করতে পঞ্চাশ হাজারও কিছুই নয়। এখানে ভালোবাসার কোনো স্থান থাকতে পারে না। গত সংক্রান্তির দিন বাবা যখন আপন অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদের অনেককেই ব্রাহ্মণদের দান করে দিলেন, তখন তারা কেউই মহারাজের জন্যে একফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি বরং ভিতরে ভিতরে খুশীই হয়েছে। ভামা আমাকে এ কথা বলেছে।"

"দান গ্রহণকারী ব্রাহ্মণের ঘরে খুব বেশী হলে একটি বা দুটি সতীন থাকতে পারে, ষোল হাজারের ভীড় সেখানে থাকবে না। অবশ্য একেও আমি দাসত্ব বলে মনে করি। স্ত্রীলোক কি একটা সম্পত্তি যে, তাকে এইভাবে দান করা যাবে?"

"আমাদের চেষ্টা করতে হবে সমবেতভাবে তুর্কীদের মোকাবিলা করার।"

"সে-সব তো মহারাজের হাতে। ভণ্ড শ্রীহর্ষ তাঁর কানের পাশে লেগে রয়েছে।"

৫

অষ্টমীর রাত। সবে মাত্র চাঁদ উঠেছে; গোটা পৃথিবীটা আলোকিত হয়ে উঠতে এখনও দেরী। চারিদিকে অখণ্ড নিস্তব্ধতা, তারই বুক চিরে মাঝে মাঝে পেচকের ভীতিপ্রদ ডাক শোনা যাচ্ছে। নিঃসীম এই নিস্তব্ধতার মাঝে দু'জন লোক তীর থেকে দ্রুত যমুনার জলে নেমে পড়ল। মুখে আঙুল দিয়ে তিনবার শিস দিল তারা। যমুনার অপর দিক থেকে একটি নৌকা আসতে দেখা গেল। নীরব-প্রবাহিত জলস্রোতে ধীরে ধীরে দাঁড় টেনে মাঝারি গোছের এক নৌকা পারে এসে ভিড়ল। লোক দু'জন নিঃশব্দে নৌকায় উঠে পড়ল। ভিতর থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা করল, "সেনানায়ক মাধব?"

"হ্যাঁ আচার্য, আলহনও আমার সঙ্গে এসেছে। কুমার কেমন আছেন?"

"এখন পর্যন্ত তো জ্ঞান হয়নি; তার জন্য অবশ্য আমিই সামান্য ওষুধ দিয়ে রেখেছি। কি জানি, জ্ঞান হলেই যদি রণক্ষেত্রে ফিরে যেতে চায়!"

"কিন্তু আচার্য, আপনার আদেশ কখনও অমান্য করতে পারেন না তিনি।"

"সে আমিও বিশ্বাস করি; কিন্তু এই-ই ভালো, ক্ষতের ব্যথাও এতে কমে যাবে।"

"ক্ষততে ভয়ের কিছু নেই তো, আচার্য?"

"না সেনানায়ক, ক্ষত আমি সেলাই করে দিয়েছি এবং রক্তস্রাবও বন্ধ হয়ে গেছে। দুর্বলতা খুবই আছে, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই আর। এ-বারে বল কি-কি কাজ শেষ করে এলে তুমি? মহারাজের শব রাজান্তঃপুরে পাঠিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"এখন তবে রাজান্তঃপুরের স্ত্রীলোকেরা মহারাজের সঙ্গে সহমরণে যাবে!"

"যার যাওয়ার সে যাবে।"

"আর সেনাপতি, তার খবর কি?"

"বুড়ো সেনাপতি তো মরতে মরতে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল। অবস্থা সঙ্গীন দেখে বহু সেনানায়ক পালিয়েছে, কিন্তু পালাবার কৌশল তারা জানে না। আমি আশা করি না যে, ওদের মধ্যে কেউ বেঁচে আছে।"

"এ-সব ব্যাপার যদি তিন বছর আগে ঘটত এবং কুমার হরিশ্চন্দ্র যদি আমাদের রাজা আর তুমি মাধব কান্যকুব্জের সেনাপতি হতে!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাধব বলল, "আপনার প্রতিটি কথা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার, আচার্য। মহারাজকে আপনি অনেক করে বুঝিয়েছিলেন যে, পৃথ্বিরাজের সঙ্গে এক হয়ে তুর্কীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত, কিন্তু সে সবই অরণ্যে রোদন হয়েছে।"

"এখন আফসোশ করে কোনো লাভ নেই। কি কি ব্যবস্থা করলে বল।"

"পঞ্চাশ জন করে ভাগ করা সৈন্যদলে বোঝাই পাঁচ শ' নৌকা এখনই এসে পড়বে। গাগা, মোগে, সলখুর নেতৃত্বে গোটা সৈন্যবাহিনীটাকে ভাগ করে আমি আদেশ দিয়ে দিয়েছি যে, চন্দাবর থেকে পূবে সরে এসে তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ কর—সম্মুখ-সমরে কম এগুবে, অতর্কিত আক্রমণই বেশী চালাবে এবং পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে পড়ছে দেখলে পূবদিকে হঠে আসবে।"

"কনৌজের রাজপ্রাসাদ······?"

"সেখান থেকে যতটা জিনিস সরানো সম্ভব, সরিয়ে ফেলেছি আমি। দু'দিন আগে গঙ্গাতেই অনেকগুলো নৌকা নামিয়ে দিয়েছি।"

"এই জন্যই তোমাকে সেনাপতির রোষ থেকে বাঁচিয়েছিলাম মাধব। না হলে নিজের আগে, তোমাকেই সে মেরে ফেলত। তোমাকে এবং কুমারকে জীবিত দেখে আমি বড়ই সুখী। হিন্দুদের কিছু আশা রইল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে, প্রতি পরমাণু পরিমাণ শক্তি বুঝে-শুনে ব্যয় করে লড়তে হবে আমাদের।"

"কতকগুলো নৌকা আসছে বলে মনে হচ্ছে আচার্য?"

"সেনানায়ক আলহন, ওগুলো এলেই ওদের সব এখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়ে দেবে।"

"আচ্ছা আচার্য"—বিনীতভাবে বলল আলহন।

"গলুয়ের ভিতরে চল মাধব। ওখানে অন্ধকার রয়েছে—ইচ্ছা করেই আমি ওখানকার প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছি।" একটু এগিয়ে তিনি ডাকলেন, "রাধা!"

"বাবা!" এক তরুণী নারীকণ্ঠ থেকে আওয়াজ এল।

চক্রপাণি মাধবের দিকে ফিরে বললেন, "কেউ বৈদ্যরাজ বলে, কেউ আচার্য, কেউ বা বাবা! এ-সব মনে রাখাও আমার পক্ষে মুস্কিল হয়ে পড়েছে। তোমরা সবাই আমার ছেলেবেলার নাম 'চক্কু' বলে আমাকে ডাকবে।"

"উঁহু। স্ত্রীলোকের অভ্যাস বদলানো শক্ত, এ জন্য আমরা আপনাকে বাবা চক্রপাণি পাণ্ডেয়র জায়গায়, শুধু বাবা বলব।"

"বেশ! চল, বাতি জ্বলে গেছে।"

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল দু'জনে। নৌকার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে পাটাতন, তার নীচে পর পর দুটো কুঠরী; নৌকার একদিকে খানিকটা জায়গা খালি। দু'জনে একটা কুঠরীর ভিতর ঢুকল। প্রদীপের মৃদু আলোয় একটা খাট দেখা যাচ্ছে। আকণ্ঠ সাদা শাল মুড়ি দিয়ে একটা লোক শুয়ে রয়েছে। খাটের পাশে মোড়ার ওপর থেকে এক তন্বী উঠে দাঁড়াল। চক্রপাণি বললেন, "কুমারের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো ভামা?"

"না বাবা, শ্বাস-প্রশ্বাস সেই এক রকম ভাবেই চলছে।"

"ঘাবড়ে যাওনি তো তুমি ?"

"চক্রপাণির ছত্র-ছায়ায় থেকে ঘাবড়াব ? গহড়বার বংশ যদি প্রথমেই তাদের এই গুরু দ্রোণাচার্যকে চিনতে পারত !"

"আমাদের প্রধান সেনাপতি পরম সহায়ক মহারাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রের সেনাপতি মাধব এসে গেছে দেখ।"

"মহাদেবী ভামা, আপনাদের সেবক মাধব সেবার জন্য উপস্থিত"—এই বলে অভিবাদন জানাল মাধব।

"মাধবের সঙ্গে অপরিচিত নই আমি। কুমারের পাশাখেলার সঙ্গীকে কি ভুলতে পারি কখনও ?"

"আর যার অমিত বীর্য গহড়বার বংশের ধূলি-লুণ্ঠিত লক্ষ্মীকে পুনরায় তুলে ধরবার শক্তি রাখে ভামা !"

"আপনার মুখে 'ভামা' ডাক কত মধুর শোনায় বাবা !"

"নিজের বাবার কথা মনে পড়ে যায় বোধহয়, না ?"

"না বাবা, রাজকুলে আমাদের অন্য রকম আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে। উঃ, কি মিথ্যা ঠাট, কি ভণ্ডামি ! মানুষের মধ্যে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আমার শ্বশুরের সঙ্গে পুরাতন রাজকুলের নীতিকেও শেষ করে দিতে হবে।"

"শেষ হয়ে গেছে পুত্রী। বহুদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে তা। কুমারের অন্তঃপুর দেখেছ তো তুমি ?"

চোখের জল মুছে ভামা বলল, "আপনিই আমাদের মানুষ করেছেন বাবা।"

"না পুত্রী, কুমার হরিশ্চন্দ্রের জায়গায় এ যদি অন্য কেউ হত, তবে আমাকে শুধু শূন্যে চেয়েই থাকতে হত। এ সব কিছুই কুমার হরিশ্চন্দ্র…"

"বাবা !"

কুমারের চোখের পাতা অর্ধ উন্মীলিত হতে দেখা গেল। দৌড়ে তার কাছে গিয়ে ভামা বলল, "চন্দ্র আমার ! রাহুর গ্রাসমুক্ত চাঁদ !"

"ঠিক বলেছ ভামা ! কিন্তু এইমাত্র যেন বাবার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম আমি ?"

"বাবা ?"

"সে বাবা নয়, যিনি গহড়বারের সূর্যকে ডুবিয়ে দিয়েছেন ; এইবার যাঁকে তুমি বাবা বলে ডাকলে, আর আমিও যাঁকে বাবা বলেই ডাকব।"

প্রদীপের আলোয় কুমারের পাংশু চেহারা দেখে তার কপালে হাত রেখে চক্রপাণি বললেন, "শরীর কেমন আছে কুমার ?"

"শরীর এত ভালো যে, মনে হয়, আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত হয়ে ফিরিনি।"

"ক্ষত কিন্তু খুব সাংঘাতিক ছিল কুমার!"

"হবে, কিন্তু আমার পীযূষপাণি বাবাও যে কাছে ছিল আমার!"

"একটু কম কথা বল কুমার।"

"বাবা চক্রপাণির মুখের প্রতিটি কথা হরিশ্চন্দ্রের কাছে ব্রহ্মবাক্যতুল্য।"

"কিন্তু এমন হরিশ্চন্দ্র চক্রপাণির কোনোই কাজে আসবে না যে!"

"এ হল শুধু হরিশ্চন্দ্রের শ্রদ্ধার কথা; কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনার প্রশ্ন যেখানে, সেখানে হরিশ্চন্দ্র ব্রহ্মবাক্যকেও যাচাই না করে গ্রহণ করবে না।"

"তোমাকে পেয়ে শুধু গহড়বার বংশ নয়, সমগ্র হিন্দু দেশ আজ ধন্য, কুমার।"

"আর বাবা চক্রপাণিকে পেয়ে··· —একটু জল।"

তাড়াতাড়ি গ্লাসে জল গড়িয়ে দিল ভামা। নৌকা চলতে সুরু করেছে দেখে বাবা বললেন, "আমরা দ্বিতীয় রাজধানী বারাণসী চলেছি কুমার। সেনাপতি মাধব সৈন্য-বাহিনীকে যথারীতি আদেশ দিয়েছে। সৈন্যরা এদিক থেকে তুর্কীদের গতিরোধ করবে। ওদিকে বারাণসীতে গহড়বার লক্ষ্মীর জন্য নতুন সৈন্য সংগ্রহ করব আমরা।"

"না বাবা, আগে যেমনটি বলতেন আপনি, সেই হিন্দু রাজলক্ষ্মী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন করুন। পুনঃপ্রতিষ্ঠ এই রাজলক্ষ্মীই এ-বার হিন্দুর রাজলক্ষ্মী হবে। হিন্দুর বাহুবলে জয় করেই একে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"

"চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণের ভেদাভেদও ঘুচিয়ে দিতে হবে।"

"নিশ্চয়ই গুরু দ্রোণ।"

বাবা নুরদ্দীন

কাল : ১৩০০ খৃষ্টাব্দ

"সে সব দিনকাল শেষ হয়েছে, যখন আমরা ভারতভূমিকে দুগ্ধবতী গাভীর চেয়ে বেশী কিছু ভাবতে পারতাম না। তখনকার দিনে কৃষক, কারিগর, ব্যবসায়ী ও রাজাদের কাছ থেকে আদায় করে অনেক বেশী ধনদৌলত জমা হত আমাদের হাতে—ফূর্তি করে ওড়াতাম আর টাকা পাঠাতাম গোর দেশে। এখন আমরা আর গোরের অধীন নই, স্বাধীন খিলজী শাসক আমরা!" কথাগুলো বলল একটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবক নিজের কালো দাড়ির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে। তার সামনে বসে শুভ্রশ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্য সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন পুরুষ, পরনে সাদা আচকান, মাথায় বিরাট পাগড়ি।

বৃদ্ধ বলল, "কিন্তু জাঁহাপনা। মোড়ল, মাতব্বর, প্যাটেল, তালুকদার এদের স্বার্থ যদি ক্ষুণ্ণ করা হয় তবে তারা বিগড়ে যাবে, আর খাজনা আদায় করার জন্য গ্রামে গ্রামে ফৌজ পাঠাবার সামর্থ্য আমাদের নেই।"

"প্রথমে এই বিষয়ে আপনাকে মন স্থির করতে হবে যে, আপনারা ভারতের অধিবাসী হয়ে ভারতবর্ষের শাসক রূপে এ-দেশে অবস্থান করবেন—না, উট ও খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে হীরা-মুক্তা লুণ্ঠনকারী গোর-গজনীর দস্যু রূপে বাস করবেন!"

"এখন ভারতবর্ষেই আমাদের বসবাস করতে হবে জাঁহাপনা।"

"হ্যাঁ, পূর্বতন শাসকদের মতো আমাদের অস্তিত্বের মূল এখন আর গোরে নেই। দিল্লীতে যদি কোনো বিদ্রোহ, অশান্তি সুরু হয় তবে আরব, আফগানিস্থান থেকে সাহায্য আমরা পাব না, অথবা কোথাও পালিয়ে গিয়েও নিস্তার পাব না।"

"এ কথা স্বীকার করি জাঁহাপনা!"

"সুতরাং এই আমাদের ঘর, এখন এখানেই থাকতে হবে, আর এ জন্য আমাদের এমনভাবে এই ঘর তৈরী করতে হবে যাতে এখানকার লোকে সুখী এবং শান্ত থাকে! এখানকার প্রজাদের মধ্যে ক'জনই বা মুসলমান আছে? একশ' বছরের ভেতর দিল্লীর আশপাশের জায়গাগুলোকেও আমরা মুসলমান করে তুলতে পারিনি। মোল্লা আবুমোহাম্মদ, আপনি কত দিনের ভেতরে সমগ্র দিল্লী এবং এই দেশকে মুসলমানে রূপান্তরিত করতে পারেন, বলুন তো?"

সম্মুখে উপবিষ্ট তৃতীয় বৃদ্ধ দাঁতহীন ঠোঁটের নীচ থেকে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত সাদা দাড়ির গোছা ঠিক করতে করতে বলল, "আমি নিরাশ হইনি সুলতানে-জমানা। তবে অশীতি বর্ষের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, যদি জবরদস্তি করে মুসলমান করাতে চাই তবে পুরোপুরি সফল হবার কোনো আশা আমাদের নেই।"

"এ জন্য ভারতে অধিষ্ঠিত মুসলমানেরা সমগ্র ভারতবর্ষ মুসলমান হয়ে যাবার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না। এক শতাব্দী আমরা এইভাবেই কেটে যেতে দিয়েছি এবং নিজেদের প্রজা-সম্বন্ধে কোনো কিছু না ভেবে যথাশক্তি শুধু জমির খাজনা বাণিজ্য শুল্ক এবং রাজস্ব আদায় করতেই চেয়েছি। তার পরিণাম হল—নবাবের খাজনা বাবদ এক টাকা আনে তো পাঁচ টাকা যায় তহশীল আদায়কারীর পেটে। দুনিয়ার আর কোথাও দেখেছেন, গ্রামের কর্মচারীরা রেশমী পোশাক পরে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বের হয়, ইরাণের তৈরী তীর-ধনুক ব্যবহার করে! না—ওয়াজির-উল্-মুল্ক আমার রাজ্যে এই ধরনের অবাধ লুণ্ঠন এখনই বন্ধ করতে হবে।"

"কিন্তু হুজুর! বহু হিন্দু, মুসলমান হয়েছে এই লোভেই। এ-বার তা'হলে সে পথও বন্ধ হয়ে যাবে।" —মোল্লা বলল।

"ইস্‌লামও যদি এই ধরনের লুট এবং ঘুষের ব্যাপার সমর্থন করত, তবু সরকারী খাজনা এবং সরকারী সম্পত্তির স্বার্থে সে-সব বরবাদ করে দেওয়া হত। তা'ছাড়া যে সরকারের কর্মচারীরাই লুট করে তার আর আশা-ভরসা কি ?"

"রাজ্যের ভিত এদের দিয়ে মজবুত হতে পারে না, স্বীকার করতেই হবে জাঁহাপনা। কিন্তু আমি শুধু বিদ্রোহ ও বিপদের কথাই ভাবছিলাম।" —ওয়াজির বলল।

"গ্রামের আমলারা তাই করে বসবে যদি তাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু গ্রামে আমলার সংখ্যা বেশী —না কৃষকের সংখ্যা বেশী ? —কৃষকের। আমলা তো প্রতি একশ' কৃষকে মাত্র একজন। এই একশ' কৃষকের রক্ত চুষেই ঐ একজন ঘোড়ায় চড়ে, রেশমী পোশাক পরে আর ইরাণী তীর-ধনুক ব্যবহার করে। এই ধরনের রক্তচোষা বন্ধ করে আমরা কৃষকের অবস্থার উন্নতি করব! তাদের সরকারের অনুগত করে তুলব। একজনকে অখুশী রেখে একশ' লোককে খুশী করে তোলাই কি ভালো কাজ হবে না ?"

"ঠিকই বলেছেন হুজুর! এ বিষয়ে আমারও এখন আর সন্দেহ নেই যদিও হিন্দুস্থানের মুসলমান সুলতানগণের মধ্যে এক নতুন পন্থা আপনি অনুসরণ করতে যাচ্ছেন। এই পথেই হয়ত সাফল্য লাভ করা যাবে। এতে গ্রামের উচ্চশ্রেণীর কিছু লোককে শুধু অখুশী করে তুলব আমরা।"

"গ্রামে এবং শহরে উচ্চশ্রেণীর সামান্য কিছু লোক অখুশী হয়ে উঠলে কিছু যায় আসে না। এখন শাসনকার্যের পাকাপোক্ত ইমারতের বুনিয়াদ তৈরী করতে হবে।"

মোল্লা কি যেন চিন্তা করে বলল, "হুজুরআলা, আমিও এখন বুঝতে পারছি, গাঁয়ের সমগ্র কৃষকশ্রেণীর সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখলে সরকারের পক্ষে সেটা লাভজনক হবে। গ্রাম এবং শহরের তাঁতীদের প্রতি সামান্য নজর দিয়েছি আমরা। পঞ্চায়েতকে মজবুত করে তুলতে তাদের সাহায্য করেছি, যাতে বেনে-মহাজনদের লুটের হাত থেকে রেহাই পায় তারা। আগে প্রত্যেক আমলা এদের দিয়ে বেগার খাটিয়ে নিজেদের জন্য কাপড় তৈরী করাত, আমরা সে-সব বন্ধ করে দিয়েছি এখন। আজ তার পরিণাম দেখতে পাচ্ছি —ধুনুরী, তাঁতী আর দর্জির ভিতর এমন লোক এখন আর দেখাই যায় না যারা ইস্‌লামের আওতায় চলে আসেনি।"

"তা'হলে এখন নিজেই দেখলেন তো মোল্লাসাহেব, যে কাজে সাম্রাজ্যের মঙ্গল সাধিত হয়, তাতে ইস্‌লামেরও মঙ্গল!"

"কিন্তু এক বিষয়ে আমার আর্জি আছে জাঁহাপনা! আপনি হলেন আমিরউল্‌—মোমিনীন (মুসলমানদের নায়ক)…"

"সেই সঙ্গে হিন্দুদেরও সুলতান আমি, ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা তো খুব কম, সম্ভবত হাজারে একজন!"

"হিন্দুরা অবিরাম ইস্‌লামের অপমান করে চলেছে এদের এই আচরণ ভবিষ্যতে আরও বেড়ে যেতে পারে। কাজেই এই অপমানকর আচরণ বন্ধ করতে হবে এবং সে কাজটা আপনারই।"

"অপমান ? কেন তারা কি পবিত্র কোরান পদদলিত করেছে ?"

"না, এত বড় সাহস কেমন করে তাদের হবে।"

"তবে কি মস্‌জিদকে অপবিত্র করেছে তারা ?"

"না না, সেও সম্ভব নয় তাদের পক্ষে।"

"তবে কি তারা সারা বাজারময় খোদার রসুলকে গালাগালি দিয়ে বেড়াচ্ছে ?"

"না জাঁহাপনা ! বরং যারাই আমাদের সুফিগণের সংস্পর্শে এসেছে, খোদা-রসুলকে তারা ঋষির মতোই দেখছে। কিন্তু এরা যে আমাদের চোখের সামনে বসেই এদের কাফের ধর্ম পালন করে চলেছে !"

"যখন তাদের কাফের বলেই মনে করেন, তখন তাদের কাফেরোচিত আচরণে আপত্তি কেন ? আমার চাচা সুলতান জালাল্‌উদ্দিন আমার মতো মনস্থির করতে পারেননি যে, নিজেকে তিনি ভারতবর্ষের স্থায়ী শাসক রূপেই গণ্য করবেন, না সমগ্র ভারত মুসলমান না-হওয়া পর্যন্ত এক অস্থায়ী শাসক বলে মনে করবেন। কিন্তু তিনি একবার আপনার মতো এ প্রশ্নকারীকে কি জবাব দিয়েছিলেন জানেন ?"

"না হুজুর-আলা !"

"বলেছিলেন, 'বেওকুফ দেখতে পাওনা আমার মন্‌জিলের সামনে দিয়ে প্রতিদিন হিন্দুরা শাঁখ বাজিয়ে আর ঢোল পিটিয়ে নিজেদের মূর্তিপুজোর জন্য যমুনার তীরে যায়, আমার চোখের সামনেই তারা তাদের কাফের-ধর্মের অনুষ্ঠান করে, আমার এবং আমার শাহী-রোবকে (বাদশাহী মর্যাদা) খাটো করে দেখে, তারা আমার ধর্মের দুশমন (হিন্দু) যারা আমার রাজধানীতে আমারই চোখের সামনে বসে বিলাস-ব্যসনের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে এবং ধন-দৌলত আর উন্নত অবস্থার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে নিজেদের ঠাটঠমক আর অহঙ্কার জাহির করছে। আমার কাছে এ লজ্জার কথা। ধনদৌলত সমস্তই আমি তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। তাই আমি নিজে দান হিসেবে তাদের দেওয়া সামান্য খড়কুটো নিয়েই খুশী রয়েছি।' —আমার মনে হয় এর চাইতে ভালো জবাব আমিও দিতে পারি না।"

"কিন্তু সুলতানে-জমানা, ইস্‌লামের প্রতিও তো সুলতানের কর্তব্য রয়েছে।"

"এমন অপরাধও যে করেছে, যার সাজা হল ফাঁসি, সেও ইস্‌লামের শরণে এলে আমি তার বাঁচাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি, যে গোলাম হয়ে আছে অথচ ইস্‌লাম গ্রহণ করেছে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে দেবার হুকুম দিতে পারি কিন্তু সরকারী খাজনা

থেকে তার খরিদ-মূল্য দিয়ে। এই দেশে কোটি কোটি টাকা গোলাম রাখায় ব্যয় হয়েছে। কাজেই ও ছাড়া সমস্ত গোলামের মুক্তির কথা তো আপনি বলতেই পারেন না।"

"না জাঁহাপনা, গোলাম রাখার ফরমাজ তো আল্লাহ্‌তালাও দিয়েছেন।"

"না, যদি আপনি বলেন তো আমি তখতের বিনিময়েও মুসলমান-অমুসলমান সমস্ত দাস-দাসীর মুক্তির ফরমান জারি করতে পারি!"

"কিন্তু তা'হলে শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ করা হবে।"

"শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কথা ছাড়ুন মোল্লাসাহেব, এই মুহূর্তে আপনি নিশ্চয় কোনো প্রিয় দাসীর কথা ভাবছেন! সবচেয়ে বেশী গোলাম রয়েছে মুসলমানদেরই ঘরে।"

"আল্লাহ্‌তালা মোমিনদের এই অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন!"

"কিন্তু দাস-দাসীরাও যদি মোমিন হয়! তা'হলেও আমার মনে হয় আপনি এই দুনিয়ার মুক্ত হাওয়ায় ওদের নিশ্বাস নিতে দেবেন না এবং বেহস্তের আশায় ওদের বসিয়ে রাখবেন।"

"আমার আর কিছু বলার নেই। ইস্‌লামী সাম্রাজ্যে ইস্‌লামী শরীয়তের শাসন চালু হওয়া উচিত, আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই।"

"কিন্তু এই চাওয়াটুকুই যে বিরাট। এর জন্য ইস্‌লামী সাম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাকেই মুসলমান হতে হবে। আপনাদের সামনে—আপনিও শুনুন ওয়াজির সাহেব, আমার সাফ মতামত। সুলতান মামুদের মতো এক বিদেশী সুলতান জবরদস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে শান্তিপূর্ণ শহরসমূহ লুণ্ঠন করতে পেরেছিল, লুটের মাল উট এবং খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যেতে পেরেছিল, কিন্তু সে রকম কোনো কাজ করা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে দিল্লীতে অধিষ্ঠিত আমার মতো লোকের ক্ষমতার বাইরে। আমার সরকার কায়েম হয়েছে হিন্দু প্রজাদের রাজস্বের ওপর, কায়েম হয়েছে হিন্দু সিপাই, সেনানায়কদের ওপর নির্ভর করে—আমার সেনাপতি হিন্দু; পাঁচ হাজার সৈন্যের সেনানায়ক চিতোরের রাজা আমার সপক্ষে।"

"কিন্তু জাঁহাপনা গোলাম সুলতানও তো দিল্লীতেই থাকতেন।"

"আপনি বাধা দেবেন না! আমাকে চঞ্চল এবং বদমেজাজী বলা হয়, কিন্তু এইসব বিরোধী মতামত শোনা থেকে আমাকে বিরত করতে পারে না। গোলামদের সরকার এক রাতের পাখীর বাসার সামিল ছিল। মোঙ্গলদের সৃষ্ট তুফানে হিন্দুস্থানের ইস্‌লামিক রাজত্ব কোনো মতে বেঁচে গেছে। হিন্দুরা জানত না যে, মোঙ্গলদের মতো দুশমন, মুসলমানেরা কখনও দেখেনি। তারা যদি মোঙ্গলদের সামান্য উৎসাহও দিত তবে ভারতের মাটিতে নতুন ইস্‌লামী সাম্রাজ্য দাঁড়াতেই পারত না। আপনারা জানেন না যে, চেঙ্গিসের বংশ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য চীনের ওপর আধিপত্য করছে!"

"জানি হুজুর-আলা।" —মোল্লা বলল।

"ঐ বংশ বৌদ্ধধর্মকেই অনুসরণ করে।"

"বৌদ্ধধর্ম! এত সব মঠ-মন্দির জালিয়ে, মাটিতে মিশিয়ে দেবার পরও কাফেরদের সাকার স্বরূপ ধর্ম ভারতের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি!"

"কাফেরদের সাকার স্বরূপ ধর্ম কেন?"

"জাঁহাপনা, হিন্দুদের —ব্রাহ্মণদের ধর্মে ও সিরজনহার (স্রষ্টা) আল্লার কথাও কিছু আছে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম তো তাঁকে একেবারেই অস্বীকার করে।"

"চেঙ্গিসের বংশ শুধু আজ নয়, কুবলাই খাঁর সময় থেকেই বৌদ্ধধর্মের বিশ্বস্ত অনুচর বলে মনে করে নিজেদের। শুধু তাই নয় চেঙ্গিসের ফৌজে, মোঙ্গলদের মধ্যে বহু সিপাহ্-সালার এবং সৈন্য ছিল। বুখারা, সমরখন্দ বলখ ইত্যাদি ইস্‌লামী দুনিয়ার শহরগুলোর মুসলমানী সভ্যতার সমস্ত কেন্দ্রকে বেছে বেছে নির্মূল করে দিয়েছে তারা; আমাদের নারীদের উচ্চ-নীচ বংশের বিচার না করে যথেচ্ছভাবে দাসীতে পরিণত করেছে; শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে —আর এই সমস্ত অত্যাচারকে প্ররোচিত করেছিল বৌদ্ধ মোঙ্গলরা। তারা বলত, আরবেরা আমাদের বিহারসমূহ ধ্বংস করেছে, আমাদের এ সবের প্রতিশোধ নিতে হবে। ভেবে দেখুন, যদি মোঙ্গলেরা ভারতীয় বৌদ্ধদের সঙ্গে মিলে হিন্দুদের দলে টানতে পারত তবে ইসলামের অবস্থা কি হত?"

"নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত জাঁহাপনা!"

"এই জন্যই বালুর চরে আমাদের রাজ্যের ভিত স্থাপন করা উচিত নয়, গোলামদের নকল করতেও আমরা পারি না।"

ওয়াজীর এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে ছিল, এইবার সে মুখ খুলল, "সরকার আলী! গ্রামের আমলাদের ক্ষমতা কমে গেলে অতদূর পর্যন্ত সাম্রাজ্য পৌছাবে কি করে?"

"যখন রেশমী-পরা ঘোড়ায়-চড়া আমলারা ছিল না, তখন কি করে কাজ চলত?"

"আমি সে সম্বন্ধে খোঁজ করিনি।"

"আমি করেছি। যখন শাসকেরা নিজেদের লুণ্ঠনকারী বলে মনে করল, তখন তারা লুণ্ঠনকারী আমলা নিযুক্ত করল। সব জায়গায় এমনই হয়, কিন্তু তার আগে সমস্ত গ্রামে পঞ্চায়েত থাকত, পঞ্চায়েত গ্রামের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া থেকে শুরু করে সরকারের রাজস্ব দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থাই করত। গ্রামের কোনো এক ব্যক্তিকে নিয়ে রাজার কোনো দুশ্চিন্তা ঘটত না। সে শুধু পঞ্চায়েতের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখত এবং জানত যে তার এবং খাজনা-দেনেওয়ালা কৃষকের মাঝে সম্বন্ধ স্থাপিত করবার জন্য এই পঞ্চায়েত রয়েছে।"

"তা'হলে জাঁহাপনা, একশ' বছরের বেশী মৃত এই পঞ্চায়েতগুলোকে আবার আমাদের বাঁচিয়ে তুলতে হবে?"

"এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। যদি ইস্‌লামী সাম্রাজ্যকে এ দেশে শক্তিশালী করে তুলতে হয়, তা'হলে সর্বতোভাবে প্রজাসাধরণকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করতে হবে, দিল্লীর সাম্রাজ্যে ইস্‌লামী শরীয়তের জায়গায় সুলতানী শরীয়ত চালু করতে হবে। ইস্‌লামের প্রচার মোল্লাদের কাজ, তাদের আমরা বৃত্তিদান করতে পারি। 'সুফিদেরও কাজ তাই এবং ভালোভাবেই কাজ করে যাচ্ছে তারা। তাদের মঠগুলোকে আমরা নগদ টাকা দিতে পারি অথবা সরকারী খাজনা থেকে রেহাই দিতে পারি।"

২

বর্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও খালবিলগুলি জলে ভরে আছে। বড়-বড় বাঁধ দেওয়া ধানের ক্ষেতে জল জমে আছে, তার ভেতর সবুজ-সবুজ ধানের শিষ দুলছে। চারিদিকে সুদূর বিস্তৃত মগধের সবুজের মাঝখানে বড় হিলসা (পাটনা) গাঁ অবস্থিত, সেখানে কিছু ব্যবসায়ীদের ইঁটের পাকা বাড়ি, বাকি সব কৃষক এবং কারিগরদের খোলা বা খড়ের ঘর। এ ছাড়া ব্রাহ্মণদের কিছু বাড়ি আছে, তাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। হিলসার মন্দিরসমূহ প্রায় একশ' বছর আগে মহম্মদ বিন-বখ্‌তিয়ার খিলজির সৈন্যরাই বিধ্বস্ত করেছিল, তারপর থেকে সেই ভগ্নস্তূপগুলোকে যেখানে-সেখানে পূজা করছে হিন্দুরা। গাঁয়ের পশ্চিম প্রান্তে বৌদ্ধদের মঠ, তার প্রতিমাগৃহ ভেঙে-চুরে গেলেও ঘর এখনও পর্যন্ত বাসযোগ্য। ভিতরে ঢুকে কেউ বলতে পারবে না যে, বৌদ্ধভিক্ষুরা তাদের ছেড়ে চলে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় মঠের বাইরে পাথরের ছোট এক পাটাতনের ওপর আধাবয়সী এক পুরুষ বসে ছিল। বাদামী এক কৌপীনে তার শরীর ঢাকা। মাথা এবং ভ্রূ কামানো গোঁফ-দাড়ি খুব ছোট ছোট —মনে হয় এক সপ্তাহ আগে কামানো হয়েছিল। হাতে কাঠের মালা। দিনটা ছিল আশ্বিনের পূর্ণিমার দিন, গ্রামের নর-নারী সকলে খাবার, কাপড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে এসে কৌপীন-পরা পুরুষের সামনে রেখে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিল। পুরুষটি স্মিত মুখে হাত তুলে আশীর্বাদ করছিল সবাইকে।

এ সব কি? হিলসার পুরনো বৌদ্ধ মঠ নষ্ট হয়ে গেলেও মঠের বাইরের ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার ভাব ঠিকই ছিল। আজ হিলসায় কৌপীনধারী বাবাকে দেখে কি বৌদ্ধভিক্ষু ছাড়া অন্য কিছু বলা যায়! সে অবিবাহিত, তার পূর্বতন চারজন গুরুও অবিবাহিত কৌপীনধারী ছিল। হিন্দু অথবা বৌদ্ধ থেকে মুসলমান হওয়া দশ-পাঁচ ঘর কারিগর একে সন্ন্যাসীর সমাধি বলত; ব্রাহ্মণ এবং কিছু ব্যবসায়ী একে মঠ বলত না, কিন্তু গ্রামের বাকি সকলে এখনও মঠ বলে। এই বাবার আগের সন্ন্যাসীদের কোনো জাতবিচার ছিল না, আর নতুন বাবাগণেরও জাত নেই। এরা কৌপীন পরত, অবিবাহিত থাকত। অসুস্থ হলে এরা ঔষধ-পথ্য দেয়, মরণ ও শোকের সময় এরা অলখ-নিরঞ্জন

নির্বাণের উপদেশ দিয়ে সান্ত্বনা প্রদান করে। এই জন্য আজ শরতের পূর্ণিমার নির্বাণ দিনে লোকে আগের মতোই এই মুসলিম ভিক্ষুদেরও পূজা দেয়। আর কারিগর মুসলমানেরা আগে যেমন বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের আপন পূজ্য গুরু বলে মান্য করত, এখন তেমনি বাবা এবং তার কৌপীনধারী চেলাদের মান্য করে।

মঠের পুরনো মোহান্তদের সমাধিগুলোকে বন্দনা করে গ্রামবাসীরা চলে গেল। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রুপালী চাঁদের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই সময় কারিগরদের ঘরের দিক থেকে দুটো লোকের সঙ্গে একজনকে আঙিনার দিকে আসতে দেখা গেল। কাছে এলে মৌলানা আবুল-আলাইকে বাবা চিনতে পারল। তার মাথায় শাদা পাগড়ি, পরনে লম্বা চোগা, পায়ে জুতোর ওপর পর্যন্ত পায়জামা। তার কালো দাড়ি হাল্কা হাওয়ায় দুলছে। উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত বাড়িয়ে মধুর স্বরে বাবা বলল, "আসুন, মৌলানা আবুল-আলাই। আস্‌-সালাম-আলায়কুম।" মৌলানার শক্ত দুই হাতকে নিজের হাতে নিয়ে তাকে আলিঙ্গন করল।

মৌলানাও অনিচ্ছুকভাবে 'ওয়ালেকুম সালাম' বলল!

তাকে খোলা পাটাতনের কাছে নিয়ে গিয়ে বাবা বলল, "আমার তখৎ এই নগ্ন পাথর, বসুন।" মৌলানা বসবার পর বাবাও বসল, প্রথমে মৌলানাই কথারম্ভ করল।

"শাহ্ সাহেব, যখন এখানে কাফেরদের ভিড় লেগেছিল, তখন আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম সেই তামাসা।"

"তামাসা! একশ' বার বলুন মৌলানা, কিন্তু 'কাফের' বলবেন না আপনি, নূরের হৃদয়ে যেন শরাঘাত হয় এতে।"

"এই হিন্দুরা কাফের নয় তো কি?"

"সকলের ভেতরই ঐ নূর রয়েছে; নূর আর কাফের, আলো আর অন্ধকারের বিবাদের মতো —এরা এক জায়গায় থাকতে পারে না।"

"আপনার এই সমস্ত তসব্বুফ্ (বেদান্ত) ইস্‌লাম নয়, ঐন্দ্রজালিক ভেল্কি।"

"আমরা কিন্তু আপনাদের ভাবধারাকে ইন্দ্রজাল বা ভেল্কি আখ্যা দিই না। আমরা 'এক নদীর বহু ঘাট'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করি। আচ্ছা আপনারা সকল মানুষকেই খোদার সন্তান বলে মনে করেন না?"

"হ্যাঁ, মনে করি।"

"আর এও মানেন তো যে তিনি সর্বশক্তিমান।"

"নিশ্চয়ই।"

"মৌলানা, আমাদের সর্বশক্তিমান মালিকের হুকুম ছাড়া যখন গাছের একটা পাতাও ঝরতে পারে না, তখন আমি বা আপনি আল্লার এই সমস্ত সন্তানকে কাফের বলবার

কে ? আল্লা যদি ইচ্ছা করতেন তা'হলে সকলকেই এক পথে চালাতেন। চান না বলেই সকল পথই সমান প্রিয় তাঁর।"

"শাহ সাহেব, আমাকে আপনার তসব্বুফের মিথ্যাগুলো শোনাবেন না !"

"কিন্তু মৌলানা, এ তো আমি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকেই বলছি। আমরা সুফিরা আল্লা এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই স্বীকার করি না। আমাদের কলমা (মহামন্ত্র) হল, 'অনল-হক্' (আমিই সত্যদেব), 'হাম-ও-স্ত' (সবই ঐ ব্রহ্ম) !"

"এটা কাফেরের ধর্ম।"

"আপনি এ কথা মনে করেন, আগেও অনেকে এমনি মনে করত, কিন্তু সুফিরা আপন রক্ত ঢেলে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতেও করবে।"

"আপনাদের জন্যেই এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না।"

"আগুন এবং তলোয়ারের সাহায্যে তাকে প্রতিষ্ঠা করবার যে প্রচেষ্টা আপনাদের ; তাকে আমরা অন্যায় মনে করেছি ঠিকই কিন্তু তার বিরুদ্ধে তো রুখে দাঁড়াইনি, তবু কতটুকু সাফল্য আপনারা লাভ করেছেন শুনি !"

"আপনারা ওদের ধর্মকেও সত্য বলে মনে করেন ?"

"হ্যাঁ, কারণ মহান্ সত্যকে কুলুঙ্গীতে তুলে রাখার শক্তি নিজের ভিতর অনুভব করি না আমরা, ইস্লাম যদি তার শহীদদের কাছে সত্যি হয়, যদি তসব্বুফ প্রতিভাবান প্রেমিকের কাছে সত্যি হয়, তা'হলে হিন্দুরাও আপনাদের তলোয়ারের নীচে হাসতে হাসতে গর্দান এগিয়ে দিয়ে হিন্দু ধর্মকেই সাচ্চা প্রমাণিত করেছে।"

"হিন্দু-মার্গ সাচ্চা ! হিন্দুদের মার্গ পূবের, আমাদের হল পশ্চিমের, সম্পূর্ণ উল্টো।"

"এতই যদি উল্টো হবে তবে আজ সন্ধ্যায় গ্রামের মুসলমান মঠকে পূজো দিয়ে গেল কেন হিন্দুরা ? আপনি মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুয়ানীর গন্ধ-মাত্র সহ্য করতে চান না মৌলানা ?"

"না, সহ্য করা চলবে না।"

"তা'হলে সধবা মুসলমান স্ত্রীদের সিন্দুর মুছিয়ে দিন গিয়ে।"

"মোছাব।"

বাবা হেসে বললেন, "সিন্দুর মোছাবে ! এই জুম্মন, বল দেখি আমাকে, তোমার বিবি সলিমা কি মেনে নেবে ব্যাপারটা ?"

"না বাবা। মৌলবীসাহেব জানেন না, সিন্দুর শুধু বিধবাদের কপাল থেকেই মোছা যায়।" পাশেই দণ্ডায়মান জুম্মন উত্তর দিল।

বাবা তার কথা বলে যেতে লাগল, "ক্ষমা করুন মৌলানা আবুল-আলাই, আমরা সুফিরা কোনো সুলতানের ভিক্ষা অথবা কোনো আমীরের দয়ার দান নিয়ে এখানে বসিনি। আমরা কৌপীন আর লেংটি পরে এখানে এসেছিলাম। কোনো হিন্দুই

আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করেনি। এই মঠটাকেই ধরুন, আগে এটা বৌদ্ধ-বিহার ছিল। আমার পূর্বতন পঞ্চম গুরু বৌদ্ধ-শ্রমণদের চেলা ছিলেন। তিনি এসেছিলেন বুখারা থেকে এবং বৌদ্ধ শ্রমণদের বেদান্ত দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাদের চেলা হয়েছিলেন। বেদান্তের বাণী সর্বক্ষেত্রেই এক; বাইরের পোশাকের এর কোনো পরিবর্তন হয় না—সে পোশাক বৌদ্ধেরই হোক, হিন্দুর হোক বা মুসলমানেরই হোক। আমাদের ঐ গুরুর পরে এই মঠ মুসলমান নামধারী ফকিরদের জিম্মায় রয়েছে। পোশাক বদলানোর ওপর আমরা কোনো জোর দিইনি, আমরা লোককে প্রেম শিখেয়েছি, যার ফলে দেখতে পাচ্ছেন গ্রামের খুব কম লোকই আমাদের ঘৃণা করে দূরে সরে থাকে। পণ্ডিতগণের মধ্যে জড়তা ছিল, প্রেমের পথ তারা চিনতে পারেনি, আপনারাও যেমন চিনতে পারছেন না আজ—আর এই জন্যেই জুম্মনের বাপ-দাদাকে হিন্দুর বদলে মুসলমান নাম ধারণ করতে হয়েছিল, তাই এদের কাছে আপনাদের খাতির রয়েছে!"

৩

চৈত্র মাস শেষ হয়ে গিয়েছে। গাছে নতুন পাতা গজিয়ে উঠেছে। এ বছর খুব আম হয়েছে, আম গাছগুলোতে তাই পুরনো পাতাই রয়ে গেছে। নীচে খামারের উঠোন। সেখানে দুপুরের গরম আবহাওয়ার মধ্যেও দু'জন কৃষক মাড়াই করছে। এমন সময় একজন পরিশ্রান্ত পথিক ঘর্মসিক্ত হয়ে খামারের এক গাছের নীচে এসে বসল। তার মুখচোখের চেহারা দেখে তাকে ভিনদেশী বুঝতে পেরে মঙ্গল চৌধুরী তার কাছে এসে বলল, "রাম রাম ভাই, এই রোদ্দুরে হাঁটা যথেষ্ট শক্তির কাজ!"

"রাম রাম ভাই! কিন্তু পথ চলতে যাকে হবেই, তার রোদ্দুর-ছায়ার বিচার করবার সময় কই?"

"জল খাও ভাই, তোমার যেন মুখ শুকিয়ে গেছে, ঐ ঘটিতে ঠাণ্ডা জল রয়েছে।"

"কি জাত তোমরা?"

"আহীর। মঙ্গল চৌধুরী আমার নাম।"

"চৌধুরী, আমি ব্রাহ্মণ, কুয়োটা দেখিয়ে দাও আমাকে।"

"যদি আমার ছেলেকে দিয়ে জল আনাই—তা'হলে হবে না পণ্ডিতজী?"

"তাই দাও পাঠিয়ে, বড্ড শ্রান্ত হয়ে পড়েছি।"

"ঘীসা, এদিকে আয় তো বাবা।"

মাড়াই বন্ধ রেখে মঙ্গল চৌধুরী গুড় আর কুয়ো থেকে টাট্‌কা জল নিয়ে আসতে বলল ছেলেকে। এদের কাছে জিজ্ঞেস করে পথিক জানতে পারল, দিল্লী এখান থেকে বিশ ক্রোশ দূর; কাজেই আজ আর সে পৌছাতে পারবে না। মঙ্গল চৌধুরী অত্যন্ত রসিক লোক। চুপ করে থাকাই তার পক্ষে সবচেয়ে মুস্কিলের ব্যাপার।

চৌধুরী বলল, "আমাদের এখানে এ বছর ভগবানের কৃপায় চমৎকার ফসল হয়েছে। বৈশাখে ফসল কাটা কঠিন ব্যাপার হবে। ওখানে ফসলের অবস্থা কি পণ্ডিতজী?"

"ফসল মন্দ হয়নি চৌধুরী!"

"রাজা ভালো হলে দেবতারাও খুশী হয় পণ্ডিতজী! যখন থেকে নতুন সুলতান তখতে বসেছে তখন থেকেই প্রজারা বেশ সুখে আছে।"

"তুমি কি সেই রকমই দেখছ, চৌধুরী?"

"আরে, এই খামারের তো কিছুটা দেখছি। দু'বছর আগে এসে দেখতে পেতে এর চার ভাগের এক ভাগ ফসলও হয়নি।"

"তা'হলে উন্নতি হয়েছে, চৌধুরী!"

"উন্নতি হয়েছে সুলতানের কৃপাতেই পণ্ডিতজী। আগে আমরা কিষাণরা না খেয়ে, না-পরে মরতাম আর কয়েকটা বদ লোক রেশমী পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াত। গম এতটুকু হতে না হতেই তাদের ঘোড়া আমাদের ক্ষেতে এসে হাজির হত। কে প্রতিবাদ করবে? আমাদের গ্রামগুলোর তো ওরাই ছিল সুলতান!"

এই সময় মঙ্গল চৌধুরীর মতোই হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, গায়ে এক ময়লা ফতুয়া, মাথায় চাপা শাদা-টুপি পরিহিত অপর এক চৌধুরী এসে পড়ল এবং ওদের দু'জনের কথার মাঝেই বলে উঠল, "আরে এখন দেখছ তো চৌধুরী, কোথায় চলে গেল তাদের সেই বিরাট ক্ষমতা! এখন ব্যাটারা আবার দান পাবার আশায় বসে আছে। আমাকে বলছিল সেই ব্রাহ্মণ—কি যেন নাম তার, চৌধুরী?"

"সিব্বা।"

"এখন কেন সিব্বা বলছ, সে সময় তো পণ্ডিত শিবরাম বলতে! বলছিল, 'চৌধুরী ছেদারাম, দু'মণ গম দাও, হাতে পয়সা হলে দাম দেব।' মুখের ওপর তো না বলা যায় না, কিন্তু আমার তখনকার কথা মনে পড়ল, যখন এই ব্রাহ্মণটা ভদ্রভাবে কথাও বলতে জানত না। 'আরে ছিদ্দে' ছাড়া অন্য কোনো রকম সম্ভাষণ তার মুখ থেকে শুনিনি।"

"আর এখন? তুমি হলে চৌধুরী ছেদারাম, আর আমি চৌধুরী মঙ্গলরাম। 'মঙ্গে' আর 'ছিদ্দে' থেকে কোথায় চলে এসেছি আমরা আড়াই বছরের মধ্যে।"

"আমি বলব, এ সবই সুলতানের দয়া, তা না হলে আমরা সেই 'মঙ্গে' আর 'ছিদ্দে'ই রয়ে যেতাম।"

"সেই কথাই তো আমি বলছিলাম পণ্ডিতজীকে। আমাদের পঞ্চায়েতও ফিরে পেতাম না আমরা, দিনও চলত না আমাদের।"

"চৌধুরী মঙ্গলরাম, তুমি কলম ধরতে জানো না, অথচ তুমি গ্রামের পঞ্চায়েতের সব কাজকর্ম চালাও। আমলাদের কথা ছেড়ে দাও, এইসব বানিয়ারাও এক টাকা

দিয়ে দু' টাকার ফসল তুলে নিয়ে যেত। জ্যৈষ্ঠ মাস পার হতে না হতেই আমাদের ঘরে ইঁদুর চরে বেড়াত!"

"আমরা তো তাই বলছি, আমাদের সুলতান লক্ষ বছর বেঁচে থাকুক।"

ব্রাহ্মণ পথিক অজ্ঞ আহীরদের মুখে এই তারিফ শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু একটা বলার সুযোগ খুঁজতে লাগল সে। গুড় আর জল খাওয়ার পর সে আরও উতলা হয়ে উঠল! চৌধুরীদের কথা শেষ হচ্ছে না দেখে মাঝখানেই সে বলে উঠল, "সুলতান আলাউদ্দিন তোমাদের পঞ্চায়েত ফিরিয়ে দিয়েছে…"

"হ্যাঁ পণ্ডিত, তার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। কিন্তু পণ্ডিত, জানি না কে আমাদের সুলতানের নাম অলাভদীন দিয়েছে। আমরা তো নিজেদের গাঁয়ে লাভদীন বলি তাকে!"

"তোমাদের যা খুশী নাম রাখ চৌধুরী! কিন্তু জানো, সুলতান হিন্দুদের ওপর কি ভয়ানক অত্যাচার করছে?"

"আমাদের মেয়েরা গায়ে চাদর না দিয়েও রাত দিন বুক ফুলিয়ে ক্ষেতে-খামারে ঘুরে বেড়ায়। কই, কেউ তো তাদের টেনে নিয়ে যায় না!"

"ইজ্জতওয়ালা ঘরের ইজ্জত নষ্ট করে তারা।"

"তা'হলে আমরা হলাম সব বেইজ্জতওয়ালা কিন্তু তোমাদের সেই চোখামারা ইজ্জত-ওয়ালা কারা, পণ্ডিত?"

"তুমি অভদ্রভাবে কথা বলছ, চৌধুরী মঙ্গলরাম!"

"কিন্তু পণ্ডিত, তোমার বোঝা উচিত যে, যখন থেকে আমরা পঞ্চায়েত ফিরে পেয়েছি, তখন থেকে আমাদের ইজ্জতও ফিরে এসেছে। এখন আমরা বুঝি, বড়-বড় আমলার দল কেমন করে ইজ্জতদার হয়ে উঠেছিল। হিন্দু-হিন্দু, মুসলমান-মুসলমান, কিন্তু যারাই আমলা হয়েছে, তারা সকলেই অত্যাচারী, তা'ছাড়া তাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু।"

চৌধুরী ছেদারাম বলে উঠল, "আমাদের বলা হয় হিন্দু-মুসলমান —এরা দু'জাত আলাদা। কিন্তু দেখনি চৌধুরী, নিজেদের হিন্দু-ব্রাহ্মণ-বলা এইসব লোকেরা নিজেদের বৌদের সাত-পর্দায় ঢাকা বেগম বানিয়ে রাখছে।"

"হ্যাঁ! অথচ আমার ঠাকুর্দা বলত যে, কনৌজ এবং দিল্লীর রাণীকে খোলা মুখে ঘোড়ায় চড়তে দেখেছে।"

ব্রাহ্মণ বলল, "কিন্তু চৌধুরী, সে সময় আমাদের ইজ্জত নষ্ট করবার মতো কোনো মুসলমান এ দেশে ছিল না।"

"আজও আমাদের ইজ্জত ক্ষেতে-খামারে ঘুরে বেড়ায়, কেউ নষ্ট করে না তাকে।"

"আর যদি কখনও নষ্ট হয়ে থাকে তো সে ঐ ব্রাহ্মণ সিব্বাদেরই চালে।"

"বেকার বসে-খাওয়া এইসব লোক অন্যের ইজ্জত নষ্ট করা ছাড়া আর কি করবে!"

"এ হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন নয় পণ্ডিত, এ হল যারা পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায় তাদের কাজ। পাকা হিন্দু আমরাই পণ্ডিত। আমাদের মেয়ে-বউরা কোনোদিন সাত-পর্দার আড়ালে থাকবে না।"

ব্রাহ্মণ আর একবার সাহস করে বলল, "আরে চৌধুরী, তোমরা তো জানো না, সুলতানের সেনাপতি মালিক কাফুর দক্ষিণে গিয়ে আমাদের মন্দির ভেঙে দিয়েছে, সব দেবমূর্তি পায়ের তলায় গুঁড়িয়েছে।"

"আমরা অনেক শুনেছি পণ্ডিত, একবার নয়, হাজারবার শুনেছি যে মুসলমানী রাজত্বে হিন্দুদের ধর্ম বিপন্ন। কিন্তু আমরা দিল্লীর খুবই কাছে থাকি পণ্ডিত, না হলে হয়ত আমরাও বিশ্বাস করে নিতাম। আমাদের বিশ ক্রোশের মধ্যে তো কোনো মন্দির ভাঙা হয়নি, কোনো দেবমূর্তিকেও পায়ের তলায় মাড়ানো হয়নি।"

"হ্যাঁ, মঙ্গলরাম, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, আমি অনেকবারই দশহরা দেখতে দিল্লী গিয়েছি। কি বিরাট মেলা হয় সেখানে, অর্ধেকের বেশী সেখানে স্ত্রীলোক। হিন্দুদের মেলা, কাজেই মেলার লোক বেশীরভাগই হিন্দু। দেবমূর্তি সাজিয়ে সুলতানের অলিন্দের নীচে দিয়ে নিয়ে শঙ্খ, নাকাড়া আর শিঙা বাজাতে বাজাতে হিন্দুরা যায়।"

"ঠিক কথাই বলেছ ছেদারাম, এ-সব মিথ্যাই। শেঠ নিক্কামল সুলতান-প্রাসাদ থেকে একশ' গজ দূরেই এক বড় মন্দির তৈরী করাচ্ছে। কত লক্ষ টাকা লাগবে কে জানে। গতবারে পাথর আসতে দেখেছিলাম আমি। এ-বারে দেখে এসেছি এক কোমর সমান দেয়াল উঠে গেছে। সুলতানের যদি ভাঙার ইচ্ছাই থাকবে, তা'হলে নিজের চোখের সামনে মন্দির উঠতেই বা দেবে কেন?"

"হ্যাঁ চৌধুরী, রাজায় রাজায় লড়াই হয়; লড়াইতে কেউ কারও অপেক্ষায় থাকে না। আগে কিছু হয়ত হয়ে গেছে, তাই নিয়ে এখন হল্লা বাধানো হচ্ছে। একশ' বছর আগে আমাদের আশে-পাশে এমনি ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু আজ কোথাও কিছু শোনা যায় না।"

"আমার মনে আছে যখন আমরা গ্রামের কয়েকজন লোক হাকিমের তাঁবুতে গিয়েছিলাম, সে বলেছিল, আগের সুলতানেরা এক রাত্রি বাস করতে আসত এখানে, আর এখন আমাদের সুলতান লাভদীন, আমাদের সুখ-দুঃখের চিরসাথী—এই জন্য প্রজাদের লুণ্ঠন করে না সে, বরং তাদের সুখী দেখতে চায়।"

"এখন শুধু এটা চাওয়ার কথা নয় বরং চারিদিকেই লোকেরা সুখী হয়ে উঠেছে।"

৪

দিল্লীর বাইরে এক নির্জন কবর। তার কাছে কিছু নিম এবং তেঁতুলের গাছ জন্মেছে। অগ্রহায়ণের ঠাণ্ডা রাত। কাঠের আগুনের কাছে দু'জন ফকির বসেছিল, এর মধ্যে একজন আমাদের পূর্ব-পরিচিত নুরদীন। দ্বিতীয় ফকির নিজের সাদা দাড়ি এবং গোঁফের

ওপর হাত বুলতে বুলতে বলল, "বাবা, পাঁচ বছরের ভিতর আবার হরিখানায় দুধের নদী বয়ে যেতে আরম্ভ করেছে।"

"ঠিক বলেছ বাবা জ্ঞানদীন, এখন কিষাণদের চেহারা বেশ হাসিখুশী।"

"ক্ষেত-খামার যখন হেসে ওঠে, তখন মুখের চেহারাতেও হাসি ফোটে।"

"আমলারা গেছে, কিন্তু এই বানিয়া-মহাজনেরা মরলে শান্তির বাঁশরী বাজত।"

"প্রচুর লোটে ওরা। আর ওদের এই বড়-বড় মঠ, বড়-বড় মন্দির, সদাব্রত সবই এই লুটের অর্থেই চলছে।"

"জ্ঞানী-ধ্যানী, পীর-পয়গম্বর, মুনি-ঋষি ছাড়া ধর্মের পথে কে চলবে? অথচ তাদের কাছে একটা কম্বল, একটা কৌপীন ছাড়া আর কি থাকে?"

"যতদিন পর্যন্ত গরীবের শ্রমে বড় হওয়া লোক থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষ ভাইভাই হতে পারবে না। আর সুলতানও মানুষে মানুষে শত্রুতা বাড়িয়ে তোলবার একটা যন্ত্র মাত্র, অথচ তার মান-মর্যাদাও জনসাধারণের শ্রম-বিনা টিঁকতে পারে না।"

"সেই দিনের আশায় আমরা থাকব বন্ধু; যেদিন এই সমস্ত গোলকধাঁধাঁর খেলা শেষ হয়ে যাবে এবং পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।"

সুরৈয়া

কাল : ১৬০০ খৃষ্টাব্দ

বর্ষার কর্দমাক্ত বারিধারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সমতলভূমির ওপর দিয়ে মন্থর-গতিতে জলের ধারা গড়িয়ে চলেছে, বেগে ছুটে চলেছে ঢালু জমির ওপর দিয়ে, আর উচ্ছল আবেগে ফুলে উঠে বিস্তৃত পাহাড়ী জলস্রোতের রূপ ধারণ করছে নদী-নালাগুলোর বুকে। বৃক্ষগুলি যেন এখনও পর্যন্ত জলভরা মেঘ ধরে রেখেছে, ওগুলো থেকে এখনও বড়-বড় ফোঁটা ঝরে পড়ছে টুপ্‌টাপ শব্দে। প্রবল বর্ষা এখন গুঁড়ি-গুঁড়ি বর্ষণ ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে।

এক শমীবৃক্ষ থেকে কিছুটা দূরে শ্বেতবসনা এক তরুণী দাঁড়িয়েছিল। তার মাথার ওপর থেকে শাদা চাদর খসে পড়েছে এবং দ্বিধাবিভক্ত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের গভীর অরণ্যানীতে প্রবাহিত গঙ্গার রূপালী ধারার মতোই সিঁথির সরল রেখা দেখা যাচ্ছে। কানের পাশে কুঞ্চিত কালো কুন্তল থেকে এখনও দু-এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। তরুণীর তুষারশুভ্র গম্ভীর মুখমণ্ডল থেকে বড়-বড় কালো চোখ দুটো যেন দূরস্থিত কোনো চিত্রপট নিরীক্ষণ করছে। আজানুলম্বিত রেশমী পোশাক

জলে ভিজে বুকের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে, যার নীচে লাল কাঁচুলীতে বাঁধা সুগোল স্তনযুগল স্পষ্টভাবে উপচে পড়ছে মনোরম ভঙ্গিমায়। সরু কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পায়জামা—তার আঁটোসাঁটো নিম্নাংশে জঙ্ঘা প্রদেশের সুডৌল আকৃতি পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। কর্দমাক্ত শাদা মোজার ওপর লাল রঙ-এর জুতো। জলে ভিজে সে দুটো আরও নরম এবং সম্ভবত হেঁটে চলারই অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে।

একটি তরুণকে তরুণীর দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তার পাগড়ী, আচকান সবই শাদা এবং ভিজে। কাছে এসে সে লক্ষ্য করল তরুণীর দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ। পায়ের শব্দ না করেই তরুণীর পাশে দু'হাত দূরত্বের মধ্যে এসে গেল সে। কিছু দূরে প্রবাহিত নালার কর্দমাক্ত জলধারা তরুণী স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল। তরুণ ভেবেছিল, তার সহচরী এ-বারে তার দিকে ফিরে তাকাবে। কিন্তু এক-এক মিনিটে এক একটা যুগ অতিবাহিত হয়ে চলল, তরুণীর দৃষ্টি তবুও নিশ্চল। কপালের ওপর থেকে গুঁড়ি-গুঁড়ি জলকণাগুলো মুছে ফেলবারও অবকাশ হল না তার। আর অপেক্ষা করতে না পেরে ধীরে ধীরে তরুণীর কাঁধের ওপর তার হাতটি রাখল। তরুণী মুখ ফেরাল, দূর-নিবদ্ধ দৃষ্টি ফিরে এল তার, উজ্জ্বল হয়ে উঠল বড়-বড় কালো চোখ দুটো, রক্ত অধরপুটে মৃদু হাসির রেখা ফুটে বেরুল এবং ভিতর থেকে চিক্‌চিক করে উঠল সুসজ্জিত দন্তবাজি। তরুণের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সে বলল, "তুমি কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কমল ?"

"বহুযুগ থেকে—সেই তখন থেকে, স্রষ্টা যখন সবেমাত্র জলের ভিতর থেকে বিশ্বসৃষ্টি সুরু করেছেন, পৃথিবী যখন তরলাবস্থায় ছিল এবং পর্বত বৃক্ষ বা প্রাণীসমূহের ভার বহন করতে পারার মতো দৃঢ় ছিল না…"

"থাম, কমল! তুমি তো সব সময়ই কাব্য কর।"

"হায় সুরৈয়া, সত্যি কথাই তুমি বলেছ, মনে হচ্ছে আমার অদৃষ্টে কবিতা নেই!"

"সুরৈয়া অন্য কোনো রমণীকে সঙ্গে রাখা পছন্দ করে না।"

"এই হৃদয়ও তো ঐ কথা বলে। কিন্তু, তুমি অমন তন্ময় হয়ে কি ভাবছিলে ?"

"ভাবছিলাম—দূর, বহুদূর—সমুদ্র কত দূরে, কমল!"

"সবচেয়ে কাছে হল সুরাট, এখান থেকে মাত্র এক মাসের রাস্তা।"

"আর এই জল কোথায় যায় ?"

"বাঙলার দিকে। সে আরও অনেক দূর, সম্ভবত দু'মাসের পথ।"

"বেচারা, এই কাদাগোলা জলকে এতটা পথ চলতে হবে! আচ্ছা কমল, তুমি সমুদ্র দেখেছ ?"

"বাবার সঙ্গে একবার উড়িষ্যা গিয়েছিলাম আমি, তখন দেখেছি প্রিয়ে!"

"কি রকম দেখতে ?"

"দিগন্ত-বিস্তৃত এক কালো মেঘ যেন পড়ে রয়েছে সামনে।"

"এই জলধারার অদৃষ্টেও সমুদ্র সন্দর্শন রয়েছে! আচ্ছা ওখানে গিয়েও এর ঘোলা রঙ এমনটিই থাকবে?"

"না সুরৈয়া, ওখানে একটি মাত্র রঙই দেখা যায় —ঘন নীল বা কালো।"

"তুমি যদি নিয়ে যাও তো আমিও একদিন সমুদ্র দেখতে পাই।"

"সুরৈয়া, তুমি আজ্ঞা করলে এই জলের সঙ্গেই যাত্রা করতে আমি প্রস্তুত।"

দু'হাত দিয়ে কমলের গলা জড়িয়ে ধরে তার ভেজা গালে নিজের সিক্ত গাল চেপে ধরল সুরৈয়া, তারপর কমলের উৎফুল্ল চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "সমুদ্রে আমাকে যেতেই হবে, কিন্তু এই জলের সঙ্গে নয় কমল।"

"মলিন জলধারার সঙ্গে নয় —তাই না প্রিয়তমা?"

"মলিন বলছ কেন কমল, আকাশ থেকে যখন পড়ে তখন কি এ মলিন ছিল?"

"না সুরৈয়া, চন্দ্রসূর্যের চেয়েও তখন নির্মল ছিল। তোমার ঐ সুন্দর অলকগুচ্ছ কেমন উজ্জ্বল করে তুলেছে এই জলের ধারা। চাঁদের মতো শুভ্র তোমার দুটো গাল কেমন মনোরম করে তুলেছে! আকাশ থেকে সোজা তোমার যে-সব অঙ্গে পড়েছে, সে সমস্ত স্থানেই তোমার সৌন্দর্যকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে।"

"তা'হলে তো এর এই মলিনতা নিজস্ব নয়। সাগর সঙ্গমের যাত্রাপথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে যে, তারই সঙ্গে সংঘর্ষে এই মলিনতা প্রাপ্ত হয়েছে। সোজা সাগরের জলে ঝরে-পড়া ফোঁটাগুলোও কি এমনি মলিন হয় কমল?"

"না প্রিয়তমা।"

"এই জন্যই তো এই মলিনতাকে আমি এর দোষ মনে না করে ভূষণ বলেই মনে করি। তুমি কি বল কমল?"

"তোমার অধর আমার মনের কথাকেই ব্যক্ত করছে সুরৈয়া।"

২

আকাশের নীলিমার ছায়া সরোবরের অতল জলরাশিকে আরও নীল করে তুলেছে। অমল-ধবল শ্বেত পাথরের ঘাট আরও যেন সাদা হয়ে উঠেছে এই নীলিমার পটভূমিকায়। সবুজ দূর্বা ঘাসের মধ্যে সূক্ষ্মপত্রযুক্ত সবুজ বৃক্ষরাজি বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল। বিশেষ করে এই বসন্তের মধ্যাহ্নবেলায়। বহু দূর প্রসারী বৃক্ষশ্রেণীর লতা-মণ্ডপ এবং ঝর্ণাধারায় সুসজ্জিত মনোরম উদ্যান। শাহীবাগ আজ তরুণ-তরুণীদের বসন্তোৎসবের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং উন্মুক্ত এই উদ্যানে স্বর্গবিহারীদের মতো তারাও পরমানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পুষ্করিণী থেকে দূরে বাগানের ধারে লালপাথরের ছাউনীর বাইরে চার ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মাথায়ই এক ধাঁচের পাগড়ী —সামনের দিকে কিছুটা প্রসারিত; হাঁটু

পর্যন্ত লম্বা একই রকমের গলাবন্ধ জামা, একই রকমের শাদা কোমরবন্ধনী। সকলের একই রকমের গোঁফ, অধিকাংশই শাদা হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ এরা বাগানের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর এগিয়ে এসে চারদিক-খোলা ছাউনীর নীচে গদীর ওপর বসে পড়ল। চারিদিকে এক অখণ্ড নিঃস্তব্ধতা বিরাজ করছিল, এই বৃদ্ধের দল ছাড়া আর কেউই সেখানে নেই।

নীরবতা ভঙ্গ করে একজন বলে উঠল, "বাদশাহ্ সালামত!..."

"কি ব্যাপার ফজল, এখনও কি আমি দরবারে অধিষ্ঠিত রয়েছি? আমি কি কখনও সাধারণ মানুষের মতো সহজভাবে থাকতে পারি না?"

"ভুলে যাই..."

"নাম ধরে ডাকো —বল জালাল বা আকবর, না হয় শুধু বন্ধু বল!"

"এ বড় মুস্কিল বন্ধু জালাল, দু'রকমের জীবনযাপন করতে হয় আমাদের।"

"দু'রকম নয়, চার রকম ভাই ফজলু!"

"ভাই বীরু! তোর তারিফ করি আমি, সব সময়েই যেন সমস্ত কিছুর জন্য তৈরী থাকিস তুই, আমি তো যখন এক দুনিয়া থেকে অন্য দুনিয়ায় চলে আসি তখন মনটাকে তৈরী করে নিতে অনেক সময় লেগে যায়। কি ভাই টোডর, ঠিক বলিনি?"

"হ্যাঁ ভাই ফজলু, আমিও তাজ্জব বনে যাই, কি অদ্ভুত মগজ ওর..."

"বীরবলকেই হিন্দুস্থানের সমস্ত লোক ভারতের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্ণধার বলে জানে!"

"কিন্তু টোডরমলও তো তাই! সেও কি সব জায়গায় পর্যবেক্ষণ চালায়নি?"

বীরবল, "চালাক বা না-চালাক, দুনিয়া আমার কথাই জানে, আর আমার এই মগজের প্রশংসা আমাদের জল্লুও করে।"

আকবর, "নিশ্চয়ই, আর এ ব্যাপার শুধু সেই সব কাহিনীতেই শেষ নয়, বাদশাহ্ জালালুদ্দিন আকবরের বিভিন্ন বেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো সম্বন্ধে যা প্রচলিত।"

বীরবল, "এ এক চমৎকার স্মৃতি মনে করিয়ে দিলে জল্লু ভাই। ঐ কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমিও মারা যেতে বসেছি। বীরবল এবং আকবরের নামে যে কোনো রকমের কাহিনী রচনা করে বলে বেড়ানো এক সখের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন বহু কাহিনী আমি জমিয়ে ফেলেছি —প্রত্যেকটির জন্য আমি এক-এক আশরফি মূল্য ধার্য করেছি।"

আকবর, "এই আশরফির জন্যে কাহিনীগুলো তোমার মগজ থেকেই সোজা বেরিয়ে আসে না তো?"

বীরবল, "হতে পারে, কিন্তু তাতে কোনো তফাৎ নেই। সে ক্ষেত্রেও তো এ কথা বোঝা যাবে যে, কি রকম সব অর্থহীন কাহিনী আমাদের দু'জনের নামে রটানো হচ্ছে। রাগ করিস না ফজলু ভাই, শেঠ ছদামীমলের মতো আমি কঞ্জুষ নই।"

আবুল ফজল, "না রে বীরু, আমার ওপর মিছামিছি রাগ করিস না, তোর গল্পগুলোকে ভাই বড় ভয় করি আমি।"

বীরবল, "হাঁ, আমিই আইন-ই-আকবরীর মতো পুথি লিখে রেখে দিয়েছি কিনা!"

আবুল ফজল, "আইন-ই-আকবরী পড়ার মতো ক'টা লোক পাওয়া যাবে, আর রবলের গল্পগুলোকে মুখে মুখে ছড়াবার লোকই বা কত হবে?"

টোডরমল, "এ তো বীরু নিজেও জানে।"

আবুল ফজল, "যাহোক্। তোমার আশরফিওয়ালা গল্প শোনাও বীরু!"

বীরবল, "কিন্তু তোমরা সকলে তো প্রথমেই ধরে নিয়েছে যে, এ গল্প আশরফি দিয়ে কিনিনি আমি, আমার নিজের মগজ থেকেই বেরিয়েছে।"

আকবর, "কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা জাল সে আমরা বুঝতে পারি।"

বীরবল, "যেন আমার সব গল্পের ওপরেই ছাপ মারা আছে! বেশ, যা তোমাদের মর্জি। গল্প তো শুনিয়ে দিই আমি। তবে গল্পের সারাংশটুকুই বলব শুধু—

"আকবরের একবার খুব সখ হল হিন্দু হবার। বীরবলকে সে এই কথা জানাল; বীরবল বড়ই বিপদের মধ্যে পড়ল। বাদশাহকে সে না করতেও পারে না, অথচ তাকে হিন্দু বানাবার ক্ষমতাই বা তার কোথায়? দিন কয়েক গা ঢাকা দিয়ে থাকল। একদিন সন্ধ্যায় বাদশাহ-মঞ্জিলের খিড়কির কাছে 'হিছ—ছো—ও', 'হিছ—ছো—' করে জোর আওয়াজ হতে লাগল। বাদশাহ-মঞ্জিলের এই দিকটাতে এমন সময় কখনও কাপড় কাচার শব্দ শোনা যায় না। কৌতূহল বেড়ে গেল বাদশাহর। এক মজুরের পোশাক পরে যমুনাতীরে এল। পোশাক যতই বদলাক, বীরুর চোখে ধরা না পড়ে পারল না। সে যাহোক ওখানে কাপড় আছড়ানো হচ্ছিল না, মোটাসোটা এক গাধাকে সোডা-সাবান দিয়ে রগ্‌ড়ে ধোয়া হচ্ছিল।"

"মুচকি হাসিটুকু লুকিয়ে গলার আওয়াজ বদলে বাদশাহ জিজ্ঞেস করল, 'কি করছ হে চৌধুরী'?"

"নিজের কাজ করছি ভাই, তোর কি দরকার তা দিয়ে?"

"বড় অসময়ে ঠাণ্ডায় হাওয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌধুরী —অসুখ করবে।

"মরতে তো হবেই, কালই একে ঘোড়া বানিয়ে বাদশাহের কাছে না দিতে পারলে"

"গাধাকে ঘোড়া বানিয়ে?"

"কি করা যাবে, এই হল বাদশাহের হুকুম!"

"বাদশাহ এ বার হেসে উঠে স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'চল বীরবল, আমি বুঝতে পেরেছি যে, মুসলমানের হিন্দু হওয়া গাধার ঘোড়া হবারই সামিল'।"

"ভাই ফজল, এই গল্প শুনে মনে হল, যেন আমার দেহের ভেতর সাপ ঢুকেছে।"

আকবর, "জীবন সায়াহ্নে এসে আমাদের এইসব গল্প শুনতে হচ্ছে! আমাদের সারা জীবনের একাগ্র সাধনার পরিণাম কি শেষে এই দাঁড়াবে!"

আবুল ফজল, "আমরা শুধু আমাদের কালের ঝক্কিই বহন করতে পারি, কিন্তু আমাদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করছে বসন্তোৎসবরত ঐ সব যুবক যুবতীদের ওপর।"

টোডরমল, "কিন্তু আমরা মুসলমানকে হিন্দু বা হিন্দুকে মুসলমান বানাতে চাইনি।"

আবুল ফজল, "আমরা দু'জনকেই এক করে দেখতে চেয়েছি—এক জাতি এক প্রাণ বানাতে চেয়েছি।"

বীরবল, "মোল্লা আর পণ্ডিতেরা কিন্তু আমাদের ধারায় চিন্তা করে না। আমরা চাই ভারতবর্ষকে শক্তিশালী রূপে দেখতে। ভারতের অস্ত্রে তীক্ষ্ণতা আছে, ভারতীয় মস্তিষ্কে প্রতিভা রয়েছে, যুবকদের রয়েছে সাহস। কিন্তু ভারতবর্ষের দোষ, ভারতের দুর্বলতা হল তার ভিতরকার অনৈক্য; তার বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার প্রবণতা।"

আকবর, "এই তো আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল বন্ধু, এতদিন পর্যন্ত আমরা এরই জন্যে সংগ্রাম করে এসেছি। আমরা যে সময় কাজ আরম্ভ করি—চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন তখন, কিন্তু এখন তো আর তা বলা চলে না। এক পুরুষে যতটা করা সম্ভব আমরা সেটা যথাযথভাবে করেছি। কিন্তু এই গাধা-ঘোড়ার গল্প আজ পাথরের মতো চেপে বসেছে আমার অন্তরে।"

আবুল ফজল, "ভাই জালাল, নিরাশ হওয়াও আমাদের উচিত নয়। বৈরাম খাঁয়ের সময়ের সঙ্গে তুলনা কর আজকের। সে সময় কি যোধাবাই তোমার স্ত্রী হয়ে হারেমে বসে বিষ্ণুর মূর্তি পূজা করতে পারত?"

আকবর, "তফাৎ সত্যিই আছে ফজল, কিন্তু লক্ষ্যে পৌছাতে হলে এখনও বহু দূর যেতে হবে আমাদের। ফিরিঙ্গি পাদরীদের কাছে আমি শুনেছি, তাদের দেশে সবচেয়ে বড় বাদশাহও একটির বেশী স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে পারে না। এই প্রথা আমার কত ভালো লেগেছে, তা সেই সময়ের আমার কথাবার্তা থেকে তুমি বুঝে থাকবে টোডর। আমিও যদি এ দেশে এমন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারতাম! কিন্তু এ বড় বিড়ম্বনার কথা যে, মন্দ কাজ করবার স্বাধীনতা বাদশাহের যতটা আছে, ভালো কাজের সময় ততটা নেই। যদি সম্ভব হত তবে সেলিমের মা ছাড়া আর কাউকে আমার হারেমে রাখতাম না। এ ব্যবস্থা যদি সেলিমের জন্য করতে পারতাম আজ!"

বীরবল, "প্রেম কেবল একজনের সঙ্গেই হতে পারে জালাল। মনোহর হংস-দম্পতি যখন দেখি, তখন বুঝতে পারি তাদের জীবন কত সুন্দর। আনন্দের দিনে যেমন পরস্পরের সাথী ওরা, বিপদের দিনেও ঠিক তেমনি।"

আকবর, "আমার চোখ থেকেও একবার জল ঝরেছিল বীরু ভাই! সে-বার সিংহ শিকারে গুজরাট গিয়েছিলাম। হাতীর পিঠে চড়ে বন্দুকের সাহায্যে সিংহ মারা কোনো বাহাদুরীর কাজ নয়। এ কথা আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করব —সিংহের মতো থাবা এবং নখ যখন তোমার নেই, তখন ঢাল-তলোয়ার নিয়ে তার সামনে এগোতে পার তুমি, এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী অস্ত্র নেওয়া বীরত্বের পরিচায়ক নয়। আমি কিন্তু বন্দুকের সাহায্যেই সিংহটিকে মারলাম। গুলি ওর মাথায় গিয়ে লাগল, আর্তনাদ করে সেখানেই পড়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল তার সিংহিনী। অপরিসীম ঘৃণার দৃষ্টিতে সে একবার আমার দিকে তাকাল, পরক্ষণেই মৃত সিংহের গাল চাটতে লাগল। তৎক্ষণাৎ আমি শিকারীদের গুলি ছোড়া বন্ধ করতে বললাম এবং হাতী ফিরিয়ে আনলাম। আমার মনে সেদিন এত বড় আঘাত লেগেছিল যে, সিংহিনী যদি হামলাও করত আমার ওপর তবু হয়ত বন্দুক তুলতাম না আমি। বহুদিন পর্যন্ত বেদনাভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি এবং সেই সময়েই বুঝতে পেরেছি যে, ঐ সিংহের যদি হাজার-পাঁচশ' সিংহী থাকত, তবে অমন করে সেদিন গাল চাটত না কেউ।"

আবুল ফজল, "আমাদের দেশকে কত দূর পথ অতিক্রম করতে হবে, অথচ আমাদের গতি কি মন্থর! তা'ছাড়া এও তো আমাদের জানা নেই যে, আমরা অসমর্থ হয়ে পড়লে আমাদের ভার বহন করবার মতো কেউ রয়েছে কিনা!"

আকবর, "আমি চেয়েছিলাম হিন্দু, মুসলমান দুই জাতির মধ্যে রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হোক। এই সম্পর্কের কথা স্মরণে রেখেই প্রয়াগে ত্রিবেণী তটে কেল্লা তৈরী করিয়েছি আমি। গঙ্গা-যমুনা ধারার এই সঙ্গম আমার অন্তরেও এক বিরাট মিলনের স্পৃহা জাগ্রত করে তুলেছে। কিন্তু কত সামান্য সফলতা লাভ করেছি তা এখনও দেখতে পাচ্ছি না। বস্তুত যে কাজ শুধু বংশ পরম্পরাই অনুষ্ঠিত হতে পারে, এক পুরুষের মধ্যে তাকে গড়ে তোলা যায় না। কিন্তু একটা বিষয়ে চিরকালই আমার গর্ব থেকে যাবে যে, আমি যেমন বন্ধু পেয়েছি, তেমন বন্ধু খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। আকবর আর যোধাবাই মেহেরুন্নিসার মতো মিশ্র বিবাহ ঘরে ঘরে দেখতে চাই আমি। অথচ এমন আর একটিও দেখতে পেলাম না।"

টোডরমল, "হিন্দুরাই এ বিষয়ে বেশী পশ্চাৎপদ বলে প্রমাণিত হয়েছে।"

বীরবল, "আর এখন তারা গাধাকে ঘষে-মেজে ঘোড়া বানাবার গল্প তৈরী করছে। কিন্তু, হিন্দু মুসলমানে যদি এতই তফাৎ থাকবে, তো ঘোড়া গাধা হয়ে যাচ্ছে কি করে! হাজার হাজার হিন্দুকে মুসলমান হয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে না কি?"

আকবর, "আমি তো সব সময়েই এটা দেখব বলে অপেক্ষা করে আছি যে, হিন্দু তরুণরা নাম এবং ধর্ম ত্যাগ না করেই মুসলমান তরুণীদের বিয়ে করুক।"

আবুল ফজল, "এখানে আমি তবে একটা সুসংবাদ শোনাই জালাল! আমরা যে কাজ করে উঠতে পারিনি, আমার সুরৈয়া সে কাজ করেছে।"

সকলে উৎসুক নয়নে আবুল ফজলের দিকে তাকাল।

"তোমরা আরও কিছু শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছ তো? আমাকে একটু বাইরে থেকে আসতে দাও" —বলে আবুল ফজল বাইরে গিয়ে থামের পাশে দাঁড়িয়ে কি দেখল, তারপর ফিরে এসে বলল, "শোনার চেয়ে চোখে দেখাই ভালো, এস আমার সঙ্গে।" সকলে থামের কাছে গেল। অশোক গাছের নীচে পাথরের ওপর উপবিষ্ট যুগল মূর্তির দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে আবুল ফজল বলল, "ঐ দেখ আমার সুরৈয়াকে।"

টোডরমল, "আর ঐ আমার কমল! দুনিয়া আর আমাদের কাছে অন্ধকার নয় ফজলু ভাই" —বলে টোডরমল দু'হাতে আবুল ফজলকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করল।

এরা দু'জন যখন আলিঙ্গন-মুক্ত হল, তখন চার জনেরই চোখে জল। আকবর মৌনতা ভঙ্গ করে বলল, "তরুণদের এই বসন্তোৎসবের ব্যবস্থা অনেক বছর হতেই আমি করেছি। কিন্তু এত বছর পরে আজই প্রথম আসল বসন্তোৎসবের অনুষ্ঠান হল। আমার মন চাইছে, ওদের দু'জনকে ডেকে কপালে আশিস-চুম্বন দিয়ে দিই আমি। ওরা যদি জানে যে, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের মতো ওদের ঐ মধুর মিলনকেও অন্তরের সঙ্গেই সমর্থন করি আমরা, তবে খুবই ভালো হয়।"

আবুল ফজল, "সুরৈয়া জানে, তার বাপ-মা এই প্রণয়কে সুখের বলে মনে করে।"

টোডরমল, "কমল সেটা জানে না। কিন্তু তুমি বড় ভাগ্যবান ফজলু। কারণ সুরৈয়ার মা তোমার সঙ্গে একমত। কমলের মা এবং সুরৈয়ার মা —দু'জনে যদিও অন্তরঙ্গ সখি, তবুও কমলের মা কিন্তু কিছুটা প্রাচীনপন্থী, যাহোক, তাতে ক্ষতি নেই। কমল আর সুরৈয়াকে আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করব।"

আকবর, "সবচেয়ে আগে আমাকেই আশীর্বাদ করতে দেওয়া উচিত।"

বীরবল, "আর আমাকে তোমার সঙ্গে নেবে না জল্লু?"

আকবর, "নিশ্চয়ই, এমন ধোবী কোথায় পাওয়া যাবে?"

বীরবল, "আর এমন ঘোড়া বনে যাওয়া গাধাই বা কোথায়!"

আকবর, "আমাদের এই মিলন আজ কত মধুর। মাসে একদিনও যদি এমন আনন্দ লাভ করা যেত!"

৩

ছাদের ওপর চারিদিকে দরজাযুক্ত এক সুসজ্জিত কামরা। কামরার ভেতরের দিকটায় ছাদ থেকে লাল, সবুজ, সাদা, ঝাড় টাঙানো। দরজাগুলোতে দু'পাল্লা করে পর্দা দেওয়া। ভেতরের দিককার পর্দাগুলো বুটিদার গোলাপী রেশমের। মেঝের ওপরও সুন্দর

ইরাণী গালিচা পাতা। কামরার মাঝখানে সাদা গদির ওপর অনেকগুলো তাকিয়া বালিশ। গদির ওপর বসে দু'টি তরুণী দাবা খেলছে। এদের মধ্যে একজন আমাদের পূর্ব পরিচিত সুরৈয়া। আর লাল ঘাঘরা, সবুজ চেলী এবং হলদে ওড়না পরা অপর তরুণীটি বীরবলের তের বছরের কন্যা ফুলমতী। তারা খেলার চাল দেবার চিন্তায় এত মগ্ন হয়ে আছে যে, গদির ওপর এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ শুনতে পেল না। "সুরৈয়া!" —ডাক শুনে দু'জনেই চোখ তুলে তাকাল এবং তারপর উঠে দাঁড়াল। "কাকিমা" —বলে উঠে দাঁড়াল সুরৈয়া, আর কমলের মা তার গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমু দিল। সুরৈয়ার মা বলল, "তোর জন্যে রঙিন মাছ নিয়ে এসেছে কমল —যা পুকুরে ছেড়ে আয়। ততক্ষণ আমি মুন্নীর সঙ্গে খেলছি।"

"মুন্নী বড় হুঁসিয়ার মা, আমাকে দু'বার মাত করে দিয়েছে। ছোট মেয়ে বলে ওকে উড়িয়ে দিয়ো না" —এই বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুরৈয়া।

প্রাসাদের পিছনের দিককার বাগানে পুকুরের ধারে কমল দাঁড়িয়ে ছিল। তার সামনে নতুন এক মাটির হাঁড়ি। কাছে এসে নিজের হাতের মধ্যে কমলের হাত নিয়ে সুরৈয়া বলল, "লাল আর গোলাপী মাছ নিয়ে এসেছ কমল?"

"হ্যাঁ, সোনালী রঙেরও এনেছি।"

"দেখি একবার" —বলে সুরৈয়া সামনে ঝুঁকে হাঁড়িটা ঝাঁকাতে লাগল।

"এগুলোকে আমি পুকুরে ছেড়ে দিচ্ছি, সেখানে থাকলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে। পুকুরের স্বচ্ছ জলের মধ্যে ওগুলোকে দেখ সুরৈয়া।"

ঠোঁটে এবং চোখে হাসি ফুটিয়ে পুকুরের কাছে এসে দাঁড়াল সুরৈয়া। কমল হাঁড়ি উপুড় করে মাছগুলো পুকুরে ছেড়ে দিল। পুকুরের স্বচ্ছ জলে তাদের লাল, গোলাপী, সোনালী রঙ সত্যিই বড় সুন্দর মনে হতে লাগল। কমল গম্ভীর স্বরে বোঝাতে লাগল, "এগুলোকে আমি পুকুরে ছেড়ে দিলাম, এখানে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে। এখনও এগুলো ছোট সুরৈয়া, কিন্তু বয়স হলেও ছয় আঙুলের বড় হবে না।"

"কিন্তু দেখতে বড় সুন্দর কমল।"

"এই দেখ সুরৈয়া —এটার কি রঙ বলতে পার?"

"গোলাপী।"

"ঠিক যেমন তোমার দুটি গাল।"

"ছোটবেলায় তুমি এমনি করেই বলতে, কমল।"

"ছোটবেলায় সুরৈয়াও যে ঠিক এমনিই ছিল।"

"ছেলেবেলায় তোমাকে বেশ মিষ্টি লাগত কমল।"

"আর এখন?"

"এখন খু—উ—ব মিষ্টি।"

"আগের চেয়ে বেশী! কেন?"

"কেন জানি না, যখন থেকে তোমার গলার স্বর বদলাতে লাগল, তোমার ঠোঁটের ওপর সূক্ষ্ম কালো গোঁফের রেখা দিতে লাগল, মনে হয় তখন থেকেই আমার প্রেম গভীর হয়ে উঠল আরও।"

"আর তখন থেকেই কমলকে দূরে-দূরে রাখতে আরম্ভ করলে তুমি।"

"দূরে? দূরে রাখতে?"

"নয় কেন—আগে আগে কেমন লাফিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলতে।"

"ও সব নালিশের ফিরিস্তি রাখ কমল, তার চেয়ে নতুন কোনো খবর বল।"

"নতুন খবর হল, আমাদের প্রেমের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে।"

"কোথায়?"

"দু'জনের বাড়িতে! আলি হজরৎ বাদশাহ সলামত পর্যন্ত জেনেছেন!"

"বাদশাহ সলামত পর্যন্ত!"

"ভয় পেলে না-কি সুরৈয়া?"

"না, প্রেমের কথা তো একদিন প্রকাশিত হবেই। কিন্তু এখনই কি করে হল?"

"এত কথা আমিও জানতাম না, কিন্তু শুনেছি কাকা-কাকিমাই একে প্রথম সমর্থন জানিয়েছেন, তারপর বাবা এবং বাদশাহ সলামত এবং সকলের শেষে মা।"

"মা?"

"মা'র সম্বন্ধে সকলের ভয় ছিল। জানো তো, মা বড় প্রাচীনপন্থী?"

"কিন্তু এখনও আমার গালের ওপর থেকে কাকিমার চুমুর দাগ মোছেনি!"

"হ্যাঁ, সকলের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে! বাবা যখন তাঁর কাছে বললেন তখন মা অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠেছিলেন।"

"তা'হলে আমাদের প্রেম সকলের সাদর-সমর্থন পেয়েছে?"

"আমাদের আপনজন সবার কাছেই পেয়েছে কিন্তু বাইরের দুনিয়া একে মানতে হয়ত রাজি নয়!"

"এই বাইরের দুনিয়ার তুমি পরোয়া কর, কমল?"

"একেবারেই নয় সুরৈয়া, পরোয়া করি আমি শুধু ভবিষ্যৎ দুনিয়ার—যার জন্য এ পথ প্রদর্শন করতে যাচ্ছি আমরা আজ!"

"বৌদিও সব কথা জানে কমল, রাত্রে তার ঘরে গিয়েছিলাম, ঠাট্টা করে আমায় বলল, 'ঠাকুরঝি, আমি যে নন্দাইয়ের আশায় বসেছিলাম—আজ আমার সে সাধ পূর্ণ হতে চলেছে'—তোমার নাম অবশ্য করেনি।"

"এর মানে দাদাই বলেছেন বৌদিকে, আর ওদের দু'জনেরও বেশ সমর্থন রয়েছে আমাদের প্রেমে।"

"তা'হলে তোমার শ্বশুরকুলের সবাই তোমার অনুকূলেই কমল ?"

"তোমারও বাহাদুরি —তুমি আমার মায়ের সমর্থন আদায় করেছ।"

"কাকিমার পূজা-পাঠের কথাই তোমরা চিন্তা করেছ কমল, কিন্তু যদি জানতে যে আমাকে তিনি কত ভালোবাসেন, তবে সম্ভবত তাঁর সম্বন্ধে কোনো রকম সন্দেহই পোষণ করতে না।"

"আমরা জানতাম বলেই তো তাঁর ওপর প্রয়োগ করার জন্য তোমাকেই চরম অস্ত্র রূপে ঠিক করে রেখেছিলেন বাবা। কিন্তু সে অস্ত্র প্রয়োগ করবার আগেই কেল্লা-ফতে হয়ে গেল। এখন তো আমাদের বিয়েই হতে চলেছে।"

"কোথায় ?"

"পণ্ডিতের কাছে নয়, মোল্লার কাছেও নয়। আমাদের আপন পয়গম্বরের কাছে, যিনি ভারতবর্ষে নতুন ত্রিবেণীর দুর্গ নির্মাণ করেছেন।"

"যিনি খাল, বিল, নদীনালাকে পবিত্র সমুদ্রে পরিণত করতে চান ! কিন্তু কবে কমল ?"

"পরশু, রবিবার স্বরৈয়া।"

"পরশু !" স্বরৈয়ার চোখের জল শিশির বিন্দুর মতো টলটল করে উঠল। তা মুছে দিয়ে তার চোখে চুম্ দিল কমল। ওদের দু'জনের কেউই তখন জানতে পারল না, আরও চারটি চোখ তাদের মতো লুকিয়ে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করছে।

৪

বসন্তের হাল্কা হাওয়া, প্রাক্-সন্ধ্যার অস্তগামী সূর্যকিরণের লাল আভায় অগ্নিবর্ণ সাগর—সব মিলিয়ে অপূর্ব এক দৃশ্য ! সমুদ্রের বালুকাবেলায় বসে দুটি তরুণ হৃদয় এই দৃশ্য উপভোগ করছিল। উপভোগের এমনি এক পরম মুহূর্তে একজন বলল, "কি সুন্দর এই সমুদ্র !"

"আমরা সকলেই যে সমুদ্রের সন্তান তাতে কোনো সন্দেহ আছে প্রিয়ে ?"

"না গো আমার কমলবরণ কমল, আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি যে এমন এক স্বর্গলোককে সমুদ্র আপন গর্ভে লুকিয়ে রেখেছিল।"

"পরিপূর্ণভাবে না হলেও ভেনিসকে মানুষ স্বর্গে পরিণত করে ফেলেছে, এতেও কোনো সন্দেহ নেই।"

"সাধুজী যখন বলতেন যে, আমাদের দেশের কুলবধূরা এবং কুলকন্যারা পুরুষের মতোই অবগুণ্ঠনহীন স্বাচ্ছন্দ্যে একদা ঘুরে বেড়াত, তখন তাঁর কথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। আজ দু'বছর হয়ে গেল আমরা এই স্বর্গরাজ্যে বাস করছি, এই ভেনিসের সঙ্গে দিল্লীর তুলনা করত প্রিয়।"

"যদি কেউ বলে যে, ফ্লোরেন্সের মতো সমৃদ্ধ রাজ্য রাজাহীন অবস্থায় টিকে থাকতে পারে তবে আমরা সে কথা বিশ্বাস করতাম কখনও!"

"আর ভেনিসের মতো নগরীকে কোনো রাণী কি পরিচালনা করতে পারে!"

"দিল্লীতে কি আমরা এমন স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারতাম, সুরৈয়া!"

"বোরখা ছাড়া? না প্রিয়তম, পাল্কির ভিতর আবরু রেখে সেখানে চলাফেরা করতে হয়। আর এখানে—হাত-ধরাধরি করে চললেও কেউ আমাদের দিকে তেমন দৃষ্টি দেয় না।"

"গুজরাটে কিন্তু অনাবৃতমুখী কুলাঙ্গনাদের আমি দেখেছি। শুনেছি দক্ষিণেও পর্দা প্রথা নেই।"

"এ থেকেই বোঝা যায়, ভারত-ললনারাও একটা সময়ে পর্দামুক্ত ছিল। আমাদের দেশ আবার কখনও কি অমন হতে পারবে কমল?"

"আমাদের পিতৃপিতামহরা তো আজীবন চেষ্টা করছেন। এই ছোট্ট দেশ ফ্লোরেন্স, মাত্র তিন দিনেই যাকে অতিক্রম করা যায়, তার দিকে একবার চেয়ে দেখ সুরৈয়া! এখানকার লোক কেমন গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচিয়ে চলে। কারও সামনে মাথা নত করা বা কুর্নিশ করা এদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। 'রাজা' শব্দটা শুনলে তারা থুতু ফেলে, রাজা এদের কাছে এক শয়তান অথবা অগ্নিশ্বাসনিক্ষেপকারী এক দৈত্য বিশেষ।"

"কিন্তু কমল এ-সবের মধ্যে সত্যতাও কি কিছু নেই? ফ্লোরেন্সের কৃষকের সঙ্গে তুলনা কর ভারতবর্ষের কৃষকের, এখানে কি সেই নগ্ন-জীর্ণ কঙ্কালসার চেহারা কোথাও দেখা যায়?"

"না প্রিয়ে, আর তার কারণ হল এই যে, এখানে শাহী শান্-শৌকতে কোটি-কোটি টাকা ব্যয় করা হয় না।"

"ভেনিসের ধনকুবেররা অনেকেই আমাদের কোটিপতিদের হার মানায়।"

"আমাদের কোটিপতিরা এক লাখের ওপর এক নিশান ওড়ায়! আমি ভাবতাম চৌবাচ্চা-ভরা এত টাকা আর মোহর অন্ধকারে পড়ে থেকে কি লাভ হয়? টাকা তো এক হাত থেকে আর এক হাতে ঘোরা উচিত। এই গতিশূন্যতার কারণে মিঠাই-মণ্ডা নিজের জায়গায় পড়ে শুকোয়, ফল নিজের জায়গায় পড়ে থেকে পচে। গুদামের কাপড় পোকায় কাটতে থাকে। অথচ এইসব পুঁতে রেখে আমাদের শেঠেরা তার ওপর লাল নিশান ওড়ায়। লোকে বলে, এর যখন একশ' নিশান রয়েছে, তখন ও শেঠ ক্রোড়মল।"

সূর্যের রক্তিম আভা কিছুক্ষণ হল মিলিয়ে গেছে। চারিদিকে এখন অন্ধকারের ছায়া, সমুদ্রলহরী পাথরের গায়ে আছাড় খেয়ে একটানা শব্দ করে চলেছে, তরুণ-তরুণীরা এখনও বালুতট ছেড়ে উঠতে চাইছে না। সমুদ্রকে সুরৈয়া ও কমল সত্যিকারের সঙ্গী বলে

গ্রহণ করে নিয়েছে। যদিও তারা শুধু জলপথেই ভ্রমণ করেনি, তবু জানত, তাদের সম্মুখে অবস্থিত এই সমুদ্রের একাংশ ভারতের মাটি স্পর্শ করে আছে। তাই কখনও কখনও তাদের মনে প্রশ্ন উঠত, এপারের সঙ্গে ওপারের মিলন ঘটানো যায় কি! অনেক রাতে ফিরতি পথ ধরল তারা। অন্ধকার এই রাত এবং সেই সঙ্গে নিজের অবস্থা উপলব্ধি করে স্থরৈয়া বলল, "আমাদের বাদশাহ নিজ রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, এবং তাতে বহুলাংশে সফলতাও লাভ করেছেন কিন্তু সেখানে কি এমন নিঃশঙ্ক হয়ে বেড়াতে পারি আমরা! —কেন পারি না কমল?"

"এখানে সকলের অবস্থাই ভালো। কৃষকের ক্ষেতে আঙ্গুর, গম এবং অন্যান্য ফসল যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।"

"আমাদের দেশের জমিতেও তো সোনা ফলে!"

"কিন্তু সেই সোনা লুটবার লোকও যে আমাদের দেশে অনেক!"

"আর একটা জিনিস দেখছ তো কমল, এখানে কারও বাড়ি গেলে সঙ্গে সঙ্গে কেমন মদের বোতল-গ্লাস এনে হাজির করে টেবিলে।"

"ভারতবর্ষে কিন্তু আমার বাবার এই জন্যেই বদনাম ছিল যে, তিনি বাদশাহর সঙ্গে বসে মদ্যপান করে থাকেন।"

"আর আমার ঝি-রা আমাকে কি শেখাত জান! বলত 'রাজপুতানীরা বড় নোংরা, তাদের ঘরে শুয়োর রান্না হয়।' এখন আমার মনে হয়, ওখানকার অন্ধরা এখানে এলে বুঝত যে, দুনিয়ায় ছোট-বড় জাত বলে কিছু নেই।"

"পান-ভোজনে জাত-পাতের বালাই নেই এখানকার দুনিয়ায়।"

"ফ্লোরেন্স বেশ একতাবদ্ধ দেশ, একদিন হয়ত ভারতবর্ষও এমনি একতাবদ্ধ হবে।"

"সেটা তখনই হবে, যখন আমরা সবাই সমুদ্রকে জয় করতে পারব।"

"সমুদ্র-বিজয়!"

"ভেনিস সাগর-বিজয়িনী নগরী, স্থরৈয়া। ভেনিসের এই খালের পথ, এই সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ ঐ সমুদ্র-বিজয়েরই প্রাসাদ। সমুদ্র-বিজয়ে ভেনিস আজ আর একা নয়, —বহু প্রতিদ্বন্দ্বী তার রয়েছে। আমার কিন্তু এ কথাই মনে হয় যে, পৃথিবীতে এখন সমুদ্রজয়ীদের শাসনই প্রতিষ্ঠিত হবে। আমার নিজের মনও ঐ সমুদ্র-বিজয়ের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছে বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি আমি।"

"তুমি কি সব অত বই নিয়ে রাতের পর রাত পড়াশুনা কর প্রিয়তম? তা'ছাড়া বইপত্র পাওয়া কত সহজ এখানে!"

"আমাদের দেশেও সীসা রয়েছে, কাগজ এবং সুদক্ষ কারিগরও রয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও ছাপার কাজ শিখিনি। আমাদের দেশে যদি ছাপাখানা খোলা হয়

তবে জ্ঞানার্জন অনেক সুলভ হয়ে উঠবে। এই যে এত বই পড়ছি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ নাবিকদের মধ্যে কাটিয়ে দিচ্ছি, এর ফলে আমি ক্রমেই স্থির নিশ্চিত হয়ে উঠছি যে, সমুদ্র বিজয়ী দেশই বিশ্বজয়ী শক্তিরূপে বিরাজ করবে। প্রত্যহ স্নান না করার জন্য এই সব ফিরিঙ্গীদের আমাদের দেশের লোকেরা নোংরা বলে, কিন্তু এদের অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা না করে থাকতে পারি না। ঘরে বসে ভূগোলের গল্প রচনা না করে এরা সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে সম্যক জ্ঞানার্জন করে। এদের তৈরী মানচিত্র তো আমি তোমাকে দেখিয়েছি সুরৈয়া।"

"সমুদ্র আমার বড় ভালো লাগে কমল!"

"শুধু ভালো লাগা নয় সুরৈয়া, সমুদ্রের ওপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই কাঠের জাহাজের ওপর রক্ষিত কামানটিকে দেখছ তো? এইসব জাহাজ হল এক একটা ভাসমান দুর্গ। মোঙ্গলরা তাদের জয়যাত্রার জন্য ঘোড়া এবং বারুদের কাছে সম্পূর্ণ ঋণী। আর এখন পৃথিবীতে যাদের কাছেই এইসব যুদ্ধজাহাজ থাকবে তারাই জয়ী হবে। এই জন্যই আমি এ বিদ্যা অর্জনের সঙ্কল্প করেছি।"

কমল এবং সুরৈয়ার সাধ পূর্ণ হল না। জলপথে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করেছিল তারা, কিন্তু সেটা ছিল জলদস্যুদের যুগ। সুরাটে পৌঁছাবার মুখে জলদস্যুরা তাদের আক্রমণ করল। সঙ্গীদের নিয়ে কমল তার বন্দুক এবং কামান চালিয়ে যেতে লাগল দস্যুদের ওপর। দস্যুরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশী। কমলের জাহাজ গোলাবিদ্ধ হয়ে জলে ডুবে যেতে লাগল। সুরৈয়া তার কাছেই ছিল, তার ঠোঁটে মৃদুহাসি ফুটে উঠল, তার মুখের শেষ কথা হল —'সমুদ্র-বিজয়'!

রেখা ভগৎ

কাল : ১৮০০ খৃষ্টাব্দ

কার্তিকের পূর্ণিমা। এই সময় গণ্ডক-স্নান (নারায়ণী) এবং হরিহর দর্শনের খুব ভিড়। দূর দূরান্তর থেকে গ্রাম্য নর-নারীরা বহুযত্ন-সঞ্চিত অর্থ এবং ছাতু-চাল নিয়ে হরিহরক্ষেত্রে এসে পৌঁছায়। বাগানের মধ্যে কিছু বলদ, ঘোড়া আর হাতী বাঁধা —এ-সব দেখে তখন কে ভাবতে পেরেছিল যে, এটাই ভবিষ্যতে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মেলায় পরিণত হবে!

একখানা মোটা গামছা বিছিয়ে কাঁচালঙ্কা আর মূলো সহযোগে নুন-মাখা ছাতু পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করে রেখা ভগৎ আর তার চার সঙ্গী এক আমগাছের নীচে কম্বলের ওপর বসেছিল। রেখার মহিষ বিক্রয় হয়ে গেছে, সে থেকে থেকে ট্যাঁকে হাত দিয়ে বিক্রির কুড়িটা টাকা দেখে নিচ্ছে। এই মেলায় এমন সব চোর এসেছে যারা যাদুমন্ত্রে

টাকা মেরে নেয়। রেখা আর একবার ট্যাঁকের ওপর হাত বুলিয়ে পরম নিশ্চিন্তের সঙ্গে কথা আরম্ভ করল, "আমাদের মোষ তো বিক্রি হয়ে গেল, তিনমাস ধরে খুব খাইয়ে-দাইয়ে আমি ওকে তৈরী করেছিলুম মৌলুভাই। ও রকম মোষের জন্যে বিশ টাকা দাম বেশী নয়। কিন্তু টাকাও আজকাল দেখতে দেখতে উড়ে যায়।"

মৌলা, "ঠিকই! উড়েই যায়! এ ছাড়া টাকা-পয়সার আজকাল অভাবও পড়ে গেছে চারিদিকে। এই কোম্পানীর রাজত্বে কোনো কিছুরই সুরাহা নেই। আমরা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মরে যাই, অথচ আমাদের ছেলেপুলেদের পেট-ভরা খাওয়া জোটে না এক সন্ধ্যাও!"

রেখা, "এতদিন পর্যন্ত আমরা হাকিমকে নজর, বেগার এবং আমলা-পাইককে ঘুষ দেওয়ার ভিতর দিয়েই দিন কাটিয়েছি, কিন্তু জমি আমাদেরই ছিল।"

মৌলা, "সাত-পুরুষ থেকে জঙ্গল কেটে জমি আবাদ করছি আমরা!"

সোহরণ, "মৌলুভাই, বাঘাক্ষেতের কথা জানো তো? ওখানে ভয়ানক জঙ্গল ছিল! আমাদের মুরিস্ ঘিনাবন বাবাকে ওখান থেকেই বাঘে ধরে নিয়ে যায়। সেই থেকেই ঐ জায়গার নাম 'বাঘাক্ষেত' হয়েছে। প্রাণ দিয়ে আমরা সেই জমি আবাদ করেছি।"

রেখা ভোলাপণ্ডিতের দিকে তাকাল। ভোলাপণ্ডিতের রঙ কালো, পাতলা শাদা কাপড়ের পাগড়ী ঠিক করছিল। রেখা বলল, "ভোলাপণ্ডিত, তুমি তো সত্যযুগের কথা জানো, বলতে পার, প্রজারা এমন দুর্দশায় আর কোনোদিন কি পড়েছে?"

মৌলা, "জমি আমরা তৈরী করেছি। চাষ-করা, বীজ-বোনা সব কাজে আমরা খেটেছি। অথচ আমাদের গ্রামের মালিক আমরা নই, রামপুরের মুন্সীজী।"

ভোলাপণ্ডিত, "অধর্ম! রেখা ভগৎ, সর্বত্র অধর্ম। রাবণ এবং কংসের অত্যাচারকেও হার মানিয়েছে কোম্পানী। পুরাণ ধর্মশাস্ত্রে লেখা আছে, রাজা পাবে কৃষকের কাছ থেকে এক দশমাংশ ফসল।"

মৌলা, "আমি তো অবাক হয়ে যাই পণ্ডিত! কোথাকার কে রামপুরের মুন্সী! তাকে আমাদের মালিক আর জমিদার বানিয়ে দিয়েছে?"

ভোলাপণ্ডিত, "সবই উল্টে গেছে মৌলু, প্রথমে প্রজাদের ওপর একজন রাজা ছিল। কৃষকেরা শুধু একজন রাজাকেই জানত। রাজা বহুদূরে আপন রাজধানীতে থাকত। শুধু ফসলের এক দশমাংশ পেলেই সে খুশী, তাও যখন ফসল হত তখন। কিন্তু এখন ফসল হোক আর না হোক, নিজের হাড়মাংস বেচে, মেয়ে-বোনকে বেচে জমিদারের খাজনা ঠিক মতো দিতেই হবে।"

রেখা, "আর এই খাজনার কোনো হদিস্ পাওয়া যায় না পণ্ডিত। বছর-বছর খাজনা বেড়েই চলেছে! জিজ্ঞেস করবারও কেউ নেই যে, এমন অন্যায় কেন হচ্ছে।"

মুন্সী সদাসুখলাল পাটোয়ারী এসেছিল হরিহরক্ষেত্রে স্নান করতে, আর সস্তায় পেলে একটা গরু কিনতে। কিন্তু এ বছরের দুর্মূল্যতা দেখে কাঁপুনি ধরে গেছে তার। তার গায়ে ময়লা ছেঁড়া এক কতুয়া এবং মাথায় টুপি। কানে এখনও থাগের কলম —দেখে মনে হয়, এখানেও বুঝি হিসাব লিখতে হবে তাকে। মসরখের জমিদারের পাটোয়ারী বলে সে ভাবছিল, এই আলোচনায় তার অংশগ্রহণ করা উচিত কিনা। কিন্তু আলোচনা যখন গ্রাম্য রাজনীতি নিয়ে, তখন মুখ-কানওয়ালা মানুষের পক্ষে চুপ করে থাকা মুস্কিল! দ্বিতীয়ত, দয়ালপুর গ্রাম তার মালিকের জমিদারীতে নয়। কাজেই দয়ালপুরের কৃষকদের কথাবার্তায় অংশগ্রহণ করায় কোনো ক্ষতি আছে বলে সে মনে করল না। কলমটাকে আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে মুন্সীজী বলল, "কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে কিনা বলছ পণ্ডিত? কে জিজ্ঞেস করবে? এখানে তো সবাই পরের ধন লুট করে খায়। যত পার লুটে খাও। কোনো রাজা নেই। নাজিম সাহেবের দরবারে আমার মাসতুত বোনের এক জামাই থাকে, অনেক গোপন তথ্যই সে জানে। একশো-দুশো ফিরিঙ্গি ডাকাতের দল জেঁকে বসেছে। এই দলকেই তারা নাম দিয়েছে কোম্পানী!"

রেখা, "ঠিক বলেছ মুন্সীজী, 'কোম্পানী বাহাদুর' শুনে-শুনে আমরা ভেবেছিলাম, কোম্পানী কোনো রাজা হবে বুঝি, কিন্তু আসল কথাটি আজ বুঝলাম।"

মৌলা, "সেই জন্যেই তো যেদিকে তাকাও সেই দিকেই দেখবে লুট চলছে। ন্যায় অন্যায়ের খোঁজ-খবর করবার কি কেউ আছে? এই রামপুরের মুন্সীজীর সাত পুরুষের কখনও দয়ালপুরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না।"

সোবরণ, "আমার তো মৌলুভাই মাথায় ঢোকেনা যে, এই রামপুরের মুন্সী আমাদের গাঁয়ের মালিক হয়ে গেল কি করে! শুনতে পাচ্ছি দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে কোম্পানীর না-কি যুদ্ধ চলছে…"

মুন্সী, "দিল্লী নয় সোবরণ রাউৎ, মকসুদাবাদের (মুর্শিদাবাদের) নবাবের কাছ থেকে এই অঞ্চল কোম্পানী লিখিয়ে নিয়েছে। দিল্লীর তখৎ থেকে আমাদের এই অঞ্চলকে মকসুদাবাদ আগেই ছিনিয়ে নিয়েছিল, সোবরণ রাউৎ।"

সোবরণ, "আমাদের এত কথা মনে থাকে না মুন্সীজী, আমরা তো শুধু দি..র কথাই জানতাম। আচ্ছা মকসুদাবাদের হাতেও যখন রাজ্য এল, তখনও তো একটাই রাজা ছিল? আমাদের যেমন জুটত তেমনই খাজনা দিতাম। কিন্তু এখন একে দুই রাজার রাজ্য বলবে, না কি বলবে?"

রেখা, "দুই রাজাই হয়েছে সোবরণ ভাই —এক কোম্পানী-রাজ আর দ্বিতীয় রামপুরের মুন্সীজীর রাজ্য। জাঁতার এক পাল্লায় পিষলে বাঁচার আশা কিছুটা থাকে, কিন্তু দু'পাট্টে পড়লে বাঁচা একেবারেই অসম্ভব। আর এ ব্যাপার তো আমরা নিজেদের চোখেই

দেখতে পাচ্ছি। মুন্সীজী তুমিই বল! আমরা তো গেঁয়ো, মূর্খ, আনাড়ী, তুমি এবং ভোলাপণ্ডিতই আমাদের মধ্যে জ্ঞানী।"

"মুন্সী, "রেখা ভগৎ কথাটা বলেছ তুমি ঠিকই। জমিদার হল জাঁতার একটা পাল্লা। আর রাজার চেয়ে সে কোন বিষয়েই বা কম?"

রেখা, "কম কেন, বরং এক-কাঠি বেশী মুন্সীজী। গাঁয়ের পঞ্চায়েতের পরামর্শ কেউ নেয় এখন? রেওয়াজ মতো আমরা এখনও পাঁচজন মোড়ল ঠিক করে দিই, কিন্তু কোনো কাজে হাত দিতে পারে তারা? সবই জমিদার আর তার আমলা-গোমস্তারা করে। গাঁয়ের ভেতর ঝগড়া বাধলে বাদী-বিবাদী দু'জনের কাছ থেকেই তারা জরিমানা আদায় করে। পনের বছরও তো কাটেনি সোবরণ রাউৎ, মেয়ে-মরদের ঝগড়ায় কখনও মোষ বিক্রি করতে দেখেছ?"

সোবরণ, "আরে ভাই তখন তো সব কিছুই পঞ্চায়েতের হাতে ছিল। গাঁয়ের পঞ্চায়েত কোনো পরিবারকে উচ্ছন্নে যেতে দিত না, খুনের মামলা পর্যন্ত আপোসে মিটমাট করে দিত তারা। বাঁধ আর খালগুলোর অবস্থা দেখনি? মনে হয়, ওগুলোকে দেখবার বা ওগুলোর ভার নেবার এখন আর কেউ নেই। পঞ্চায়েত যদি এখনও সক্রিয় থাকত তা'হলে কি কোনোমতেই এমনটা হতে পারত?"

রেখা, "কোনোমতেই হত না সোবরণ রাউৎ। বৃষ্টি বেশী হলে এমন পরিষ্কার নালা নেই, যা দিয়ে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যেতে পারে।"

মুন্সী, "পঞ্চায়েতকে ধ্বংস করে কোম্পানী এ-সব তুলে দিয়েছে জমিদারের হাতে।"

রেখা, "আর জমিদারেরা যে কি করছে সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি!"

মুন্সী, "আমিও জমিদারের নিমক খাই রেখা ভগৎ। তুমি জানো, মসরখের জমিদারের পাটোয়ারী আমি। কিন্তু এ অন্যায়ের সম্পত্তি, অন্যায়ের ধন যে খায় সে নির্বংশ হয়ে যায়। আমাকেই দেখ, সাত ছেলে, ঘোড়ার মতো জোয়ান —সব মরে গেল!"

মুন্সীজীর চোখে জল দেখে সকলেরই হৃদয় সহানুভূতিতে ভরে উঠল। "সব মরে গেল রেখা ভগৎ, ঘরে এখন জল দেবার জন্য একটা বাচ্চা মেয়েও নেই। আর আমার মালিক ছাপরার সেই রাণ্ডীর পেছনে কিভাবে ঘুরছে! তার ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে পড়েছে। —এই যে দুটো বাচ্চাকে দেখছ, এদের লোকে তার সন্তান বলে জানে কিন্তু আসলে এরা নাপিতের ঔরসজাত।"

রেখা, "মালিকদের মধ্যে এ-রকম ঘটনা এখন অনেকেরই হচ্ছে।"

সোবরণ, "ক্ষেত গেল, গ্রাম গেল, সাত-সমুদ্র পারের দস্যুরা আমাদের ওপর দেশী ডাকাত লেলিয়ে দিল। পঞ্চায়েত গেল, যে সামান্য ফসল আমরা ফলাই তাও কেড়ে

নেওয়া হয়! আর যদি কখনও ঠিক মতো রোদ-বৃষ্টি হল, সামান্য ফসল ঘরে উঠল, তো মালিক, জমিদার, চৌকিদার, পাটোয়ারী গোমস্তার পেট ভরাতেই সব খতম।"

মুন্সী, "পাটোয়ারীদের লুটের কথা আমি জানি সোবরণ রাউৎ, কিন্তু এও তোমরা জানো, জমিদার মাত্র আটআনা মাইনে দেয় পাটোয়ারীদের মাসে, আটআনা পয়সায় জিভও ভেজানো যায় না—এ কথা কি জমিদার নিজে জানে না?"

রেখা, "জানে মুন্সীজী, জমিদার অন্ধ নয়, সবই দেখতে পায়। কোম্পানী বাহাদুর ডাকাত—আমাদের ওপর এক নতুন ডাকাত জমিদারকে বসিয়ে দিয়ে গেছে। এততেও আমরা বেঁচে আছি কি করে?"

সোবরণ, "বেঁচে কোথায় আছি রেখা? পেট ভরে ভাত খেতে বা দেহে এক টুকরো কাপড় জড়াতে পারে—এমন লোক ক'টা দেখা যায় দয়ালপুরে?"

মুন্সী, "কোম্পানীর এতে কি এসে যায় সোবরণ রাউৎ? সে খাজনা বেঁধে দিয়েই খালাস, জমা দেওয়ার দিন ছাপরা গিয়ে জমিদারেরা টাকার তোড়া জমা দিয়ে আসে। দয়ালপুরে কৃষক মরুক আর বাঁচুক, কোম্পানীর পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে দেওয়া হয়। আর পুরো খাজনা না দিলে মেরে কৃষকের হাড্ডি গুঁড়ো করে দেবে জমিদার। তোমার কাছ থেকে জমিদার পাঁচ টাকা নেবে—এক টাকা কোম্পানীকে দিয়ে বাকী চার টাকা নিজে গিলবে।"

রেখা, "হা ভগবান! তুমি কি ঘুমিয়ে আছ, না মরে গেছ? কেন তুমি সুবিচার করছ না? আমরা যে ধ্বংস হয়ে গেলাম!"

সোবরণ, "হ্যাঁ, শেষ হয়েই গেলাম রেখা, শোনোনি বারো-পরগণার লোকেরা একজোট হয়ে জমিদারকে তাদের মালিক বলে মানতে অস্বীকার করেছিল? তারা ছাপরা গিয়ে কোম্পানীকে বলেছিল, 'আমাদের পঞ্চায়েত তোমাদের খাজনা মিটিয়ে দেবে, আমরা জমিদারকে মানব না।' সাহেব কি জবাব দিয়েছে জানো? 'অনাবৃষ্টি আর বন্যার সময়ও ঠিকমতো খাজনা দেবে'? অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ বা প্লাবনের সময় নিজেদের কাচ্চা-বাচ্চার প্রাণ বাঁচানোই মুস্কিল—তা কি ওরা জানে না, ফিরিঙ্গীর ঐ কথাটা বলতে ভগবানের ভয়ও হল না রেখা! এরপর সে কি বলেছিল জানো? 'তোমরা তো কাঙাল, খাজনা যদি না দাও তো কোম্পানী বাহাদুর কি নেবে তোমাদের কাছ থেকে? আমরা টাকাওয়ালা সম্ভ্রান্ত লোককে জমিদার করে দিই, যাতে আমাদের খাজনা বাকী রাখলে তাদের ঘরবাড়ি নিলাম হয়ে যাবার, মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবার ভয় থাকে'।"

রেখা, "এই জন্যই তো ফিরিঙ্গীগুলোর সারা গায়ে শ্বেতী। বড় নির্দয় ওরা।"

সোবরণ, "বারো-পরগণাবাসীদের কোনো কিছুই নেই, কাজেই ওরা জীবনের বিনিময়ে লড়াই করে। কোম্পানী যদি বাহাদুরই হত, তবে বাহাদুরের মতোই লোকের সঙ্গে

লড়ত। বারো-পরগণাবাসীদের কাছে বন্দুকই আছে আর কোম্পানীর লোকদের আছে কামান। এখান থেকে সেখান থেকে কালা-গোরা বহু পল্টনও এসে গেছে তাদের। গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে দিয়েছে, নারী শিশুদেরও ছাড়েনি। বারো-পরগণার লোকদের আর কি করবার আছে ?"

মৌলা, "চাষবাস তো এইভাবেই নষ্ট হয়ে গেল, তাঁতীদের মুখের অন্নও ঘুচতে আরম্ভ করেছে সোবরণ রাউৎ। কোম্পানী এখন বিলাত থেকে কাপড় এনে বেচছে।"

মুন্সী, "হ্যাঁ, কলের তৈরী সুতো, কলের তৈরী কাপড়। আমার এই ফতুয়া ঐ কাপড়ের তৈরী। তাঁতের কাপড় এত সস্তায় পাওয়া যায় না। কাজেই মান বাঁচাবার জন্যে এই জিনিসই কিনতে হয়। এটা মান বাঁচাবারই প্রশ্ন—কিন্তু তুমি অমন করে হাসছ কেন রেখা ? সরকারী জাজিমের ওপর বসতে হলে তখন বুঝতে।"

রেখা, "তোমার কথায় হাসিনি মুন্সীজী, হাসছি এই জন্যে যে, কোম্পানী বাহাদুর রাজত্বও করছে, আবার ব্যবসাও চালাচ্ছে। এমনি মজার রাজত্ব!"

ভোলাপণ্ডিত, "সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—তিন যুগ পার হয়ে গেছে। কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর কেটে গেছে। কিন্তু এমন রাজত্ব কখনও ছিল বলে তো শুনিনি!"

মুন্সী, "নাজিমের দরবারে এক মুন্সী কোম্পানীকে ফিরিঙ্গী-ডাকাত আখ্যা দিয়েছে, আর একজন বলেছে, কোম্পানী হল ফিরিঙ্গী ব্যবসাদারদের আড্ডা। ওরা শুধু ব্যবসার জন্যেই নিজেদের দেশ থেকে এসেছে। প্রথমে এখানকার মাল ওখানে নিয়ে গিয়ে বেচত, কিন্তু এখন ওরা বিলাতে বড়-বড় কারখানা খুলেছে—সেখানে নিজেরাই মাল তৈরী করায় আবার নিজেরাই সেটা বিক্রি করে।"

মৌলা, "তা'হলে বোঝা যাচ্ছে, কারিগরদেরও আর উন্নতির আশা নেই।"

২

শীতের গঙ্গা সবুজ আকার ধারণ করে এবং তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যময় গতি আরও গম্ভীর রূপ নেয়। এই সময় নৌকাডুবির ভয় কম থাকে এই জন্য ব্যাপারীরা এই সময়টাকে ব্যবসায়ের মরসুম বলে মনে করে। এই সময় গঙ্গার পারে ঘণ্টা কয়েক বসে থাকলেই দেখা যাবে, শত শত বড় নৌকা সামনে দিয়ে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশতেই কোম্পানীর মাল বোঝাই থাকে—তার মধ্যে বহু মালই আসে বিলাত থেকে এবং সেগুলো ওপরের দিকে যায়। আর পাটনা, গাজীপুর মির্জাপুরের মতো তেজারতী শহরের ঘাট থেকে দেখা যায়, গঙ্গার চারিধার বড় বড় নৌকায় ভর্তি।

পাটনা থেকে একটি বজরা নীচের দিকে যাচ্ছিল। এতে সোরা, জাজিম ইত্যাদি বহু জিনিস বিলাতে চালান যাবার জন্যে ছিল। এরই একটা নৌকায় যাচ্ছিল বঙ্গসন্তান তিনকড়ি দে আর বিলিতি সাহেব কোলম্যান। পাটনা থেকে কলকাতা যেতে এক

সপ্তাহের বেশী সময় লাগে, স্থতরাং তিনকড়ি দে আর কোলম্যানের ভিতর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। যদিও প্রথমে একে অপরের সঙ্গে দেখা হলে সঙ্কুচিত হয়ে উঠত। তিনকড়ি দে-র কাছে জুলফী, আঁটোসাটো প্যাণ্ট, ফিতায় ঝোলানো বোতাম এবং কালো কোট পরিহিত শ্বেতমুখ ভয় এবং ভক্তির বস্তু ছিল। কিন্তু কোলম্যানই প্রথম আলাপস্থরু করায় তিনকড়ির সাহস বেড়ে উঠছিল। আলাপ-আলোচনায় তিনকড়ি বুঝতে পারল যে, কোলম্যান কোম্পানীর সাহেবদের ঘোরতর বিরুদ্ধে এবং গভর্নর থেকে আরম্ভ করে কোম্পানীর ছোট বড় কাউকেই গালাগাল দিতে দ্বিধা করে না। তিনকড়িও কোম্পানীর চাকরদের বরদাস্ত করতে পারত না। বিশ বছর কোম্পানীর বড় বড় দপ্তরে সে কেরানীর কাজ করেছে। গরীবের ঘরেই সে জন্মেছিল, কিন্তু সে ছিল তাদেরই একজন যাদের আশা সীমাবদ্ধ এবং লোভ যাদের আত্মসম্মানের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ। অবশিষ্ট জীবনের মতো খাওয়া পরার মতো সংস্থান করে নিয়েছিল তিনকড়ি। কোনো পুরনো এজেণ্টের দয়ায় সে চব্বিশ-পরগণা জেলায় চারখানা গ্রামের জমিদারী পেয়েছিল, যার আয়ের তুলনায় খাজনা ছিল অনেক কম। কিন্তু এই দয়াটুকু পাবার জন্য এমন কাজ তিনকড়ি করেছিল, যার পাপ জন্ম-জন্মান্তরে মোচন হবে না বলে তার বিশ্বাস। সাহেবকে খুশী করবার জন্যে গ্রামের এক স্থন্দরী ব্রাহ্মণ তরুণীকে তুলে দিয়েছিল সাহেবের হাতে। সাহেবরা সে সময় খুব কমই বিলেত থেকে নিজেদের মেম সঙ্গে করে আনত। কারণ ছ'মাসের বিপদ ঘাড়ে করে সমুদ্র-যাত্রা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না।

তিনকড়ির বয়স পঁয়তাল্লিশ। তার স্থঠাম কালো দেহের কাঠামো খুবই বলিষ্ঠ। রোজ সকালে উঠে সে আয়নায় নিজের মুখ দেখত আর হাতের আঙুলগুলো পরীক্ষা করত, কোনদিন তার দেহে কুষ্ঠ রোগ ফুটে বেরুবে—সেই আশঙ্কায় সে থাকত, কারণ ব্রাহ্মণীর সতীত্বনাশের এই শাস্তি তার কপালে আছে বলে তার মনে হত। সাহেবদের খিটিমিটি, গালাগালি আর পায়ের ঠোক্কর সয়ে সয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল! তাই চাকরীর বয়স থাকলেও কাজে ইস্তফা দিয়ে সে গ্রামে ফিরে আসছিল। বিশ বছর নীরবে সহ্য করা অপমানের আগুনে তার অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল। যখন সে কোলম্যানকে নিজের চাইতেও কোম্পানীর বড় শত্রু বলে বুঝতে পারল, তখন ধীরে ধীরে দু'জনের আলাপ চলতে লাগল। কোলম্যান একদিন বলছিল, "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৈরী করা হয়েছিল বাণিজ্যের জন্য, কিন্তু পরে এরা লোককে লুট করতে স্থরু করে। দেখছ না, যত সাহেব এখানে আসে, সবাই দু'দিনের ভেতর লাখপতি হয়ে দেশে ফিরে যায়। ছোট-বড় সবারই এই অবস্থা। ক্লাইভ এই কাজই করেছে, কিন্তু তাকে কেউই ধরেনি। চেৎসিংহের রাণীরা অনাহারে মরে যাওয়া সত্ত্বেও লোভের তাড়নায় ওয়ারেন হেষ্টিংস তাদের কথা ভাববার অবকাশই পায়নি আর অযোধ্যার বেগমদের কাঙাল বানিয়ে ছেড়েছে সে। কিন্তু

আমাদের দেশবাসীরা তাকে ছাড়েনি। শাস্তির হাত থেকে সে বেঁচে গেছে, কিন্তু যা কিছু সে রোজগার করেছিল, কয়েক বছরের মামলায় সবই সে খুইয়েছে!"

"মোকদ্দমা কে চালাল সাহেব?"

"পার্লিয়ামেণ্ট। আমাদের দেশে রাজা নিজের খুশীমতো চলতে পারে না। খুশীমতো চলার অপরাধে এক রাজার গর্দান আমরা কুড়াল দিয়ে কেটে ফেলেছি, আর সে কুড়াল এখনও রয়েছে। পার্লিয়ামেণ্ট হল পঞ্চায়েত, বুঝলে মিঃ. দে! এদের অধিকাংশ সদস্যকেই দেশের ধনী-মানীরা নির্বাচিত করে, আর কিছু বড়-বড় জমিদার বংশগত অধিকারে এর সদস্য হয়।"

"জমিদারী প্রথা কতদিন থেকে চলে আসছে?"

"আমাদের দেশে এ প্রথা কয়েক শ' বছর ধরে চলে আসছে। আমাদের দেশের দেখাদেখি ভারতবর্ষে জমিদারী প্রথা কায়েম হয়েছে। সেখানেও জমির ওপর থেকে কৃষকের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ দেশে জমিদারীপ্রথা কায়েম করেছে যে গভর্নর, তার নাম জানো?"

"হ্যাঁ, কর্নওয়ালিস।"

"ঠিক বলেছ। বিলাতের পয়লা নম্বরের কসাইজমিদার। এখানে এসে সে দেখল, যতদিন কৃষকেরা জমির মালিক থাকবে ততদিন অনাবৃষ্টি ও প্লাবনের সময় ঠিক মতো খাজনা আদায় হবে না। সে এ কথাও ভাবল, সাতসমুদ্র তেরনদীর পারের দেশ থেকে আগত ইংরাজদের এ দেশের কিছু লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে—আর তা হবে এমন সব লোকের সঙ্গে, যাদের স্বার্থ ইংরাজদের স্বার্থের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। জমিদার হল ইংরাজদের সৃষ্ট। কৃষক-বিদ্রোহে ইংরাজদের যেমন বিপদ, তেমনি জমিদারের বিপদ। জমিদারী, সম্পত্তি এবং সম্ভ্রম চলে যাওয়ারও সমূহ আশঙ্কা। এই জন্য ছোট-ছোট কৃষকদের মালিক বলে স্বীকার না করে যদি পঁচিশ-পঞ্চাশটা গ্রামের বড়-বড় মালিক জমিদার সৃষ্টি করা যায়, তবে তারা সুসময়-দুঃসময় সর্বদাই কাজে আসবে। এইভাবে বিলাতের এই কসাই ভারতবর্ষের কৃষকদের গলা কেটে রেখেছে।"

"কেটে যে রেখেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই"—নিজের জমিদারীর কৃষকদের কথা মনে পড়ল তিনকড়ির।

"জায়গীরদারদের জুলুমে সারা দুনিয়ার লোকই মরছে; তবে এদের দিনও ফুরিয়ে এসেছে! ফ্রান্সের রাজা-রাণীকে কয়েক বছর আগেই প্রজারা মেরে ফেলেছে। তাদের ক্রোধাগ্নিতে বহু জমিদার পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। জমিদারী প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানকার লোকেরা সকল মানুষের জন্য সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। সে সময় আমি ফ্রান্সে ছিলাম। ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদের ওপর ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের তেরঙা

ঝাণ্ডা আমি নিজের চোখে উড়তে দেখেছি। ইংলণ্ডেও ফ্রান্সের মতোই অবস্থা হত, কিন্তু একটা ব্যাপার তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।"

"কি ব্যাপার সাহেব?"

"দেখছ না বিলিতি কারখানার তৈরী জিনিসে ভারতবর্ষের বাজার ছেয়ে গেছে? তোমাদের এখানে তাঁতীরা বেকার হয়ে পড়েছে আর আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা কারখানা খুলে তাতে জমিদারের অত্যাচারে খেতে-না-পাওয়া লোকদের কাজ দিয়েছে। তাদের তৈরী মাল এখানে পৌঁছাচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশেও হাত দিয়েই কল চালানো হত, কিন্তু এখন স্টীম-ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে, আর ঐ কলের কাপড় অনেক সস্তায় পাওয়া যায়। ফলে তোমাদের দেশের কারিগররা তো একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেল। তবে এখন এই সব কারখানায় মজুর হয়ে পেট চালাবার মতো কাজ তারা পেতে পারে। যদি এই কারখানাগুলো খোলা না হত, তবে আমাদের দেশেও ফ্রান্সের দশাই হত। মানুষকে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে দিতে হবে, মিঃ. দে। অপরকে যে পশু বলে মনে করে, নিজেকেই তার ছেলেপিলে সহ পশু হতে হয়।"

"ঠিক বলেছ সাহেব। আমি নিজের কর্মচারী এবং চাকরদের মানুষ বলেই মনে করতাম না। কিন্তু একই ব্যবহার যখন সাহেবরা করতে লাগল আমার সঙ্গে, তখন বুঝতে পারলাম যে, মানুষকে অপমান করা কত বড় পশুর কাজ।"

"দাস-প্রথা তুলে দেবার জন্য বিলেতে প্রবল চেষ্টা হচ্ছে।"

"বিলাতেও দাস-প্রথা চলতে দেওয়া হয়?"

"সারা দুনিয়াতেই হতভাগ্য নর-নারীদের নিয়ে কেনা-বেচা চলছে। কিন্তু আমি আশা করি, শীগ্‌গিরই এর বিরুদ্ধে আইন পাশ হয়ে যাবে!"

"তা'হলে দাসদের মালিক ধনীরা কি করবে?"

"ধনীরা তো এ সব চায়ই না, আর আমাদের পার্লামেণ্টে ধনীদেরই প্রভুত্ব, কিন্তু এখন তাদের মধ্যেই কিছু লোক একে খারাপ বলে মনে করছে। যাই হোক না কেন, মানুষ কেনা-বেচার যারা পক্ষপাতী নয় তারাও পাপ-পুণ্যের বিচারেই যে একে উঠিয়ে দিতে চায় তা নয়। তারা সম্পূর্ণ অন্য কারণে চাইছে। আজকাল অনেক কারখানায় দাসেরা কাজ করছে, তারা যে সব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করে তার দাম অনেক, অথচ মূল্যবান যন্ত্রগুলির ওপর কোনো মমতা নেই দাস-শ্রমিকদের, তাই সূক্ষ্ম কাজের ভার দাসদের দেওয়া যায় না। যার জীবন-মরণ নিয়ে তুমি রাতদিন খেলা করছ, সে তো সুযোগ পেলেই তোমার ক্ষতি করে প্রতিশোধ নিতে চাইবে।"

"মা আর তার শিশুকে আলাদা করে যখন আমি বেচতে দেখি, তখন আমার কাছে সেটা নিতান্তই অসহ্য মনে হয়।"

"অসহ্য যার মনে হয় না, সে মানুষই নয় মিঃ. দে!"

"আমি ভাবছি ফ্রান্সের রাজাহীন রাজ্যের কথা —তাকে কি বলে সাহেব?"

"প্রজাতন্ত্র।"

"প্রজাতন্ত্র কি রাজতন্ত্রের চেয়ে ভালো?"

"প্রজাতন্ত্র সব চেয়ে ভালো ব্যবস্থা! শাহ, শাহজাদা, বেগম আর শাহজাদীদের জন্যেই দেশের সম্পদের অধিকাংশ নিঃশেষ হয়ে যায়! পঞ্চায়েতী রাজ্যের সরকারের কাছ থেকে অধিক ন্যায়, নিরপেক্ষতা এবং সহানুভূতি পাওয়া যায়।"

"হ্যাঁ, আমি আগে আমার নিজের গ্রামের পঞ্চায়েতের কাজ দেখতাম, ওতে সত্যিই বেশী ন্যায়নিষ্ঠা দেখা যেত। আর ব্যয়ের বাহুল্যে কেউই ধ্বংস হয়ে যেত না। কিন্তু যখন থেকে কর্নওয়ালিসের জমিদারেরা এসে পঞ্চায়েতকে ডুবিয়ে দিল, তখন থেকে লোকে শেষ হয়ে যেতে লাগল।"

"এ কথা ঠিকই বলেছ মিঃ. দে, কিন্তু ফ্রান্সের জনতার উদ্দেশ্য প্রজাতন্ত্রের চেয়েও মহৎ ছিল, তারা মানুষ মাত্রেরই সাম্য, স্বাধীনতা এবং মৈত্রী এই তিন মূল ভিত্তির ওপর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল।"

"আমাদের দেশের জন্যেও?"

"তোমরা কি মানুষ নও?"

"সাহেবদের চোখে তো আমরা সত্যিই মানুষ নই!"

"যতদিন পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়ার শাদা-কালো সমস্ত জাতির শাসনব্যবস্থা সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন মানুষ, মানুষ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। কসাই কর্নওয়ালিস তার নিজের জাতের গোরা কৃষকদের মানুষ বলে মনে করত না। ফ্রান্সের রাজা, জমিদাররা তো খতম হয়ে গেছে, কিন্তু বানিয়ার দল —ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাতভাইরা রাজ্য দখল করে নিয়েছে, যার জন্য সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আসল তেরঙা ঝাণ্ডা ফ্রান্সেও উড়তে পারেনি।"

"তা'হলে ফ্রান্সে রাজপরিবারের জায়গায় ব্যবসায়ীদের রাজ্য স্থাপিত হয়েছে?"

"হ্যাঁ, এবং ইংলণ্ডের ব্যবসাদারেরাও সোরগোল বাধিয়ে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, 'যখন আমরা সাতসমুদ্র তেরনদী পারে ভারতবর্ষের রাজ্য চালাতে পারছি, তখন আর ইংলণ্ডে পারব না!' এ জন্য রাজ-শক্তিকে তারা নিজেদের হাতে তুলে নিতে চায়, যদিও রাজাকে সরিয়ে দিয়ে নয়।"

"আপনি বলেছিলেন, ইংলণ্ডের রাজার হাতে শাসন-ক্ষমতা নেই।"

"হ্যাঁ! এটা গোরা-ব্যবসায়ীদের চালাকি। আমার খুব দেশ-ভ্রমণের সখ ছিল। সুবিধা পেয়ে আমি কোম্পানীর চাকরী নিলাম। চাকরী যদি না করতাম তবে

ব্যবসায়ীরা আমাকে সন্দেহ করত এবং দেশ পর্যটন আমার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ত! তাই আমি দু'বছর কোম্পানীর দাসত্ব রূপ নরকে ছিলাম।"

"ভালো মানুষের কাছে এটা সত্যিই নরক। এখানে সে-ই শুধু থাকতে পারে, যে সকল পাপেই সিদ্ধহস্ত, সমস্ত অপমান সহ্য করে শুধু টাকা রোজগারের জন্যেই যে সৃষ্টি হয়েছে। কর্নওয়ালিসের এক অনুচরের কৃপায় পাপের প্রতিদান হিসাবে চারটি গ্রামের এক জমিদারী আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু তার প্রতিফলও পেয়েছি আমি —আমার বউ, ছেলে মেয়ে সব মরে গেছে। ঐ জমিদারীর নামে আমার প্রাণ কাঁপে, আমিও আজ আপনার সঙ্গে একমত। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার রাজ্যই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করতে পারে।"

"কিন্তু এই একমত হওয়াতে বা তার আশা করাতে কিচ্ছু হবে না। এর জন্য ফ্রান্সের মতো সহস্র সহস্র লোককে আত্মবলি দিতে হবে। এই আত্মবলি চুপি চুপি দিলে কাজ হবে না। ভারতবর্ষীয় সিপাইরাও তো ইংরাজের জন্যে লাখে লাখে আত্মবলি দিচ্ছে। এই আত্মবলি দিতে হবে নিজেদের মঙ্গলের জন্য এবং সব জেনে বুঝে।"

"জেনে, বুঝে আত্মবলি!"

"জানা-বোঝার মানে হল, ভারতবাসীর পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান দরকার। বিজ্ঞান মানুষের হাতে জোরালো শক্তি যুগিয়ে চলেছে। এই বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান দিয়ে মানুষ বন্দুক বোমা বানিয়েছে, নিজেকে সবল করে তুলছে। এই বিজ্ঞানই তোমাদের দেশকে ধ্বংস করে ইংলণ্ডে নতুন কলকারখানা এবং নতুন শহর তৈরী করে চলেছে। বিজ্ঞানের শরণ তোমাদেরও নিতে হবে।"

"তারপর?"

"তারপর ভারতবর্ষের ছোঁয়াছুঁয়ি, জাত-পাত, হিন্দু-মুসলমান —সব কিছুর ভেদাভেদ মেটাতে হবে। দেখছ না, আমরা জাত-বিচার করি না।"

"হ্যাঁ সেটা ঠিক কথা।"

"ইংরাজদের মধ্যে ধনী দরিদ্র ছাড়া আর কি কোনো জাত-বিচার আছে?"

"না। কিন্তু তারপর?"

"সহমরণ বন্ধ করতে হবে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোককে আগুনে পোড়ানো—তুমি কি মনে কর, একে ভগবান কোনোদিন ক্ষমা করবেন?"

কলকাতায় পৌঁছে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে —এই চিন্তায় কোলম্যান ও তিনকড়ি দে বিষণ্ণ বোধ করল। সবশেষে কোলম্যান বলেছিল, "বন্ধু, আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে পড়েছি। পৃথিবীতে প্রচণ্ড ওলট-পালট চলেছে। এতে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। আর এ জন্য প্রথম প্রয়োজন হল, ছাপাখানা এবং সংবাদপত্র চালু করে দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিফহাল করা।"

৩

এ বছর বর্ষা হয়নি। জ্যৈষ্ঠের মাটি শুকনো পড়ে রয়েছে। আউশ বা রবিশস্য এক ছটাকও হয়নি। পরিবারের পর পরিবার মরে গিয়েছে অথবা তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়েছে। শীর্ণ লম্বা বিলের জল শুকিয়ে গেলে দেখা গেল, পঁচিশ মাইল দূর-দূরান্তের লোককে তার গহ্বরে মরে পড়ে থাকতে। এরা পদ্মমূল খুঁজতে এসেছিল। আর এর জন্য কতবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে তার ঠিক নেই। পরের বছর বর্ষা যখন এল, প্রথম ফসলে রেখা হাত লাগাল। গমের বীজ বুনতে বুনতে মঙ্গরীকে দেখে বিস্মিত হচ্ছিল সে। একটা বছরে যেন পৃথিবীতে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে বলে মনে হচ্ছে। অধিকাংশ লোকই মরে গিয়েছিল, বহু পরিবারের লোকজন দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। রেখা এই ভেবে আশ্চর্য হল, কি করে তারা দুটি প্রাণী দেহমনকে এক করে রেখে এক সঙ্গেই বেঁচে আছে! অতীতে অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ হয়েছে কিন্তু এত কষ্ট সম্ভবত রেখার পূর্ববর্তী কৃষকদের ভোগ করতে হয়নি। সে সময় একমাত্র গভর্নমেণ্টই ছিল, আর দুর্দিনে তাকে খাজনা কম দিলেও চলত। এখন কোম্পানীর সরকারের নীচে জমিদারের জবরদস্ত সরকার রয়েছে, যাদের লস্কর-পেয়াদার কবল থেকে একটা খড়-কুটোও রেহাই পায় না। কোনো ফসল দেড়মাস বাঁচিয়ে রাখা যায় না, ফলে ভবিষ্যৎ আকালের জন্যে কৃষকেরা কিছুই সঞ্চয় করে রাখতে পারে না।

অগ্রহায়ণ মাসে মঙ্গরী যখন একটি ছেলের জন্ম দিল, তখন আরও বিস্মিত হল রেখা। তার নিজের বয়েস পঞ্চাশ হয়েছে বলে নয়, কারণ মঙ্গরীর বয়েস ত্রিশ বছর এবং আরও কয়েকটি মৃত সন্তানের জননী হয়েছিল সে। তার বিস্মিত হবার কারণ হল, দুর্ভিক্ষের দিনে যখন নিজের অস্থিচর্মকে জীইয়ে রাখাই মুস্কিল তখন মঙ্গরী এক নতুন প্রাণীকে কেমন করে জীইয়ে রেখে জন্ম দিল!

মাঘ মাসে রামপুরের জমিদার হাতী-ঘোড়া, পাইক-পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে দয়ালপুরে এল। রেখা শুনেছিল, জমিদারের ঘরে একটি ছেলেমেয়েও শুকিয়ে যায়নি। দুর্ভিক্ষের সময়ে তার ঘরে সাত বছরের পুরনো চাল খাওয়া হয়েছে। জমিদারের কাছারি ছিল গ্রামের এক প্রান্তে, তার সামনে পঁচিশ একর জমি জুড়ে এক আমবাগান তৈরী করা হচ্ছিল। তাতে প্রয়োজনীয় জল-ঢালা ও মাটি খোঁড়ার কাজে দয়ালপুরবাসীদের বেগার দিতে হত। প্রতি ঘরের লোকের ওপর মালিক পঞ্চাশটি করে আমগাছের চারার ভার দিয়ে রেখেছিল। চারাগাছ শুকিয়ে গেলে একটির জন্য পাঁচ সিকি দণ্ড দিতে হত। রেখার পরবর্তীরা জমিদারের অত্যাচারকে সনাতন বলে মেনে নিতে আরম্ভ করেছিল। তাদের কাছে সোবরণ রাউৎ এবং রেখা ভগতের বাণত জমিদারের রূপ এবং গ্রামে পঞ্চায়েতের কাজ— এ সবই গল্প বলে মনে হত। আকালের পর মালিকের পেয়াদারা আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে

উঠেছিল। তারা ভাবত, কৃষকের মনোবল ভেঙে দিতে এবং মালিকের দাপট বাড়িয়ে তুলতেই আকালের আগমন হয়। অগ্রহায়ণ মাসে যখন রেখার চালে লাউগাছে ফল ধরতে সুরু করল, তখন থেকেই জমিদারের পেয়াদারা ঘোরাঘুরি করতে আরম্ভ করে। লোকে বলত, আকালের পর রেখার মেজাজ চড়ে গেছে। রেখার কাছে ওটা ভুল বলে মনে হত—কিন্তু কথাটা সত্যিই। বস্তুত, আকালের পরে গ্রামের অন্যান্য মানুষদের আত্মসম্ভ্রমবোধ যতটা নীচে নেমে গিয়েছিল, তার তুলনায় রেখা ছিল অনেক ওপরে। এই জন্যই তার ব্যবহার অন্যের কাছে রুক্ষ বলে মনে হত। পাইক-চৌকিদারকে নিজের ঘরের কাছে ঘুরতে দেখলে রেখা ভয়ানক রেগে যেত, যদিও মুখে সেটা প্রকাশ করত না। একদিন চৌকিদার দেওয়ানজীর জন্য লাউ পাড়বার জন্যে রেখার ঘরের চালের ওপর উঠল। রেখা ঘরে বসে ছেলে সুখারীকে কোলে নিয়ে আদর করছিল। চালের ওপর মচ্‌মচ শব্দ হতেই সুখারীকে মাদুরের ওপর রেখে বাইরে এল। দেখলে চৌকিদার চালার ওপর উঠে লাউ ছিঁড়ছে। তিনটি ইতিমধ্যেই ছিঁড়েছে, চতুর্থটি ছিঁড়বার জন্যে হাত বাড়িয়েছে। রেখার দেহে যেন আগুন জ্বলে উঠল। অর্ধেক গ্রাম শুনতে পায়, এমনি জোরে চীৎকার করে সে বলল, "কে হে?"

"দেওয়ানজীর জন্যে লাউ পাড়ছি, দেখতে পাচ্ছ না?"—মাথা না তুলেই উত্তর দিল চৌকিদার।

কর্কশস্বরে রেখা বলল, "হাত-পা আস্ত রাখতে চাও তো ভালোয় ভালোয় নেমে এস। —বলি শুনতে পাচ্ছ কথাটা?"

"মালিকের চাপরাশী জানো তো?"

"খুব জানি! ভালো মানুষের মতো লাউগুলো ওখানে রেখে নেমে এস।"

চৌকিদার নিঃশব্দে নেমে এল। সব শুনে দেওয়ানজী তখনকার মতো রাগ চেপে রাখল। মাঘ মাসে মালিকের আগমনের অপেক্ষায় থাকল সে।

মালিক আসবার পর সেই চৌকিদার একদিন সন্ধ্যাবেলা রেখা ভগতের বাড়ি এসে বলল, "কাল সকাল থেকে দু'সের করে দুধ মালিকের বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে।"

"আমার কাছে গরু মহিষ কিছুই নেই, দুধ কোথা থেকে দেব?"

"যেখান থেকে হোক, মালিকের হুকুম।"

দেওয়ান অবশ্যই জানত, রেখার গরু-মহিষ কিছুই নেই। কিন্তু রেখাকে তার টিট্ করতে হবে এখন। সন্ধ্যাবেলাতেই সে রেখার ঔদ্ধত্যের কথা মালিকের কাছে জানিয়ে দিয়েছে; আর এও বলেছে যে, সারা গ্রাম বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। মালিক সেই রাতের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল তার করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে। সকালে রেখার কাছ থেকে দুধ এল না। পেয়াদা এলে রেখা তার নিজের গরু-মহিষ না থাকার কথা জানাল।

মালিক পাঁচজন গুণ্ডাপ্রকৃতির পেয়াদাকে হুকুম দিল, "যাও হারামজাদার মাগের দুধ দুইয়ে নিয়ে এস।"

গ্রামের কয়েকজন লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা ভাবল, পেয়াদারা রেখাকে ধরে আনবে। রেখাকে কোনো কিছু বলার বা শোনার সুযোগ না দিয়ে পেয়াদারা তাকে বেঁধে ফেলল। তারপর দু'জনে ঘরে ঢুকে মঙ্গরীকে ধরে আনল। নিরুপায় রেখা অগ্নিবর্ণ চোখে দেখতে লাগল —মঙ্গরীর আর্ত চিৎকারের মধ্যেই তার স্তন টিপে ধরে গ্লাসের মধ্যে সত্যি-সত্যিই কয়েক ফোঁটা দুধ বের করল তারা।

পেয়াদারা রেখাকে বেঁধে রেখেই চলে গেল।

লজ্জায় মরে গিয়ে মঙ্গরী সেইখানেই মুখগুঁজে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে রেখা যেন কথা, বলার শক্তি খুঁজে পেল। বলল, "লজ্জা করিস না মঙ্গরী। আজ আমাদের গ্রামের পঞ্চায়েত বেঁচে থাকলে বাদশাহও এমন বেইজ্জতি কাউকে করতে পারত না। কিন্তু এই বেইজ্জতির মজা আমি দেখাব। যদি আমার দেহে সাচ্চা আহীরের রক্ত থাকে তো এই দেওয়ান এবং রামপুরের মুন্সীর কুলে কাঁদবার কেউ থাকবে না। এই অপমানের প্রতিকার আমার এই হাতই করবে মঙ্গরী। আয়, আমার বাঁধন ছাড়িয়ে দে।"

মঙ্গরী জলভরা চোখেই রেখার বাঁধন খুলে দিল। ঘরের ভিতর গিয়ে রেখা সুখারীকে কোলে নিয়ে তার মুখে চুমা দিতে থাকল। তারপর মঙ্গরীকে বলল, "এখান থেকে যা নেবার আছে তা নিয়ে শীগ্‌গির পালা। আমি এই ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছি।"

রেখার গলার স্বর মঙ্গরীর অজানা ছিল না। ছেলেকে কোলে নিল, আর দু-তিনখানা কাপড় সঙ্গে নিল —তারপর রেখার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

রেখা অত্যন্ত কোমল স্বরে বলল, "শুধু তোর ইজ্জৎ নয়, সারা গ্রামের ইজ্জতের বদলা নিতে হবে। চলে যা, আর বড় হলে সুখারীকে বলিস তার বাপ কেমন ছিল। দেরী করিস না, আমি চললাম চুল্লী থেকে আগুন আনতে।"

মঙ্গরী বহু দূর পর্যন্ত ঘরটাকে দেখতে লাগল —যতক্ষণ পর্যন্ত তার চাল থেকে লেলিহান শিখা উঠতে আরম্ভ না করল, ততক্ষণ। লোকেরা গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত রেখার ঘরের দিকে দৌড়তে লাগল, আর রেখা খোলা তলোয়ার নিয়ে দৌড়াল জমিদারের কাছারীর দিকে। নিজেদের জীবন সংশয় দেখে চৌকিদার, পেয়াদারা পালাতে লাগল। মালিক এবং দেওয়ানকে মারবার সময় রেখা বলল, "তোমাদের জন্যে কাঁদবার লোকও রাখব না শয়তানের দল!"

রেখা নিজের কথাকে সত্য প্রমাণিত করল। প্রতিজ্ঞা পূরণের চেয়েও বেশী করল সে। কসাই কর্নওয়ালিস না-জানি কতজন রেখাকে জন্ম দিয়েছিল!

মঙ্গল সিংহ

কাল : ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ

এরা দু'জনে আজ 'টাওয়ার' দেখতে গিয়েছিল। সেখানে এরা সেই কুঠরীগুলো দেখল যার ভিতর সারা জীবন বন্দী থেকে রাজদ্রোহীরা পচে মরত। বন্দীদের দেহ টানা দিয়ে রাখবার যন্ত্র, কুড়াল এবং অন্যান্য সেই হাতিয়ারগুলো দেখল —যার সাহায্যে রাজা প্রমাণ করত, প্রজার জীবন-মরণ তারই হাতের মুঠোয় এবং পৃথিবীতে সে-ই সত্যিকারের ঈশ্বর প্রেরিত যুবরাজ কিম্বা যমরাজ। কিন্তু সবচেয়ে যা আকর্ষণ করল এদের, তা হল সেই স্থান, যেখানে ইংলণ্ডের অনেক রাজারাণীর ছিন্নশির ধূলিলুণ্ঠিত হয়েছিল। এ্যানি রাসেল আজও তার কোমল হাত মঙ্গীর হাতে রেখেছিল। কিন্তু আজ সেই কোমলতা ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এগারো বছর আগে (১৮৪৫) বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রিসিটির মতো এক শক্তি এ্যানির হাত থেকে সারা শরীরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মঙ্গল সিংহ বলল, "এ্যানি, তুমি ব্যাটারী না-কি ?"

"এমন কথা কেন বলছ মঙ্গী ?"

"আমি যে সেই রকমই অনুভব করছি ! ষোলো বছর আগে যখন আমি ইংলণ্ডে পদার্পণ করি, তখন মনে হয়েছিল, অন্ধকার থেকে আলোতে এলাম। পৃথিবী এখানে বিশাল —লম্বা-চওড়ায় বড় নয়, কিন্তু দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিরাট জগৎ আমার চোখে পড়ল। চুকন্দরের চিনি (১৮০৮), বাষ্পীয় জাহাজ (১৮১৯), রেলওয়ে (১৮২৫), তার (১৮৩৩), দিয়াশলাই (১৮৩৮), ফোটো (১৮৩৯), বিজলী আলো (১৮৪৫)— এ-সব নতুন এবং আশ্চর্যজনক দেখবার জিনিস তো ছিলই কিন্তু যখন আমি কেম্ব্রিজে এ সম্বন্ধে পড়াশুনা এবং রসায়নাগারে এগুলোকে প্রত্যক্ষ প্রয়োগ করবার সুযোগ পেলাম, তখন বুঝতে পারলাম, পৃথিবীর অদৃষ্টে কি বিরাট এক ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে !"

"ইংলণ্ডে এসে সত্যিই তোমার মনে হয়েছিল যে, অন্ধকার থেকে আলোতে এলে ?"

"সেই অর্থে, যার কথা আমি এখনই বললাম। ভারত ছাড়বার সময় আমার মনে শুধু দুটো উদ্দেশ্য ছিল। এক আমার প্রিয় ইষ্টদেব যিশুখৃষ্টের ভক্তবৃন্দের দেশ দর্শন করব। দ্বিতীয়ত, আমাদের কুলের হারিয়ে যাওয়া রাজলক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব।"

"কতবার আমি ভেবেছি, তোমার মুখে তোমার কথা শুনব, কিন্তু বারম্বার কথায় কথায় ভুলে গিয়েছি। আজ তোমার কথাই বল মঙ্গী।"

"যে আমার জীবনের গতিকেই বদলে দিয়েছে তার কাছে বলতে আপত্তি কি ! এ্যানি প্রিয়তমা, চল শান্ত টেম্‌সের পারে। আমাদের গঙ্গার মতো অত বিরাট, অত সুন্দর নয় টেম্‌স, তবুও যখনই আমি টেম্‌সকে দেখি, তখনই গঙ্গার মধুর স্মৃতি আমাকে বিহ্বল করে তোলে। তুমি তো জানো এ্যানি, খৃষ্টানরা ভগবান যিশুখৃষ্ট ছাড়া আর কারও

পূজাকে বিধর্ম বলে মনে করে এবং ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু টেম্‌স আমাকে খৃষ্টান থেকে বিধর্মী করে দিয়েছে। আমি আমার মাকে অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে ফুল দিয়ে গঙ্গাকে প্রণাম করতে দেখেছি।"

দু'জন টেম্‌সের ধারে এসে পৌছাল। টেম্‌সের দিকে মুখ ঘুরিয়ে পাথরের চত্বরের ওপর ওরা বসল। শাদা টুপির ভেতর থেকে বেরিয়ে গালের ওপর এসে-পড়া এ্যানির সোনালী কেশগুচ্ছ হাওয়ায় উড়তে লাগল। মঙ্গল তাকে চুম্‌ দিয়ে কথা আরম্ভ করল, "এই টেম্‌সের পার থেকে বহুবার আমি গঙ্গাকে আমার মানস-তর্পণ নিবেদন করেছি।"

"তোমার মা গঙ্গাকে পুষ্পার্ঘ দিতেন ?"

"হ্যাঁ, খুব ভক্তিসহকারে, যেমন খৃষ্টানেরা প্রভু যিশুকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। তখন আমি প্রথম খৃষ্টান হয়েছি, আমার কাছে এটা ঘৃণিত প্রথা বলে মনে হত। কিন্তু এখন আমি গঙ্গাকে অপমান করার পাপের জন্য অনুতপ্ত হচ্ছি।"

"খৃষ্ট ধর্ম যে আদর্শকে নষ্ট করতে চেয়েছে, আমাদের কবিরা তাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। তুমি জানো, আমরা টেম্‌সকে পিতা বলে অভিহিত করি ?"

"আর আমরা বলি মা গঙ্গা…"

"তোমাদের কল্পনা আরও মধুর মঙ্গী ! তোমরা কথা বল আমাকে।"

"বেনারস আর রামনগর গঙ্গার এপার আর ওপার —উভয়ের দূরত্ব সামান্যই। ষোলো বছর পর্যন্ত আমি গঙ্গাকে দেখেছি। বেনারসে একেবারে গঙ্গার ওপরেই আমাদের বাড়ি। তার নীচ থেকে ষাট ধাপ সিঁড়ি গঙ্গার জল পর্যন্ত নেমে গেছে। সম্ভবত যখন আমি প্রথম চোখ মেলি, তখনই মা আমাকে কোলে নিয়ে গঙ্গা দেখিয়েছেন। কেন জানি না, আমার মনে হয়, আমার রক্তে গঙ্গা বয়ে চলেছে। রামনগরে আমার ঠাকুর্দার কেল্লা, কিন্তু সেটা আমি একবার মাত্র দেখেছি —নৌকা করে গঙ্গায় বেড়াবার সময়। ওর ভিতরে গিয়ে দেখবার ইচ্ছা আমার হত না, মা তো আরও যেতে চাইতেন না। বুঝতেই পারছ এ্যানি —যে একদিন ঐ কেল্লার যুবরাজ্ঞী ছিল আর আজ যে ইংরাজদের ভয়ে নাম বদলে বেনারসের এক বাড়িতে জীবন কাটাচ্ছে, সে কেমন করে ঐ কেল্লার দিকে তাকাতে সাহস করবে ? আমার ঠাকুর্দা চেৎসিংহকে দস্যু ওয়ারেন হেষ্টিংস নাজেহাল করেছে —ইংলণ্ডে হেষ্টিংস আপন কৃতকর্মের ফলও পেয়েছে কিছুটা, কিন্তু আমার ঠাকুর্দার প্রতি কিছুমাত্র ন্যায়-বিচার হয়নি, লুণ্ঠিত রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া বড় সহজ ন্যায়ের কাজ ছিল না, এ্যানি।"

"তোমার মা কি এখনও বেঁচে আছেন ?"

"বেনারস থেকে প্রায়ই আমাদের পাদ্রীর চিঠি আসে, আমি তাঁর মারফৎ মাকে চিঠি লিখি। পাঁচ মাস আগেও তিনি জীবিত ছিলেন এ্যানি।"

"প্রথমে তুমি খৃষ্টান ছিলে না তা'হলে ?"

"না, আমার মা এখনও হিন্দু। আমি প্রথম প্রথম তাঁকেও খৃষ্টান করতে চাইতাম, কিন্তু এখন…"

"এখন তুমিও তোমার মা'র সঙ্গে একত্রে মা গঙ্গাকে ফুল দিয়ে প্রণাম করবে ?"

"আর পাদ্রীরা বলবে, এ খৃষ্ট ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে।"

"তুমি খৃষ্টান হলে কি করে ?"

"অন্তরের প্রেরণা কিছুই ছিল না, বেনারসে ইংরাজ পাদ্রী এবং পাদ্রিনীরা খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করে বেড়ায়। কিন্তু বেনারস হল হিন্দুদের রোম। এ জন্য সেখানে তেমন সুবিধে করতে পারত না। একবার এক পাদ্রী ডাক্তার আমার মা'র অসুখের সময় চিকিৎসা করেন। তারপর তাঁর স্ত্রী আমাদের বাড়িতে যাতায়াত আরম্ভ করলেন। আমার মা'র সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমি তখন খুব ছোট ছিলাম এবং তিনি আমাকে প্রায়ই কোলে তুলে নিতেন…"

"ছেলেবেলায় তুমি বোধহয় খুব সুন্দর ছিলে —তাই না মঙ্গী ?"

"তারপর সেই পাদ্রী মাকে বোঝালেন যে, ছেলেকে ইংরাজী পড়াও। পাঁচ-ছ'বছর বয়স থেকেই পাদ্রী আমাকে ইংরাজী পড়াতে সুরু করলেন। মা নিজের পরিবারের অতীত বৈভবের কথা ভাবতেন এবং আশা করতেন, হয়ত ইংরাজী পড়ে ছেলে কুললক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আনবার জন্য কিছু করতে পারবে। আমার বাবা আমার তিন বছর বয়সের সময়ই মারা গিয়েছিলেন। এ জন্য আমার মাকেই সব কিছু করতে হত। আমাদের সব সম্পত্তি ও রাজ্য চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেদখল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মা'র কাছে তাঁর শাশুড়ীর দেওয়া প্রচুর মণিমুক্তা ছিল। আর আমার মামাও মাকে সাহায্য করতেন। আট বছর বয়স থেকে আমি বেশী করে সেই পাদ্রী দম্পতির বাড়িতে থাকতে লাগলাম। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জানবার সুযোগ আমার খুব কমই মিলত আর যদি কিছু মিলত তো সেই পাদ্রিনীর মুখ থেকে। তিনি বলতেন, 'এ তোমার ভাগ্য যে তোমার মা বেঁচে গিয়েছেন। না হলে তোমার বাবা মরে যাওয়ার পর লোকে তোমার মাকে জীবন্ত দগ্ধ করে সতী বানাতে চাইত।' আমার মাকে জীবন্ত দগ্ধ করার সঙ্গে হিন্দুধর্মকে এক মনে করার পর— তুমিই বুঝতে পার এ্যানি, আমার হৃদয়ে ঐ ধর্মের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা ছাড়া আর কোনো ভাবের উদ্রেক হতে পারে ? এই সময় সতীদাহ প্রথা বন্ধ হতে দু'বছর (১৮২৯) বাকী ছিল। আমার মঙ্গলের কথা ভেবে পাদ্রিনীর কথা মা মেনে নিলেন এবং পড়ার জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। কলকাতায় যখন পড়ছিলাম, তখন মা'র মনে সন্দেহ হল যে, আমাকে খৃষ্টান বানাবার জন্যেই পাদ্রিনী এই সব করছে। মা প্রথমে কিছু বুঝতে না পারায় ভালোই হয়েছিল, নইলে নিজের চোখ খুলবার সুযোগ পেতাম না।"

"ভারতবর্ষে শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর কথা কেউ কি ভাবে না ?"

"তেরশ' বছর আগে যে বিদ্যা পড়লে লাভ ছিল এখনো সেই বিদ্যাই শেখানো হয়।"

"তারপর ইংলণ্ডে আসবার জন্যে মা'র অনুমতি কি করে পেলে?"

"অনুমতি! পাদ্রীর সাহায্যে আমি মাকে না বলেই চলে এলাম। কেম্ব্রিজে পড়বার ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। এখান থেকে যখন আমি মাকে কুশল-সংবাদ পাঠালাম, তখন তিনি আশীর্বাদ জানালেন। তাঁর বয়স তখন পঞ্চান্ন। প্রত্যেক চিঠিতেই আমাকে দেশে চলে যেতে লিখতেন তিনি।"

"তুমি কি জবাব দিতে?"

"জবাব আর কি দেব? তিনি ভাবতেন, আমি রাজধানীতে আছি, ইংলণ্ডের রাণীর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে এবং এক সময় আমি চেৎসিংহের সিংহাসনের অধিপতি হয়ে দেশে ফিরব।"

"ঐ গঙ্গা-পূজারিণী বেচারী কি করে জানবেন যে, রাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়ে হয়েছে সমগ্র দুনিয়ার যত মুকুট-শোভিত-শিরের ভয়ঙ্কর শত্রু কার্ল মার্কস আর ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্‌সের সঙ্গে!"

"যে সময় সমগ্র ভারতবর্ষ পুঁজিবাদী দুনিয়া এবং তার শক্তি সম্বন্ধেই অজ্ঞ, তখন মার্কসের সাম্যবাদকে কি করে বুঝবেন তিনি!"

"মার্কসের সঙ্গে ভারত সম্বন্ধে কখনও কিছু কথা হয়েছে তোমার?"

"বহুবার। আমার অবাক লেগেছে যে, এখানে বসে বসে ভারতের জীবন-প্রবাহ সম্বন্ধে কি অসাধারণ জ্ঞান তাঁর! কিন্তু এ কোনো ভানুমতীর খেলা নয়, গত তিনশ' বছরে বিভিন্ন ইংরাজ ভারত সম্বন্ধে যতটা জ্ঞানার্জন করে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছে, সবই এই লণ্ডনে মজুত রয়েছে। আবর্জনার মতো পড়ে থাকা এই পুস্তকাবলী গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়েছেন মার্কস। আর যখনই কোনো ভারতীয়ের এখানে দেখা পেতেন, তাকে জিজ্ঞাসা করে তাঁর অধীত জ্ঞান যাচাই করে দেখতেন।"

"ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মার্কসের কি অভিমত?"

"ভারতের যোদ্ধাদের খুবই প্রশংসা করেন—আমাদের বুদ্ধিরও প্রশংসা করেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীনপন্থীদের, ভারতের সব চেয়ে বড় শত্রু বলে তিনি মনে করেন। আমাদের গ্রামগুলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোট-ছোট প্রজাতন্ত্র বলে মনে করেন।"

"প্রজাতন্ত্র?"

"সমগ্র দেশ নয়, দেশের একটা জেলা, এমন কি এক সঙ্গে দুটো গ্রামও নয়, শুধু একটি একক গ্রাম। কিন্তু সব জায়গাতে নয়, যেখানে লর্ড কর্নওয়ালিস ইংরাজি ছাঁচে জমিদারী প্রথা কায়েম করেছে, সেখানকার প্রজাতন্ত্র প্রথমেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় গ্রামীণ প্রজাতন্ত্রকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পরিচালনা করে থাকে। পুলিশ,

আইন, সেচ, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি সমস্ত বিভাগই সে পরিচালনা করে, এবং অত্যন্ত বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তা, ন্যায় এবং নির্ভয়তার সঙ্গে। গ্রামের এক অঙ্গুলি পরিমাণ জমি বা দুর্বলতম মানুষের ইজ্জৎ রক্ষার জন্যেও আপন পঞ্চায়েতের হুকুমে গ্রামের শিশু-বৃদ্ধ সর্বদা প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত থাকে। যখন দিল্লীর আশপাশে অল্প দূর পর্যন্তই, মুসলমান শাসকদের রাজত্ব ছিল, এবং তারা নিজেদের মুসাফির বলে মনে করত, সেই সময়ে প্রথম প্রথম [illegible] পঞ্চায়েতের ক্ষতি করতে চাইত। পরে তারা পঞ্চায়েতের স্বায়ত্ত শাসনকে মেনে [illegible]। কিন্তু ইংরাজ শাসকবৃন্দ, বিশেষ করে ইংলণ্ডের জমিদার লর্ড কর্নওয়ালিসই গ্রামীণ প্রজাতন্ত্রকে বরবাদ করবার আওয়াজ তুলল, এবং বহুলাংশে সফলও হল। কিন্তু এতেও সম্ভবত ভাঙত না এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। গ্রামের প্রজাতন্ত্র এবং তার অর্থ নৈতিক স্বনির্ভরতার ওপর সব চেয়ে বড় আঘাত এল ম্যানচেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়, শেফিল্ডের লোহার জিনিস এবং এখান থেকে রপ্তানী-করা আরও বহু জিনিসপত্রের কাছ থেকে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের ১০ তারিখে কলকাতায় প্রথম বাষ্পীয় পোত জলে নামল। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের প্রজাতন্ত্রের অর্থ নৈতিক অবশিষ্ট স্বাধীনতাটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম মলমল উৎপাদনের স্থান ঢাকা, দুই-তৃতীয়াংশ জনবিরল হয়ে পড়ল। গ্রামের তাঁতীদের অবস্থা হয়ে উঠল অবর্ণনীয়। যে ভারতীয় গ্রাম নিজেদের কামার, কুমার, জোলা, তাঁতী নিয়ে নিজেকে স্বাধীন মনে করত, তার এই সমস্ত কারিগর তখন হাত গুটিয়ে ঘরে বসে অনাহারে মরতে লাগল। আর তাদের জন্যে ল্যাঙ্কাশায়ার, ম্যানচেষ্টার, বার্মিংহাম, শেফিল্ডের মাল পাঠানো হতে লাগল। শুধু কাপড়ের কথাই ধর। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ভারত থেকে ব্রিটেনে ১৮,৬৬,৬০৮ থান কাপড় এসেছে এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৩,৭৬,০৮৬ থান। আর এখন আমাদের ওখানে ৮,১৮,২০,৯৫,১৭,৭৭,২৭৭ গজ বিলাতী কাপড় রপ্তানি হয়েছে। ঢাকাই মলমল বস্ত্র উৎপাদনকারী ভারতবর্ষ নিজের তুলা বিলাতে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় কাপড় তৈরী করাচ্ছে! একেবারে হালের হিসাব অনুযায়ী ১৮৪৬-এ ১০,৭৫,৩০৯ পাউণ্ড তুলা ভারত থেকে এখানে এসেছে।"

"কি নিষ্ঠুরতা, কি অত্যাচার!"

"কিন্তু মার্কস বলেন, বিদেশীদের এই অত্যাচারে আমাদের হৃদয় কেঁদে ওঠে, কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমত্তা তৃপ্ত হয় প্রাচীনপন্থার এই পতনে।"

"দুটোর মধ্যে তা'হলে দু'ধরনের পরিণতি ঘটছে?"

"হ্যাঁ এ্যানি! সন্তান প্রসবের সময় মা কি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করেন, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সন্তান প্রাপ্তির আনন্দও অনুভব করেন। ধ্বংস বিনা সৃষ্টি অসম্ভব। ছোট-ছোট ঐ সব প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস না করে বিরাট শক্তিশালী এক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করা যায় না। যতদিন পর্যন্ত ভারতীয়দের আসক্তি কেবলমাত্র নিজ-নিজ গ্রামীণ প্রজাতন্ত্রের

প্রতি সীমাবদ্ধ থাকবে, ততদিন সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য তারা আত্মত্যাগ করতে পারবে না। ইংরাজেরা নিজেদের ব্যবসার সুবিধার জন্যেই রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ এই সমস্ত যন্ত্রকে শুধু ভারতে আমদানি করছে, কিন্তু মার্কসের সিদ্ধান্তই সঠিক যে, রেলগাড়ি তৈরী এবং মেরামতের জন্য যদি ইংরাজ পুঁজিপতি ভারতীয় কয়লা এবং লোহাকে কাজে লাগাতে না পারে, তবে বেশী দিন তারা সস্তায় এইসব জিনিস চালাতে পারবে না। আর ভারতীয়েরাও বিজ্ঞানের এই চমৎকারিতা চোখের সামনে দেখে কতদিন ঘুমিয়ে থাকবে ?"

"অর্থাৎ ভারতেও শিল্প এবং পুঁজিবাদের বিস্তার অপরিহার্য ?"

"নিশ্চয়ই, ইংলণ্ডে এখন আর সামন্তবাদী প্রভুত্ব নেই।"

"হ্যাঁ, সংস্কার আইন (১৮৩২ খৃঃ.) ইংলণ্ডের শাসনভার পুঁজিপতিদের হাতেই তুলে দিয়েছে অথবা বলতে পার, পুঁজিপতিদের শাসনারূঢ় হবার সূচনা ঐ আইন।"

"তুমি ঠিকই বলেছ। আচ্ছা চার্টিস্টদের সভাসমূহ এবং পত্রিকাসমূহ কি তোমার ওপর কোনো রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল এ্যানি ?"

"ঐ আন্দোলনের সময় আমি ততটা সচেতন ছিলাম না, ওগুলোর স্মৃতি সামান্যই মনে আছে আমার। আমার কাকা রাসেল মন্ত্রীসভায় চার্টিস্টদের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। তাঁর মুখে বহুবার আমি ঐ বিপজ্জনক আন্দোলনের কথা শুনেছি।"

"আচ্ছা এ্যানি, এইসব কথা বলার সময় তাঁকে কি তেমনি জোরালো বক্তা রূপে দেখা যেত যেমনটি দেখা গিয়েছিল পার্লামেণ্টে বারো লক্ষ জনতার সহিযুক্ত সাধারণ দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সময় ?"

"না প্রিয়, এখনও তিনি ভয় করেন, যদিও এই ১৮৫৬ সালে চার্টিস্টদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু শোনাই যায় না।"

"ভয় কেন পাবেন না, এ্যানি ? পুঁজিপতি ব্যবসায়ীরা যেমন সামন্ত-শাসনকে ধ্বংস করে নিজেদের শাসন কায়েম করেছে, তেমনি মজুরেরাও এই পুঁজিপতিদের রাজ্য খতম করে ছাড়বে এবং মানবতার রাজ্য কায়েম করবে যেখানে ধনী-দরিদ্র, বড়-ছোট, কালো-সাদার ভেদাভেদ ঘুচে যাবে।"

"স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্যও ঘুচবে মঙ্গী ?"

"হ্যাঁ, স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের জুলুমে মারা পড়ছে। আমাদের দেশে সামন্তবাদ এই সেদিন পর্যন্তও সতীপ্রথার নামে লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোককে প্রতি বছর আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে আর এখনও তারা যে রকম পর্দার আড়ালে বন্দী হয়ে, সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পুরুষের জুলুম সহ্য করছে —সেটা মানবতার কলঙ্ক।"

"আমাদের এখানকার স্ত্রীলোকদের তুমি হয়ত স্বাধীন ভেবে থাকবে, কেন না, আমাদের পর্দার আড়ালে বন্দী করে রাখা হয় না।"

"স্বাধীন বলি না এ্যানি, শুধু এইটুকু বলি যে, তোমরা তোমাদের ভারতীয় বোনদের চেয়ে ঢের ভালো অবস্থায় আছ।"

"গোলামীর আবার ভালো-মন্দ! পার্লামেণ্টে ভোটের অধিকার নেই, বড়-বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চৌকাঠও আমরা পেরুতে পারি না। মুঠোর মধ্যে ধরা যায় এমন আঁট করে কোমর কষে, আর ষাট গজ কাপড় তা থেকে মাটিতে লুটিয়ে এমনি সব ঘাঘরা পরি আমরা—শুধু পুরুষদের খেলার পুতুল হবার জন্যে। সে যাহোক, তা'হলে মার্কস এই আশা করেন যে, ভারতে শিল্প এবং পুঁজিবাদের প্রসার হবে, যার ফলে একদিকে জনগণের মধ্যে অধিকতর সাহসের সঞ্চার হবে, অপরদিকে ওখানেও গ্রামের বেকার, কৃষক এবং কারিগরদের কারখানায় একত্রিত করা যাবে। তারপর তারা আপন শ্রমিক-সমিতি গড়ে লড়তে শিখবে এবং সাম্যবাদের ঝাণ্ডা নিয়ে ইংলণ্ডের মজুরদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবে, এবং পৃথিবীকে পুঁজিপতিদের গোলামী থেকে মুক্ত করে সেখানে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু এ তো কয়েক শত বছরের ব্যাপার মঙ্গী!"

"মার্কস এ কথাও বলেন, যদিও ইংরাজেরা বিজ্ঞানের দান কলকারখানা থেকে ভারতবর্ষকে বঞ্চিত করে রেখেছে, তবুও বিজ্ঞানের অ|রাপর দান যুদ্ধের অস্ত্রসমূহ দিয়ে ভারতীয় সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করেছে। এই ভারতীয় সৈন্যেরা ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে বড় রকমের সহায়ক হবে।"

"কিন্তু এ কি খুব শীঘ্র হতে পারে?"

"খুব দূরের ব্যাপার নয় এ্যানি, সময় এসেই গেছে। কাগজে পড়নি, ৭ই ফেব্রুয়ারী (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ) অযোধ্যাকে ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ, এবং নেওয়া হয়েছে বেইমানী করে।"

"বেইমানী বা ইমানদারী নিয়ে তর্ক করার কিছু নেই। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা সব কিছুই নিজেদের স্বার্থের জন্য করছে। কিন্তু অজ্ঞাতে তারা অনেক কিছু ভালোও করে ফেলেছে। তারা গ্রামীণ প্রজাতন্ত্রকে ভেঙে আমাদের সামনে দেশের বিস্তৃত রূপ তুলে ধরেছে। তারা নিজেদের রেল, তার, জাহাজ দিয়ে আমাদের কূপমণ্ডুকতাকে ভেঙে বিশাল জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত করেছে, অযোধ্যা অধিকার করায় কিছু পরিবর্তন আসবে, আর আমি তারই প্রতীক্ষায় আছি এ্যানি।"

"মার্কসের শিষ্যের কাছ থেকে আর কি আশা করা যেতে পারে?"

২

গঙ্গার প্রশান্ত তট আবার অশান্ত হয়ে উঠতে চাইল। বিঠুরের বিশাল প্রাসাদে পেশোয়ার উত্তরাধিকারী নানাসাহেব (ছোট) শুধু সিংহাসন থেকেই নয়, পেন্সন থেকেও

বঞ্চিত হয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠল। তার অনুচরেরা তারই মতো পদচ্যুত অপরাপর সামন্তদের কাছে রাত-দিন ছুটাছুটি করতে লাগল। এই সময় ইংরাজেরা আরও একটি বড় ভুল করে বসল। আর সে ভুল শুধু ভুলই নয়, নিত্য-নতুন পরিস্থিতির মধ্যে এ হল রীতিমতো প্রাণ নিয়ে টানাটানি। ইংরাজেরা আগের ছর্‌রা বন্দুকের জায়গায় আরও বেশী জোরদার কার্তুজের বন্দুক তাদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করল। এই কার্তুজ বন্দুকে ভরবার সময় দাঁতে কাটতে হত। অদূরদর্শী ইংরাজের শত্রু এই ব্যাপার থেকেই সুযোগ সংগ্রহ করে নিল। চারদিকে রব তুলে দিল যে, বন্দুকের কার্তুজের ভিতর গরু এবং শুয়োরের চর্বি আছে, ইংরাজেরা জেনেশুনেই এই কার্তুজ সিপাইদের দাঁতে কাটতে দিয়েছে, যাতে ভারতবর্ষ থেকে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম উঠে যায়, আর সকলেই খৃষ্টান হয়ে যায়।

কাশীরাজ চেৎসিংহের পৌত্র মঙ্গল সিংহের নাম সৈন্যদের মধ্যে বিদ্যুতের মতো কাজ করছে, এ কথা মঙ্গল সিংহ জানত, কিন্তু সে কখনও এই রহস্যকে উন্মুক্ত হতে দেয়নি। নানাসাহেব এবং অপর বিদ্রোহী নেতারা তার সম্পর্কে এইটুকুই জানত, সে ইংরাজ শাসনের পরম শত্রু, বিলেত গিয়ে সে ইংরাজদের বিদ্যা যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছে। রাজনীতি সম্বন্ধে তার প্রগাঢ় জ্ঞান। বিলাতে থাকার ফলে তার ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, যদিও খৃষ্টান ধর্মকেও সে মানে না।

বিদ্রোহী নেতাদের সযত্ন-রক্ষিত মনোভাব বুঝতে মঙ্গল সিংহের দেরী লাগল না। সে দেখল যে, পদচ্যুত সামন্তরা নিজ-নিজ অধিকারকে পুনরুদ্ধার করতে চাইছে এবং তার জন্য সকলের সাধারণ শত্রু ইংরাজকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। তাদের কাছে আত্মত্যাগী সৈন্যরা দাবার ঘুঁটির বেশী আর কিছুই নয়। ধর্ম নষ্ট হবার ভয়ে সিপাহীরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কার্তুজের চর্বি যদি দাঁতে কাটতে না হত তা'হলে সম্ভবত অনন্তকাল তারা কোম্পানীর জয়-জয়কার করে যেত, নিজেদের প্রাণও বিসর্জন দিত। আর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য —সে তো এতটুকুও কমেনি। উপরন্তু যদি বিদ্রোহ সফল হয়, তবে ধর্মের নামে গর্বিত নিরক্ষর সিপাহী আল্লা এবং ভগবানের কৃপাপাত্র হবার আশায় নিজেদের আরও বেশী কঠোর ধার্মিক বলে প্রমাণিত করবার চেষ্টা করবে। হয়ত গ্রাম এবং শহরগুলো লুণ্ঠন করতেও চাইবে তারা। যদিও এই ধরনের মনোবৃত্তি-সম্পন্ন সিপাহীদের সংখ্যা কমই ছিল এবং কম জায়গাতেই এমনি লুণ্ঠন চলেছিল। তা'হলেও সোরগোল এতটা বেশী হয়েছিল যে, গ্রামের লোকেরা ডাকাত পড়ার মতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল। দেশের মুক্তিদাতা সেনাবাহিনীর প্রতি এমন মনোভাব ভালো নয়। এ-সব জেনে মঙ্গল সিংহ প্রথমটায় নিরাশ হল। চেৎসিংহের সিংহাসন পুনরুদ্ধারের আশায় সে দেশে ফেরেনি, এসেছিল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার রাজ্য

প্রতিষ্ঠা করতে। তাতে জাত-পাত, হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ, ইংরাজ পুঁজিপতিদের শাসনের মতোই অবাঞ্ছনীয়। কূপমণ্ডুকতাকে সংরক্ষিত করতে সে চায়নি, ভারতবর্ষের বহু শতাব্দী-ব্যাপী সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনীকে ভেঙে তাকে বিশ্বের অভিন্ন অংশ রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সে চেয়েছিল। ইংরাজ পুঁজিপতিদের শাসন এবং শোষণকে হঠিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে এক সুন্দর জগৎ নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিল। কার্তুজের চর্বির মিথ্যা প্রচারকে সে সমর্থন করতে পারেনি কারণ এর দ্বারা ভারতবর্ষে ধর্ম আবার তার শিকড় গেড়ে বসবে।

নানাসাহেব এবং অপরাপর নেতারা দামী বিলাতী মদ ওড়াত এবং সুযোগ পেলেই মদ আর মাংস খেয়ে গৌরাঙ্গী সুন্দরীদের এঁটো মৈটে লেহন করবার জন্য লালায়িত হয়ে পড়ত। মজার ব্যাপার হল, এরাই ধর্মরক্ষার পবিত্র কর্তব্য নিয়ে বিক্ষুব্ধ সেনাবাহিনীর নেতৃপদ দখল করে বসল। এই সমস্ত দোষ-ত্রুটির সঙ্গে যখন একটা বিষয় মঙ্গল সিংহ চিন্তা করল, তখন আপন কর্তব্য স্থির করে ফেলতে তার দেরী হল না। যুগপৎ ইংরাজ-শাসক এবং ভারতীয় সামন্তদের গোলামীতে পিষ্ট হচ্ছিল ভারতবর্ষ, যার মধ্যে মজবুত এবং সুচতুর শাসন হল ইংরাজের। এদের হঠিয়ে দেবার পর শুধু স্বদেশী সামন্তদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে ---ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে যা অধিকতর সহজ কাজ।

জানুয়ারী মাস। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল, যদিও লণ্ডনের তুলনায় সেটা কিছুই নয়। বিঠুরে চারিদিকে স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। কিন্তু পেশোয়ার প্রাসাদের প্রহরীরা স্ব-স্ব স্থানে প্রহরায় নিযুক্ত। নিজেদের প্রভুর এক বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে এক অপরিচিত ব্যক্তিকে তারা মহলের ভিতর ঢুকতে দেখল। তারা আজকাল এমনি অপরিচিতদের প্রতি রাত্রেই মহলের ভিতরে ঢুকতে দেখে।

নানাসাহেবের সঙ্গে মঙ্গল সিংহের সাক্ষাৎ এই প্রথম নয়, কাজেই তারা একে অন্যকে বেশ ভালোভাবেই জানত। এখানে দিল্লীর বৃত্তিভোগী বাদশাহ, অযোধ্যার নবাব, জগদীশপুরের কুঁঅর সিংহ এবং অন্যান্য বহু সামন্তের প্রতিনিধিকে দেখতে পেল মঙ্গল সিংহ। ব্যারাকপুর (কলকাতা), দানাপুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা মীরাট প্রভৃতি ক্যাণ্টনমেণ্টের সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব কতদূর প্রাবল্য লাভ করেছে তা শোনা গেল। এটা আশ্চর্যের কথা যে, এত বড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে নেমে নিজেদের একটিও সৈন্য না রেখে এই সব সামন্তরা শুধু বিদ্রোহী সৈন্যদের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে বসেছিল। আর যুদ্ধবিদ্যার কথা ধরলে প্রায় সমস্ত নেতারই ছিল সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তবুও নিজেরা সর্বাধিনায়কের পদ অধিকার করবার জন্য ব্যগ্র ছিল। অত্যন্ত আশাপূর্ণ স্বরে নানাসাহেব বলল, "ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব নির্ভর করছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ওপর। সেই বাহিনী আজ আমাদের হাতে চলে আসছে।"

"কিন্তু সমস্ত ভারতীয় সৈন্যই কি আমাদের দিকে আসছে নানাসাহেব? পাঞ্জাবী শিখদের বিদ্রোহ করার কোনো খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অপর পক্ষে অপরাপর ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ইংরাজের পক্ষে লড়াই করে যেভাবে তাদের পাঞ্জাবকে পরাজিত করেছিল সে কথা স্মরণ করে পাঞ্জাবীরা তার প্রতিশোধই নিতে চাইবে। ইংরাজরাও বড় হুঁশিয়ার নানাসাহেব। না হলে পেশোয়া এবং অযোধ্যার নবাবের মতো দিলীপ সিংহকে যদি তারা কোথাও নজরবন্দী করে রাখত, তবে আজ সমস্ত শিখ পল্টনকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসা খুবই সহজ হত। যাহোক, আমাদের মনে রাখতে হবে, শিখ এবং নেপালী দেশীয় রাজ্যসমূহের পল্টনেরা আমাদের দিকে নেই। আর দেশের এই স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা আমাদের সঙ্গে নেই, তাদের বিরোধী বলেই ধরতে হবে।"

নানাসাহেব বলল, "আপনার কথা ঠিকই ঠাকুরসাহেব। কিন্তু যদি সূচনাতেই আমরা সাফল্য লাভ করতে পারি, তবে কোনো দেশদ্রোহীরই আমাদের বিরুদ্ধে লড়বার সাহস হবে না।"

"আরও একটি বিষয়ে আমাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এখন থেকেই জনসাধারণকে বোঝাতে হবে যে, আমরা দেশের মুক্তিযোদ্ধা।"

পূর্বাঞ্চলের এক প্রতিনিধি বলল, "আমরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করব --এই ব্যাপারটাই কি এ কথা বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়?"

মঙ্গল সিংহ, "সমস্ত জায়গাতেই তো চব্বিশ ঘণ্টা অস্ত্র ঝন্‌ঝন করবে না। আমাদের দেশে বহু কাপুরুষ রয়েছে যারা ইংরাজের অজেয়তা সম্পর্কে বিশ্বাসী। তারা নানা রকমের গুজব রটাবে। আমার মনে হয়, পূর্ব, পশ্চিম এবং মধ্য —এই তিন ভাগে ভাগ করে তিনটি হিন্দী এবং উর্দু খবরের কাগজ আমাদের ছাপতে হবে।"

নানাসাহেব, "ইংরাজি কায়দা-কানুন আপনার বেশী পছন্দ ঠাকুরসাহেব। কিন্তু খবরের কাগজ ছাড়াই আমরা কার্তুজের ব্যাপারটা রটিয়ে কিভাবে জনসাধারণকে তৈরী করেছি তা তো দেখছেন!"

মঙ্গল সিংহ, "কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে ইংরাজের চাকরেরা আমাদের বিরুদ্ধে যে সব কথা রটাবে, তার জন্য কিছু একটা করতে হবে নানাসাহেব। একদিনেই তো আমরা ইংরাজের গোটা শাসনযন্ত্রকে অধিকার করে নিতে পারব না। মনে করুন তারা গুজব রটিয়ে দিল যে, বিদ্রোহী সৈন্যরা, মনে রাখবেন আমাদের এই নামেই ডাকবে তারা —গ্রাম এবং শহর লুট করতে, ছোট ছেলেমেয়েদের কেটে ফেলতে আসছে।"

নানাসাহেব, "এ কথা কি লোকে বিশ্বাস করবে?"

মঙ্গল সিংহ, "যে কথা রটানো হবে এবং যে রটনার বিরুদ্ধে অন্য কোনো আওয়াজ উঠবে না সে কথা লোকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করবেই।"

নানাসাহেব, "মনে হয়, কার্তুজের ব্যাপারে ধর্মবিদ্রোহী বলে ইংরাজদের এত বদনাম করে দিয়েছি যে ওদের কোনো কথাই কেউ বিশ্বাস করবে না।"

মঙ্গল সিংহ, "আমি কিন্তু একে যথেষ্ট মনে করি না। যাইহোক, আমাদের এই লড়াইকে ইংরাজেরা নিছক বিদ্রোহ বলে প্রচার করবে। কিন্তু দুনিয়ায় আমাদের মিত্র এবং ইংরাজের শত্রু অনেক, তারা আমাদের স্বাধীনতা কামনা করে—বিশেষ করে ইউরোপে এ রকম বহু জাতি আছে। এই জন্য আমাদের এই লড়াইকে সমগ্র ইউরোপীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে জেহাদ্ রূপে আমরা দাঁড় করাব না এবং শান্তিপূর্ণ ইংরাজ বালবৃদ্ধ নারীদের ওপর হস্তক্ষেপ করব না। তাতে আমাদের কোনো লাভ হবে না, উল্টে দুনিয়া জুড়ে ভারতবর্ষের বদনাম হবে।"

নানাসাহেব, "এ সব সেনাপতিদের মনে রাখবার কথা। কোন সময়ে কি করতে হবে, সে সম্বন্ধে তারা নিজেরাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।"

মঙ্গল সিংহ, "সবশেষে আমি বলতে চাই, যুদ্ধে যে সৈন্যরা নিজেদের জীবন পণ করছে এবং যে যুদ্ধে জনসাধারণের কাছ থেকেও সাহায্য আশা করছি, তাকে চর্বিযুক্ত কার্তুজের ঝগড়ায় সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। আমাদের বলতে হবে, ইংরাজদের তাড়িয়ে দিয়ে কি ধরনের রাজত্ব আমরা কায়েম করব। সেই রাজত্বে সৈন্য এবং যে কৃষকশ্রেণী থেকে সৈন্যরা আসছে সেই কৃষককুল কি পাবে।"

নানাসাহেব, "ধর্মদ্রোহীদের শাসন উঠিয়ে দেওয়াই তো তাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য পর্যাপ্ত।"

"এ প্রশ্ন যদি আপনাকেই করা যায় তা'হলে কি জবাব দেবেন আপনি? আপনার মনে কি পেশোয়ার রাজধানী পুণাতে ফিরে যাবার ইচ্ছা নেই? নবাবজাদার অন্তরে কি লক্ষ্ণৌর তখতের আকর্ষণ নেই? যখন আপনারা কার্তুজ এবং ইংরাজ-শাসন থেকে মুক্ত হবার চেয়েও বড় ইচ্ছা পোষণ করেন—যার জন্য আপনারা জীবনকে বাজী রাখতে চলেছেন, তখন আমি মনে করি, জনসাধারণের সামনেও ভবিষ্যৎ লাভের বিষয়ে কিছু বলে রাখা উচিত। যেমন, গ্রামে গ্রামে আমরা পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করব, যেখানে অল্প ব্যয়ে লোকে ন্যায়বিচার পাবে। সমগ্র দেশে আমরা একটি পঞ্চায়েত বানাব, যাকে সমস্ত গ্রামের প্রজাসাধারণ নির্বাচন করবে এবং বাদশাহের ওপরও যার ক্ষমতা থাকবে। জমিদারী প্রথা আমরা উঠিয়ে দেব এবং কৃষক আর সরকারের মাঝে কোনো স্বত্বভোগী থাকবে না। জায়গীর যারা পাবে তারা শুধু সরকারকে দেয় খাজনাই আদায় করতে পারবে। যাতে কেউ বেকার বসে না থাকে সে'জন্যে সেচকার্যের উপযোগী নালা আর বাঁধ তৈরী করব আমরা। তাতে কোটি-কোটি মজুরের কাজ মিলবে, দেশের মধ্যে বহুগুণ বেশী তরি-তরকারী জন্মাবে এবং কৃষি-কাজের জন্য অনেক নতুন জমি পাওয়া যাবে।"

মঙ্গল সিংহের কথাগুলোকে কেউ বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইল না। সকলের মতে ওগুলো সব রাজত্ব হাতে আসবার পরের কথা।

খাটিয়ার ওপর শোবার অনেকক্ষণ পরেও মঙ্গল সিংহের চোখে ঘুম এল না। সে ভাবছিল, এটা বৈজ্ঞানিক যুগ। রেল, তার, স্টিমারের যাদুকে সে স্বচক্ষে দেখছে। দিয়াশলাই, ফটোগ্রাফি এবং বিদ্যুতের যুগে মানব-সমাজ প্রবেশ করছে ; কিন্তু এইসব লোক পুরনো যুগের স্বপ্ন দেখছে। তবুও এই ঘোর অন্ধকারের মাঝে একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারল সে। এই লড়াই শুধু জনসাধারণের শক্তি দিয়েই পরিচালনা করা সম্ভব হবে, ফলে জনগণ আপন শক্তিকে চিনতে পারবে। বিলাতী পুঁজিপতিরা যেমন বিলাতের মজুরশ্রেণীর সাহায্য নিয়ে আপন প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করে মজুরদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে, এই ভারতীয় সামন্তরাও ভারতীয় জনতা—সৈন্যবাহিনী ও কৃষককুলের সঙ্গে কাজ শেষ হয়ে গেলেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে। কিন্তু এরা জনসাধারণের মন থেকে তাদের আত্ম-বিশ্বাসকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বাইরের শত্রুর কাছ থেকে বাঁচবার জন্যে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারকে কাজে লাগাবেই। রেল-লাইন, টেলিগ্রাফের লাইন, কলকাতায় প্রস্তুত স্টিমার এখন আর ভারত থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। মঙ্গল সিংহের আস্থা অবক্ষয়ী সামন্ত-নায়কদের ওপর ছিল না, ছিল পৃথিবীতে মানব-সমাজের পরিবর্তনকারী শক্তিশালী জনগণের ওপরেই।

৩

১০ই মে (১৮৫৭ খৃঃ.) মঙ্গল সিংহ মীরাটের কাছে ছিল, এই সময় সৈন্যেরা বিদ্রোহের ধ্বজা ওড়াল। বাহাদুর শাহের প্রতিনিধিদের নামে একটা বাহিনীকে সে নিজের অধীনে রাখবার সুযোগ পেল। মঙ্গল সিংহের যোগ্যতা সম্পর্কে কারও কোনো সংশয় ছিল না, কিন্তু তারা জানত যে, তার উদ্দেশ্য অন্যান্য নেতৃবর্গ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তাই তাকে দিল্লীর দিকে না পাঠিয়ে, পূর্বদিকে পাঠিয়ে দিল। তারা কেউ ভাবতে পারেনি, মীরাটের পূর্ব এবং পশ্চিমের ঐ রাস্তা ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধের ভাগ্যে কোনো পৃথক ফল প্রসব করবে না। দিল্লীর দিকে ধাবিত সৈন্যদের মঙ্গল সিংহের মতো নেতার প্রয়োজন ছিল—যে দিল্লীর প্রতিষ্ঠাকে পূর্ণভাবে যুদ্ধজয়ের কাজে লাগাতে পারত। মঙ্গল সিংহের বাহিনীতে এক হাজার সৈন্য ছিল। তারা ভাবত আমরা সকলেই জেনারেল। এদের এই কথাটা বোঝাতেই মঙ্গল সিংহের এক সপ্তাহ লেগে গেল যে, শুধু জেনারেলের বাহিনী কখনও যুদ্ধে জিততে পারে না। সৈন্যবাহিনীতে মঙ্গল সিংহ ছাড়া উচ্চ সৈনিক-বিদ্যা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি ছিল না। আর এই একই অবস্থা সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনীতে। এক জায়গায় থেকে শিক্ষা দেবার সুযোগ মঙ্গল সিংহের ছিল না। তখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, অধিকতর এলাকায় ইংরাজ শাসনকে দ্রুত ধ্বংস করা।

গঙ্গা পার হয়ে রোহেলখণ্ডে প্রবেশ করেই মঙ্গল সিংহ প্রত্যেক রাতে সৈন্যদের কাছে রাজনৈতিক আদর্শের কথা প্রচার করত। সৈন্যদের বুঝতে বেশী সময় লাগত, তাদের মনে নানা রকম সন্দেহ জাগত, মঙ্গল সিংহ সেগুলো দূর করে দিত, এরপর মঙ্গল সিংহ ফ্রান্সের দুটো বিপ্লবের ইতিহাস (১৭৯২ ও ১৮৪৮ খৃঃ.) শোনাল, এও বলল যে, কি করে ওয়েল্‌সের মজুরশ্রেণী ভারত-শাসক এই ইংরাজ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল, এবং অসীম কৃতিত্বের সঙ্গে লড়েছিল। সংখ্যাবলের সাহায্যে পুঁজিপতিরা তাদের দমন করতে পেরেছিল, কিন্তু তাদের অর্জিত অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি। এইসব শুনে যুদ্ধরত তার সৈন্যদের আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেল।

এদের প্রত্যেকেই স্বাধীনতা-যুদ্ধের সাধক হয়ে উঠল, তারা গ্রাম-শহরে গিয়ে কথায় এবং ব্যবহারে লোকের মনে বিশ্বাস এবং সম্মানের উদ্রেক করতে লাগল। ইংরাজদের খাজনার প্রতিটি পয়সা ঠিকমতো ব্যয় করা—প্রয়োজন হলে লোকের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা, কিন্তু স্থানীয় পঞ্চায়েত কায়েম করে তার কাছ থেকে এবং লোককে বুঝিয়ে তাদের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা অনুসারে—এ সব কাজ তারা মঙ্গল সিংহের নির্দেশ অনুযায়ী করেছিল। কোনো জিনিসই বিনামূল্যে না নেওয়া এবং প্রত্যেকটি জায়গায় হাজার হাজার লোকের মধ্যে মঙ্গল সিংহের বক্তৃতা এগুলো এমনই ব্যাপার ছিল যার প্রভাবে দলে দলে তরুণরা স্বাধীনতার সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্য আসতে লাগল।

মঙ্গল সিংহ সৈনিকদের শিক্ষার ব্যাপারে শুধু প্যারেডই নয়—গুপ্তচর, রসদ-সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা দিতে লাগল, হাকিম এবং বৈদ্যের এক বাহিনীও সে সঙ্গে রাখল। সামন্তশাহী লুঠতরাজ এবং দুর্নীতির পঙ্ক পরিষ্কার করবার জন্য শিক্ষিতদের মধ্যে দেশভক্তি জাগানো প্রয়োজন ছিল আর এই সময়ে সেটা সহজ কাজ ছিল না। তবুও দুটো দিন মঙ্গল সিংহের সঙ্গে যে থেকে গেছে, সে তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেনি। সিপাহীদের মধ্যে মঙ্গল সিংহের আচরণ দেখে কেউ বলতে পারত না যে সেই অধিনায়ক। শেষ পর্যন্ত তার সৈন্য সংখ্যা দু'হাজার অবধি পৌঁছেছিল। তার ইঙ্গিতে প্রাণ দেবার জন্য পল্টনের প্রত্যেকটি প্রাণ সদা প্রস্তুত থাকত। মঙ্গল সিংহ সব সময়েই সিপাহীদের সঙ্গে একত্রে আহার করত, তাদেরই মতো কম্বলে শয়ন করত, আর বিপদের সময় সকলের আগে ঝাঁপিয়ে পড়ত। বন্দী ইংরাজ স্ত্রী-পুরুষকে সে যথেষ্ট আরামে রেখেছিল। তারাও সেনাপতির ভদ্র আচরণ দেখে বিস্মিত হত, কারণ ঐ সময়ে ইউরোপেও কয়েদীদের সঙ্গে এই ধরনের ভদ্র ব্যবহার করা হত না। মঙ্গল সিংহ রোহেলখণ্ডের চারিটি জেলায় গেল এবং সব জায়গাতেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করল

নানাসাহেব ৫ই জুন (১৮৫৭ খৃঃ.) ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করল এবং দেড় মাস যেতে না যেতেই ১৮ই জুলাই ইংরাজদের কাছে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হল।

হাওয়া ঘুরে গিয়েছে এটা বুঝতে মঙ্গল সিংহের দেরী হল না, তবুও আজাদীর ঝাণ্ডাকে সে জীবিতাবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হতে দিল না ইংরাজদের সৈন্যরা অযোধ্যায় নিরস্ত্র জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা করতে সুরু করল, স্ত্রীলোকের প্রাণ, মান, ইজ্জৎ পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলল, এ সব শুনেও মঙ্গল সিংহ এবং তার সৈন্যেরা কোনো বন্দী ইংরাজের দেহে হস্তক্ষেপ করল না।

বর্ষাকাল শেষ হতে না হতে সব জায়গাতেই বিদ্রোহীদের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ল কিন্তু রোহেলখণ্ড এবং পশ্চিম অযোধ্যায় মঙ্গল সিংহ অস্ত্র উঁচিয়ে রাখল। চারিদিক থেকে ইংরাজ, গুর্খা এবং শিখ সৈন্যেরা তার ওপর আক্রমণ চালিয়ে চলেছিল। মুক্তিসেনার সংখ্যা দিনে দিনে কমে যেতে লাগল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে অনেককে বাড়ি পাঠিয়ে দিল মঙ্গল সিংহ, কিন্তু মীরাট থেকে আগত এক হাজার সৈন্যের মধ্যে কেউই তার সঙ্গ ছাড়তে রাজি হল না। অবশেষে মঙ্গল সিংহ এমন এক ব্যাপার দেখল যা তার কাছে মৃত্যুকেও আনন্দময় করে তুলল। উৎসর্গীকৃত প্রাণ, দেশব্রতী তার এই ছোট বাহিনীতে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, জাঠ, গুর্জর, হিন্দু-মুসলমানের সকল ভেদাভেদ চলে যেতে লাগল। সকলে এক সঙ্গে রুটি বানাতে লাগল এবং এক সঙ্গে খেতে লাগল। এইভাবে তারা ভারতবর্ষের এক জাতিত্বের উদাহরণ স্থাপন করল।

বিন্দা সিংহ, দেবরাম, সদাফল পাণ্ডে, রহিম খাঁ ও গুলাম হোসেন —মীরাটের এই পাঁচজন সিপাহী মঙ্গল সিংহের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিল। যখন গঙ্গার দু'দিক থেকে তার নৌকা আক্রান্ত হল, তখন বন্দী ইংরাজ নর-নারীদের অনুরোধে ইংরাজ জেনারেল ক্ষমা ঘোষণা করে শর্ত দিল যে, মঙ্গল সিংহ আত্মসমর্পণ করুক, কিন্তু মঙ্গল সিংহ গুলি চালিয়ে ইংরাজদের শর্ত প্রত্যাখ্যান করল। অবশেষে ছ'টি মৃতদেহ নিয়ে গঙ্গার বুকে ভাসমান মঙ্গল সিংহের নৌকা ইংরাজদের হাতে বন্দী হল। ইংরাজেরা সেদিন ভারতীয় বীরত্বের প্রতি অভিবাদন জানাল।

সফ্দর

কাল : ১৯২২ খৃষ্টাব্দ

ছোটো সুন্দর বাংলো। বিশাল প্রাঙ্গনের এক ধারে লাল এবং গোলাপী রঙের বড় বড় ফুল ফুটেছে। একদিকে ব্যাডমিন্টন খেলার ছোট লন। লনের সযত্ন-লালিত সবুজ ঘাসগুলোর ওপর হেঁটে বেড়ানোও এক আনন্দের বস্তু। তৃতীয় দিকে এক লতামণ্ডপ এবং চতুর্থ দিকে বাংলোর পেছনে খোলা বারান্দা, সন্ধ্যার সময় সফ্দর প্রায়ই সেখানে বসতেন।

বাংলোর বাইরের দেয়ালের প্রাচীর বেয়ে সবুজ লতা উঠেছে। সফ্‌দর সাহেব অক্সফোর্ডে এমনি এক লতামণ্ডিত গৃহ দেখেছিলেন, নিজের বাংলোর প্রাঙ্গনে মনোরমভাবেই এগুলোকে লাগিয়েছেন।

এ ছাড়া তাঁর দু'টো মোটর গ্যারেজও রয়েছে। সফ্‌দর জঙ্গ-এর সব কিছুতেই হুবহু ইংরেজী ঢঙ। আধ ডজন চাকর-বাকর তাঁর —ইংরাজ অফিসারের চাকরদের মতোই তাদের সব আদব-কায়দা। কোমরে লালপট্টি, আঁটো করে বাঁধা পাগড়িতে নিজ সাহেবের নাম-চিত্র (মনোগ্রাম)। খাওয়ার ব্যাপারে বিলিতি খানাই ছিল সফ্‌দর সাহেবের সব চেয়ে প্রিয় এবং খানসামাও সে'জন্য রাখা হয়েছিল তিন জন।

সফ্‌দর তো সাহেব ছিলেনই, সাকিনাকেও চাকর-বাকর মেমসাহেব বলে ডাকত। সাকিনা ধনুকের মতো বাঁকা ভ্রূর অতিরিক্ত রোমরাজি কামিয়ে ফেলে আরও সূক্ষ্ম করে নিয়েছিলেন এবং কলপ দিয়ে সেই বঙ্কিম ভ্রূ হয়েছে আরও সুন্দর। পনের মিনিট অন্তর লিপষ্টিকে ঠোঁট রাঙানো তাঁর অভ্যাস। তবে বিলিতি মেয়েদের পরিচ্ছদ কখনই পছন্দ করতেন না সাকিনা।

গত বছর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সফ্‌দর সাহেব বিলেত যান। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, সাকিনাও স্কার্ট-পেটিকোট পরেন। সাকিনা কিন্তু এতে রাজী হননি। আর বিলেতের নর-নারীরা সাকিনার সৌন্দর্যের সঙ্গে তাঁর বেশভূষারও যে রকম তারিফ করেছিল, তাতে সফ্‌দরের আর কোনো আফসোশ ছিল না। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের গায়ের রঙই এত পরিষ্কার যে, ইউরোপে সবাই তাঁদের ইতালীয়ান মনে করত।

১৯২১-এর শীতকাল। উত্তর ভারতের সমস্ত শহরের মতো লক্ষ্ণৌতেও শীতকালটাই সবচেয়ে সুন্দর। সফ্‌দর সাহেব আজ কাছারী থেকে ফিরেই বাংলোর পিছনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে এসে বসেছেন। তাঁর মুখমণ্ডল আজ অপেক্ষাকৃত গম্ভীর। সামনের ছোট টেবিলের ওপর তাঁর নোটবুক এবং আরও দু-তিনখানা বই রয়েছে। পাশে তিনখানা খালি চেয়ার। সফ্‌দরের পরনে কড়া ইস্ত্রী করা প্রথম শ্রেণীর ইংরাজী স্যুট। তাঁর গোঁফদাড়ি-বিহীন মুখের এই সময়কার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সাহেব আজ কোনো গুরুগম্ভীর চিন্তায় মগ্ন। এই সময় চাকর-বাকরেরা খুব কমই আসত মনিবের সামনে। এমনিতে সফ্‌দর সাহেব মোটেই রাগী নন তবে চাকর-বাকরেরা ধরে রেখেছিল যে, এ রকম সময় সাহেব একলা থাকতেই ভালোবাসেন।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে কিন্তু সফ্‌দর ঐ একই আসনে বসে রয়েছেন। একজন চাকর টেবিল ল্যাম্প এনে রাখল সামনে। বাংলোর দিক থেকে কার যেন আসার শব্দ পেলেন সফ্‌দর। চাকরকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, 'মাস্টার শঙ্কর সিংহ ফিরে যাচ্ছেন।' —দৌড়ে গিয়ে মাস্টারজীকে ডেকে আনবার আদেশ দিলেন সফ্‌দর।

মাস্টার শঙ্কর সিংহের বয়স এই ত্রিশ-বত্রিশ, কিন্তু ইতিমধ্যেই বার্ধক্যের ছাপ পড়ে গেছে তাঁর চেহারায়। তাঁর গলাবন্ধ কালো কোট, পায়জামা, মাথায় গোল ফেল্ট-টুপি, ঠোঁটের ওপর ঝুলে-পড়া ঘন কালো গোঁফে তারুণ্যের কোনো চিহ্নই নেই। যদিও তাঁর উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে প্রতিভা ফুটে ওঠে।

মাস্টারজী পৌঁছতেই সফ্দর উঠে তাঁর হাত ধরলেন এবং চেয়ারে বসিয়ে বললেন, "শঙ্কর, দেখা না করেই ফিরে যাচ্ছিলে ?"

"ক্ষমা কর ভাই সাহেব, ভেবেছিলাম তুমি কোনো কাজে ডুবে রয়েছ।"

"মোকর্দমার দলিলপত্রে একেবারে ডুবে থাকলেও আমার কাছে তোমার জন্য দু'মিনিট সময় সর্বদাই থাকে, আর আজ তো কোনো দলিলপত্রও নেই !"

শঙ্কর সিংহের প্রতি সফ্দরের নিবিড় স্নেহ ছিল, অপর কাউকে তিনি তার চেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে করতেন না। সৈয়দপুর স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে লক্ষ্ণৌতে বি. এ. পাশ করা পর্যন্ত দু'জনেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পরীক্ষায় কখনও কেউ দু'চার নম্বর বেশী পেতেন, কখনও বা কম। কিন্তু যোগ্যতার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তাঁদের মধ্যে কখনও ঝগড়া বা মনোমালিন্য হয়নি। একটি ব্যাপারে দু'জনের বন্ধুত্বকে নিবিড় করে তুলতে সাহায্য করেছিল —তাঁরা দু'জনেই ছিলেন গৌতম-রাজপুত বংশের সন্তান। একজনের পরিবার আজ হিন্দু আর অন্যজন মুসলমান কিন্তু দশ পুরুষ আগে এই দুটো পরিবার শুধু যে হিন্দু ছিল তাই নয়, উপরন্তু দুটো বংশই পূর্বজে গিয়ে মিলে যেত। বিশেষ বিশেষ কারণে সংঘটিত পারিবারিক মিলন-সভাগুলোতে এখনও দুই পরিবারের লোককে একত্রিত হতে দেখা যেত।

সফ্দর পিতার একমাত্র পুত্র। একজন ভাই-এর অভাব তাই খুবই অনুভব করতেন তিনি। আর সেই অভাব পূরণ করেছিলেন শঙ্কর, কিন্তু এ সব তো বাইরের ব্যাপার। এগুলো ছাড়াও শঙ্করের মধ্যে এমন গুণ ছিল, যার জন্য পাকা সাহেব সফ্দর সাদাসিধে শঙ্করের প্রতি এতটা স্নেহপরায়ণ এবং শ্রদ্ধাবান। শঙ্কর ছিলেন অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির কিন্তু খোসামোদ করতে জানতেন না। ফলে, প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করেও আজও তিনি সরকারী স্কুলের সামান্য শিক্ষকই। তিনি যদি সামান্য একটু ইঙ্গিত করতেন তবে অপরে তাঁর জন্য সুপারিশ করতে পারত এবং তাতে তিনি কোনো হাইস্কুলের হেডমাস্টার হয়ে যেতেন। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হয়, সারাজীবন সহকারী শিক্ষক হয়েই তিনি থাকতে চান। হ্যাঁ একবার অবশ্য বন্ধুর সাহায্য নিয়েছিলেন —লক্ষ্ণৌর বাইরে যখন বদলী করা হয়েছিল তাঁকে। বিনয়ের সঙ্গে আত্মসম্মান বোধও শঙ্কর সিংহের মধ্যে ছিল প্রবল, যাকে অত্যন্ত সম্ভ্রম করে চলতেন সফ্দর সাহেব। তাঁদের বারো বছর বয়সের বন্ধুত্ব আজ বিশ বছর পরেও ঠিক তেমনি আছে।

এ-কথা সে-কথা করে দুটো চারটে কথাবার্তার পরই সোনালী ধান-রঙের শাড়ি এবং লাল ব্লাউজ পরিহিতা সাকিনা এসে হাজির হলেন।

শঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নমস্কার বৌদি!"

মৃদু হেসে 'নমস্কার' বলে জবাব দিলেন বৌদি। ধনী 'স্যার'-এর গ্রাজুয়েট দুহিতা সাকিনা কোনো দিনই পর্দার আড়ালে থাকেননি, কাজেই শঙ্কর সিংহের সামনে আসা বা না-আসার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সফ্দরের সঙ্গে শঙ্করকে নিঃসঙ্কোচে কথাবার্তা বলতে দেখলেই বিয়ের পর প্রথম মাস ছয়েক পর্যন্ত ভ্রূ কুঁচকে থাকত সাকিনার। পরিশেষে সফ্দরের কাছে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, শঙ্কর বাস্তবিকই স্নেহ-সম্মানের পাত্র। বর্তমানে তো শঙ্করের সঙ্গে সাকিনার খাঁটি দেওর-বৌদির সম্পর্ক। সাকিনা নিজেকে স্বেচ্ছায়ই সন্তানহীনা করে রেখেছিলেন, কিন্তু মাঝে-মাঝে তিনি শঙ্করের শিশুপুত্রকে কাছে এনে রাখতেন।

এ দিকে গত ছ'বছর থেকে শঙ্কর বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর ওপর ভগবান শঙ্করের কৃপা অসীম। তাঁর ঘরে দু'বছরের কম বয়সের কোনো না কোনো শিশু সব সময়েই রয়ে যাচ্ছে বিগত ছ'বছরে।

গত এক সপ্তাহ ধরে সফ্দরের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য সাকিনাকে চিন্তিত করে তুলেছিল। আজকে শঙ্করকে দেখে বড়ই খুশী হলেন। কেন না তিনি জানতেন যে, সাহেবের মনের ভার লাঘব করতে একমাত্র শঙ্করের সাহায্যের প্রয়োজন। তাঁর দিকে তাকিয়ে সাকিনা বললেন, "ঠাকুরপো, তোমার তাড়া নেই তো? বৌদির হাতের চকোলেট পুডিং কেমন লাগবে?"

সফ্দর, "এ আর জিজ্ঞেস করবার দরকার কি?"

সাকিনা, "আমি জেনে নিতে চাই ঠাকুরপো কখন যাবেন। তাঁর চলে যাবার তো কোনো ঠিক নেই!"

শঙ্কর, "এমন কথা বল না বৌদি! কখনো তোমার হুকুম অমান্য করেছি?"

সাকিনা, "কিন্তু হুকুম শোনার আগে সরে পড়া সেও তো এক অপরাধ।"

শঙ্কর, "আমার হুকুমদার বৌদির হুকুম শুনতে আমি সব সময় প্রস্তুত।"

সাকিনা, "আচ্ছা তা'হলে খাবার এবং পুডিং খেয়ে যেতে হবে তোমাকে।"

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন সাকিনা। সফ্দর এবং শঙ্করের বাক্যালাপও ক্রমশ গুরুতর বিষয়ে প্রবেশ করল। সফ্দর বললেন, "সম্পূর্ণ নতুন এক বৈপ্লবিক যুগে আমরা প্রবেশ করেছি শঙ্কর। আমার মতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পর এই প্রথম সমগ্র ভারতভূমির ভিতসুদ্ধ টলমল করে উঠেছে।"

"সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলতে চাইছ?"

"রাজনৈতিক আন্দোলন কথাটা অত্যন্ত সাধারণ, শঙ্কর। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন সেটা ইংরেজ আই-সি-এস সাহেবদের অবসর বিনোদনের প্রতিষ্ঠান ছিল, তখনও কংগ্রেসের বড়দিন-উৎসবের বক্তৃতা এবং সুরাপানকে 'আন্দোলন' আখ্যাই দেওয়া হত। তুমিও যদি তাকে আন্দোলন বলতে চাও তো আমি বলব, আন্দোলনের যুগ থেকে আমরা এখন বিপ্লবের যুগে প্রবিষ্ট হয়েছি।"

"যেহেতু গান্ধীজি তিলক-স্বরাজ ফাণ্ডের জন্য এক কোটি টাকা তুলেছেন এবং স্বরাজের দাবী নিয়ে খুব হৈ-চৈ সুরু করেছেন —এই জন্যে ?"

"কোনো এক বিশেষ ব্যক্তি বিপ্লব অথবা বিপ্লবী আন্দোলনের আধার হতে পারে না শঙ্কর। যে বিরাট পরিবর্তন বিপ্লব বয়ে আনে, তাও এক-আধ ডজন মহাপুরুষের সামর্থ্যের বাইরে। আজকের এই আন্দোলনের মূল কারণ যখন আমি বিশ্লেষণ করি, তখন এই সিদ্ধান্তেই আমাকে পৌছাতে হয়। তুমি তো জানো শঙ্কর, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা ছিল পদচ্যুত সামন্তপ্রভুরা, কিন্তু সে যুদ্ধ চলেছিল সাধরণ লোকেরই প্রাণের বিনিময়ে। আমাদের দুর্বলতার জন্য আমরা সফল হতে পারিনি সে যুদ্ধে, পরাজিতদের ওপর কঠোর প্রতিশোধ নিল ইংরেজরা। সে যাক্, আমি বলতে চাই যে, ১৮৫৭ সালের পরে এই প্রথম দেশের সমগ্র জনসাধারণকে স্বাধীনতার যুদ্ধে একতাবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয় ইতিহাসের একজন কৃতী ছাত্র হয়ে তুমিই বল, এমন আর একটিও আন্দোলনের কথা কি তোমার জানা আছে, যাতে জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে?"

"ভাই সফ্দর, নাগপুর কংগ্রেস (১৯২০ খৃঃ.) এবং কলকাতা কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে যে উত্তেজনার কথা তুমি বলছ, তা আমিও নিজের চোখেই দেখেছি এবং তাকে অভূতপূর্ব বলেই স্বীকার করি। কিন্তু প্রচণ্ড এই ঝড়ের পর, এই লক্ষ্ণৌতেই বহুবার বিদেশী কাপড়ের স্তূপ পোড়ানোর পরও যা তোমার মনে বিশেষ কোনো রেখাপাত করেনি সেই ব্যাপারেই আজ তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন এক আসন্ন বিপ্লবের সঙ্গে তুমি ভীষণভাবে জড়িত।"

"তোমার কথা ঠিকই শঙ্কর। সত্যিই এই বিপ্লবের ঢেউ যেন দেহ থেকে আমার পা-দুটোকে ভেঙে ফেলতে চাইছে। কিন্তু এই বিপ্লব-তরঙ্গকে ছোট রকমের এক স্থানীয় ঘটনা বলে আমি মনে করি না। বরং এ এক বিরাট গণ অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েই উঠেছে। সমস্ত যুগেই সব চেয়ে বড় বিপ্লবী শক্তি জনগণকে আশ্রয় করেই প্রকট হয়ে ওঠে।"

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করলে ভাই, মস্ত বড় জাল ছড়িয়ে বসছ যে!"

"ও কথা কেন, আমার বক্তব্য শুনবে কি শঙ্কর ?"

"বল, আমি শুনব। বৌদি পুডিং তৈরী করছেন, আর কাল রবিবার। শুধু কেউ গিয়ে

বাড়িতে খবর দিয়ে এলেই হল যে, শঙ্কর এই লক্ষ্ণৌতে বেঁচেই আছে এবং তার বৌদির হাতের পুডিং খেয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ব্যস্ তারপর সারারাত ধরে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কথা শুনতে পারব আমি।"

"শঙ্কর শুধু আমিই নই, ভারতের বাইরে সমস্ত জায়গার রাজনীতির ছাত্ররা' স্বীকার করে যে গত শতাব্দী এবং বর্তমান শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে সকল পরিবর্তনই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত, এবং নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পৃথিবীর অপরাপর রাজশক্তির গতিবিধি দ্বারা। আর এইসব পরিস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর —মূলে রয়েছে অর্থ নৈতিক কারণ। ১৮৫৭-র ঢেউ চলে যাবার পর আমাদের দেশ ঘুমিয়ে পড়েছিল একেবারে। অর্থাৎ আমাদের গতি তখন এত শ্লথ যে, তাকে ঐ ঘুমিয়ে-পড়া আখ্যাই দিতে হয়, কিন্তু অন্যান্য দেশে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেল। এক হাজার বছর আগে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে খণ্ড-বিখণ্ডিত ইটালী ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে (২রা এপ্রিল) একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হল, এবং ম্যাজিনী গ্যারিবল্ডীর মতো মহান্ আদর্শ আমাদের উপহার দিল। রোমান সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হলেও যে জার্মান জাতি নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তারা আংশিকভাবে এবং ফ্রান্স বিজয়ের পর ১৮৭০-এ (১৮ই জানুয়ারী) প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রুশিয়ার নেতৃত্বে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের এইসব পরিবর্তন পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন। এরপর, ফ্রান্সের বিশাল শক্তিকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পরাস্ত করে প্যারিস এবং ভার্সাই-এর ওপরেও জার্মানী তার ধ্বজা ওড়াতে পেরেছিল, যার ফলে ইংলণ্ড এবং রাশিয়া ভীত হয়ে বার্লিনের ওপর লক্ষ্য রাখতে লাগল। এটা তো হল বৈদেশিক শক্তিতে ভীতির ব্যাপার। কিন্তু এর চেয়েও বড় ভয় তাদের হল প্যারীর শ্রমিক রাজ্য প্যারী-কমূনকে দেখে —দোসরা এপ্রিল থেকে যে দেড় মাসের কিছু বেশী টিঁকে ছিল এবং প্রমাণ করে দিয়েছিল, শুধু জমিদার পুঁজিপতিরাই নয়, শ্রমিকরাও রাজ্যশাসন করতে সক্ষম।"

"তুমি কি মনে কর ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীও এ সবের সঙ্গে জড়িত ?"

"রাজনৈতিক ঘটনাই শুধু নয়, আমাদের ইংরেজ শাসকবৃন্দের ভারত-সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণেও এর প্রভাব বিদ্যমান। ইউরোপে জার্মানীর মতো এক দুর্জয় শক্তির উদ্ভব হতেই ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। কারণ জার্মানী থেকেই এখন তার যত বিপদের আশঙ্কা। মৃত প্যারী-কমূন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া বাদে জার্মানীর সকল রাষ্ট্রের মিলিত এক জীবন্ত যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রাজতান্ত্রিক শাসকবৃন্দের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল —এ কথা আর বলার দরকার হয় না। একই সঙ্গে এই সময় আরও পরিবর্তন ঘটল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড সামান্য ব্যবসায়ী থেকে পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হল। কাঁচামাল কেনা থেকে আরম্ভ করে উৎপাদিত পণ্য বাজারে ছাড়া পর্যন্ত সকল পর্যায়েই

মুনাফা-শিকারের একচেটিয়া ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। ব্যবসাতে শুধু কারিগরদের কাছ থেকে মাল খরিদ করে এদিক-সেদিকে বেচে লাভ হয়। কিন্তু পুঁজিবাদে প্রতিটি পদক্ষেপেই লাভ। তুলা কিনতে গিয়ে লাভ, পরিষ্কার করিয়ে বস্তা-বন্দী করাতে লাভ, রেলে এবং জাহাজে চাপিয়ে নিয়ে যেতে পারলে লাভ, ম্যান্‌চেস্টারের মিলে স্থতো-কাটা এবং কাপড় বোনায় লাভ, আবার তৈরী কাপড় জাহাজে করে ফিরিয়ে আনতে, জাহাজ কোম্পানী থেকে লাভ, রেলের লাভ —এই সমগ্র মুনাফার তুলনা কর কারিগরের হাতে বোনা মাল বিক্রি করা ব্যবসায়ীদের লাভের সঙ্গে!"

"হ্যাঁ, ব্যবসা থেকে পুঁজিবাদে লাভ তো নিশ্চয়ই বেশী।"

"১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যখন ভার্সাইতে বিজয়ী জার্মানী প্রুশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ামকে সমগ্র জার্মানীর কাইজার (সম্রাট) বলে ঘোষণা করল, তার পরের বছর (১৮৭২) ফেঁপে ওঠা ইংরেজ পুঁজিপতিরা টোরি প্রধানমন্ত্রী ডিস্‌রেইলীর মারফৎ সাম্রাজ্যবাদ ঘোষণা করল। এই ঘোষণা শুধু নতুন শব্দ নয় —খুবই স্থচতুর তার লক্ষ্য এবং অভিসন্ধি। কল কারখানাও এত বেড়ে উঠেছিল যে, তার জন্য স্থরক্ষিত বাজারের প্রয়োজন ছিল। এমন বাজার, যেখানে জার্মানী এবং ফ্রান্সের তৈরী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভয় নেই। অর্থাৎ যে-সব বাজারের ইজারাদারী সম্পূর্ণ নিজের হাতের মুঠোয় থাকবে। এরই সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিও এতটা ফেঁপে উঠেছিল যে, তাকে মুনাফা-মৃগয়ায় খাটাবার জন্যও প্রয়োজন হল সংরক্ষিত স্থানের। আর এইসব কার্যসিদ্ধি অপর দেশকে সম্পূর্ণ রূপে নিজের হাতের মুঠোয় আনতে পারলেই হতে পারে। ডিস্‌রেইলীর অভিধানে এই সবই ছিল সাম্রাজ্যবাদ শব্দের অর্থ। ভারতবর্ষে এই দুই বিষয়েই স্থবিধা ছিল, আর ইউরোপ থেকে ভারতে আসবার সব চেয়ে সস্তা এবং সহজ পথ ছিল স্থয়েজ খাল —১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে যার খননকার্য শেষ হয়েছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মিশরের কাছ থেকে ১,৭৭,০০০ শেয়ার চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড দিয়ে টেলিগ্রামে কিনে নিল ডিস্‌রেইলী, সাম্রাজ্য-বিস্তারে এটা হল তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ। তারপর ১৮৭৭-এর ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে দরবার বসিয়ে রাণী ভিক্টোরিয়াকে সম্রাজ্ঞী রূপে ঘোষণা করে ডিস্‌রেইলী সাম্রাজ্যবাদকে এত দূর এগিয়ে নিয়ে গেল যে, উদারনৈতিক দলের গ্ল্যাডস্টোন প্রধানমন্ত্রী হয়েও ডিস্‌রেইলীর নীতি পরিবর্তন করতে সমর্থ হল না।"

"আমরা এখনও ছাত্রদের পড়াই যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতসম্রাজ্ঞী —কাইজার-ই-হিন্দ উপাধি ধারণ করে ভারতবর্ষকেই ধন্য করেছেন।"

"ছ'বছর আগে প্রুশিয়ার রাজাও এই কাইজার উপাধি ধারণ করেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে পরিত্যক্ত শব্দের মূল্য হঠাৎ কেমন বেড়ে উঠল!"

"রোমান শব্দ 'কাইজার'কে শুধু ভারতবর্ষেই ব্যবহার করা আর ইংরাজীতে তার জায়গায় 'এম্‌প্রেস্‌' ব্যবহার করা —এর ভেতর আবার রহস্য নেই তো কোনো?"

"থাকতে পারে! যাইহোক, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আমরা সাম্রাজ্যবাদী যুগে প্রবিষ্ট হয়েছি। প্রথমে এল ইংলণ্ড। পরাজিত প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্স নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তুসিনের (আফ্রিকা) ওপর অধিকার কায়েম করে সাম্রাজ্যবাদের পথ ধরল। আর নতুন ফ্যাক্টরী এবং পুঁজিপতিদের দ্বারা সমৃদ্ধ জার্মানীও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে উপনিবেশের দাবী উত্থাপন করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হল।"

"কিন্তু ভারতে ইংরাজের নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে এগুলোর কি সম্বন্ধ?"

"নিত্য-নতুন আবিষ্কৃত যন্ত্র, ক্রমবর্ধমান কল-কারখানা এবং সেগুলি থেকে উৎপাদিত পুঁজির জন্য মৃগয়াক্ষেত্রের ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। ১৮৭৪-৮০ খৃষ্টাব্দের ভিতর ডিস্‌রেইলী মন্ত্রীসভা সেটা সম্পাদন করে ফেলল। ১৮৮০-৯২ খৃষ্টাব্দের উদারনৈতিক গ্লাডস্টোন সরকারও ডিস্‌রেইলীর পথ থেকে পশ্চাদপসরণ করতে সমর্থ হল না। পুঁজির নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী দানবতাকে কিছুটা ভদ্রবেশ পরাবার প্রয়োজন ছিল, যাতে জনসাধারণ সতর্ক হয়ে উঠতে না পারে। এই জন্যই ডিস্‌রেইলী 'ভারত সম্রাজ্ঞীর' অভিনয়ের অবতারণা করেছিল। এরপর প্রয়োজন হল উদারনৈতিকদের আরও কিছুটা উদারতা দেখানো। এই উদারতা নেমে এল আয়র্ল্যাণ্ডের 'হোম রুল' রূপে। কিন্তু আয়র্ল্যাণ্ডের প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত। ভারতীয়রা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নিজেদের কংগ্রেসকে দাঁড় করাল। কংগ্রেস বস্তুত ব্রিটিশ উদারনৈতিক দলের ধর্মপুত্র রূপেই জন্মলাভ করল এবং এক যুগ পর্যন্ত আপন ধর্মপুত্রকে ব্রিটিশরা সস্নেহে রক্ষা করল। কিন্তু ১৮৯৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত ব্রিটেনে পুনরায় টোরি সরকার প্রতিষ্ঠিত হল; তারা এলগিন এবং কার্জনের মতো সুযোগ্য সন্তান ভারতবর্ষে পাঠাল সাম্রাজ্যবাদের ভিত সুদৃঢ় করতে। কিন্তু ফল হল উল্টো।"

"তুমি কি লালা লজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক আর বিপিনচন্দ্র পাল—এঁদের কথাই বলতে চাইছ?"

"এই লাল, বাল, পাল—এঁরা ছিলেন বহির্বিশ্বের ঘটনাবলীর প্রতীক। রাশিয়াকে পরাভূত করে (ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪) জাপান নিজেকে বৃহৎ শক্তিসমূহের পর্যায়ভুক্ত করে। ফলে কংগ্রেসের অস্পষ্ট বক্তৃতার জড়তা ভেদ করে ভারতীয় যুবকদের সামনে এগিয়ে যাবার প্রেরণা জোগায়। অর্ধশতাব্দী পর ভারতীয়গণ নিজেদের জন্য মরতে শিখল, এ বিষয়ে আয়র্ল্যাণ্ড এবং রাশিয়ার শহীদদের উদাহরণেও অনুপ্রাণিত হলাম আমরা। কাজেই বর্তমান ঘটনাবলীর কারণগুলির অনুসন্ধান শুধু ভারতবর্ষের ভেতর থেকে করতে গেলে ভুল হবে না কি?"

"নিশ্চয়ই, দুনিয়ার সকল জায়গাই যে পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত।"

"কোনো বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তি নির্ভর করে দুটো বিষয়ের ওপর। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তথা আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্তসমূহ থেকে কতটা প্রেরণা লাভ করল এবং সে দেশের

সব চেয়ে সংগ্রামী শ্রেণী কতটা পরিমাণে অংশগ্রহণ করল। প্রথম উৎসের উদাহরণ আমি দিয়েছি। দ্বিতীয় উৎস হল, মজুর-কৃষক জনগণ। বিপ্লবী-যুদ্ধ সেই চালাতে পারে —হারাবার মতো যাদের কিছু নেই। সাকিনার অধর-সুধা, এই বাংলো এবং গাঁয়ে পৈতৃক জমিদারী হারাবার ভয় যাদের আছে বিপ্লবের সৈনিক সে হতে পারে না। এই জন্যই বলছিলাম যে, সর্বহারা জনতাই শুধু বিপ্লবের বাহন হতে পারে।"

"এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত।"

"তা'হলে জনতার অন্তরে যে উত্তেজনা আজ রয়েছে তাকে উপলব্ধি কর, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকে কতটা প্রেরণা পাওয়া যাচ্ছে সে সম্বন্ধেও চিন্তা করে দেখ। গত মহাযুদ্ধ গোটা পৃথিবীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে! সে যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ —পুঁজি এবং উৎপাদিত পণ্যের সুরক্ষিত বাজার দখলে রাখবার বা বলপূর্বক অধিকার করতে যাবার পরিণাম। জার্মানীর ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের সুরক্ষিত বাজারের জন্যে নতুন উপনিবেশ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু পৃথিবী বণ্টন করা হয়েছিল আগে থাকতেই। তাই যুদ্ধ করেই উপনিবেশ ছিনিয়ে নেবার প্রয়োজন হল, আর উপনিবেশগুলির মালিক ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধল জার্মানীর। যুদ্ধে জার্মানী হেরে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যবাদের স্বপ্ন চুরমার করে দেবার জন্য অপর এক শত্রু জন্মলাভ করল —যার নাম সাম্যবাদ। সাম্যবাদের শাসনাধীনে উৎপাদন মুনাফাশিকারের যন্ত্র নয়, পরন্তু মানব সমাজকে সুখী এবং সমৃদ্ধ করে তোলবার উপাদান। যন্ত্রের ক্রমোন্নতি সাধিত হয়, কল-কারখানা প্রসার লাভ করে, পণ্য উৎপাদন বেড়ে যায় এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত বাজারের। আবার ঐ সব পণ্য ক্রয় করার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হয় যার জন্য ক্রেতার পুরো মজুরী লাভের সুযোগ থাকা উচিত। ক্রেতার আর্থিক সঙ্গতি যত কম থাকবে, পণ্যও সেই পরিমাণে অবিক্রীত পড়ে থাকবে বাজারে বা গুদামে। পণ্য উৎপাদন কমিয়ে দিলে কারখানা বহুলাংশে বন্ধ হয়ে যাবেই, মজুরেরা বেকার হয়ে পড়বে, মাল খরিদ করবার মতো পয়সাও তাদের হাতে থাকবে না। লোকে তখন মাল খরিদ করবে কি করে, কি করে কারখানাই বা চালু থাকবে! সাম্যবাদ বলে, মুনাফার বাসনা ত্যাগ কর। নিজ রাষ্ট্র বা সমগ্র পৃথিবীকে একক পরিবার বিবেচনা করে তার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন কর; প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্যানুযায়ী শ্রম আদায় কর, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জীবন ধারণের উপযোগী আবশ্যকীয় সামগ্রী দাও। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত সকলের প্রয়োজন মেটাবার মতো কল-কারখানা এবং কারিগর সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দাও। আর এই ব্যবস্থা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকবে না, কারখানা এবং সমগ্র উৎপাদন যন্ত্রের ওপর থেকেই ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

"এ রকম কল্পনা সত্যই সুন্দর।"

"এখন এ শুধু কল্পনা নয় শঙ্কর; পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ রাশিয়ায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে, ৭ই নভেম্বর সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পুঁজিবাদী দুনিয়া অবশ্য আজও মানবতার এই একমাত্র আশা-ভরসার স্থলকে নির্মূল করতে চাইছে কিন্তু সোভিয়েত সরকার প্রথম অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; অবশ্য হাঙ্গেরীতে মাত্র ছ'মাস পরে (মার্চ—আগষ্ট, ১৯১৮) ফ্রান্স এবং আমেরিকার পুঁজিপতিগণের সাহায্যে এই সোভিয়েত শাসনকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ায় মজুর-কৃষক রাজের অস্তিত্ব সমগ্র দুনিয়ার সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আর এই সোভিয়েত শাসন কায়েম করেছে যে বিরাট শক্তি তা সমস্ত দেশেই কাজ করে চলেছে। যুদ্ধ থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা রাউলাট বিল পাশ করবার জন্য এত তাড়াহুড়া করেছিল কেন? —এই বিশ্ববিপ্লবী শক্তিকে দমন করার জন্য। যদি ঐ বিপ্লবীশক্তি পৃথিবীকে রূপান্তরিত করবার জন্য দেশে দেশে তার বীজ বপন না করত, তা'হলে ইংরেজেরা রাউলাট বিল পাশ করত না আর গান্ধীও তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেন না। সেই সঙ্গে ১৮৫৭-র পর থেকে চাপা পড়ে থাকা আগুন সারা দেশে জ্বলে উঠত না। এই জন্যই আমি বলছি, আমরা এক বিপ্লবী যুগে এসে পড়েছি।"

"তা'হলে তোমার মতে গান্ধী বিপ্লবী-নেতা? কিন্তু যে গান্ধী গোখেলের মতো উদারনৈতিক নেতাকে নিজের গুরু বলে মনে করেন, তিনি কি করে বিপ্লবী নেতা হতে পারেন সফ্ফু ভাই?"

"গান্ধীর আদর্শ এবং সমস্ত কাজকে আমি বিপ্লবধর্মী মনে করি না, শঙ্কর। বিপ্লবী শক্তির ভিত্তি সাধারণ মানুষকে তিনি যে সংগ্রামে আহ্বান করেছেন আমি শুধু তাঁর সেই কাজটুকুকেই বিপ্লবধর্মী বলে মনে করি। তাঁর ধর্মের দোহাই—বিশেষ করে খিলাফৎ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মনোভাবকে আমি বরং সরাসরি বিপ্লব-বিরোধী চাল বলেই মনে করি। কল-কারখানার যুগ ছেড়ে তাঁর অতীতে ফিরে যাবার প্রচেষ্টাকে আমি প্রতিবিপ্লবী বিচ্যুতি মনে করি। আর তাঁর স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্তকেও আমি ঐ একই পর্যায়ে ফেলি।"

"তোমার মঙ্গল হোক সফ্ফু ভাই। তুমি যখন গান্ধীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলে আমার তো শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল তখন। আমি ভাবছিলাম, তুমিও আবার স্কুল-কলেজগুলোকে শয়তানের আখড়া বলে বসবে!"

"শিক্ষা-প্রণালী দোষযুক্ত হতে পারে শঙ্কর, কিন্তু আজকের স্কুল-কলেজে বসে বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে আমাদের। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে আজ মানুষ বাঁচতে পারে না। আমাদের স্বাধীনতা যখনই আসুক না কেন, বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে যাবেই।

মানুষের ক্রমবর্ধমান ভবিষ্যৎ-সমৃদ্ধি বিজ্ঞানের ওপরই নির্ভরশীল —তাই বিজ্ঞানকে ছেড়ে অতীতের পথে পা বাড়ানো আত্মহত্যারই সামিল। স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিয়ে চরকা-তাঁতের স্কুল প্রতিষ্ঠা করার অর্থ দেশকে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার যুগে নিয়ে যাবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে বিপ্লবী সেনাদলে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রদের আহ্বান করা মোটেই অন্যায় নয় —এটা অন্তত তুমি স্বীকার করবে শঙ্কর।"

"নিশ্চয়। আর অন্যান্য বয়কটগুলোর বিষয়ে কি বল তুমি ?"

"আদালত বয়কট ? সেটা কিন্তু ঠিকই। তার সাহায্যে আমরা বিদেশী শাসকবৃন্দকে আমাদের ক্ষমতার পরিধি এবং তীব্র অসন্তোষের কথা জানাতে পারি। আর বিলিতি জিনিস বর্জন করা তো বিলিতি ব্যবসায়ীদের গালে এক প্রচণ্ড থাপ্পড় মারার সামিল। তা'ছাড়া এতে আমাদের স্বদেশী শিল্প প্রসারের প্রেরণাও মিলবে।"

"আমি দেখতে পাচ্ছি ভাই সফ্ফু, বহু দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছ তুমি।"

"এখনও যাইনি। কিন্তু আমি যেতে চাই।"

"যেতে চাও ?"

"তুমি আগে বল —আমরা এক বিপ্লবী যুগের ভিতর দিয়ে চলেছি কিনা ?"

"তোমাকে আমিই তো কতবার এ প্রশ্ন করেছি সফ্ফু ভাই। রুশ-বিপ্লবের কথা শুনেই আমি খুঁজে-খুঁজে সাম্যবাদী-সাহিত্য পড়তে লাগলাম এবং নিজেদের সমস্যাগুলো সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে সুরু করলাম। এতদিন পর্যন্ত আমি শুধু এই সন্দেহের মধ্যে ছিলাম যে, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এই মহান্ উদ্দেশ্যের পরিপূরক কিনা। কিন্তু তুমি যখন বিপ্লবী জনতার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, অমনি আমার সন্দেহ দূর হয়ে গেল। গান্ধীকে আমি বিপ্লবের যোগ্য নায়ক বলে মনে করি না সফ্ফু ভাই —তোমার কাছে খোলাখুলিই বলছি। কিন্তু জনতার শক্তির ওপরে আমি বিশ্বাস রাখি। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পদচ্যুত সামন্তগণ চর্বি, কার্তুজ আর ধর্ম বিপদগ্রস্ত —এই ধুয়া তুলে জনতার এক শক্তিশালী অংশকে দলে টেনে ছিল, কিন্তু আজ রুটির দাবীতেই সমগ্র জনতা আন্দোলনের মাঝে এসে পড়েছে। আমার মনে হয় গণমনে উত্তেজনার এই কারণ যথার্থ, বিপ্লবের ধ্বনিটা খাঁটিই এবং গান্ধী যদি নিজের আসল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তবুও বিপ্লবের গতি ফেরাতে সক্ষম হবেন না তিনি !"

"আমি ঠিক করছি যে বিপ্লবী সেনাদলে ভর্তি হব, হব অসহযোগী।"

"এত তাড়াতাড়ি !"

"তাড়াতাড়ি করলে তো অনেক আগেই লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়তাম। অনেক বিচার-বিবেচনার পর আজ তোমার সঙ্গে আলোচনা করে আমি আমার সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করছি।"

সফ্‌দর যখন গম্ভীর স্বরে এই কথাগুলো বলছিলেন, শঙ্করের দৃষ্টি তখন কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সফ্‌দর আবার বললেন, "তুমি হয়ত ভাবছ, তোমার বৌদির অধর-রাগের কথা, তার রেশমী শাড়ির মখমলের পাড়টির কথা, অথবা এই বাংলো এবং তার খানসামাদের কথা! সাকিনার ওপর অবশ্য কোনো সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দেব না, তার ইচ্ছামতো সে জীবনযাপন করুক। তার জন্যে তার নিজের সম্পত্তি এবং এই বাংলো রয়েছে। কিন্তু এখন থেকে আমার কাছে এ সবের আর কোনো আকর্ষণই নেই।"

"তোমার এবং বৌদির কথাই শুধু ভাবছি না আমি, ভাবছি আমার নিজের সম্বন্ধেও। আমার চলার পথে যে মানসিক বাধা ছিল সেটা দূর হয়ে গেছে। চল আমরা দুই ভাই এক সঙ্গেই বিপ্লবের আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে সফ্‌দর বললেন,"অক্সফোর্ডে থাকাকালীন তোমার সম্বন্ধেই আমার ভয় ছিল শঙ্কর। এবারে তো আমি হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াব!"

সাকিনা এসে খেতে ডাকলে দুই বন্ধুর বৈঠক শেষ হল।

২

এই রাত থেকে সফ্‌দরকে কিছুটা প্রফুল্ল দেখতে পেলেন সাকিনা। তিনি ভাবলেন যে, এটা হয়ত শঙ্করের সঙ্গে গল্প-গুজবের ফল। সফ্‌দরের কাছে সব চেয়ে মুস্কিলের ব্যাপার হল নিজের সিদ্ধান্তের কথা সাকিনাকে জানানো। এমনিতে সফ্‌দরও আদর-আহ্লাদের মাঝে লালিত হয়েছেন। কিন্তু তা'হলেও তিনি ছিলেন গাঁয়ের লোক। নগ্ন দারিদ্র্যকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে তাঁর নিজের ওপর বিশ্বাস জন্মেছে যে, যে-পরীক্ষায় তিনি অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন, তাতে নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হবেন। কিন্তু সাকিনার কথা স্বতন্ত্র। তাঁর সম্বন্ধে এ কথাই বলা যেতে পারে যে, পা দিয়ে কখনও কঠিন মাটি স্পর্শ করেননি তিনি। রবিবারেও তাই সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারলেন না সফ্‌দর। সোমবার কোর্টে যখন নিকট বন্ধুদেরও তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়ে গেল, তখন সাকিনাকে সব কথা জানানোর প্রয়োজন আরও প্রবলভাবে অনুভব করলেন তিনি।

সে রাতে তিনি লক্ষ্ণৌর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্যাম্পেন আনালেন। সাকিনা ভাবলেন, আজ কোনো বন্ধু আসবেন বুঝি! কিন্তু খাওয়ার পর যখন বেয়ারাকে শ্যাম্পেন খুলে আনার আদেশ সফ্‌দর দিলেন তখন সাকিনার কিছুটা কৌতূহল হল। সাকিনার ঠোঁটে শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে ধরে সফ্‌দর বললেন, "সাকিনা, প্রিয়তমা, আমার কাছে এটাই তোমার শেষ প্রসাদ হয়ে দাঁড়াবে।"

"তুমি মদ ছেড়ে দিচ্ছ?"

"হ্যাঁ প্রিয়তমে, আরও অনেক কিছুই ছাড়ছি, কিন্তু তোমাকে নয়। এখন থেকে

তুমিই হবে আমার সুরা।" এই কথার পর সাকিনার কাতর চেহারা লক্ষ্য করে সফ্দর বললেন, "সাকিনা আমার কাছে এস, আমরা শ্যাম্পেন পান করি এখন। আরও অনেক আলোচনাই রয়েছে আমাদের।"

সুরাপানে সাকিনার কোনোই ভাবান্তর হল না, যদিও সফ্দর ওমর-খৈয়াম থেকে অনেকটাই আবৃত্তি করে গেলেন। চাকর-বাকরেরা বিদায় নেবার পর সাকিনা যখন স্বামীর কাছে এসে অমঙ্গল আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে শুয়ে পড়লেন, তখন নিজের কথা বলতে আরম্ভ করলেন সফ্দর—

"সাকিনা, আমি এক গুরুতর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যদিও প্রথমেই আমি স্বীকার করছি যে, এমন একটা সিদ্ধান্ত নেবার সময় তোমাকেও কিছু বলবার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু এই অপরাধ আমি কেন করেছি, আমার পরবর্তী কথাগুলো থেকেই সেটা বুঝতে পারবে তুমি। সংক্ষেপে আমার সিদ্ধান্তের মূল কথা হল —আমি এখন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হতে চলেছি।"

কথাগুলো সাকিনার হৃদয়ে এসে যেন বজ্রঘাত করল, আর এ জন্য মুখে কিছুই বলতে পারলেন না তিনি। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে সফ্দর আবার বললেন, "কিন্তু সাকিনা, তোমাকে আমি সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর লালিত-পালিত হতে দেখেছি, কাজেই এ কৃচ্ছ্রসাধনের মাঝে তোমাকে টেনে আনতে চাই না।"

সাকিনার মনে হল যেন আর একবার নতুন করে আঘাত লাগল তাঁর ক্ষতস্থানে —এ আঘাত যেন প্রথম আঘাতকেও ভুলিয়ে দিল। আঘাতের পর আঘাতে আত্ম-সম্মান জেগে উঠল সাকিনার; তিনি বলে উঠলেন, "প্রিয়তম তুমি কি সত্যিই আমাকে এতটা আরামপ্রিয় বলে মনে কর যে, তোমাকে কষ্ট সইতে দেখেও আমি পালঙ্কের ওপর বসে থাকতে চাইব? শোন সফ্দর, যদি প্রাণ দিয়ে আমি তোমাকে ভালোবেসে থাকি, তবে সে ভালোবাসা আমাকে তোমার সঙ্গে যে-কোনোখানে যাবার শক্তি জোগাবে। অধর-রাগ অনেক ব্যবহার করেছি আমি, বহু সময় নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছি শুধু সাজ পোশাকেই, কঠোর জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে কোনোদিনই চেষ্টা করিনি আমি —এ সব সত্যি। কিন্তু তা'হলেও তুমিই আমার সব সফ্দর। আমি চিরদিনই তোমার সঙ্গে থাকব। আর আমার বর্তমান জীবনের পথ প্রদর্শন যেমন তুমিই করেছিলে তেমনি আগামী জীবনেও তুমিই আবার আমার পথপ্রদর্শক হবে।"

সফ্দর কিন্তু এতটা আশা করেননি! যদিও তিনি জানতেন যে, সাকিনা অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মেয়ে। সফ্দর আবার বলতে লাগলেন, "নতুন মোকদ্দমা নেওয়া আমি বন্ধ করে দিয়েছি। পুরনোগুলো অন্যের কাছে সোপর্দ করে দিচ্ছি। আশা করছি এই সপ্তাহের মধ্যেই আদালতের কাজ থেকে ছুটি পেয়ে যাব। আরও একটা খবর শুনবে

সাকিনা ? শঙ্করও আমার সঙ্গে আন্দোলনে ঝাঁপ দিচ্ছে। শঙ্কর একটি রত্ন বুঝলে সাকিনা! আমার সঙ্গে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে যেতে সে প্রস্তুত।”

“শঙ্করের ত্যাগ কিন্তু তোমার চেয়েও বড় সফ্‌দর।”

“আত্মত্যাগের জীবনই সে বরণ করে নিয়েছিল সাকিনা। এ পথ থেকে কোনোদিনই সরেনি সে। তা' না হলে খুবই বড় উকিল সে হতে পারত, অথবা নিজের চাকরীতেও যথেষ্ট উন্নতি করতে পারত।”

“তার দুটি ছেলে যখন মারা যায়, তখন খুব কেঁদেছিলাম আমি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে, চারটি থেকে দুটি বোঝা কমে যাওয়ায় ভালোই হয়েছে!”

“আচ্ছা শঙ্করের এই সিদ্ধান্তকে চম্পা কিভাবে গ্রহণ করবে সাকিনা ?”

“চোখ বুঁজে মেনে নেবে সে। স্বামীকে কি করে ভালোবাসতে হয় সেই তো আমায় শিখিয়েছে সফ্‌ফু!”

“ভবিষ্যতের থাকা-খাওয়ার জন্য কিছু ব্যবস্থা আমাদের করে রাখতে হবে।”

“এ সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ পেলাম কই ? তুমিই বল না কি করা যায় ?”

“আমাদের গাঁয়ের শরীফন এবং মঙ্গরুকে রেখে বাকি চাকরদের দু'মাসের মাইনে দিয়ে বিদায় করে দিতে হবে। দু'খানা মোটরগাড়িই বেচে দেব।”

“ভালোই হবে।”

“দু'একটি খাট আর কয়েকটা চেয়ার বাদে ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র বিলিয়ে অথবা নীলাম করে দিতে হবে। লাটুস রোডে মাসীর যে বাড়ি পেয়েছি, সেখানেই থাকব গিয়ে, আর এই বাংলো ভাড়া দিয়ে দেব।”

“খুব চমৎকার ব্যবস্থা।”

“আমার আর তো কিছুই মনে পড়ছে না!”

“আর আমার কাপড়-চোপড় —আমার বিলিতি পোশাক-পরিচ্ছদগুলো ?”

“গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিচ্ছি তাই ও সবের কথা বলছ ? আমি কিন্তু ও সব পোড়ানোর পক্ষপাতী নই, বিশেষ করে সারা দেশেই যখন প্রচুর বিলাতী জামা কাপড় পোড়ানো হচ্ছে। তবে আমার নিজের জন্যে খদ্দরের পায়জামা-পাঞ্জাবী পর্শুর মধ্যে তৈরী হয়ে আসবে।”

“তুমি বড্ড স্বার্থপর সফ্‌ফু!”

“খদ্দরের মোটা আর ভারী শাড়ি পরবে সাকিনা ?”

“তোমার সঙ্গে সব অবস্থাতেই আমি মানিয়ে চলতে পারব।”

“দেখি তা'হলে কি করা যায়। খুব ভালো হত যদি ঐ সব জামা-কাপড় নীলামে বিক্রী করে দিয়ে সেই টাকায় গরীবদের জন্য কাপড় কিনে দিতে পারতাম।”

৩

সফ্দরের মতো উদীয়মান ব্যারিস্টারের এই মহান্ ত্যাগের কথা চতুর্দিকে আলোচিত হতে লাগল যদিও সফ্দর শঙ্করকেই প্রশংসার যোগ্যতর পাত্র বলে মনে করতেন। সারা অক্টোবর এবং নভেম্বর জুড়ে সফ্দর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালাবার সুযোগ পেলেন। কখনও কখনও সাকিনা বা শঙ্কর তাঁর সঙ্গে থাকতেন। গ্রামের দিকে তাঁর মনোযোগ বেশী, কারণ গ্রামের কৃষক-মজুরের ওপর যতটা তাঁর আস্থা ছিল লেখাপড়া-জানা শহরের লোকের ওপর ততটা ছিল না। কিন্তু এক সপ্তাহের ভেতরই তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর উচ্চশ্রেণীর উর্দু গ্রামের এক-চতুর্থাংশ লোকও বুঝতে পারছে না। শঙ্কর কিন্তু প্রথম থেকেই গ্রাম্য ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর সাফল্য দেখে সফ্দরও ওইভাবে বক্তৃতা দেওয়া ঠিক করলেন। প্রথমে তাঁর কথাবার্তায় পুঁথিগত শব্দই বেশী থাকত কিন্তু শঙ্করের সাহায্যে এবং নিজের পরিশ্রমে দু'মাস যেতে না যেতেই ভুলে যাওয়া বহু শব্দ এবং সেই সঙ্গে নতুন নতুন সর্বজন-বোধ্য শব্দ তিনি রপ্ত করে ফেললেন।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে (১৯২১ খৃঃ.) বহু রাজনৈতিক কর্মীসহ সফ্দর এবং শঙ্কর এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ফৈজাবাদ জেলে প্রেরিত হলেন। চম্পা এবং সাকিনা গ্রেপ্তার এড়িয়ে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

জেলে গিয়ে এক ঘণ্টা নিয়মিত চরকা কাটতেন সফ্দর। যারা তাঁর গান্ধী-বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদের কথা জানত, তারা কটাক্ষ করত। সফ্দর কৈফিয়ৎ দিতেন, "বিলিতি কাপড় বয়কট করাকে আমি একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার বলে মনে করি; সেই সঙ্গে এও আমি জানি যে, আমাদের দেশে এখনও পর্যাপ্ত কাপড় তৈরী হয় না, তাই কাপড় আমাদের তৈরী করতে হবে। তবে দেশের কারখানাগুলি যখন পর্যাপ্ত বস্ত্র উৎপাদন করবে, তখন আর চরকা কাটার পক্ষপাতী থাকব না আমি।"

জেলের ভেতর অলসভাবে বসে থাকা লোকের সংখ্যাই ছিল বেশী। এই সমস্ত লোকেরা গান্ধীজির এক বছরে স্বরাজ আনার কথায় আস্থাবান হয়ে বসেছিল। তারা মনে করত, জেলে আসাতেই তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। গান্ধীবাদী আদর্শে বিশ্বাসীদের মধ্যে তখন পর্যন্ত ভণ্ডামী, ধাপ্পাবাজী আর লোক-ঠকানো কর্মীদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। কাজেই বন্দীদের মধ্যে সাচ্চা দেশভক্তের সংখ্যাই ছিল বেশী। সফ্দর এবং শঙ্করের আক্ষেপ হত রাজনৈতিক জ্ঞান বাড়ানোর দিকে এদের দৃষ্টি নেই বলে। এদের অনেকে রামায়ণ, গীতা বা কোরান পাঠ করত, মালা হাতে নাম জপত; অনেকে শুধু তাস, পাশা খেলেই সময় অতিবাহিত করত। একদিন গান্ধীবাদী রাজনীতি দিগ্‌গজ পণ্ডিত বিনায়ক-প্রসাদের সঙ্গে দেখা করলেন সফ্দর এবং শঙ্কর। বিনায়কপ্রসাদ বললেন, "রাজনীতি ক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ গান্ধীজির এক মহান্ আবিষ্কার এবং অমোঘ অস্ত্র।"

"আমাদের বর্তমান অবস্থায় এটা উপযোগী হতে পারে, কিন্তু অহিংসা কোনো অমোঘ অস্ত্রই নয়। পৃথিবীতে যত অহিংস পশু আছে তারাই অপরের শিকার হয়।"

"পশুকুলে না হতে পারে, কিন্তু মানুষের মধ্যে অহিংসা এক অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার করে।"

"রাজনীতির ক্ষেত্রে এ রকম কোনো নজির নেই!"

"নতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কোনো নজির থাকে না।"

"এটা নতুন আবিষ্কার নয়।" শঙ্কর বলে উঠলেন, "বুদ্ধ, মহাবীরের মতো বহু ধর্মোপদেশক এই অহিংস নীতির ওপর জোর দিয়ে গেছেন।"

"কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়।"

সফ্‌দর, "রাজনীতির ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা যে কিছুটা বেড়ে গেছে তা এই জন্যেই যে, মানবতা আজ কিছুটা উচ্চস্তরে উঠেছে। সংবাদপত্রগুলিতে নিরস্ত্রদের ওপর গুলি চালাবার খবর পড়ে আজ সবাই তার নিন্দা করে। জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালিয়ে ইংরেজরা এর প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছে।"

"তা'হলে কি বলতে চান, অহিংসাত্মক-অসহযোগ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়?"

"প্রথমে আপনি বলুন, স্বরাজের সংজ্ঞা কি!"

"আপনিও তো স্বাধীনতার সংগ্রামে নেমেছেন, আপনিই বলুন না!"

"আমি মনে করি স্বরাজ মানে মেহনতকারীর রাজত্ব—শুধুই মেহনতকারীর।"

"তা'হলে আপনার স্বরাজে মন-প্রাণ দিয়ে, অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, কষ্ট করে কারাবরণ করা—শিক্ষিত পুঁজিপতি এবং জমিদারদের কোনো অধিকার থাকবে না?"

"এ তো আপনিই দেখেছেন—পুঁজিপতি এবং জমিদারেরা সালিশী-সভা বসাতেই ফুরসৎ পায় না। ওরা জেলে আসতে যাবে কোন দুঃখে! আর যদি কেউ এসেও থাকে তবে শ্রমজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে তার স্বার্থকে আলাদা করে দেখা কখনই উচিত নয়।"

শঙ্কর এবং সফ্‌দর সর্বদাই বই পড়তেন, এবং দেশের আর্থিক, সামাজিক সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। প্রথম দিকে তাঁদের কথা অন্যান্যরা খুব কমই শুনত। কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর (১৯২১ খৃষ্টাব্দ) মধ্যরাত্রি পার হয়ে যাবার পরও যখন জেলের ফটক খুলল না, তখন তারা নিরাশ হয়ে পড়ল। যখন আতঙ্কিত, উত্তেজিত জনতা কর্তৃক চৌরীচৌরায় কয়েকজন পুলিশের লোকের হত্যার খবর শুনে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ বন্ধ করে দিলেন তখন বহু লোকই নতুনভাবে চিন্তা করতে লাগল এবং তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক এগিয়ে এসে সফ্‌দর এবং শঙ্করের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হল যে, বিপ্লবী শক্তির একমাত্র উৎস জনসাধারণ—গান্ধীজির মস্তিষ্ক নয়। জনসাধারণের এই শক্তিকে অবিশ্বাস করে গান্ধী নিজেকে বিপ্লব-বিরোধী বলে প্রমাণ করে দিয়েছেন।

সুমের

কাল : ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাস। এক নাগারে বর্ষা চলছে এবং কয়েকদিন হল সূর্যের সাক্ষাৎই মিলছে না। পাটনা শহরে গঙ্গা উজিয়ে আসছে—যে কোনো সময় বাঁধ ভেঙে শহরে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা। এমন আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাঁধের ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখা বিশেষ জরুরী। শহরের যুবক ও ছাত্ররা গঙ্গার বাঁধ দেখা-শোনার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছে। সুমের পাটনা কলেজের এম. এ. ক্লাসের প্রথম বর্ষের ছাত্র। সে দীপাঘাটের পাশে বাঁধ দেখা-শোনার দায়িত্বে রয়েছে। মাঝরাতে তার মনে হয়েছিল গঙ্গা ভীষণভাবে ফুলে উঠছে। সকালেও গঙ্গার বিশাল জলরাশিকে আটকাবার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি—বাঁধ থেকে বিঘৎখানেক নীচ দিয়ে গঙ্গার জলরাশি প্রবাহিত হচ্ছিল। শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে আশু-বিপর্যয়ের এক গভীর আতঙ্ক। ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে হাজার হাজার মানুষ তৈরী কিন্তু সকলের মনেই গভীর সন্দেহ—গঙ্গার বাঁধকে আর এক ইঞ্চিও উঁচু করা সম্ভব কিনা। সকাল থেকেই সুমের ব্যাকুল চিন্তা নিয়ে টহল দিচ্ছিল, দুপুরে জল কিছুটা কমতে দেখে সে স্বস্তি পেল। তার নজরে পড়ল, বাঁধের যে এলাকাটুকু সে টহল দিচ্ছিল সেখানে এক সৌম্যমূর্তি ভদ্রলোক তার মতোই ঐ অঞ্চলে তদারকির কাজ করছিলেন। সুমেরের বেশ কয়েকবার ইচ্ছে হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করার কিন্তু আশু-বিপর্যয়ের দুর্ভাবনা ক্লিষ্ট মন সাড়া দেয়নি। এখন জল নামছে, মেঘ সরছে, সুমেরের বাসি ইচ্ছেটা আবার চাগিয়ে উঠল।

সুমের একুশ বছরের তরুণ, উঁচু নাক, ফর্সা রঙ; আর ঐ ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের মতো, কিছুটা শিথিল স্থূল দেহ, গায়ের রঙ কালো। সুমেরের পরণে খাকি প্যাণ্ট, হাফ-সার্ট, কাঁধে বর্ষাতি, পায়ে রবারের জুতো আর ঐ ভদ্রলোকের সাদা খদ্দরের পোশাক, মাথায় গান্ধী-টুপি এবং খালি পা। সুমের কয়েক পা এগিয়ে এসে হাসিমুখে বলল, "নমস্কার। জল এবার নামছে।"

"আর বাদলা আবহাওয়াও কেটে যাচ্ছে।"

"ক'দিন কি যে দুর্ভাবনা গেছে! এক জায়গায় পড়েছিলাম, আড়াই হাজার বছর আগে যখন পাটলিপুত্র নগরের পত্তন হয় তখন গৌতমবুদ্ধ ও তংরহের কথোপকথনে পাটলিপুত্রে প্লাবনের কথা জানা যায়। বুদ্ধ, আগুন জল ও গৃহ-বিবাদ এই তিনটি জিনিসকে নগরের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।"

"মনে হচ্ছে আপনি ইতিহাসের ছাত্র?"

"না, আমি রাজনীতির ছাত্র তবে ইতিহাসের মূল গ্রন্থগুলি অনুবাদের মাধ্যমে পড়তে আমি ভালোবাসি।"

"হ্যাঁ, জল গত কয়েকদিন ধরেই আমাদের শত্রু হিসাবেই হানা দিয়েছিল।"

"আগুনের ভয় তখন ছিল, যখন পাটলিপুত্রের অধিকাংশ বাড়ি-ঘর ছিল কাঠের আর ছিল শহরের আশপাশে বিপুল শালবন। অগ্নিকাণ্ড তখন প্রায়ই হত।"

"আচ্ছা, আপনার নামটা জানতে পারি?"

"আমার নাম সুমের, আমি পাটনা কলেজের ফিফ্‌থ ইয়ারের ছাত্র।"

"আর আমার নাম হল রামবালক ওঝা। প্রায় কুড়ি বছর আগে আমি পাটনা কলেজের ছাত্র ছিলাম। এক বন্ধুর প্রভাবে এম. এ. ডিগ্রী না নিয়েই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। অবশ্য সে'জন্য আমার কোনো অনুশোচনা নেই কারণ আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি—স্কুল-কলেজের শিক্ষা একটা অনর্থকারী ব্যাপার।"

"তবে আপনার অধীত বিদ্যা সব ভুলে গেছেন?"

"কখনো কখনো বেমালুম ভুলে যাই। যদি একেবারে শাদা শ্লেট হয়ে যেতে পারতাম তা'হলে খুবই ভালো হত—সত্যকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে থাকা সম্ভব হত।"

"অর্থাৎ আপনি বুদ্ধিমার্গ ত্যাগ করে ভক্তির পথে চোখ বুঁজে চলতে চান?"

"সুমেরবাবু আপনি কি ভক্তির পথকে নিন্দনীয় মনে করেন?"

"ওঝাজী আমি বাবু নই, এক অভাজন মুচির ছেলে। জমিদারের জবরদস্তিতে বাস্তুভিটে হারিয়েছি। আমার মা কায়ক্লেশে বেঁচে আছেন মাত্র। এক সজ্জনের কৃপায় এইটুকু লেখাপড়া করতে পারছি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, 'বাবু' হবার কোনো যোগ্যতা আমার নেই।"

"সুমেরজী, আপনার শিষ্টাচারের এখন পর্যন্ত যে পরিচয় পেয়েছি তাতে আমি খুব খুশী। জানেন কি, গান্ধীজি তাঁর এক হরিজন শিষ্যকে আপনার মতো জীবনসংগ্রামে ব্রতী দেখে কি আনন্দই না পেয়েছিলেন!"

"ওঝাজী আপনার সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কথা বলতে চাই, সে'জন্যে মনে হয় আমার মতামত আগেই জানিয়ে রাখা ভালো। 'হরিজন' শব্দটিকে আমি ঘৃণা করি আর 'হরিজন' পত্রিকাটি আমার মতে স্থিতস্বার্থের সংরক্ষক। ভারতে অন্ধকারকে স্থায়িত্ব দেওয়াই ঐ পত্রিকাটির কাজ। আর গান্ধীজিও আমার মতে জাতির ভয়ঙ্কর শত্রু।"

"গান্ধীজি জাতির কোনো উপকার করেছেন বলে আপনি মনে করেন না?"

"মজুরের ক্ষেত্রে কারখানার মালিক যে উপকার করে—কারখানা খুলে, সেই ধরনের উপকার গান্ধীজিও করেছেন!"

"গান্ধীজি কি শুধু মালিকদের স্বার্থেই কাজ করেছেন?"

"জমিদার, পুঁজিপতি, দেশীয় রাজাদের 'অভিভাবক' বলার মানে অন্য কিছু কি হয়? আমাদের ওপর গান্ধীজির প্রীতি এই কারণেই যাতে আমরা হিন্দুসমাজের বাইরে চলে

না যাই। পুণায় তিনি আমরণ অনশন করলেন—যাতে আমরা হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা গড়ে না তুলি। হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দুদের সস্তা দাসের চাহিদা আমাদের জাতের লোকরাই যোগান দিয়েছে। আগে আমাদের দাস বলা হত, গান্ধীজি এখন 'হরিজন' বলে আমাদের উদ্ধার করতে চাইছেন। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বাদ দিলে 'হরি' আমাদের এক বড় দুশমন। এখন ভেবে দেখুন সেই 'হরি'-র জন হবার বাসনা আমাদের কেন হবে!"

"তা'হলে আপনি ঈশ্বরেও বিশ্বাস করেন না?"

"কি দরকার? হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট, অচ্ছুৎ বলে মনে করা হচ্ছে এবং সে সব চলছে ঈশ্বরের নাম নিয়েই। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কথায় কথায় অবতারের জন্ম দিয়ে রথ হাঁকিয়ে চলে আর আমাদের ঘরের মেয়েদের ইজ্জৎ লুণ্ঠিত হয়। শোনপুরের মেলায় জীবজন্তু কেনাবেচার মতো আমাদের নিয়েও বেচা-কেনা হয়েছে। গালাগাল, প্রহার, অনাহারে মৃত্যু—আমাদের এ সব কিছুকেই বলা হয়েছে ঈশ্বরের করুণা। কিন্তু হাজার হাজার বছরের এত অত্যাচার এত দুর্দশা যে ঈশ্বর দেখতে পায় না—তাকে মানতে যাব কোন যুক্তিতে!"

"আপনি কি ডাঃ আম্বেদকরের পথ পছন্দ করেন?"

"না, তবে ডাঃ আম্বেদকরও ভুক্তভোগী। কলেজ-জীবনের প্রথম-দ্বিতীয় বর্ষে আমাকেও হিন্দু ছাত্রদের হোস্টেলে থাকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আম্বেদকরের পথ আর কংগ্রেসের অচ্ছুৎ-নেতাদের পথের মধ্যে আমি কোনো ফারাক দেখতে পাই না। উভয়ের পথই গান্ধী-বিড়লা-বাজাজদের পথের সঙ্গে মিশে গেছে। ওঁরা এখন চাইছেন কিছু অচ্ছুৎকে পাঁচ-ছ'হাজারি তন্‌খাওয়ালা বানিয়ে দিতে। অচ্ছুৎদের মধ্যে থেকে বিড়লা-বাজাজ না হোক, অন্তত দু-চারজন হাজারীলাল হোক। কিন্তু দু-একজন অচ্ছুৎ যদি ছোটখাট জমিদার বনে যায় তা'হলেও ভারতের দশ কোটি অচ্ছুৎদের শোচনীয় অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হবে না।"

"আপনি চান যাতে শোষণ বন্ধ হয়—তাই না?"

"অবশ্যই। গরীবদের শ্রমে ফুলে-ফেঁপে ওঠা কিছুসংখ্যক মানুষের কর্তৃত্ব কেড়ে নিলেই আমাদের সমস্যার সমাধান সহজেই হতে পারে।"

"সেই জন্যেই তো গান্ধীজি হাতে-তৈরী কাপড়, গুড় এবং হাতে-তৈরী সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন।"

"বটে! বিড়লা আর বাজাজের টাকার জোরে? খাদি-সংঘের দু'এক লাখ টাকা ঘাটতি পড়লেই কোনো না কোনো শেঠ এসে চেক কেটে দেয় কেন? যদি গান্ধীর চরকার দাপটে ওদের কাপড়ের কল বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হত, মুনাফায় টান ধরত

কিম্বা রেশমী শাড়ির চাহিদা কমে যেত তা'হলে কোনো শেঠ-শেঠানী গান্ধী-ভজনা করতে এগিয়ে আসত না —বুঝলেন ওঝাজী ! এ ব্যাপারে আমার কোনো মোহ নেই।"

"জাপানীরা থাবা বাড়িয়েছে। আপনি কি চান, তারা এ দেশের কল-কারখানা ধ্বংস করে দিয়ে যাক ? কত পরিশ্রম, কত বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করে ভারতীয়রা এইসব গড়ে তুলেছে —এ ব্যাপারগুলোও বিবেচনা করুন, সুমেরজী।"

"পরিশ্রম, বিঘ্ন-বাধা এগুলো অবশ্যই বিবেচনাযোগ্য। কিন্তু ব্যাপারটা কি, একদিকে গান্ধীবাদীদের বক্তব্য যে তারা কল-কারখানার অস্তিত্ব এক মুহূর্তের জন্যেও মানতে রাজী নয় অন্যদিকে এ দেশের মালিকশ্রেণী বিশ্বাস করে জাপানীরা এলেও তাদের কল কারখানার মালিকানা সুরক্ষিত থাকবে। জাপানের বেতারভাষ্য শুনে এ সম্পর্কে তাদের আস্থা বেড়ে গেছে।"

"তারা দেশের অর্জিত সম্পদ রক্ষা করতে চায়।"

"কাটা ঘায়ে নুন দেবেন না ওঝাজী। দেশের সম্পদ না নিজেদের সম্পদের দিকে তাদের নজর ? তাদের মুনাফা লুণ্ঠনের সুব্যবস্থা থাকলে ও সব কল-কারখানা ধ্বংস হয়ে গেলেও কিছু আসে যায় না তাদের।"

"মালিকদের সম্পর্কে যদি আপনার কথা মেনেও নেওয়া যায় তা'হলেও গান্ধীজির সততা সম্পর্কে সন্দেহ করা আপনার উচিত নয়।"

"কথা এবং কাজের মিল কিম্বা অমিল এর দ্বারাই আমি ব্যক্তির সততা যাচাই করি। আমি গান্ধীর দুগ্ধপোষ্য শিশু নই। এগুরুজ-ফাণ্ডের জন্য গান্ধীর পাঁচ লাখ টাকা দরকার ছিল আর বোম্বাই-এর শেঠরা পাঁচ দিনের মধ্যেই সাত লাখ টাকা এনে গান্ধীর চরণে সমর্পণ করেছিল। পুঁজিপতিশ্রেণীর জন্য তিনি যা করেছেন তাতে ইংলণ্ড আমেরিকার ব্যবসায়ীরা দরকার হলে সাত কোটি টাকার থলি উপুড় করে দিতে দ্বিধা করবে না !"

"এর কারণ ব্যবসায়ীশ্রেণীর আস্থা অর্জন করেছেন তিনি।"

"ব্যবসায়ীরা ভগবানকেও ঘুষ দেয়, তাই মন্দিরের দরজায় লিখে রাখে 'শুভ-লাভ'।"

"চরকা-খাদিকে এই শোষণ-ব্যবস্থার শত্রু বলে আপনার মনে হয় না ?"

"আমি চরকা-খাদি এইসব ব্যাপারগুলোকে শোষণ-ব্যবস্থা কায়েম রাখার কূট কৌশল বলেই মনে করি।"

"তা'হলে কল-কারখানাকেই শোষণ-প্রক্রিয়ার শত্রু মনে করা উচিত।"

"তবে শুনুন, এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য। পাথরের হাতিয়ার নিয়ে যে সভ্যতা সুরু হয়েছিল আজকের মানুষ সেখান থেকে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। চরকা-তাঁত সভ্যতার কোনো এক পর্যায়ে মানুষের অগ্রগতির সহায়ক হলেও আজ ওগুলো ব্যবহারিক যৌক্তিকতা হারিয়েছে। পাটনার যাদুঘরে দেখেছি তালপাতায় লেখা পুথি। নালন্দার

বিদ্যার্থীদের জন্য বইপত্তর লেখা হত তালপাতায়। 'ফিরে চলো তালপাতার যুগে' —সাত জন্ম ধরে হেঁকে চলুন গান্ধীজি; তুনিয়া কিন্তু কলের কাগজ, মোনো টাইপ, রোটারি মেসিনে ছাপার যুগ থেকে তালপাতার যুগে ফিরে যাবে না। আর এই না যাওয়াটাই মঙ্গল। এ যেন ফ্যাসিষ্ট হানাদারদের ট্যাঙ্ক, বিমান, ডুবোজাহাজ ইত্যাদির বিরুদ্ধে পাথরের হাতিয়ার নিয়ে মোকাবিলা করতে বলছেন গান্ধীজি!"

"আপনি দেখছি অহিংসার মহান্ সিদ্ধান্তও মানেন না!"

"গান্ধীজির অহিংসা? ঈশ্বর রক্ষা করুন! যে অহিংসার মন্ত্রে কৃষক-মজুরদের ওপর সরকারের গুলি চালানোকে সমর্থন করা যায় আর ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডাদের সামনে বৈষ্ণব বনে যেতে হয় তেমন অহিংসাকে বুঝে ওঠা আমার পক্ষে অসম্ভব। চরকা-খাদির ব্যাপারে আমার বক্তব্য শুনুন ওঝাজী, মিল মালিকেরা ভালোভাবেই জানে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর সঙ্গে চরকা-তাঁতের উৎপাদন কোনো দিক থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। তাই তারা মুক্তহস্তে খাদি-ফাণ্ডে খয়রাতি দিয়ে যাচ্ছে। চরকা-খাদি এই ব্যাপারগুলো হল শোষণমুখী সমাজ-ব্যবস্থার সত্যকার শত্রু সাম্যবাদের পথে একটা বড় বাধা। কত লোক যে ভুলভাবে বুঝে বসে আছে —সাম্যবাদ এবং কল-কারখানার ওপর শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার চেয়ে খাদি-উদ্যোগ পন্থাই ভালো। এই ভ্রান্তি যাতে সহজে নষ্ট না হয় সে জন্যে মিল-মালিকেরা সব খাদি-ভক্ত হয়ে উঠেছে।"

"আপনার বক্তব্য গান্ধীনীতির ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ।"

"গান্ধীবাদী আদর্শের প্রতিটি বক্তব্য আমাদের মতো কোটি কোটি শোষিত মানুষের কাছে মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখার, চিরস্থায়ী শোষণ-ব্যবস্থা চালু রাখার দালালদের গুদাম ঘরে আমরা চাই চিরকালের জন্যে তালা ঝুলিয়ে দিতে। আর গান্ধীজীর চেষ্টা —হল আমাদের ঠকিয়ে স্থিতস্বার্থের সেবা করা। ধনিকশ্রেণীর উচ্ছিষ্টজীবীদের যদি আমরা জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিতে পারতাম তা'হলে খুবই ভালো হত; আর তা না পারলেও তাদের রাস্তা আমরা আটকে দিতে চাই। একদিকে জাতিভেদ প্রথা অন্যদিকে শোষণ-ব্যবস্থা এই তুইয়ে মিলে ভারতবর্ষে আমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করে দিতে চাইছে! আর গান্ধীজি উদ্ভট দার্শনিকতার সাহায্যে এ সব কিছুর ব্যাখ্যা করছেন। এই সব সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে 'হরিজন-উদ্ধার' নিছক ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কি? অবশ্য এর ফলে উচ্চবর্ণের কিছু লোকের জীবিকার ভালোই ব্যবস্থা হচ্ছে।"

"আপনি কি চান না বর্ণহিন্দু এবং অচ্ছুতেরা এক হয়ে যাক?"

"যুগের দাবীতেই আমরা হয়ত এক হব, কিন্তু গান্ধীজির প্রিয় —ধর্ম, ঈশ্বর, সনাতন পন্থা আমাদের ঐক্যের পথে প্রতিবন্ধক। ওঝাজী, আমাকে দেখুন —আমার গায়ের রঙ পাকা গমের মতো, পাতলা উন্নত নাক। আর আপনার রঙ কালো, নাক চ্যাপ্টা।

এর তাৎপর্য, আমার শরীরে আপনার তুলনায় আর্য রক্তের পরিমাণ বেশী। আপনার পূর্ব পুরুষরা বর্ণবিভাগের লৌহপ্রাচীর তুলে ভেবেছিলেন যে, রক্তের সংমিশ্রণ ঘটতে দেবেন না, কিন্তু তাঁদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। এর জলন্ত উদাহরণ আপনি এবং আমি —ভোল্‌গা আর গঙ্গা তটের রক্তধারা সময়ের প্রবহমান গতিতে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই গায়ের রঙ নিয়ে ঝগড়া আর নেই। সব কিছুই ঠিক হয়ে যেত যদি ধর্ম, ঈশ্বর এবং সনাতনপন্থীরা এ-পথে বাধা হয়ে না থাকত। আর এখন শোষকশ্রেণী এবং তাদের প্রতিনিধি গান্ধীজি এসে আমাদের মিলনের পথকে আরও দুর্গম করে তুলেছেন।"

"আচ্ছা, আপনি যখন চরকা-খাদি এ সবের ওপর আস্থা রাখেন না তখন কি মনে করছেন, বিদেশী সাম্যবাদ ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?"

"যা কিছু শোষকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিকূল তাকেই তারা বলে বিদেশী, বলে অসম্ভব। চিনির কারখানা, বাষ্পীয় জাহাজ, মোটর, কাঁচ, ফাউণ্টেন পেন ইত্যাদি জিনিসগুলো কোটি কোটি টাকা মুনাফা নিয়ে আসে সুতরাং ওগুলো আর বিদেশী নয়। বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার, চলচ্চিত্র, রেডিও এ সবই তো বিদেশের জিনিস কিন্তু এখন স্বদেশী হয়ে গেছে যেহেতু ও সবের সাহায্যে এ দেশের মানুষকে খুব ভালোভাবে শোষণ করা যাচ্ছে। অর্থাৎ শোষণের তাবৎ উপকরণ বিদেশী হলেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু সাম্যবাদ যেহেতু শোষণমুখী সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংসকারী এক অমোঘ শক্তি তাই এ দেশের শাসকবৃন্দরা সব সময়েই —সাম্যবাদ বিদেশী ভাবধারা এ দেশের মাটিতে চলতে পারে না —এমন একটা প্রচার তারস্বরে চালিয়ে যাচ্ছে। ওঝাজী এর নাম কি সততা!"

"সাম্যবাদ ধর্ম-বিরোধী আর ভারত চিরকালই ধর্মপ্রাণ —এটা ভেবে দেখেছেন?"

"স্কুল-কলেজের শিক্ষা আপনি বেমালুম ভুলে গেছেন ওঝাজী —আপনাকে কি করে বোঝাতে পারি! ধর্মের কথা যখন আপনারা বলেন তখন আপনাদের মনে কেবল হিন্দুধর্মের ব্যাপারটাই থাকে। গো-সেবা মণ্ডল সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাংস ছাড়া গরুর সব কিছু খাওয়া চলবে এমন কি গোমূত্র গোবর পর্যন্ত। গান্ধীজি এই গো-সেবা মণ্ডলকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন। ভারতে যদি গো-খাদক এবং গো-খাদক বিরোধীদের মধ্যে ভেদরেখা টানা হয় তবে দেখা যাবে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই গো-খাদক। আপনি তো জানেন আমাদের সম্প্রদায় গরু খায়, এর সঙ্গে যোগ করুন ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মুসলমানদের, কোটিখানেক খৃষ্টানদের এবং কয়েক লক্ষ বৌদ্ধকে। যদি গরু খাওয়া আর না-খাওয়া এতেই ধর্মাধর্মের মীমাংসা হয়ে যেত তা'হলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বাদ দিয়ে দুনিয়ার অন্যান্য সব ধর্মাবলম্বীরা অধার্মিক? গান্ধীজির ভূতপূর্ব বন্ধু লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতিমান। ধর্মের জিগীর তুলে তিনি সকলকে সাম্যবাদ থেকে দূরে থাকার জন্য প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। ওঝাজী, শোষকশ্রেণীর সবাই

দারুণ রকম ধর্মপ্রাণ এবং শোষণ-বিরোধী যে-কোনো চিন্তাধারাকেই ধর্মের শত্রু হিসাবে ঘোষণা করা হয়। হ্যাঁ, মেনে নিলাম সাম্যবাদী চিন্তাধারার জন্ম বিদেশে, কিন্তু খৃষ্টধর্ম, ইস্‌লাম ধর্ম, রেল-তার-উড়োজাহাজ-কারখানা প্রভৃতি বিদেশ-জাত বস্তু আমাদের চোখের সামনে কেমন স্বদেশী হয়ে গেছে! সাম্যবাদও অদূর ভবিষ্যতে আমাদের কাছে বিদেশী ভাবধারা থাকবে না, যার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে।"

২

পাটনায় সান্ধ্যভ্রমণের দু'টি জায়গা—বাঁকীপুর ময়দান এবং হার্ডিঞ্জ পার্ক। দুটোর অবস্থাই এমন শোচনীয় যে কাউকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা তাদের আর নেই। তবু কিছু লোক আসে, যাদের পায়ের তলায় সর্ষে অথবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কিছুটা আড্ডা দিতে হয়। অন্ধকার ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে—তিন বন্ধুর কথা এখনও ফুরোয়নি। তিনজনে বাঁকীপুর ময়দানে চলে এসেছে। ওদেরই একজন বলল, "ভাই সুমের, আবার বলছি—আর একবার ভেবে দেখ। বড় ভয়ঙ্কর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছ।"

"মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে যাচ্ছি তাই হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি। কথাটা বুঝে দেখ রূপ, এটা কোনো দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপ নয়।"

"তুমি হাওয়ায় ভাসবে ভাই। আমার কিন্তু ঘরের ছাদের কিনারায় দাঁড়ালেই বুক ঢিবঢিব করে।"

"কত লোকের সাইকেল চড়তেই ভয় লাগে, আর তুমি দিব্যি চলন্ত সাইকেলে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়।"

"একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, মজুরশ্রেণীর জন্য লড়াকু সুমের কেন এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জীবনপণ করছে!"

"কারণ একটাই। মজুরশ্রেণীর স্বার্থ এবং এই মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণাম এক বিন্দুতে এসে মিলিত হচ্ছে। এই যুদ্ধ শুধু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের টানা-পোড়েন নয়, শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের এক নতুন অধ্যায় সূচনা করবে।"

"এই যুদ্ধের জন্য সব চেয়ে বড় অপরাধী ইংরেজ পুঁজিপতিরা—এ কথাটা তুমি অস্বীকার করতে পার?"

"বল্ডউইন, চেম্বারলেন যাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে তারাই যে দায়ী, এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে এক মত। কিন্তু সাম্যবাদের প্রসারকে রুখবার জন্যে ওরাই তো হিটলার মুসোলিনীকে মদত দিয়েছে, শক্তিশালী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। ভস্মাসুর শিবের বরে বলীয়ান হয়ে প্রথমে শিবের ওপরেই চড়াও হয়। এই মহাযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সেই ধরনের তামাসা ঘটতে আমরা দেখলাম। কিন্তু এখন ভস্মাসুর শিবকে ছেড়ে আমাদের দিকে থাবা বাড়িয়েছে।"

"আমি তো কোনো তফাৎ দেখছি না যুদ্ধের প্রথম অবস্থার সঙ্গে বর্তমানের।"

"তফাৎ তো দেখতেই পাবে না—বেনিয়াগোষ্ঠীর লোক যে তোমরা। ফ্যাসিষ্ট শাসনেও বেনিয়াগোষ্ঠীর লোকের ঘি-মশলায় হাত পড়ে না। সোভিয়েত পরাজিত হলে মজুর কিষাণের সমস্ত আশা-ভরসা ধ্বংস হয়ে যাবে। ফ্যাসিষ্ট রাজত্বে মজুর-কৃষকরা, তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী তুলবারই সুযোগ পায় না; তাদের অবস্থা ক্রীতদাসদের মতো হয়ে ওঠে। আমাদের কাছে সোভিয়েত রাশিয়া অনেকগুলি রাষ্ট্রের মধ্যে একটি রাষ্ট্র নয়—একমাত্র রাষ্ট্র। সারা বিশ্বের মেহনতী জনসাধারণের বন্ধন-মুক্তির একমাত্র আশার প্রদীপ। ঐ প্রদীপের শিখা নিভে গেলে সারা দুনিয়ায় ঘোর অন্ধকার নেমে আসবে। তাই আমাদের দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ ঐ ফ্যাসিষ্ট স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব।"

"কিন্তু সুমের, দেশে আরও অনেক সমাজবাদী রয়েছে, তারাও তো চায় জগৎকে শোষণমুক্ত করতে।"

"সেবাগ্রাম থেকে প্রলম্বিত অন্ধকারে যে-সব সমাজবাদীদের অস্তিত্ব তাদের অভিভাবক শয়তান। হিটলারও নিজেকে সমাজবাদী বলে, বলে গান্ধীর চেলারাও। কিন্তু সমাজবাদী বলে নিজেকে জাহির করলেই কি সমাজবাদী হওয়া যায়! ভারতবর্ষ হিটলার-তোজোর শাসনাধীনে এলে এ দেশ থেকে পুঁজিবাদ বা পুঁজিপতিরা খতম হবে না বরং আরও বেশী শক্তিশালী হবে। ফ্যাসিষ্ট শাসনে সাম্যবাদীদের কি হাল হয় সেটা ইতালী ও জার্মানীর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে। শুধু তাই বা কেন, ফ্রান্সে প্রতিদিন বহু কমিউনিস্টকে গুলি করে মারা হচ্ছে! যে নিজেকে মার্কস্‌বাদী মনে করেও এই যুদ্ধ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চায় সে একই সঙ্গে নিজেকে এবং অপরকে প্রতারিত করে।"

"তার মানে তুমি বলতে চাও, এ যুদ্ধে কেউ নিরপেক্ষ থাকতে পারে না?"

"ঠিক তা'ই। যার মস্তিষ্ক যথাযথভাবে কাজ করছে তাকে একটা না একটা পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে। এই যুদ্ধের পরিণতিতে হয় সাম্যবাদী শক্তি খতম হয়ে যাবে না হলে এমন শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে, হিটলার-মুসোলিনী-তোজো এমন কি তাদের পিতৃপুরুষগণ—বল্ডউইন, চেম্বারলেন, হ্যালিফ্যাক্সদের পা রাখার মতো জমি দুনিয়ায় থাকবে না। যাদের তোমরা নিরপেক্ষ ভাবছ তাদের নিরপেক্ষতা একটা লোক-দেখানো ব্যাপার। ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়বার সদিচ্ছা তাদের নেই।"

"আমাদের এখানকার ইংরেজদের মনোভাব তুমি কি লক্ষ্য করছ?"

"ওরা অন্ধ—ত্রিশ বছর আগেকার জমানার গাড্ডায় পড়ে আছে এবং থাকতে চাইছে। ওদের ধারণা যুদ্ধের শেষে দুনিয়ার হাল থাকবে যথাপূর্বম। এটাই স্বাভাবিক, যারা আমাদের প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রতি পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তারা পুরনোকে

আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইবেই। দেখতেই পাচ্ছ, এ দেশের শাসক ইংরেজরা এখন সভামঞ্চ থেকে জনগণকে আত্মত্যাগের উপদেশামৃত বিতরণ করছেন। অথচ গভর্নর, গভর্নর জেনারেলদের খরচের বহর দেখলে মাথা ঘুরে যায়। এ দেশের একজন মজুরের আয়ের সঙ্গে ঐ সব রাজপুরুষদের গত ২৫ বছরের আয়ের একটা তুলনা করলেই অসাম্যের আশমান-জমিন ফারাকটা খুব সহজেই বোঝা যায়। যেমন—

ভাইসরয়ের	আয় ২,৫০,৮০০	টাকা	দেশীয়	মজুরের	তুলনায়	১০,০০০	গুণ
বাংলার গভর্নরের	" ১,২০,০০০	"	"	"	"	৪,৮০০	"
যুক্তপ্রদেশের গভর্নরের	" ১,২০,০০০	"	"	"	"	৪,৮০০	"
বিহারের গভর্নরের	" ১,০০,০০০	"	"	"	"	৪,০০০	"

এর সঙ্গে রাহা-খরচ, ছুটির বেতন এ সব ধরলে দেখা যাবে বাংলার গভর্নরের আয় একজন দেশীয় মজুরের তুলনায় ৪২,২৩১ গুণ বেশী। এর পাশাপাশি ইংলণ্ডের অবস্থাটা দেখ, সেখানে কয়লাখনির একজন মজুরের সাপ্তাহিক বেতন আমাদের হিসাবে ৩৫ টাকার মতো। ক্ষেত মজুরের সাপ্তাহিক আয় ৪৫ টাকার কাছাকাছি। এর সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর বেতনের যদি তুলনা করা যায় তা'হলে তিনি স্বদেশের মজুরশ্রেণীর তুলনায় ৩৬ গুণ বেশী পান। আর সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বেতন সে দেশের সর্বনিম্ন মজুরীর মাত্র ৬ গুণ বেশী। আমাদের শেঠগোষ্ঠীর আয়ের অঙ্ক হিসাব করলে তো মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়।"

"এ দেখছি লুটতরাজের চাইতেও বেশী।"

"অপরিণামদর্শী ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা সামান্য কিছুও আশা করি না কিম্বা তাদের বাঁচাবার জন্যে আমরা এ যুদ্ধে সামিল হইনি। আমাদের লড়াই আগামী দিনের পৃথিবীতে সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য —যেখানে শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থায় মানবতা সুউচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে।"

সমদ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এ বার জিজ্ঞেস করল, "সুমের, তোমার অনেক কথার সঙ্গে আমি এক মত আবার কিছু ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করি। কিন্তু তোমার আদর্শকে আমি কি পরিমাণে শ্রদ্ধা করি সেটা তো তুমি জানো। এটা আমিও স্বীকার করি যে, এই বিশ্বযুদ্ধে আমরা কেউই নিরপেক্ষ থাকতে পারি না। কিন্তু তুমি বিমানবাহিনীতে ভর্তি হবার পর খবরটা আমাদের দিলে কেন?"

"হ্যাঁ আগে খবর দিই, আর বাছাই-পর্বে ছাঁটাই হয়ে যাই! ভর্তি হয়ে ২৪ ঘণ্টা আকাশে উড়ে তবেই তোমাদের জানিয়েছি। এখন জানাজানি হলে কোনো ক্ষতি নেই কারণ পরশু আম্বালায় বিমান-চালনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলে যাচ্ছি।"

"তোমার মাকে খবর দিয়েছ?"

"মা'র কাছে পাটনাও যা, আম্বালাও তাই। যতক্ষণ পরিষ্কারভাবে তাঁকে জানাতে না পারছি —আমি যুদ্ধের সৈনিক হিসাবে মৃত্যুর মুখে চলেছি ততক্ষণ তাঁর কাছে সবই এক। মাকে এখনই সব কথা খোলাখুলি লেখার অর্থ তাঁর সর্বক্ষণের ঘুম কেড়ে নেওয়া। আমি ঠিক করেছি, যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তাঁকে নিয়মিত চিঠি দিয়ে যাব, আর এতেই তিনি শান্তি পাবেন।"

"বারবার তোমার সাহসের কথাটাই ভাবছি।"

"মানুষ হয়ে জন্মানোর মূল্য শোধ দেবার জন্য সদা-প্রস্তুত থাকতে হয় সমদ, তা'ছাড়া যে আদর্শে আমি বিশ্বাসী তাতে আমার দায়িত্ব অনেক বেশী।"

"তোমার ধারণা এই যুদ্ধের পরিণতিতে বিশ্বে বিরাট পরিবর্তন স্থচনা করবে?"

"আগের মহাযুদ্ধ পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটিয়ে দিয়েছে। রাশিয়ায় সাম্যবাদী শক্তির উত্থান, পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশে মেহনতী মানুষের রাজ্য কায়েম করা বড় কম কথা নয়। তাই বর্তমান মহাযুদ্ধের শেষে —আমার বিশ্বাস, এই আকাশের নীচে এক নতুন পৃথিবী জেগে উঠবে। আমাদের সঙ্গে রয়েছে মহান্ সোভিয়েত, রয়েছে তার লালফৌজ, চীন, ইংলণ্ড, আমেরিকার জনগণ সর্বস্ব পণ করে এই যুদ্ধে লড়ছে, তাই জয় আমাদের স্থনিশ্চিত।"

সমদ ও রূপকিশোরদের তল্লাটে পাকিস্তানের দাবী নিয়ে আলোড়ন উঠেছে। রূপকিশোর সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলল, "গান্ধীবাদী স্বরাজ আস্থক অথবা সাম্যবাদী স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হোক, সেটা হবে গোটা ভারতবর্ষের জন্যে। মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে অখণ্ড ভারতে —আর এতে কি কোনো দ্বিমত থাকতে পারে স্থমেরবাবু?"

"রূপকিশোর, ভারতবর্ষ শব্দটি একটি জটিল ধারণা মাত্র! স্বাধীনতা আমরা চাই কিন্তু এ দেশের জনগণই ঠিক করবে তাদের স্বাধীনতার স্বরূপ। স্বাধীনতা আকাশ থেকে টুপ করে এ দেশের পুঁজিপতিদের মুঠোর মধ্যে পড়লে সেটা তো আর দেশের জনসাধারণের স্বাধীনতা হবে না!"

রূপ, "তোমার আদর্শ মতো স্বাধীনতা না-হয় এল, কিন্তু সেই স্বাধীনতার জন্য অখণ্ড ভারতকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা চলতে পারে না।"

স্থমের, "রূপকিশোর, তুমি শব্দের গোলকধাঁধায় পড়ে গেছ। ভারত খণ্ডিত হওয়া বা অখণ্ডিত থাকা নির্ভর করছে সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীদের ওপর। একদা হিন্দুকুশ পার হয়ে আমুদরিয়া পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্রের সীমা ছিল এবং ভাষা, রীতি-রেওয়াজ ও ইতিহাসের দিক থেকে আফগান জাতি ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দশম শতাব্দী পর্যন্ত কাবুল হিন্দুরাজ্য ছিল —অখণ্ড হিন্দুস্থানওয়ালারা হিন্দুকুশ পর্যন্ত থাবা বাড়াতে রাজি আছে?

সিন্ধু নদীর পশ্চিমে বসবাসকারী আফগানদের যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে অখণ্ড ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা না যায় তা'হলে সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, কাশ্মীর, পূর্ববাংলার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন তাদের অখণ্ড ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে?"

রূপ, "তা'হলে ওদের ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দিতে হবে!"

সুমের, "নিশ্চয়ই। আমরা জনগণের জন্যে লড়াই করছি, এর অর্থ হল যে, সমগ্র দেশের জনগণের কোনো একটি অংশকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পরাধীনতায় রাখা চলবে না। পাকিস্তানের দাবীর মীমাংসা করা হিন্দু নেতাদের কাজ নয়, ঐ প্রশ্নের সমাধানের দায়িত্ব মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলির জনসাধারণের। যদি আমরা জনগণের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারি তবে পুঁজিপতি-রাজ কায়েম হবে এবং স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রও গড়ে উঠবে। যদি কায়িক ও মানসিক শ্রমজীবী মানুষের রাজত্ব কায়েম করতে পারি তবে এই ভারতবর্ষের বহু স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠীর এক অখণ্ড রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। কিন্তু তার আগেই ভাষাগতভাবে পৃথক আশীটির বেশী স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব যে এই বিশাল দেশে রয়েছে সেটা স্বীকার করে নিতে হবে।"

"আশীর বেশী? তুমি যে পাকিস্তানের দাবীকেও হার মানালে!"

"যা বাস্তব তাকে অস্বীকার করি কি করে? আর মাতৃভাষা তাকেই বলে, যে ভাষায় কথা বলতে একটি বালকও ব্যাকরণে ভুল করে না। সোভিয়েত দেশ হল সত্তরটি জাতির সম্মেলনে এক বহুজাতিক রাষ্ট্র। সোভিয়েত দেশের দ্বিগুণ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ভারতবর্ষে যদি আশীটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা থাকে তবে অবাক হওয়ার কি আছে?"

"তবে কি তুমি পাকিস্তানের দাবীর পক্ষে?"

"যতদিন এ দেশের গরিষ্ঠসংখ্যক মুসলমান ঐ দাবী করবেন, ততদিন পর্যন্ত। এটা তো দেখাই যাচ্ছে সমস্ত মুসলিম নেতারা ঐ দাবীতে অনড়। অমুসলমানদের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের দাবীর বিরোধিতা করা ন্যায়সঙ্গত নয়। যদি মুসলমান-প্রধান প্রদেশের অধিকাংশ মানুষ অখণ্ড ভারতরাষ্ট্র থেকে পৃথক হয়ে যেতে চান তবে তাঁদের সে অধিকার মেনে নেওয়া উচিত।"

৩

নীচে কালো সমুদ্রের জলরাশি যেন প্রাণহীন, সামনে সাদা মেঘের বিশাল পাহাড়। চলন্ত বিমানে বসে এমনিতে গতিবেগ অনুভব করা যায় না। অবশ্য সুমের তার সামনের গতি-পরিমাপক যন্ত্রে দেখল, সে ৩০০ মাইল বেগে উড়ে চলেছে। সুমের ভাবছিল, সুদূর অতীতে মানুষ যখন পাথরের অমসৃণ হাতিয়ার আবিষ্কার করেছিল সেই সময়ের কথা। নিশ্চয়ই সেদিনের মানুষ ঐ পাথরের অস্ত্র হাতে নিয়েই নিজেকে প্রচণ্ড শক্তিধর মনে করেছিল। আর আজ মানুষ আকাশের অধীশ্বর। মানুষের অগ্রযাত্রার গতিবেগও কি

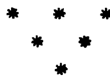
প্রবল! সহসা তার মনে পড়ে —মানবতার ঘৃণ্যতম শত্রু ফ্যাসিষ্টদের কথা। যাদের চেষ্টা, মানব প্রগতির অবদানগুলির সাহায্য নিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা। ঘৃণায় সুমেরের দেহমন রি-রি করে ওঠে, তার খেয়াল হল প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশ জাপানী ফ্যাসিষ্টদের কবলে। ভাবনার গতিমুখ ঘুরে চলে স্বদেশের মাটিতে··· কদমকুঁয়ার ঘর-বাড়ি, মানুষজন, সেখানে একটি মেয়ে যে তার প্রিয়া। তার বৃদ্ধা মা, যে অচ্ছুৎ সমাজের মধ্যে আজন্ম বন্দী হয়ে থেকে তার মতো একটি ছেলেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে।

এই সব নিকট-দূর স্বদেশের মানুষের জন্য ভাবনা ও ভালোবাসা থেকেই তার মনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন প্রচণ্ড তেজে জ্বলতে আরম্ভ করে। আর ঠিক সেই সময়েই সে সামনে দেখতে পেল সূর্য-চিহ্নিত তিনটি জাপানী বিমান। সুমের বেতারে খবর পাঠিয়ে দিল, 'দু'মিনিটের মধ্যেই জাপানী বিমানের মোকাবিলা করতে হবে।' কথা বলতে সময় লাগে, তার চেয়েও বেশী লাগে লিখতে কিন্তু চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সুমেরের মেসিনগানের কার্যকরী আওতায় চলে এল জাপানী বিমান তিনটি।

ট্র···ট্র···ট্র —নিখুঁত নিশানায় সুমেরের মেসিনগানের এক ঝাঁক গুলি বাতাস কেটে জাপানী বিমানগুলিকে বিদ্ধ করল আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের বিমান তিনটি সমুদ্রের বুকে আছড়ে পড়ল।

সুমেরের নিজের নৈপুণ্য প্রকাশ করার এটাই ছিল প্রথম সুযোগ। এই সাফল্যে সে খুব খুশী হল। ফিরতি পথে অন্য এক বৈমানিক শরীফকে বলল, "আমার নিজের দাম উশুল করে নিয়েছি। এইভাবে আমরা প্রত্যেকে যদি তিনটি করে ফ্যাসিষ্ট বিমান ধ্বংস করতে পারি তা'হলে আর কোনো ভাবনা নেই। এর পর যদি আমি মারাও যাই তবু সান্ত্বনা থাকবে যে, মৃত্যুর আগে আমার কর্তব্য কিছুটা পালন করতে পেরেছি।"

সুমের আরও ২০০ বার বিমান-যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিল এবং প্রায় ১০০ জাপানী বিমান তার হাতে ধ্বংস হয়েছিল। জীবনের শেষ দিনে একটি বিরাট জাপানী বোমারু বিমান ধ্বংস করে সে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করে। বোমারু বিমানটির পাহারাদার জঙ্গী বিমানগুলিকে ফাঁকি দিয়ে সে বোমারু বিমানটিকে ধ্বংস করে দেয় সেই সঙ্গে সুমের ও তার সঙ্গী বিমানচালকটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।



ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা (দ্বিতীয় পর্ব

[কনৈলা কী কথা]

অনুবাদ

ভগীরথ শীল

কনৈলা

স্থান : ত্রিবেণী ।। কাল : ২৩০০ খৃষ্টপূর্ব

সপ্তসিন্ধুর জমিতে আর্যরা এখনও সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করতে পারেনি। কবায়লী সমাজ ক্রমশ ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে সামন্তবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। যমুনার অপর পারে কোন জাতি বাস করে, কি তাদের সমাজ প্রণালী, সপ্তসিন্ধুর লোকেরা সে খবর রাখে না, জানে না বর্তমান আলোচ্য কনৈলার অস্তিত্বের কথা। অবশ্য সে সময়ে কনৈলার অস্তিত্ব আদৌ ছিল কি-না সন্দেহ, থাকলেও নিশ্চয়ই তা নগণ্য। হয়ত দু-একটি পাতায়-ঢাকা মাটির কুঁড়েতে দু-চারজন লোক বা দু-এক ঘর বাস করে থাকবে, কিন্তু তারা যেমন দরিদ্র তেমনি শক্তিহীন।

ভরা যৌবন মঙ্গই নদী খর বেগে বয়ে চলেছে। দু-ধারে যতদূর চোখ যায় বিরাট জঙ্গল। জঙ্গলে থকোন, শিহোর, কিলবিল, শাল, পলাশ গাছ প্রচুর। আবার কোথাও আম, কাঁঠাল, বড়হলের গাছ। বেশীর ভাগ নীচু জমিতে দহোর ও তালবন। মঙ্গই নদী তার স্বভাবানুযায়ী দু-ধারে কোথাও উঁচু কোথাও নীচু করে তীর গড়ছে আবার ভাঙছে। এই সব তাল বনের নীচু জমিতে কোথাও কোথাও বর্ষার জল আটকে থাকে সারা বৎসর। গ্রীষ্মে তৃষ্ণার্ত প্রাণীদের ভীড় জমে। এ সব জায়গায় মানুষ যে একেবারে দেখা যায় না তা নয়, কালেভদ্রে দু-এক দল মানুষ আসে বিশ্রামের প্রয়োজনে অথবা শিকারের আশায়।

শীত শেষ হয়েছে, বসন্ত আসন্ন। গাছপালা নতুন পাতায় সাজতে সুরু করেছে। পল্লবিত ডালে-ডালে বিচিত্র বর্ণের সে কি মুখর সমারোহ। আকাশে বাতাসে বুনো ফুলের গন্ধ। বনের জন্তু জানোয়ারদের মনেও যেন রঙ লেগেছে বসন্তের, ওরাও মুখর।

পরবর্তীকালে যে জায়গাটা কর্ণহট ও কনৈলা বলে পরিচিত হয়েছে সেখানে ঘন জঙ্গল। সীমানার শেষে বিস্তৃত তালবন. তারই মধ্যে কয়েকটি ছোট-বড় জলাশয়। কিছু দূরে একটু পরিষ্কার জায়গায় কতকগুলি চালাঘর। এগুলির এমন অদ্ভুত নির্মাণ-কৌশল যে এগুলিকে না বলা যায় ঘর, না বলা যায় চালা। মজবুত মোটা

গাছের গুঁড়ি গোল করে মাটিতে পুঁতে তৈরী করা হয়েছে তার দেওয়াল, ওপরে তালপাতার ছাউনি। একটি মাত্র দরজা, তা এমন ছোট যে দশ-বারো বছরের শিশুকেও কোমর বেঁকিয়ে ঢুকতে হয় ঘরে। হিংস্র জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচবার জন্তেই এই ব্যবস্থা।

ঘরগুলির পেছনে ঘন জঙ্গল, তার ভেতর দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ। এ পথ কতদূরে গেছে তা তারাই জানে, যারা প্রতি বছর দল বেঁধে এখানে এসে কিছুদিনের জন্তে বাস করে। এই মানুষের চলা পথ ধরে জঙ্গলের জানোয়ারগুলিও চলাফেরা করে। আর এমনি করে সৃষ্টি হয়েছে আঁকাবাঁকা এক জংলা পথ।

ঘরগুলির পাশে বিরাট একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলে সারা দিনরাত। ঘরের লোকগুলি সবাই গিয়ে জুটেছে তালবনের জলাশয়ে। বর্ষার জল জমে থাকে এখানটায় বারো মাস। সে জলে নানা রকমের অজস্র মাছ। লোকগুলি এখন মাছ ধরতে ব্যস্ত।

লজ্জা কি জিনিস সেটা এখনও তারা জানে না। স্ত্রীলোকদের কোমরে জংলী লতায় বাঁধা গাছের পাতা ঝুলছে। পুরুষেরা সম্পূর্ণ আবরণহীন। প্রচণ্ড শীতের সময় হয়ত শুধু মৃত পশুর চামড়া দিয়ে ঢেকে রাখে দেহটা। আগুনই হল এদের শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার প্রধান সম্বল। দেহের গড়ন মাঝারি ধরনের, গায়ের রঙ হলুদ। অতি বৃদ্ধদের চুলও ভ্রমরের মতো কালো। পুরুষদের মুখে গোঁফদাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। গালের হাড়গুলি অদ্ভুত ধরনের উঁচু, একজোড়া চোখ চেপ্টা নাকের গোড়া থেকে প্রায় কান অবধি বিস্তৃত। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় সর্বদা নেশায় বুঁদ হয়ে আছে, কারণ অত বড় চোখ থাকতেও চেষ্টা করে সবটা খোলে না, সর্বদা আধ-বোজা ভাব। চুল স্ত্রী-পুরুষদের প্রায় সমান লম্বা। হঠাৎ দেখলে স্ত্রী-পুরুষ বেছে নেওয়া কষ্টকর। এর অন্যতম কারণ পুরুষদের দাড়ি-গোঁফ বলে বিশেষ কিছু নেই। কখনও-সখনও দু-এক জনের মুখে দু চারটি দাড়ি দেখা যায়। এদের দেহের গঠন দৃঢ়, পেশীবহুল—প্রথম দর্শনে পাথরে খোদাই-করা মূর্তি বলে ভুল হয়। এরা চাষ-আবাদ জানে না, গাছের ফলমূল ও বন্য পশুর মাংসই এদের প্রধান খাদ্য—এরা যাযাবর।

মাটির ঢিপি তৈরী করে খানিকটা জায়গায় জল আটকে, সেই জলে মাছ ধরছে সবাই। কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি নানা রকমের মাছ। প্রায় ৬০-৭০ জন মিলে মাছ ধরছে আর তালগাছের গোড়ায় জমা করছে। জমতে জমতে পাহাড় প্রমাণ উঁচু হয়েছে। এত মাছ ওরা দশ দিনেও খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তাই পাশে একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে জাওলা মাছগুলি ফেলছে, জিইয়ে রাখার জন্তে।

জাল ও বাঁশের টুকরী দিয়ে মাছ ধরছে —কম জলে হাত দিয়েও ধরতে চেষ্টা করছে, মাছেরাও সুযোগ পেলে ছাড়ছে না। মাছের কাঁটার আঘাতে লোকগুলির হাত রক্তে লাল হয়ে উঠছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। সমান তালে চীৎকার করছে আর মাছ ধরছে। চীৎকার মানে, কাজ করবার জন্তে তালে তালে এক প্রকার শব্দ। এই বোধহয় ওদের গান, কখনও স্ত্রী-পুরুষ মিলে গাইছে আবার কখনও আলাদা হয়ে দল বেঁধে। সবাই মিলে সবাইকার আনন্দ উপভোগ করছে।

দল থেকে কিছু দূরে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বসে আছে, অন্য মানুষগুলির তুলনায় বেশ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন চেহারা। বড়-বড় জট পাকানো চুলে নানা প্রকার পাখির পালক গোঁজা, গলায় হাড়ের মালা, হাতে লম্বা ফলাযুক্ত বর্শা। তাকে দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই লোকটাই দলের সর্দার। এরা জাতিতে কিরাত, এদের শাখা-প্রশাখা দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। এরাও কিরাতদের একটা শাখা —থারু নামে পরিচিত। সম্ভবত এদের পূর্বতন কোনো এক প্রতাপশালী দলপতির নামানুসারেই এদের এই নামকরণ হয়েছে। বর্তমান কনৈলা থেকে দেড়শো-দুশো মাইল দূরে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে এদের কিছু কিছু বংশধরকে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। আট-নয় শত বৎসর আগেও গোরখপুর অঞ্চলে থারুদের বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।

সর্দার মাছের ঢিপির কাছে বসে মাছ ধরা দেখছিল। কিছুক্ষণ পর তাদের দিকে লক্ষ্য করে কিছু একটা ইশারা করতে মাছ ধরা বন্ধ হল। সকলে কিছু দূরে আগে থেকে জোগাড়-করা কাঠের কাছে গিয়ে কাঠে আগুন দিয়ে মাছ পোড়ানো সুরু করল। পরে সেগুলিকে নিয়ে এল নিজেদের আস্তানায়। সর্দার আবার হুকুম করল বস্তির চারদিকে আগুনের কুণ্ডগুলি জোর করে দেবার জন্তে। আবার তেজে জলে উঠল আগুন। নিশ্চিন্ত মনে এরা এ-বার ভোজনপর্ব সমাধা করতে লেগে গেল। শুধু মাছ-পোড়া হলে তো চলবে না, সঙ্গে নেশার বস্তুও আছে সুপ্রচুর। কেউ বা মাথার খুলিতে, কেউ বা মাটির বাসনে পানীয় ঢেলে নিয়ে পান করছে প্রাণ ভরে আর ঝলসানো মাছ আছে তারই উপকরণ হিসেবে।

ওদিকে আগুনের থেকে সাধ্যমতো দূরত্ব বজায় রেখে ওৎ পেতে বসে আছে হিংস্র জন্তুর দল। বহুদিন পর ওরা মাছ-পোড়া আর মানুষের গন্ধ পেয়ে এখানে এসে জুটেছে। মানুষ আর আগুনকে ভয়ও আছে, তাই দূর থেকে অপেক্ষা করছে সুযোগের। সবাই সুযোগ খোঁজে, মানুষ সুযোগ পেলে এই সব জন্তুদের শিকার করে খায়, আবার এরাও সুযোগ মতো মানুষকে ভক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

এদিকে স্ফূর্তির বহর ক্রমশ বাড়তে থাকে। পান-ভোজনের সঙ্গে নাচ, গান, বাজনার আয়োজনও আছে। গাছের খোলে জন্তুর চামড়ার ছাউনি দিয়ে তৈরী করা ঢোল, নলের নানা প্রকার বাঁশী ও একতারা বাজিয়ে চলেছে অবিরাম।

মেয়েরা সবাই মিলে গান গাইছে, কখনও-সখনও নেশার ঝোঁকে পুরুষরাও যোগ দিচ্ছে। এমনি করে জমে ওঠে ওদের আনন্দ উৎসব। রাত্রি ক্রমশ গভীর হয় আর এদের কোলাহল-মিশ্রিত আওয়াজে সারা বন কেঁপে ওঠে বার বার। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নিরাশ হয়ে বিদায় নেয় ক্ষুধার্ত জন্তুর দল —অন্য কোথাও শিকারের আশায়।

এইসব কিছুর মাঝে-মধ্যে সর্দার এক অদ্ভুত ভাষায় সকলকে সাবধান করে দেয়। আজ অবশ্য তাদের সে ভাষা আমরা বুঝতে পারব না, কারণ থারুবংশীয় মানবজাতি পূর্বের ভাষা ভুলে গিয়ে আর্যভাষা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল মানবজাতির উন্নতির ক্রমপর্যায়ে।

রাত্রি ক্রমশ শেষ হয়ে আসে, স্তিমিত হয়ে আসে উৎসবের কোলাহল। সারা বস্তিতে নেমে আসে অসীম নিস্তব্ধতা। ঘরে থাকার প্রয়োজন এখন আর নেই। কারণ ঠাণ্ডা শেষ হয়ে গেছে তাই আজ মনের আনন্দে নীল আকাশের নীচে ঘাসের বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই।

কিছু দূরে আলাদা জায়গায় ঘুমিয়ে আছে সর্দার, তার চারপাশে ঘুমিয়ে আছে কয়েকটি নগ্ন তরুণী, নানা মুদ্রায়। অন্য সকলেও বিক্ষিপ্ত হয়ে শুয়ে আছে এখানে সেখানে। নেশার মোহে ঘুমন্ত নর-নারীর চোখে-মুখে ফুটে রয়েছে অবসিত কামের তৃপ্তি। জেগে আছে শুধু তারাই কয়েক জন যাদের ওপর রাতের প্রহারার ভার পড়েছে। বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সময় মতো অগ্নিকুণ্ডে কাঠ জোগান দেওয়ার কাজটাও তাদের।

রাত্রি শেষ হয়েছে, এখনও একটু অন্ধকার রয়েছে। কিরাতের দল তেমনি অঘোরে ঘুমোচ্ছে ইতঃস্তত। জঙ্গলের পাখিগুলি কিচিরমিচির আওয়াজ করে রাত্রির অবসান ঘোষণা করছে, এমন সময় কিরাতদের পাহারাদাররা চীৎকার করে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মানুষগুলি কলের পুতুলের মতো উঠে বসল। পাহারাদাররা সর্দারকে লক্ষ্য করে কিছু বলতে সর্দার ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সকলকে ইশারা করল, অমনি সকলে যে যার হাতিয়ার নিয়ে তৈরী হয়ে নিল। কিছু দূরে কতকগুলি কুকুর কোনো কিছু লক্ষ্য করে চীৎকার করছে, ক্রমশ ব্যাপারটা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। অদূরে মঙ্গই নদীর তীর বরাবর বহু লোক চীৎকার করতে করতে ছুটে আসছে।

ওরা দুশ্‌মন! সর্দারের হুকুমে সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুট দিল সবাই। কিন্তু বেশী দূর তাদের যেতে হল না, ঝাঁকে-ঝাঁকে তীর এসে পড়তে লাগল কিরাত-দের মধ্যে। তারা মহিষের চামড়ার ঢাল দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল তবুও আহত হল বেশ অনেকে। কিরাতদের তীর দু-একটা ছাড়া শত্রুদের গায়ে লাগছিল না, কারণ শত্রুরা আসছিল বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্যে কিরাতরা প্রস্তুতও ছিল না। তবুও ভয়ে কেউ পিছনে হঠবার পাত্র নয়। আক্রমণ ও প্রত্যাক্রমণ চলে সমানভাবে। কিছুক্ষণের মধ্যে আক্রমণকারীরা এত কাছে এসে পড়ল যে, তীরের আর প্রয়োজন রইল না। হাতাহাতি লড়াই স্থরু হল দু-দলে।

এতক্ষণে সূর্য পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে, একজনের মুখ অন্যজনে দেখতে পাচ্ছে। আক্রমণকারীরা দেখতে কালো, আকৃতিতে মধ্যম। নাকের নীচের দিকটা কিছু চওড়া এবং ফোলা। চোখ এরা পুরোপুরি খুলতে পারে, এদেরও চুল ঘন কালো। মেয়েরা কোমরে গাছের পাতা বেঁধে লজ্জা নিবারণ করছে কিরাতদের মেয়েদের মতো, পুরুষরা সম্পূর্ণ নগ্ন। এদেরও সর্দারের মাথায় পাখির পালক আঁটা, মুখে কিছু কিছু দাড়ি, গলায় ঝোলানো একজন কিরাতের মুণ্ড।

কিরাতেরা ক্রমশ বলহীন হয়ে পড়ে, ওরা বুঝতে পারে, কালো মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধে জেতা অসম্ভব। লোকসংখ্যায় ওরা দ্বিগুণ। হতাহতের সংখ্যা প্রায় সমান। নিষাদরা দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিরাতদের ওপর। সে আক্রমণ কিরাতরা প্রতিহত করতে পারে না, ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় ওদের ব্যূহ। নিষাদদের দল কিরা-তদের বসতির মধ্যে ঢুকে পড়ে হত্যালীলা চালাতে থাকে নির্বিচারে —শিশুদের পর্যন্ত রেহাই দেয় না কিন্তু তরুণী মেয়েদের নিজেরা ভাগ করে নেয়। দু-চারজন যারা পালিয়ে গেছে তারাই শুধু প্রাণে বাঁচল।

কিরাত ও নিষাদ দলের যুদ্ধ শেষ হল।

আগুনের কুণ্ডলী থেকে ধোঁয়া উঠছে। কিরাতদের শিকার-করা মাছ জমানো ছিল প্রচুর —যুদ্ধে জয়লাভ করে সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে থাকে নিষাদদের দল। নেশায় মেতে উঠল নিষাদরা আর তাদের কামের অগ্নিতে ইন্ধন জোগাতে লাগল যুদ্ধবন্দী কিরাত তরুণীরা। নিষাদদের ভাষা বুঝতে পারে না কিরাত তরুণীরা, তেমনি এদের ভাষাও বুঝতে পারে না নিষাদ পুরুষরা, তবুও হাবভাব অঙ্গভঙ্গি দিয়ে উভয়ে কোনো প্রকারে পরস্পরের ভাব বিনিময় করে।

এই দুই জাতির মধ্যে ঝগড়ার কারণ হল, মঙ্গই নদীর তীরবর্তী স্থানের দখল নিয়ে। কিরাতরাই প্রথমে আসে এ জায়গায়, কিন্তু নিষাদরা কম যায় না—

তাদের নীতি হল, জোর যার মুল্লুক তার। নিষাদরা যখন দেখল যে, এমন সুন্দর জায়গার মালিক হয়ে বসে আছে কিরাতরা, তখনই দুই দলে সুরু হল অধিকারের লড়াই, কিন্তু লড়াইয়ের বিচার তো করে হাতিয়ার। হাতিয়ারের জোর যাদের বেশী, যুদ্ধের জয়টীকা তাদেরই কপালে শোভা পায়।

জয়লাভ করবার পর নিষাদরা এখানে দশ-বারো দিন অপেক্ষা করেছিল, কারণ তারা জানত যে যুদ্ধে হেরে গিয়ে যে সব কিরাত পালিয়ে গিয়েছে, হয়ত তারা অন্য সব কিরাতদের সাহায্য নিয়ে আবার পাল্টা আক্রমণ করতে আসবে। কিন্তু কিরাতরা কেউ আর ফিরে এল না।

নিষাদরা যেদিন রাতে কিরাতদের গান-বাজনার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল মঙ্গই নদীর অপর পার থেকে সেই রাতেই অন্ধকারে চুপি-চুপি নদী পার হয়ে ভোরবেলায় অতর্কিতে তারা আক্রমণ করেছিল। নিষাদদের দল মঙ্গই নদীর উভয় পারে পূর্ণ অধিকার পেল কিন্তু সরযূ এবং রাপ্তী নদীতীরের অধিকার তারা পেল না, কারণ সে সব অঞ্চলে কিরাতদের দল বহু পরিমাণে বাস করত এবং তারা আরও বেশী শক্তিশালী ছিল।

নিষাদদের জীবনযাত্রা প্রায় কিরাতদের মতোই, তবে নিষাদরা কিরাতদের চেয়ে একটু উন্নত। তারা সবে পশুপালন করতে শিখেছে এবং চাষ করতেও সুরু করেছে। নিষাদ জাতি সর্বপ্রথম কনৈলার জমিতেই চাষ সুরু করে।

লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে গাছের পাতা মাটির সঙ্গে মিশে, পচে সার হয়ে ছিল। তখন জমির উর্বরাশক্তি ছিল এখনকার চেয়ে বিশগুণ বেশী। কোনো প্রকারে মাটিটা একটু আল্‌গা করে বীজ ছড়িয়ে দিতে পারলেই ফসল ফলত আশাতিরিক্ত।

পশুদের জন্যে বনে-জঙ্গলে ঘাসের অভাব ছিল না, আর মানুষদের শিকার-জীবন তখনও অব্যাহত। মাংস বা ফলমূল শুকিয়ে বেশী দিন রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না বলেই হয়ত চাষের চিন্তাটা তাদের মাথায় ঢুকেছিল। নিষাদরা তামার কুঠার, বর্শা বা তীরের ফলা ব্যবহার করত এবং সেই জন্যেই তাদের নিজেদের শক্তির ওপর যথেষ্ট আস্থা ছিল। এই অস্ত্রবলেই তারা কিরাতদের মঙ্গই নদীর উত্তর দিক বরাবর তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

২

এই সময়কে ধাতু ব্যবহারের প্রথম যুগ বলা হলেও ধাতুর যথার্থ ব্যবহার সুরু হয় এরও বহুকাল পরে। হলদে ও কালো মানুষদের দিয়েই আমরা কনৈলার প্রাচীন অস্তিত্বের কথা জানতে পারি। সে সময় ব্যক্তি-প্রাধান্যের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না তবে জন বা সমাজ-প্রাধান্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

আজ যেখানে কর্নেলা, শিসবা প্রভৃতি গ্রাম সে আমলে ঐ জায়গায় তাম্রযুগের শেষ দিকে কিছু বসতি ছিল। তারাও কিছুটা উন্নত ছিল। শিকার করা এরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল এবং ক্ষেত-খামারের কাজে যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছিল। এদের যে শত্রু ছিল না তা নয়, একমাত্র নিষাদরাই ছিল এদের প্রধান শত্রু। এই জাতিকে দমিল জাতি বলা হয়। মাঝে মাঝে দু-এক দফা লড়াইও হতো নিষাদদের সঙ্গে। নিষাদ জাতি এ বার বুঝতে পেরেছে যে, এদের সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়, তাই তারা ক্রমশ হটে যেতে লাগল। দমিলরা অত্যাচার করত না নিষাদদের মতো বরং নিষাদদের অনেক কু-প্রথা তুলে দিয়ে উন্নত জীবনযাপনের পথ প্রশস্ত করল।

এই সময়টিকে শান্তির পথে মানব জাতির প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। প্রাণী জগৎ তখনই শান্তি চায় যখন তাদের স্বার্থের পথে কোনো অন্তরায় থাকে না। বিনা বাধায় যখন তাদের স্বার্থ বজায় থাকে তখনই হয় শান্তি প্রতিষ্ঠা। এই শান্তির পথে প্রধান সহায় ছিল গঙ্গা নদী। মঙ্গই নিজের স্রোত নিয়ে মিলিত হত গঙ্গার সঙ্গে আর গঙ্গা সমুদ্রের সঙ্গে। গঙ্গা বা তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে দেশের প্রায় সকল জায়গায় সংযোগ রাখা সম্ভব হতে লাগল এবং একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ স্থাপিত হতে সুরু হল।

মানব জাতির ক্রমবিকাশের এটা প্রথম যুগ। চোখে নতুনের তৃষ্ণা মনে-প্রাণে নতুনের আশা, অফুরন্ত উদ্যম ও শক্তি। নদীপথে যাওয়া-আসার জন্যে তৈরী হল নৌকা এবং জলযাত্রা হল সুরু। নতুনের সন্ধানে মেতে উঠল মানুষ।

৩

দমিল জাতি চাষবাস ও শিল্পকার্যে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিল। তারা ক্রমশ গ্রামের পর গ্রাম স্থাপন করতে লাগল। এক গ্রামের লোক আসতে লাগল অন্য গ্রামে এবং একে অপরের সঙ্গে শিল্প ও কৃষি বিনিময় করে নিজেদের জীবনযাত্রা আরও সহজ করে নিল। এমনি বিনিময় প্রথার মধ্যে দিয়ে সুরু হল বাণিজ্য-প্রথা। বাণিজ্য করতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া দরকার, তাই ক্রমশ নদীপথে চলার উপযোগী জিনিসেরও উন্নতি হতে লাগল এবং তার গতিপথে মঙ্গই থেকে সুরু করে গঙ্গা-যমুনার দুই তীরবর্তী এলাকা জুড়ে নতুন নতুন নগর ও জনপদ গড়ে উঠল।

কিরাত ও নিষাদ জাতি এই দমিলদের পদানত হয় এবং সবাই মিলে এক নতুন জাতির সৃষ্টি করে। এই দমিলরা নিষাদদের মতো কালো কিম্বা কিরাতদের মতো হলদে ছিল না। এদের গায়ের রঙ ছিল পাকা শ্যামবর্ণ, এদের দৈহিক গঠন

বা প্রকৃতিতে ছিল অনেক পার্থক্য কিন্তু সে পার্থক্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। দুই জাতির সংমিশ্রণে এক রকম হয়ে গিয়েছিল কিছুকালের মধ্যেই। দমিলরা তাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতিকে ঘৃণা করত না, ঝগড়া-বিবাদও পছন্দ করত না। নিষাদদের তারা কাজে খাটাতে লাগল এবং দাস হিসাবে গ্রহণ করতে লাগল। এ ছাড়া নিষাদরা অন্যান্য জায়গায় বসবাস করে নিজেরাও কিছুটা উন্নত হয়েছিল। সে সব জায়গায় দমিলরা অস্থায়ী বণিক হিসেবে বসবাস স্থুরু করল এবং নিষাদদের আরো উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে লাগল।

বারাণসী নিষাদ জাতির সবচেয়ে উন্নত নগরী ছিল। সেখান থেকে জল ও স্থলপথে গঙ্গাই তীরবর্তী সকল জনপদগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবার সুবিধা তাই দমিলরা এই সুযোগ গ্রহণ করল। বাণিজ্যের অজুহাতে তারাও বারাণসীতে পাকাপাকি হয়ে বসল এবং নিষাদদের সঙ্গে মিশতে স্থুরু করল। ক্রমশ স্থন্দরী নিষাদ তরুণীর সঙ্গে মিলিত হতে লাগল দমিল তরুণ। নিষাদ দাসীরা স্থান পেলো বিত্তবান দমিলের গৃহে। স্থুরু হলো নিষাদ-দমিল রক্তের সংমিশ্রণ, জন্ম নিল নিষাদ-দমিলের মিলিত সন্তান। শিসবা গ্রাম এমনি মিশ্রিত সন্তানদের দ্বারা ক্রমশ বর্ধিত হতে লাগল এবং দমিলদের জ্ঞান ও শিক্ষায় নতুন প্রজন্ম শিক্ষিত হয়ে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই ভূ-ভাগের চেহারা বদলে এক নতুন জাতি ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করল।

আর্যজাতির উপনিবেশ

স্থান : কাশী গ্রাম ॥ কাল : ৭০০ খৃষ্টপূর্ব

এই বসুধা যত লোক, যত দৃশ্য দেখেছে তা যদি সে বর্ণনা করতে পারত তা' হলে আজকের ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্য রকম হত। সম্ভবত বিধাতার সে ইচ্ছা নেই; তাই তিনি পৃথিবীকে মূক করে রেখেছেন। হয়ত আজকের মানুষের মনে জাগিয়ে দেওয়া উচিত নয় কালকের ঘটে-যাওয়া ঘটনা। কিন্তু যারাই এই পৃথিবীতে একবার এসেছে তারা তাদের কিছু না কিছু স্মৃতিচিহ্ন রেখে যেতে বাধ্য, আর মাটিও সেইসব প্রমাণ নিজের গর্ভে সযত্নে গচ্ছিত রেখে দেয় ভাবীকালের মানুষের জন্যে।

বর্তমান আলোচ্য সময়টা হল খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী। তখনকার স্মৃতি শিসবা বা কনৈলার বুকে নিশ্চয় লুকানো আছে, কিন্তু যতক্ষণ না আজকের সন্ধানী মানুষ তার খোঁজ পাচ্ছে ততক্ষণ সে কাহিনী থেকে যাবে অন্ধকারে। কে জানে, আজ

থেকে ২৭০০ বৎসর আগের স্মৃতি মাটির নীচে কোথায় লুকানো আছে। হয়ত, কুয়ো বা পুকুর কাটবার সময় এমন কত স্মৃতিচিহ্ন আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু অজ্ঞ গ্রামবাসীর কাছে তার মহত্ত্ব কতটুকু !

সে সময় নিষাদ বা দমিল জাতি বা তাদের ভাষা এখান থেকে লুপ্ত হয়নি, তারই মধ্যে অন্য আর এক জাতি এসে এই দুই জাতির শীর্ষস্থানে বসেছে। এরা নিজেদের আর্যজাতি বলে পরিচয় দেয়। এদের গৌরবর্ণ শরীর আর সোনালী চুল সবচেয়ে গর্বের বস্তু।

দমিল জাতি নিষাদদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করত বটে, তবে তারা এ কথা ভাবেনি যে আমরা দেবতা আর নিষাদরা মানব। কিন্তু আর্যগণ এ কথা ভাবত। আর্যগণ প্রত্যেক ক্রিয়া-কর্মে এবং ব্যবহারিক জীবনেও নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল। এমন কি গ্রাম, নদী, গাছ, ফল ও ফুলের পুরনো নাম বদলে দিয়ে নিজেদের ভাষায় নতুন নতুন নামকরণ করতে লাগল। যেখানে পুরনো নাম বদলাতে অসুবিধা সেখানেও উচ্চারণের কিছুটা অদল-বদল করে দিল।

শিংশপা বা শিশম বৃক্ষ এখানকার জঙ্গলে ছিল প্রচুর, তারই নামানুসারে আর্যগণ গ্রামের নাম রাখল শিংশপা —কালক্রমে রূপ বদলে তার নাম হয়েছে শিসবা। তবে আর্যদের দেওয়া এই নাম আসলে দ্রাবিড় অথবা নিষাদ ভাষা থেকে এসেছে কি-না তা জোর করে বলা যায় না। এই শিংশপা এখন আর গ্রাম নেই, শহরের রূপ নিয়েছে ভাঙা-গড়ায়। এখানকার ঘরবাড়িগুলিতে প্রায় সব জায়গায় কাঠের কাজ; এমন কি দৈনন্দিন জীবনেও কাঠের ব্যবহার ছিল সবচেয়ে বেশী। এখানে এমন দোতলা বা তিনতলা অট্টালিকা ছিল যার কাষ্ঠ-শিল্পের নিখুঁত সৌন্দর্য লক্ষ্য করবার মতো।

২

এক বিরাট অট্টালিকায় বাস করতেন রাজপুরুষ অরুণাশ্ব। বাড়িটাকে বলা হত রাজবাড়ি। এই সব রাজপুরুষদের বলা হত কাশীরাজ। কয়েক শতাব্দী পূর্বে এঁদের পূর্ব পুরুষরা পশ্চিম থেকে এসে এখানে বসবাস সুরু করেন, তখন তাদের জন ও জাতির নাম ছিল কাশী। আর্যগণ যেখানে গেছে সেখানেই নিজেদের স্বভাব অনুযায়ী নতুন নামকরণ করেছে, তাই ওরা এখানকার নাম রাখল কাশী জনপদ। এদের রাজপুরুষরা বাস করতেন বারাণসীতে যার প্রথম পত্তন করেছিল নিষাদ দমিল জাতি। কাশীজাতি দমিলদের কাছ থেকে এ জায়গাটা ছিনিয়ে নিয়েছিল। অন্যান্য উন্নত জনপদগুলির তুলনায় বারাণসীর গুরুত্ব ছিল খুব বেশী, তাই বারাণসী কাশীজাতির একটা প্রধান দুর্গ হয়ে উঠল।

এই আর্য জাতির উত্তর-পশ্চিমে কোশল নামে আর একটি জনপদ ছিল। এদের নিজেদের মধ্যে অনেক বিষয়ে ছিল মতান্তর এবং কলহও হত। কিন্তু অপরের সঙ্গে বিবাদের সময়, এরা নিজেদের বিবাদের কথা ভুলে গিয়ে সকলে মিলে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে যেত। এই জন্যেই অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতভূমির সবটাই আর্যদের অধিকারে আসে। ভারতভূমিতে আর্যদের সবচেয়ে বড় এবং মূল্যবান দান হল অশ্ব। একমাত্র এই অশ্বের শক্তির ওপর নির্ভর করেই মুষ্টিমেয় আর্যরা দমিল, নিষাদ ও দুর্দান্ত কিরাত জাতিকে জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন তারা অশ্বের ব্যবহার জানত না, সকলেই ছিল পদাতিক। আর্যরা ঘোড়ার সাহায্যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে অতর্কিতে আক্রমণ করবার সুযোগ পেত। দুই শতাব্দী কালের ওপর তারা এখানে বাস করলেও অশ্বের ব্যবহার তাদের কমেনি বরং বেড়েছে। আর্যগণ জন্মগত ঘোড়সওয়ার, খালি ঘোড়ার পিঠে বিনা লাগামে অশ্বারোহণ করতে পারদর্শী ছিল আর্য-সন্তানরা।

রাজা বা সামন্তরা দেশের স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ করে বাস করতেন। প্রথমে অবশ্য এইসব দুর্গ শুধু সৈনিকদের জন্য ব্যবহার হত, এবং সামন্তগণ শুধু সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবেই দুর্গে বাস করতেন। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল তাঁরাই এক একজন ছোট ছোট রাজা হয়ে উঠেছেন। আপন বিত্ত-বৈভবে সামন্তরাজ অরুণাশ্ব স্বয়ং কাশীরাজ থেকে নেহাত কম ছিলেন না। তাঁর অধিকারে বহু গ্রাম বা জনপদ ছিল, ছিল, প্রচুর অশ্ব। পঞ্চাশ বছর বয়সেও অরুণাশ্বকে মনে হত ত্রিশ বৎসরের বলিষ্ঠ যুবক। এমনই স্বাস্থ্য তাঁদের বংশ পরম্পরায়।

অরুণাশ্বের পুত্র পিতার ন্যায় বলিষ্ঠ না হওয়াতেই হয়ত তাঁর নাম হয়েছিল কৃশাশ্ব অর্থাৎ দুর্বল ঘোড়া। লম্বা-চওড়ায় পিতার সমান হলেও তার দেহের মাংসপেশী পিতার মতো ছিল না। শুধু আর্যরাজা বা সামন্তরাই সে সময় বৈভবশালী ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও সে সময় রীতিমতো আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ব্রাহ্মণরা সামন্তরাজদের থেকে কম ছিলেন না। তাঁদের কাছে হাজার গরু-ঘোড়া দক্ষিণার বহর হিসেবে শোভা পেত, ক্ষেতেও শত শত দাসদাসী কাজ করত অন্যান্য সামন্তপ্রভুদের মতো।

এই ব্রাহ্মণ জাতির আর একটা সুবিধে ছিল টোল। এক একজন ব্রাহ্মণ পরিবারে কম করে চার-পাঁচ শত ছাত্র থাকত। এরা গুরুর কাছে শুধু বিদ্যাশিক্ষাই গ্রহণ করত না, গুরুগৃহের যাবতীয় কাজকর্ম সকলে ভাগ করে নিত। যার ফলে আরাম-বিলাসের দিক থেকে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, এক একজন সামন্তের মতোই থাকতেন। ছাত্র বয়সে নিজ আচার্য সুমেধ ভরদ্বাজের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করতে

কৃশাশ্বের যত ভালো লাগত, ততো আর কোনো কাজেই লাগত না। আচার্যের গ্রাম একটি ছোট সামন্তরাজের গ্রামের মতোই প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ছিল যদিও তিনি রাজন্য অরুণাশ্বের পুরোহিত মাত্র ছিলেন। মঙ্গই নদীর ওপারে কনৈলার ভূমিতে ভরদ্বাজ পণ্ডিতের গুরুকুল। বংশ পরম্পরায় এই গুরুবংশের খ্যাতি ছিল। তখন বিদ্যা পুস্তকে লিপিবদ্ধ হত না, কারণ এখনকার মতো তখন কাগজের ব্যবহার আরম্ভ হয়নি। তখন বিদ্যা গুরুর মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকত; এবং গুরুর কাছে মুখে-মুখে শুনেই ছাত্ররা মুখস্থ করে রাখত। কৃশাশ্বের স্মরণশক্তি এত বেশী তীক্ষ্ণ ছিল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল এবং বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়ল।

সে সময় কাশীর রাজবংশ পাণ্ডিত্যের জন্য সকল আর্যাবর্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। এমন কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও কাশীরাজ অজাতশত্রুর কাছে বিদ্যাশিক্ষা করতে আসতেন। পুত্র কৃশাশ্বের এই বিদ্যানুরাগ পিতা অরুণাশ্বকে ভাবিয়ে তুলল। তিনি অবশ্য নিজেও বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তবুও তাঁর ক্ষত্রিয় রক্ত এ কথা মানতে রাজী নয় যে, তাঁরই পুত্র —দেহে ক্ষত্রিয়রক্ত বহন করে কাশীরাজ অজাতশত্রুর কাছে বিদ্যা ভিক্ষা করুক। কৃশাশ্ব অবশ্য ক্ষত্রিয়-গুণে একেবারে বঞ্চিত ছিল না, ঘোড়ায় চড়া তার জন্মগত অভ্যাস। তীর-ধনুক, অসিচালনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সে যথেষ্ট অধিকার লাভ করেছিল তবুও বিদ্যার্জনের দিকেই তার ঝোঁক ছিল বেশী। মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে কৃশাশ্ব গুরুর কাছে সকল বিদ্যার পাঠ শেষ করল। বেদশিক্ষার শেষে গুরু ভরদ্বাজ উপদেশ দিলেন, 'ধর্মাচরণ করবে, সত্য কথা বলবে, যা কিছু সাধ্য তাতে ভ্রম-প্রমাদ করবে না, বংশ পরম্পরায় গুরুদক্ষিণা ভঙ্গ করবে না, অতিথিকে দেবতুল্য মনে করবে, যা কিছু নির্দোষ গ্রহণ করবে।' কৃশাশ্ব গুরুদক্ষিণা হিসেবে গুরুদেবকে দান করল সোনা দিয়ে শিং-মোড়া একশত গাভী, একটা খচ্চর, একটা রথ, চারজন দাস ও চারজন দাসী।

পিতা অরুণাশ্বের মন থেকে একটা বড় বোঝা নেমে গেল, কিন্তু আপন কর্তব্য ত্যাগ করে কৃশাশ্ব পরিব্রাজকের নির্দ্বন্দ্ব জীবন গ্রহণ করল এবং অল্পকালের মধ্যেই বহুশ্রুত বুদ্ধিমান বলে চারিদিকে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। বড় বড় পণ্ডিতেরাও কৃশাশ্বের কাছে তর্কযুদ্ধে হার মেনেছিলেন। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় এমন কি তরুণ তরুণীরাও কৃশাশ্বের ফাঁদে পা না দিয়ে পারেনি। বিদ্যায় এতখানি আসক্তি পিতা অরুণাশ্বের চিন্তা আবার দ্বিগুণ করে দিল। কৃশাশ্ব রাজন্য পুত্র, তার পরিব্রাজক হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানো পিতার অসহ্য হয়ে উঠল। তাই অরুণাশ্ব ঠিক করলেন, পুত্রের বিবাহ দেবেন। কাশী ও কোশল রাজ্যে সুন্দরী পাত্রীর অভাব

নেই। তা ছাড়া অরুণাশ্বের উভয় জনপদেই সমান সুনাম। তবুও অনেক চেষ্টার পর কাশী-রাজপুত্রী কপিলার রূপে মুগ্ধ হয়ে কৃশাশ্ব তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে রাজী হল। রাজকুমারী কপিলার সংসর্গ কৃশাশ্বকে ক্রমশ ক্ষত্রিয়সুলভ সকল বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট করল। কিছুদিন আগেও যে কৃশাশ্ব মৃগয়ায় বিমুখ ছিল সেই কৃশাশ্বই কপিলার সংসর্গে এসে মৃগয়ার জন্যে একটার পর একটা জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলল।

কৃশাশ্বের মাতা যখন গর্ভবতী ছিলেন তখন বৃষভ মাংস ঘিয়ের সঙ্গে খেয়েছিলেন এবং প্রার্থনা করেছিলেন যে, আমার এই গর্ভজাত সন্তান যেন দীর্ঘায়ু হয়, চতুর্বেদের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং রাজসভা আলোকিত করবার মতো গুণবান হয়। মা অবশ্য তখন ভাবেননি, তাঁর সব ইচ্ছাই পূরণ হবে। কিন্তু কৃশাশ্ব গৃহস্থ জীবনের পাঁচ বৎসরের মধ্যেই রাজন্য শ্রেষ্ঠ বীর হয়ে উঠল। কৃশাশ্বকে এখন আর কৃশ বলা যায় না। তার ধমনীতে ধমনীতে তেজী রক্তের ধারা বইছে, মাংসপেশী ফুলে উঠছে, বাহুতে অসাধারণ শক্তি। পিতা অরুণাশ্ব মনে পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করলেন। কৃশাশ্বের বয়স তখন ৩৬ বৎসর মাত্র।

কৃশাশ্ব এখন শিংশপার রাজন্যপদ লাভ করলেন এবং ক্রমশ পিতার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। তাঁর অশ্বশালায় পিতার সময়ের চেয়ে দ্বিগুণ অশ্ব শোভা পেতে লাগল। দিনে দিনে কৃশাশ্বের বীরত্বের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে, কাশী কোশল ছাড়িয়েও আর্যাবর্তের দিকে দিকে। কিন্তু এ সব হলেও বিদ্যার প্রতি তাঁর আসক্তি কমেনি। জেনেশুনেই পিতাকে শুধু খুশী রাখবার জন্যে এতদিন তাঁর এই বাসনাকে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। এখন সেই বাসনাকে পূর্ণ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এখন থেকে ক্ষত্রিয়রাও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এগোতে লাগলেন।

বৈশ্য ও গৃহপতিদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যা ছিল দমিল জাতির, যারা বর্তমানে আর্যভাষা ও আর্যসংস্কৃতি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলেছে, তারা ব্রাহ্মণদের পূজা বা ভক্তি করলেও, তাদের অবচেতন মনে ব্রাহ্মণদের প্রতি বিরূপ মনোভাব দানা বাঁধতে লাগল। তারা ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকলাপে যদিও খোলাখুলিভাবে বিরোধ করত না, কিন্তু কেউ কখনও বিরোধী হলে তারা এদের সমর্থন নিশ্চয় পেত। ক্রমশ ক্ষত্রিয়রাও ব্রাহ্মণদের খোসামোদ করা অপছন্দ করতে লাগল। ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকর্ম ক্ষত্রিয়দের অজানা ছিল না। এ বার তারা প্রকাশ্যেই প্রচার করতে লাগল, 'ব্রাহ্মণদের বিধিমতো যজ্ঞ-রূপী নৌকা সংসার-সাগর পার হবার পক্ষে সুদৃঢ় নয়।' পরন্তু তারা বিশ্বের অন্তর্নিহিত অজ্ঞেয় শক্তির আবিষ্কার ও তার ব্যবহার প্রচার আরম্ভ করল এবং অল্পকালের মধ্যেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এমন কি বড়

বড় রাজকীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও তাদের কাছে জ্ঞানের সন্ধানে আসতে লাগলেন। কৃশাশ্বের বেশী দূর যাওয়ার প্রয়োজন হল না। তাঁর শ্বশুরের অগ্রজ কাশীরাজ অজাতশত্রু পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গার্গেয় উশীনর, মৎস, কুরু, পঞ্চাল, বিদেহ পর্যন্ত এই জ্ঞানের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে অবশেষে কাশীরাজ অজাতশত্রুর কাছে এলেন। নিজের বিদ্যার ওপর গার্গের বিশেষ গর্ব ছিল। কিন্তু অজাতশত্রুর প্রশ্নের জবাব না দিতে পেরে গার্গ বুঝতে পারলেন যে, তাঁর চেয়ে অজাতশত্রুর জ্ঞান অনেক বেশী। অতএব তিনি কাশীরাজের কাছে বিধিমতো শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন, কিন্তু অজাতশত্রু বললেন, 'তা কি করে সম্ভব? ব্রাহ্মণ কি করে ক্ষত্রিয়ের শিষ্য হবে?' তিনি গার্গের হাত ধরে এক ঘুমন্ত পুরুষের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে ডাকলেন, 'হে মহান্ পীতাম্বধারী সোমরাজ।' কিন্তু ঘুমন্ত পুরুষটি জাগল না। অজাতশত্রু তখন সেই লোকটিকে ধাক্কা মারলেন, লোকটি জাগল ও উঠে দাঁড়াল। অজাতশত্রু গার্গকে বললেন, 'যখন এই লোকটি ঘুমিয়েছিল, তখন এর অন্তরস্থ পুরুষ (জীব) কোথায় ছিল এবং এখন কোথা থেকে এল?' এ কথা গার্গ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। অজাতশত্রু বললেন, 'যখন এই লোকটি ঘুমিয়েছিল তখন এর অন্তরস্থ পুরুষ, তৎ অন্তরস্থ হৃদয়ের আকাশে ঘুমিয়ে অথবা বিলীন হয়ে ছিল!'

কৃশাশ্বের সময়ে এই রকম ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ সুলভ ছিল না, যাঁর কাছে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করতে দেশ-দেশান্তর থেকে মহা-মহা পণ্ডিত আসতেন। কিন্তু মুণ্ডক পরিব্রাজকেরা আরো বেশী শ্রুতিধর এবং জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ, তাঁদের কাছে শিক্ষা নিতে কৃশাশ্ব প্রাণান্ত হয়ে উঠতেন। পরিব্রাজকের পিছনে পিছনে তাঁকে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হত। কখনও কখনও পরিব্রাজকের স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হতেন বটে কিন্তু পত্নী ও পরিবারের কথা মনে পড়তেই সব আবার ভুলে যেতেন। তিনি পিতার চেয়ে আরো বেশী মৃদু স্বভাবের এবং অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন। শিংশপার লোকেরাও তাঁকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। নিজ গুরু ভরদ্বাজকে তিনি বরাবর দান করতেন কিন্তু স্বর্গ লাভের আশায় নয়! তিনি বড় বড় যজ্ঞ করতেন যার জন্য ব্রাহ্মণকুল তাঁর ওপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। গৃহপতি, কর্মকার ও দাস সকলেই কৃশাশ্বকে ধর্মাত্মা বলে মান্য করত। অবশেষে তিনি বারাণসী গিয়ে বৃদ্ধ অজাতশত্রুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ফিরে এলেন।

কাশী এবং কোশল রাজাদের মধ্যে চিরকালই বিবাদ লেগে থাকত। কাশীয়দের মধ্যে অনেকগুলি ভাগ ছিল, এবং এই প্রত্যেক ভাগের লোকদের সঙ্গে অন্য ভাগের বিবাদ প্রায়ই চলত। তেমনি কোশলদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু যখন কাশী কোশলদের

মধ্যে বিবাদ হত তখন উভয় দলই নিজেদের আভ্যন্তরীণ দলাদলি ভুলে সকলে এক হয়ে যুদ্ধ করত। বৃদ্ধ অজাতশত্রুকেও তরুণ যোদ্ধার মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যেত এবং তাঁর জন্যেই কোশলদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কাশী রাজবংশের পতন ঘটল এবং অচিরেই কাশী ও কোশল এক রাজার অধীনে এল। কাশী মহানগরী শিল্প এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কাশীবাসীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য কোশলরাজ আপন ভ্রাতাকে কাশীরাজের পদ দিয়ে রাজধানীতে রাখলেন।

৩

ইতিমধ্যে শিংশপার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কুশাশ্বের বংশের স্থানে কোশলদের এক সেনাপতি রাজন্য পদ লাভ করেছেন, কিন্তু কাশীর জনসাধারণ তাঁকে সহজে মেনে নিতে পারল না। মাঝে-মধ্যেই ঝগড়া হত। অবশ্য এর আরও একটা কারণ এই যে, যুদ্ধে জয়লাভ করে কোশলরাজ শক্তির জোরে কাশীবাসীর ঘাড়ে কোশলের আইন চাপাতে চাইলেন। কোশলের কাছে কাশীর শক্তি তখন অতি নগণ্য, তা'ছাড়া কাশীর গৃহপতিরা ছিল কোশলের পক্ষে। তারা ব্যবসায়ী। জাত-বর্ণের বিচার করতে গেলে তো ব্যবসা চলে না! কোশলরা শক্তিশালী তো বটেই, উপরন্তু তারা শাসন-ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমদানী ও রপ্তানী ব্যবসা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

নিষাদ বা দমিল জাতিরা শুধু তামারই ব্যবহার জানত। এ বার থেকে লোহার প্রচলন সুরু হল। হাতিয়ার থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ লোহা নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটাতে লাগল এবং তাতে সস্তাও হল খুব, সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকার, কর্মকার ও ছুতোরদের কদর বাড়তে লাগল বহুল পরিমাণে। শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি ভীষণভাবে বাড়তে থাকল ও কোশলদের খুব আপনভাবে গ্রহণ করল কাশীর গৃহ-পতিরা। এ ছাড়া গৃহপতিরা অন্য অনেক সুবিধা পেল, প্রথমে কোশল সীমায় কর দিয়ে ব্যবসা করতে হত, এখন আর সে বালাই রইল না, কারণ এখন সকলেই কোশলের প্রজা অতএব অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্যের দরজাও খুলে গেল। গৃহপতিরা আগে থেকেই ধনী ও সংস্কৃতিবান মানুষ, প্রাচীন দমিল জাতির সঙ্গেই তাদের ছিল সম্বন্ধ বেশী। এ বার গৃহপতিদের কন্যাও রাজ-অন্তঃপুরে যাওয়ার অধিকার পেল।

কোশল রাজ্যের পূর্বে মল্ল এবং তারও আগে বৃজিওদের (লিচ্ছবি) গণ ছিল। তারা রক্তের শুদ্ধতা খুব কঠোরভাবে মেনে চলত। বর্তমানে কোশলরা রাজা হবার পর দেখল যে, ব্রাহ্মণরাও গৃহপতিদের সঙ্গে কন্যা আদান-প্রদান সুরু করেছে, তখন কোশলরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কন্যা আদান-প্রদান বন্ধ করে দিল।

১ শিংশপা নগর মজই নদীর দুই তীরে বহু দূর অবধি বিস্তৃত ছিল, তবে অধিকাংশ

বড় বড় দোকান-পসার ও গৃহপতিদের বা শেঠদের প্রাসাদ নদীর ডান দিকেই বেশী, সেখানে শিংশপার প্রথম বসতি সুরু হয়েছিল। শিল্পী ও ব্রাহ্মণদের বাস ছিল নদীর বামদিকে, সেদিকটায় বেশীর ভাগ চাষবাস ও ক্ষেত-খামারের কাজ ছিল। অনুন্নত কিরাত-নিষাদ জাতির লোকেরা জংলী ফল ও সব্জীর চাষ সুরু করল। কর্ণহটের দিকেও শিল্প, গৃহপতি ও ব্রাহ্মণ মহাশালদের ক্ষেত-খামার উঠল। সুযোগ পেয়ে গৃহপতিরা নিজেদের ব্যবসা বাড়িয়ে ফেলল। প্রথম প্রথম তাদের বাণিজ্যক্ষেত্র শুধু কাশী, কোশল ও মল্লদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন আরও প্রসারিত হল স্বার্থ (কাঁরবা) বৃজিও ছাড়িয়ে, সুদূর পঞ্চাল, কুরু, মাদ্র ও গান্ধার পর্যন্ত। এবং আর্যাবর্তের নানা জাতি ও নানা দেশের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল।

সমাজে এই সময় সবচেয়ে বেশী প্রতিষ্ঠা ছিল ব্রাহ্মণদের। ভোগ ঐশ্বর্যে যদিও রাজন্যরা বড় ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণদের বৈভবে দেবতাদেরও হিংসা হত। তার কারণ, রাজ্য পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল। তাঁরাই মন্ত্রী, মহা-মন্ত্রী, বিচারক হতেন। রাজদণ্ড রাজার কিন্তু ধর্মদণ্ড ব্রাহ্মণদের হাতে। এই ব্রাহ্মণরা কোনো কিছুতেই সামন্তদের চেয়ে কম ছিলেন না। তাঁদের ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোয়ালে দুগ্ধবতী গাভী, মহিষ সবই থাকত।

ঘোড়ার প্রচলন এই সময় থেকে আরও বেড়ে গেল। কেউ কেউ পশ্চিম থেকে আনীত সৈন্ধব ঘোড়া রাখাটা গৌরবের মনে করত। পশুপালনের সুবিধাও ছিল যথেষ্ট। ঘরে বেঁধে রাখার কোনো দরকার হত না—মাঠে-ঘাটে বা জঙ্গলে প্রচুর ঘাস। আবার জঙ্গলে আবাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বন্য পশুর দল ক্রমশ গভীর জঙ্গলে চলে যেতে লাগল। আজকের শিংশপার চেহারা দেখে সেদিনকার শিংশপার কথা কল্পনাও করা যায় না। পশুপালনের জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-পরিবারে একাধিক দাস থাকত। এদের বলা হত কর্মকার। এদের ক্রীতদাস বলা যায় না, তবুও পশুর দামেই এদের বিনিময় হত। কখনও বা একজন দাসের বিনিময়ে ৮।১০ টি গাভী বা মহিষ দিতে হত। অজন্মার সময়ে মানুষ আরও সস্তা। অনাথ বালকরা প্রায়ই সেধে এসে দাসবৃত্তি স্বীকার করে নিত। এদের নিষাদ জাতির বংশধর বলা হত, তবে ঠিক নিষাদ নয়, এরা মিশ্র। নিষাদ ও দমিল জাতির মিশ্র সন্তান। কিরাতদের আর এখন দেখা যায় না। যদিও কিরাতদের স্ত্রীলোক লুট করে নিয়ে নিষাদরা ভোগ করেছিল কিন্তু তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

গৃহপতিদের গায়ের রঙ মাগুর মাছের মতো ফ্যাকাশে কিম্বা কালো। আর্যদের দেখাদেখি এরা ক্রমশ সুন্দরের পূজারী হয়ে ওঠে। এরা আর্যদের সঙ্গে অনুলোম

অথবা প্রতিলোম রক্তের সম্বন্ধ স্থাপনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছিল। এই গৃহপতি শ্রেষ্ঠী স্বার্থ বাহকের অর্থ ও ধনসম্পদের প্রাচুর্য যে কোনো ক্ষত্রিও বা ব্রাহ্মণ মহাশালদের চেয়ে বেশী ছিল। নিজেদের আচার আচরণের গুণে এরা রাজা, মহারাজার অতি প্রিয়পাত্র হত। শিংশপার স্থলপথে বারাণসী, সাকেত, শ্রাবস্তী ও কুশীনারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত ছিল, এবং নদীপথে গতি ছিল আরও বিস্তৃত।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মতো গৃহপতিরাও বড় বড় যাগযজ্ঞ করতে চাইত, কিন্তু ব্রাহ্মণরা ছিলেন খুব চতুর, তাই তাঁরা নিজেদের ও ক্ষত্রিয়দের জন্যে বেছে বেছে কিছু যজ্ঞ-আইন আলাদা করে রেখেছিলেন। যেমন রাজসূর্য, অশ্বমেধ যজ্ঞ কোনো গৃহপতিই করতে পারবে না। তবুও এমন ঐশ্বর্যশালী সম্প্রদায়কে একেবারে ক্ষিপ্ত করতে ব্রাহ্মণরা সাহসী হলেন না, তাই তাঁরা কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করতে বাধ্য হলেন। এই সময় রক্তের ব্যাপারে ছোঁয়াছুঁয়ি মানা হলেও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ততটা মানা হত না।

শিংশপার ভূমি তিনটি জাতির উত্থান-পতন দেখেছে, দেখেছে ত্রিবেণীর মহা-মিলন। এই তিন জাতির সজ্ঘর্ষের মধ্যে যখন চতুর্থ আর্যজাতি এসে এই তিন জাতির প্রভুত্বের ভার গ্রহণ করল, তখন বৈরীভাবটা ক্রমশ কমে গেল। আর্যরা অন্যের থেকে নিজেদের আলাদা রাখার জন্য আইনের পাকা বাঁধ বেঁধে ফেলল এবং এই সময়ে বর্ণ বিভাগ করে ফেলল। গৃহপতিরাও সুযোগ মতো আর্যদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করে নিচ্ছিল।

শিংশপার শ্রেষ্ঠী ধনদাসের কন্যা প্রভাবতী অত্যন্ত সুন্দরী, তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন শিংশপার উত্তরাধিকারী। তিনি তাঁর পিতামাতাকে মত দিতে বাধ্য করালেন প্রভাবতীকে বিবাহ করার জন্য।

শিংশপার নগরীতে ব্রাহ্মণদের দেবতা ইন্দ্র, বৈশ্রবণ ও সোম প্রভৃতিদের সকলেই খুব শ্রদ্ধা করত। তাঁদের উদ্দেশে হবন যজ্ঞ নামক এক রকম যজ্ঞ করা হত। এ ছাড়া নিষাদ, কিরাত ও দমিলদেরও কিছু কিছু দেব-পূজার প্রচলন ছিল। তখন দেবদেবীর মূর্তি হত মানুষের আকারবিশিষ্ট, এই সকল দেবদেবীর মূর্তি স্থাপন করবার একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল। এই স্থানগুলিতে গাছ ও পাতার চবুতরা তৈরী করা হত। কথিত আছে, দেবতারা মানুষের ওপর ভর করতেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। এই সকল দেবতার আহ্বানের জন্য ওঝা নামে এক সম্প্রদায় ছিল। এদের আর্যরাও ক্রমশ বিশ্বাস করতে লাগল। এমনি করে শিংশপার ইতিহাস এগোতে থাকে।

শিংশপা

স্থান : বড়ীয়াগী ।। কাল : ২৫০ খৃষ্টপুর্ব

কনৈলা ব্রাহ্মণদের একটি ছোট গ্রাম ছিল, বর্তমান রেল-স্টেশন থেকে গ্রামের দূরত্ব দশ মাইল, কাঁচা-পাকা রাস্তা বর্তমানে বাস চলবার উপযুক্ত হয়েছে। এই গ্রামের আশেপাশে অষ্টাদশ শতাব্দীরও পূর্বের যে সব ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা নানা প্রকার মত পোষণ করেন। ইতিহাস যাই লিখুক না কেন এটা প্রমাণ হয় যে, এখানে এককালে ঘন বসতিপূর্ণ লোকালয় ছিল এবং এও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এখানে সৈয়দের আমলের বহু কীর্তি লুকানো রয়েছে, সৈয়দের কবর তো এখনও রয়েছে। তা থেকে এও প্রমাণ হয় যে, কোনো এক সময় মুসলমান সামন্তদের আগে এখানে কোনো হিন্দু রাজত্ব করতেন; সৈয়দের আমলের কোনো বংশধর হয়ত বর্তমানে মুসলমান দস্তকার বলে পরিচিত। এই দস্তকার জাতি প্রারম্ভিক কালে হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিল। সরকারী কাগজ-পত্রে এই স্থানের নাম কনৈলা-কর্ণহট বলে লেখা হয়। আবছা ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট আকবরের আগে পর্যন্ত এই জায়গা ও জাতিদের মধ্যে কয়েক-বার ভাঙা-গড়া হয়েছে।

এখানে দুটি পুকুর আছে, একটির নাম 'বড়ী পোখরী' অন্যটির নাম 'লহুরী পোখরী'। এই নাম থেকে প্রমাণ হয় সৈয়দ সামন্তদের আগে কোনো হিন্দু রাজার আমলে দুই রাণীর নামানুসারেই পুকুর দুটির নামকরণ হয়েছিল। বিগত দিনের সেই স্মৃতি নিয়ে এখনও রয়েছে এই দুটি পোখরী। লহুরী পোখরী আজকাল মৃত-প্রায়। বড়ী পোখরীর চারিদিক কিছুটা সমতল হওয়ার ফলে কিছুটা অংশ সমতল ভূমির সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে বর্তমানে 'নাউর' অর্থাৎ পায়ে চলার রাস্তা তৈরী হয়েছে। বাকি অংশের কিছুটা আগাছায় ভর্তি, অন্যটুকুকে এখন দেব-খাত বা ছোট ঝিল বলা হয়। এরই পাশের ক্ষুদ্র জলাশয়ের নাম 'দল-সাগরা' বা সৈনিক সাগর। এই নাম থেকে তখনকার মুসলমানদের ক্রূরতার পরিচয় পাওয়া যায়। হয়ত এরাই সেই হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে প্রজাদের মুসলমান করেছিল।

কনৈলা থেকে এক মাইলের কিছু কম দূরে শিংশপা নামক গ্রামের ধ্বংসাবশেষ থেকে কনিষ্কের আমলের সিক্কা (মুদ্রা) পাওয়া যায় যা থেকে ইশবি সনের প্রারম্ভিক কালের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তা থেকে কনৈলার ইতিহাসকে পিছনে ফেলে শিংশপার ইতিহাস এগিয়ে যেতে পারে না, শিংশপার গ্রামেও বেশ সমৃদ্ধ জাতি ছিল।

অনেক দিন থেকে বড়ী পোখরীতে শিলের চেয়েও বড় ইঁট পাওয়া যেত। এই ইঁট, পুথি-পত্রের প্রমাণ থেকেও বেশী মূল্যবান এবং আরও অনেক কাহিনীর সাক্ষ্য

দেয়। এখানে যে ইঁট পাওয়া গেছে তার মাপ হল লম্বায় সাড়ে সতের ইঞ্চি, চওড়া সাড়ে ন' ইঞ্চি এবং আড়াই ইঞ্চি মোটা। অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা প্রত্নতত্ত্বের কি বোঝে! তাই যখনই ইঁটের সন্ধান পাওয়া গেল, অমনি লুট সুরু হয়ে গেল আর নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগল মৌর্য-সুঙ্গ যুগের একমাত্র শেষ' স্মৃতি। কিন্তু সবটা নিঃশেষ হওয়ার আগেই যখন সেই ইঁটের স্তূপ শেষ হতে হতে গ্রামের বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ সিদ্ধনাথ পাণ্ডের সীমানার মধ্যে এসে গেল, তখন তিনি লুট বন্ধ করে দিলেন। এমনি করে প্রকৃতির গর্ভ থেকে প্রকাশ পেল ২৩০০ বছর আগের হারিয়ে-যাওয়া ইতিহাস।

২

শিংশপা নগরী আজ অভিসারে সেজেছে। সমস্ত নগরী ধোয়া-মোছা, চাকচিক্যে ভরা। গলি থেকে সুগন্ধি জলের সুবাস আসছে। প্রত্যেক বাড়ির সামনে কলাগাছ, মঙ্গলঘট, ফুল-মালা দিয়ে সাজানোর উৎসাহে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সুরু করেছে। আবাল বৃদ্ধ-বনিতা নতুন বস্ত্রে অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে। হাটবাজার নতুন পণ্যদ্রব্যে হয়েছে সাজানো।

সবচেয়ে দেখার—ফুলের বাজার এবং চাহিদা। সকালেই সব দোকানের ফুল নিঃশেষ, তাই বাগান থেকে নিয়ে-আসা ফুল মালীদের কাছ থেকে নেবার জন্যে রাস্তার মোড়ে-মোড়ে ভীড় জমেছে। যদি বলা যায় যে কাশীর রমণী একটা ফুলের জন্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে পারে তা'হলে অত্যুক্তি হয় না।

মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রে এত বেশী ফুলের ব্যবহার ছিল যে যদি সেখানকার নাম পাটলীপুত্রের বদলে পুষ্পনগর রাখা হত তা'হলেই মানাত। রাস্তায় রাস্তায় লোকের ভীড়। সবচেয়ে বেশী চঞ্চলতা রাজপ্রাসাদের সামনে। উৎসুক জনতা সিংহদ্বারের সজ্জা দেখতে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতর-প্রাঙ্গনে যাওয়ার অধিকার সবাইয়ের নেই, তাই উঁকিঝুঁকি মেরে যতটা দেখা যায়, তাই দেখতে চেষ্টা করছে। সকলের আকর্ষণ প্রাঙ্গনের দিকে, তিনদিকে বিরাট অট্টালিকা, সামনে অঙ্গন। অট্টালিকায় রাজপরিবারের লোকেরা নীচের দিকে ঝুঁকে দেখছেন।

একটি জানালায় নিজ পরিচারিকাসহ রাণী উচ্চ আসনে বসে নীচের দিকে লক্ষ্য করছেন। রাজন্য সুবাহু যদি এ সময় বাড়ি থাকতেন তা'হলে তাঁকেও নিশ্চয় অন্য জানালায় দেখা যেত। সমস্ত অট্টালিকা ইন্দ্রধনুর রঙে নতুন রঙ করা হয়েছে। প্রাসাদটি যদিও ইঁটের তৈরী তবুও বাইরে সুন্দর কারুকার্য করা কাঠের কাজ। আঙিনায় সাতজন সুন্দরী তরুণী তন্ময় হয়ে নিপুণ ভঙ্গিতে নৃত্য করছে। কারো হাতে মৃদঙ্গ, কারো হাতে বীণা অথবা অন্য তারের যন্ত্র। নাচের সঙ্গে গানেরও

প্রয়োজন, তাই এক দিকে একজন কোকিলকণ্ঠ এক হাত কানে চাপা দিয়ে অন্য হাতে লয় দিয়ে দরবারী সঙ্গীত পরিবেশন করছে। সব মিলিয়ে রাজপ্রাসাদটি এক অভাবনীয় দৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

রাজন্য সুবাহু অর্ধেক কাশী জনপদের রাজ্যপাল, তাঁর শাসিত সমগ্র ভূভাগের সবচেয়ে সুন্দরী তরুণী শিল্পীরা এখানে এসেছে ও নিজ নিজ কৌশল প্রদর্শন করছে। ভূষণ ও অলঙ্কার এদের স্বর্গের অপ্সরাদের চেয়েও মোহিনী করে তুলেছে। বাদ্য-কারদের দেখলে হঠাৎ দেবপুরুষ বলে ভ্রম হয়। শিল্পী ও তাদের অদ্ভুত ক্রিয়া-কৌশল দেখে উপস্থিত সকলে নিজেদের ধন্য মনে করছে। শিংশপা নগরী আজ অমরাবতী —শুধু সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি, সুন্দরের প্রতিযোগিতা। সবাই কনকবর্ণ, গৌরবর্ণের মানুষ খুবই কম এ রাজ্যে। অবশ্য রাজন্য, পুরোহিত এবং তাঁদের সগোত্র সকলেই গৌরবর্ণ। কর্মকার এবং দাস জাতিরা সব কালো। এই দুই জাতির মধ্যে বৈভব এবং প্রভাবের একটা বিরাট পার্থক্য। প্রভুবর্গের মধ্যে কখনও কখনও শ্বেত-শ্যামল রঙ চোখে পড়ে। রঙের পার্থক্য চোখে পড়ে দাসদের মধ্যে। এই দাসেরা এসেছে দেশের নানা স্থান থেকে। কেউ আসত সরাসরি দাসত্ব করতে, কেউ আসত ঘোড়ার সঙ্গে। কম্বোজ থেকে যারা এসেছিল তারা প্রভুদের চেয়েও শ্বেতবর্ণ। আর এই জাতির মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য সবচেয়ে বেশী। তার আর একটা কারণ হচ্ছে শিংশপাধীশ সুবাহু।

সুবাহু প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের সবচেয়ে সুচতুর সেনাপতি ছিলেন। কলিঙ্গ-বিজয়ে সুবাহু সবচেয়ে বেশী রণকৌশল প্রদর্শন করেছেন। কাশী এবং কোশলের সেনাপতি ছিলেন রণবিদ্ সুবাহু। এই সুবাহুর সমতুল্য বীর সেনাপতি ছিলেন মগধ সম্রাটের সেনাপতি মদ্রক রেবত। যুদ্ধ জয় সম্রাট অশোকের মনে শান্তি দিতে পারেনি। কলিঙ্গে বীরের অভাব ছিল না, তাদের রথী-মহারথীর আত্মোৎসর্গে তাই তারা কাতর হয়ে পড়েনি। অপর পক্ষ থেকে কলিঙ্গ কোনো অংশেই কম শক্তি ধরত না। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সমস্ত জম্বুদ্বীপের সকল বীর যোদ্ধারা এক সঙ্গে যখন কলিঙ্গের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন বাধ্য হয়ে কলিঙ্গবাসী পরাজয় স্বীকার করল। এই যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা দেখে দেবপ্রিয় অশোকের হৃদয়ে ভীষণ আঘাত লাগল। সম্রাট অশোকের মনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনও আনল। হিংসা ত্যাগ করে তিনি ধর্ম ও শান্তি বিজয়ের পথ গ্রহণ করলেন।

যুদ্ধে পরাজিত কলিঙ্গের জন্যে অশোকের মন কেঁদে উঠল! তিনি খুঁজতে লাগ-লেন কি উপায়ে কলিঙ্গের ক্ষতে শান্তির প্রলেপ দেওয়া যায়। সেই সঙ্গে তিনি কাশী ও মদ্রের সেনাপতিদ্বয়কে সম্মানিত করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দুই সেনাপতির মধ্যে

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছিল। কাশী ও মদ্র দেশের দূরত্ব অনেকখানি। এই দূরত্ব হয়ত দু'জনের বন্ধুত্বকে ভুলিয়ে দিতে পারে, তাই অশোক ঠিক করলেন, সুবাহুর একমাত্র পুত্র জয়ন্তের সঙ্গে রেবতের কন্যা ভদ্রার বিবাহ। এই প্রস্তাবে দুই সেনা-পতির কাছ থেকে সহর্ষ সম্মতি পেয়ে সম্রাট অশোকের আনন্দের সীমা রইল না। শুধু তাই নয়, পাটলীপুত্রে নিজের চোখের সামনে তিনি এই প্রণয়-সূত্র বন্ধনের ব্যবস্থা করলেন। এতে রেবত ও সুবাহু আরও বেশী খুশী হলেন। কলিঙ্গ বিজয়ের চার বৎসর বাদে আজ এই বিবাহের আয়োজন হয়েছে। আপন আপন পিতার সঙ্গে জয়ন্ত ও ভদ্রা আজ শিংশপা পুরীতে আসছেন তাই শিংশপাতে এই আনন্দের ঢেউ।

বসন্তে মঙ্গই নদী প্রায় জলশূন্য হয়ে যায়, কিন্তু শিংশপাবাসীরা নিজেদের এলা-কায় সেটা হতে দেয় না —মাঝে মাঝে বাঁধ বেঁধে দিয়েছে জল আটকে রাখার জন্যে। এই বাঁধের নীচের দিকটা পাকা ওপরটা কাঁচা। বর্ষার সময়ে মঙ্গইয়ের অপর দিকের স্রোতে বাঁধের উপরিভাগটা ভেঙে যেত। আবার শরৎকালে শিংশপাবাসী তাকে মেরামত করে নিত। যদি এই জলরাশি মঙ্গই নদীতে না থাকত, তা'হলে হয়ত শিংশপার আকর্ষণ এত বাড়ত না, এত জনাকীর্ণও হত না। নতুবা শিংশপার যতগুলি জলাশয় আছে, তার জল শুধুমাত্র রাজন্যদের সকল ঘোড়া ও হাতীতে মিলে কয়েক দিনেই চুমুক মেরে শেষ করে দিতে পারে। এই অবরুদ্ধ জলে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়, চাঁদনি রাতে নৌকাবিহার ছিল একটা প্রধান আকর্ষণ। মঙ্গই সোজা গিয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বলে তার খানিকটা গর্ব আছে, গঙ্গার মতো এর যদি গভীরতা থাকত তা'হলে আজ বরবধূ ময়ূরপঙ্খী নৌকায় চেপে মঙ্গ-ইয়ের ওপর দিয়ে আসত। বর্ষার সময় মাত্র দু'মাসের জন্য বাণিজ্য-তরীর ভীড় মঙ্গইয়ের বুকে, তারপর জল কমতে সুরু হলে পণ্য-তরীর দল গঙ্গায় গিয়ে নোঙর ফেলে।

বরযাত্রী পাটলীপুত্রের কাছে (বোধহয় সৈয়দপুর ভিতরীঘাট) গঙ্গায় নৌকা থেকে রাজন্যদের নিজ নিজ শাসিত এলাকায় অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়-সওয়ার সংবাদ নিয়ে ছুটল শিংশপার দিকে —শিংশপায় সংবাদ এল আজ সন্ধ্যার মধ্যে বরবধূ এসে পৌছাবে।

উৎসব-প্রিয় জনগণ সকাল থেকেই মহোৎসব পালন করছে। চৈত্র মাসের গরম ততটা দুঃসহ নয়। দূর থেকে বাজনার আওয়াজ কানে আসে, আকাশে দেখা যায় ধূলা উড়ছে। —ঐ আসছে ! আনন্দে নগরবাসী ছুটল দক্ষিণ দিকে বরবধূকে স্বাগত জানাতে।

বরবধূ শিংশপায় প্রবেশ করতে ভীড় এত বেশী বাড়ল যে, বাধ্য হয়ে বরবধূকে

শিংশপার মহাগজ মেঘনাদের পিঠে বসতে হল, প্রজাদের দর্শন দেবার জন্যে। প্রাণভরে দর্শন করে শিংশপাবাসী তাদের ভাবী রাজারাণীকে।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোকের দেওয়া মহাগজের পিঠে বসে আছেন রাজন্য সুবাহু ও রেবত। বামদিকে মেঘনাদের অঙ্কুশ ধারণ করেছেন স্বয়ং কুমার জয়ন্ত, পিছনে বসে আছেন বধূরূপী ভদ্রা। মেঘনাদের ঠাণ্ডা স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত জনতা তার গা ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে। পিছনে আরও কয়েকটি হাতীর পিঠে অন্তঃপুরিকা সুন্দরীরা বসে আছেন। বসনে আভরণে এঁরাও এক একজন অপরূপ সাজে সেজে-ছেন, তবুও সুন্দরী ভদ্রার রূপের কাছে তাঁদের রূপ চাঁদের পাশে তারার মতো টিমটিমে মনে হচ্ছিল।

ভদ্রা এখন মদ্রের রাজকন্যা নয়, কাশী জনপদের রাণী, তাই তার অঙ্গেও কাশীর বিনীত সজ্জা। পায়ে স্বর্ণ বলয়, আট-পাক-খাওয়া সর্প যেন চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে আদর করছে। নাভী থেকে কাঁধ অবধি সুবর্ণসূত্র একের পর এক অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। বহুমূল্য রত্নরাজি সহ মুক্তার মালা বক্ষমণ্ডল ঢেকে আছে। সোনালী রঙয়ের চুলের সঙ্গে মণি-মুক্তা গেঁথে তৈরী হয়েছে বিচিত্র লতান্বিত বেণী। মুখশ্রীর তুলনা বুঝি মেলে না সমগ্র আর্যাবর্তে। আরক্তিম শঙ্খশ্বেত মুখে তাই প্রয়োজন হয়নি শঙ্খচূর্ণের। নীল পদ্মের সঙ্গে বুঝি তুলনা চলে তার মৃগনয়নের। প্রজাবৃন্দ রাণী বলে নয়, নিজেদের সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবেই গ্রহণ করল ভদ্রাকে। চঞ্চল চিত্তে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল সমগ্র নগরী এবং প্রাসাদের অধিবাসী আর অতিথি। নগরদ্বারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বরবধূর উপর পুষ্পবৃষ্টি সুরু হল প্রাসাদ অবধি। ভদ্রার মনেও আনন্দের সীমা রইল না। ভদ্রা অনুভব করলেন, যে দেশের রাণী হয়ে এসেছেন সে দেশ তাঁর পিতৃভূমির মতো উৎসব প্রিয়, সুন্দর। তাঁর একান্ত আত্মীয় আজ থেকে এই দেশ।

অন্তঃপুরের প্রবেশদ্বারে শাশুড়ি বিধিমতো অনুষ্ঠানের সঙ্গে নববধূকে অভ্যর্থনা করলেন। নতুন সুরে বেজে ওঠে সমবেত সঙ্গীতের ধ্বনি। নতুন তালে নৃত্য করে শিংশপাবাসী। জয়ধ্বনি শোনা যায় শিংশপার চারিদিক থেকে। শিংশপায় আজ রাজলক্ষ্মীর সাদর সম্বর্ধনা।

মনুষ্যজাতির স্বভাবই এমন, যার কল্পনার কখনও শেষ নেই, বরং সৃষ্টির আদি-কাল থেকে ক্রমশ বেড়েই চলেছে—ক্রমশ উন্নতির দিকে চলেছে বংশ পরম্পরায়। রাজন্য সুবাহুর পুত্র জয়ন্তের শাসনকালেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে মানব সমাজের। জয়ন্ত তাঁর পিতার সবটুকু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন! প্রজারা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট ছিল। জয়ন্তের জীবনে তারুণ্যসুলভ আমোদ-প্রমোদ থেকে বঞ্চিত হবার কোনো

কারণই নেই, তবুও নবদম্পতি কখনও বিলাসী ছিলেন না। জয়ন্তের রক্তে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বীরত্ব ও সমরকুশলতার বহতা স্রোত। কিন্তু সে সব বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করার সুযোগ অন্তর্হিত হয়ে গেল। কারণ কলিঙ্গ বিজয়ের পর প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোক যুদ্ধের রাস্তা একেবারে পরিত্যাগ করলেন। রাজ্য বিজয়ের পরিবর্তে ধর্ম বিজয়ের পথ গ্রহণ করলেন তিনি। আপন-পর সকল ধর্মেই তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। তাই রাজ্যের সকলেই সম্রাটের অনুকরণ সুরু করল, সকল প্রজাই মেনে নিল তাদের রাজার মতকে, অনুকরণ করতে লাগল রাজার স্বভাবকে। না করে উপায়ও ছিল না। জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর, যিনি সর্বদা অবরোধে থাকতেন, রাজসুখে অভ্যস্ত যিনি, তিনি যখন সব কিছু পরিত্যাগ করে স্বয়ং রাস্তায় নেমে এলেন প্রজাদের মাঝে, তাদের সুখ-দুঃখের অংশগ্রহণ করতে, তখন প্রজারাও তাঁকে অনুসরণ না করে পারল না।

তরুণ রাজা শৌর্য ও নির্ভীকতা দেখাবার জন্যে মৃগয়াক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে নিলেন। সে সময়ে লোকালয়ের চেয়ে জঙ্গলই ছিল বেশী। তবুও কোনো কোনো এলাকা থেকে জঙ্গল দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। শিংশপার আশপাশের ঘন বসতি বহু দূর উপনগরী অবধি বিস্তৃত ছিল। প্রিয়দর্শীর রাজত্বের শেষ কুড়ি বছরে এই বিস্তৃতি আরও প্রসারিত হয়েছিল। দেশের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শিল্পকলা, ব্যবসা বাণিজ্য এবং রুচিরও উন্নতি হয়। রাজন্য জয়ন্তের আমলে শিংশপার বিস্তৃতি মঙ্গইয়ের অপর পারেও অনেকটা বিস্তার লাভ করেছিল।

জয়ন্তের স্ত্রী রাণী ভদ্রা খুব কোমলহৃদয়া নারী ছিলেন, কিন্তু তাই বলে নিজ পতির মৃগয়ায় বা সহভোজে কখনো বাধা দিতেন না। জনপদের জঙ্গলে সকল প্রকার জন্তুই সুলভ ছিল। সে সময়ে মত্ত মাতঙ্গকে প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়ে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে প্রাণরক্ষা করতে হত না। শুধু বাঘই নয়, আসল সিংহও তখন কাশী জনপদের জঙ্গলে হামেশা ঘোরা-ফেরা করত। গণ্ডারের খোঁজে শিকারীকে অবশ্য তরাই অঞ্চল অবধি যেতে হত। রাজন্য জয়ন্ত দুঃসাহসিকতাপূর্ণ শিকার করতে ভালোবাসতেন, বাঘ সিংহ তিনি সামনাসামনি লড়াই করে মেরেছেন। তাঁর কথা ছিল, 'শত্রুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে পরাস্ত করায় বাহাদুরী নেই, শত্রুকে আক্রমণের সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়ে লড়াই করার নামই আসল লড়াই।' অসি এবং ঢাল নিয়ে তিনি শিকার করতেন। তীরে লক্ষ্যভেদ করতেন তিনি ছুটতে ছুটতে —এমনই ছিল তাঁর নিশানা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু মানুষের নয় প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়। জঙ্গল থেকে কি পাওয়া যায় তার ওপর নির্ভর করতে হয় না মানুষকে। তাই জনসংখ্যা যত বেড়ে

যায়, তার প্রয়োজনে ক্ষেত-খামারের, চাষ বাসের প্রয়োজনও বাড়তে থাকে। তাই জঙ্গল কেটে মানুষ সুরু করে চাষ-আবাদ, আর জঙ্গলও ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে। কাশীর ভূমি অধিকতর সবুজ জঙ্গলে শোভা পেত। তার শ্যামলতা গ্রীষ্মের দারুণ তাপ ও ঝঞ্ঝার ধূলি-ধূসরিত হয়ে উঠতে পারত না। শীতের সময়ে বনস্পতি যদিও নগ্নরূপ ধারণ করত, কিন্তু বসন্তের ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করত বনরাজি। অরণ্য শব্দ অন্যার্থে গ্রাম্য বা অরণ্য জীবনের খাদ্যপ্রাপ্তি। খাদ্যই জীবনের শরীর ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক। গৃহপালিত পশুপালন ছিল প্রচুর পরিমাণে। তবে দুধ-ঘি ছাড়া তখন ছাগমাংস মৃগমাংস প্রিয়তর বস্তু ছিল। ময়ূর বা জলপক্ষীর মাংস খাওয়াও প্রচলিত ছিল। শীতের সময়ে তখনকার মানুষের অজ্ঞাত কোনো উত্তর দেশ থেকে প্রতি বছরই নানা রকমের পাখিরা আসত, আবার বসন্তকালে তারা ফিরে যেত। উড়ন্ত অবস্থায় এইসব পাখি তীরবিদ্ধ করে শিকার করা হত।

তরুণ বয়স পার হয়ে জয়ন্তের মতিগতি গেল ধর্মের দিকে। ধর্মপথে তাঁর পত্নী ভদ্রা আগেই এগিয়ে ছিলেন। তখন রাজন্যদের এক ভার্যা খুবই কম দেখা যেত। বহু ভার্যা প্রথারই প্রচলন ছিল। কিন্তু জয়ন্ত ভদ্রাকে প্রথম পত্নী এবং লহরীকে মাত্র দ্বিতীয় পত্নী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বড়রাণী ভদ্রা আসার কিছুকাল পরেই ছোটরাণী লহরী পদার্পণ করলেন ভদ্রার সতীন হিসেবে। সে সময় ভদ্রার একমাত্র সন্তান বা পিতার উত্তরাধিকারী কর্ণ শিশুকালের সীমা পার হয়েছে। ভদ্রা লহরীর সতীন হলেও আসলে এঁরা ছিলেন সহোদরা দুই ভগ্নী। বড় বোনের আজ্ঞা পালন করাই লহরীর একমাত্র কর্তব্য ছিল। রাজন্য জয়ন্ত প্রিয়দর্শী অশোকের ধর্মকেই নিজের আদর্শ বলে গ্রহণ করলেন এবং জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি নিজের আদর্শ ও কর্তব্য পালনে রত ছিলেন।

শিংশপা নগরীতে এই সময় ভগবান তথাগতের এক নাতিবিশাল ইটের তৈরী চৈত্য (বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠ বা বিহার) বহু দিনের পরিশ্রমে, বহু অর্থব্যয়ে নির্মাণ করা হয়। এই চৈত্যের চারিদিকে চারটি বিশাল মূল তোরণ-দ্বার ছিল, পরিক্রমা করবার জন্য চৈত্যের চারিদিকে সুন্দর বাঁধানো পথ ছিল কাষ্ঠ নির্মিত। রাজন্য এবং তাঁর সকল শিল্পীবৃন্দ এই কীর্তিকে চিরস্থায়ী করবার জন্যে সকল রকম চেষ্টাই করেছিলেন। হয়ত এই কীর্তি চিরস্থায়ী হত, চৈত্যটি পাথরের তৈরী হলে। কিন্তু যেহেতু প্রিয়দর্শী অশোকের সমস্ত কীর্তি বা চৈত্যগুলি ইট দিয়ে তৈরী তাই আদর্শ অনুসরণকারী ধার্মিক জয়ন্ত নিজের চৈত্য তৈরীর কাজে ইটের বদলে পাথরের ব্যবহার ধৃষ্টতা মনে করলেন।

কাঠের কাজটা তিনি যথা সম্ভব মজবুত করবার চেষ্টা করেছিলেন। শাল প্রভৃতি

অন্যান্য কাঠ ব্যবহার করলে হয়ত আরও মজবুত হত, কিন্তু শিল্পীদের নিজ নিজ শিল্প-চাতুর্য দেখাবার জন্য শিশম কাঠই ছিল উপযুক্ত, সুলভ ও সহজপ্রাপ্য। হয়ত এই শিশম কাঠের জঙ্গলের জন্যেই এই জায়গার নামকরণ হয়েছিল শিংশপা। ইটের তৈরী চারকোণা বেদীর ওপর গোলাকার ছিল চৈত্যটি, তার ওপর সুন্দর কারু-কাজ করা তিনটি ছত্র, আরও সুন্দর ছিল এর ঝালরগুলি। শিল্পীরা নিজ নিজ কাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখে গেছে পরিক্রমা স্থানের দেয়ালের কাঠের ওপর। মূর্তি-কার, দেয়ালে মন-প্রাণ দিয়ে গড়েছে নানা প্রকার মূর্তি। দেয়ালের পাশে পাশে সোজাসুজি দাঁড় করানো কাঠের খুঁটি, তার ওপরে খোদাই করা নানা প্রকার শিল্পের নিদর্শন।

স্তম্ভের ওপর চারটি সিংহের মূর্তি, ওপর দিকে একটি বোধিবৃক্ষ, বেদীর দুই দিকের শিখরে রয়েছে ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মচক্রের মূর্তি, ত্রিরত্ন মূর্তি (বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ) তার নীচে দুটি মাছ। আড় করা পট্টিকার ওপর দুটি মকর মূর্তি, এই জন্যে এই দিকের তোরণের নাম ছিল মকরতোরণ। তোরণের অন্য সকল পট্টিকার ওপর সারিসারি হাতি, ঘোড়া ও বৃষ মূর্তি। প্রত্যেকটি স্তম্ভ, চূড়া ও শীর্ষচূড়াতে ছিল কারুকার্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তৎকালীন শিল্পীরা একই ধরনের মূর্তি বা নক্সার পুনরাবৃত্তি আদৌ পছন্দ করতেন না। তার প্রমাণ, এই চৈত্যের কোথাও এক কাজের দ্বিতীয়-বার ব্যবহার নেই। এ ছাড়াও অন্যান্য রাজন্য ও প্রিয়দর্শীর সমকালীন রাজাদের ও রাণীদের মূর্তিও ছিল চৈত্যের অভ্যন্তরে। ছিল বহু দেবদেবী, নরবাহন, বৈশ্রবন (কুবের), ধৃতরাষ্ট্র, বিরুঢক, বিরূপাক্ষ প্রভৃতির প্রতিকৃতি আবার কোথাও উৎকীর্ণ ছিল চন্দ্রা, অলকানন্দা, অহেরিয়া, সুদর্শনা, সিরিমা প্রভৃতি দেবীর মূর্তি। যক্ষিণীরা ভগবান বুদ্ধের চৈত্য বন্দনায় নিরতা—এমন চিত্রও রয়েছে। আবার কোথাও বা চক্রবাহক, নাগরাজসহ সূচিলোম, সুপ্রবাস অজকালক ও গাঙ্গেয় প্রভৃতি দেশীয় মহা-যক্ষদের মূর্তি। শাক্য-মুনিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত সিংহাসনে মহাজাতকের মূর্তি দেখলে পাষাণ হৃদয়েও ধর্মভাব জেগে ওঠে। যে সময় এই চৈত্যের উদ্ঘাটন উৎসব হয় সে সময় কাশী জনপদের সকল অঞ্চল উজাড় করে লোক এসেছিল উদ্ঘাটন উৎসব পালন করতে। মহাস্থবিরের বিশেষ শিষ্যদের এবং অন্যান্য বহু ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন জয়ন্ত।

আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেলেও মহাকালের নিয়মকে কিন্তু এড়াতে পারেনি শিল্পীদের এই প্রভূত পরিশ্রম। এমন সুন্দর কারুকার্যময় চৈত্যের চিহ্ন মাত্র ১০১ বছরের বেশী স্থায়ী হয়নি। পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয় বলেই হয়ত সেদিনকার এই পরিশ্রমলব্ধ কীর্তি আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

রাজন্য জয়ন্তও আপনার পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করলেন। সংসারে বেঁচে রইলেন মহারাণী ভদ্রা, বৃদ্ধা হয়েছেন তবুও তিনি বড়রাণী। পাটলীপুত্রের সিংহাসনে তখন অশোক-পৌত্র দশরথ, শিংশপায় জয়ন্ত পুত্র কর্ণ। কর্ণও পিতার মতোই পূর্ব-পুরুষদের সকল মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, বড়রাণী ভদ্রা সকল সময় ধর্মকর্মে রত থাকেন। বিরাট রাজপ্রাসাদে তাঁর মন বসে না, তাই তিনি নগরান্তে নিজের পুত্রের নামানুসারে কর্ণহট-বাজার নামে উপনগর স্থাপন করেছিলেন, তিনি সেখানকার প্রাসাদে চলে গেলেন। চারিদিকে মনোরম উদ্যান-বিশিষ্ট ছোট্ট প্রাসাদটি মনে হত স্বর্গপুরী বড়রাণীর সঙ্গে ছোটরাণী লহুরীও এলেন অগ্রজার সঙ্গে বাস করবার জন্য। ভদ্রা-রাণী কর্ণহটের উত্তরগ্রাম হাত-খরচার জন্য উপহার পেয়েছিলেন বলে ঐ গ্রামের নাম হয় ভদ্রাপুর, কালে কালে সেই স্থান রূপ-পরিবর্তন করে বড়ৌরা বা বউটার নামে পরিচিত হয়েছে।

ভদ্রারাণী কখনও কারো দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। নিজের ক্ষমতা-নুযায়ী দানে তিনি সর্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা মেটাবার জন্য তিনি অনেক দান করেছেন। এ ছাড়াও পথিকের শ্রান্তি দূর করবার জন্য পথিপার্শ্বে পুষ্করিণী তৈরী করেছেন। ভদ্রার তৈরী পুকুরের নাম—ভদ্রা, ভদ্দা, বড্ডা বা বড়ী। এই নাম আজও প্রচলিত। লহুরী রাণীও নিজ নামে একটা পুকুর কেটে নিজেকে ধন্য ও অমর করে রেখেছেন।

দেবপুত্র

কাল : ৭০ খৃষ্টাব্দ

নিত্য পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে সময় এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে। দুই শত বৎ-সরেরও কিছু বেশী সময় পরের কথা; যবনসেনা উত্তর ভারত আক্রমণ করেছে। ক্রমশ তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছড়িয়ে পড়তে লাগল ভারতের নানা স্থানে। এক সময় সাকেত রাজ্য আক্রমণ করল যবন সেনাদল, শিংশপাও রক্ষা পেল না এ আক্রমণ থেকে। লুটপাট, নরহত্যা ধর্মান্তরিতকরণ প্রভৃতিতে অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেল তারা। শিংশপা ও তার উপনগরী কর্ণহটের ওপর চরম অত্যাচার হল। এই আক্রমণের পর তবুও কিছু লোক কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে ছিল, কিন্তু বার-বার আক্রমণের ফলে ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যগুলি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল এবং রাজারা তখন যথেচ্ছাচারে একের ওপর অন্যে হিংসা পোষণ করতে লাগলেন।

পাটলীপুত্রের শাসন-ক্ষমতাও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল সকল স্থানে। শিংশপার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল ব্যবসায় ও শিল্পে। কিন্তু দুর্বল শিংশপার পক্ষে খণ্ড খণ্ড শাসন সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ল। দুর্বল হয়ে পড়ল জনবল ও মনোবল। দিনের পর দিন দেশের পরিস্থিতি খারাপ হতে লাগল এবং খৃষ্টীয় পাঁচ ছয় শতাব্দীর মধ্যেই এই পরিস্থিতি চরম অবস্থায় পৌঁছাল।

২

ভিক্ষুণী ধম্মদিন্না অন্য এক প্রৌঢ়াকে প্রশ্ন করেন —তা'হলে শেঠানী, তুমি সত্যি সত্যি তোমার পৈত্রিক মহাল ছেড়ে দিলে?

প্রৌঢ়া উত্তর দেন —না ভট্টারিকা, ছেড়ে দিয়েছি এমন কথা বলতে পারি না, মাঝে-সাঝে যাওয়া-আসা করি। তা'ছাড়া মহাল আর কোথায়, সবই তো ধ্বংসস্তূপ। ছাদ সব পড়ে গেছে, খালি দেয়ালগুলি এখনও খাড়া আছে। কারুকার্য-করা অমন কাঠের কাজগুলি এখন একমাত্র জ্বালানিতে পরিণত হয়েছে। দু-একটা ঘর এখনও যা টিকে রয়েছে কিন্তু সে ক'দিনই বা আর থাকবে! পূর্ব পুরুষদের ঘর তাই মাঝে মধ্যে চোখের দেখা দেখে আসি।

—শুধু তাই নয় শেঠানী, পূর্ব পুরুষদের ঘরের জন্যে শুধু নয়, তাদের বিহারের জন্যে তুমি আসো তা আমি জানি।

শেঠানী চোখের জল মুছে বললেন —আপনি ঠিকই বলেছেন, আমারই পূর্ব পুরুষেরা এই বিহার প্রতিষ্ঠা করে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান করেছিলেন। যখন আমাদের দিন ভালো ছিল তখন এই বিহারের জাঁকজমক ছিল, কিন্তু আজ আমাদের দুর্ভাগ্যের ছায়া এর ওপরও না পড়ে পারেনি।

—না না, এমন আর কি খারাপ আছে এখন? বিহারের অবস্থা মোটামুটি মন্দ নয়। তবে ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে।

এই শেঠানীর শ্বশুরকুলের সার্থবাহ ধনদত্ত শিংশপা নগরীতে এক বিরাট বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এক সময় এই বিহারে পাঁচ শতেরও বেশী ভিক্ষু থাকতেন। কিন্তু বিহার বা দেবালয়, বিদ্যালয় অথবা ধর্মশালা শহরের মধ্যে এই জন্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় যাতে শহরবাসী এদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখতে পারে। এই সব প্রতিষ্ঠান ছিল যেন নদী, আর জনপদগুলি নদীর উৎস জলাশয়ের মতো। মূল উৎস যখন শুকিয়ে যায় নদীও বাধ্য হয় শুকোতে। কোনো এক সময় বিশাল হিমালয়ের বুকে গলিত হিম থেকে যে নদী জন্মগ্রহণ করে সশব্দে এসে পড়ত নিম্নভূমিতে, তারপর দেখা গেছে কালের গতিতে সে নদীর স্মৃতিটুকুই শুধু রয়েছে। শিংশপার যখন সময় ছিল, তখন আজকের শিশবা, বছবল, শেখুপুর, ভীহা, চকরপান,

নরহত্তা, কর্ণহট (কনৈলা) প্রভৃতি অঞ্চল ছিল ধন-ধান্যে-পুষ্পে-ভরা। সে সময় বৌদ্ধ বিহারের এবং উপাশ্রয়দের কোনো অভাব ছিল না। যখন নগরী শ্রীহীন হয়ে পড়তে লাগল তখন একে একে ভিক্ষু পরিব্রাজক, কলাকার, শিল্পী সবাই অন্য স্থানে আশ্রয়ের সন্ধানে চলে যেতে সুরু করল। একমাত্র এই বিহারে কোনো প্রকারে পঞ্চাশ-ষাট জন ভিক্ষু রয়ে গেছে। ভিক্ষুণী উপাশ্রয়ে বৃদ্ধা ধম্মদিন্না আট দশ শিষ্যাসহ রয়েছেন। হয়ত এর চেয়ে ভালো আশ্রয় এঁদের মেলেনি তাই এইখানে এঁরা পড়ে আছেন। বোধহয় নগরের উপকণ্ঠবর্তী গাঁয়ের লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি এঁদের দিন যাপনের আয়োজনটুকু বজায় রাখার চেষ্টা করে থাকে!

শেঠানী উপাসিকার শুধু স্বভাবে নয়, স্বরূপেও কিছুটা বিশেষত্ব ছিল। বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, কিন্তু মাথার চুলের দিকে না তাকালে মনে হয় না যে তাঁর তারুণ্য পার হয়েছে। মাথার চুল অধিকাংশই পাকা কিন্তু তার মাঝে মাঝে সোনালী চুলের মিশ্রণে আর এক শোভা ধারণ করেছে। এই সোনালী চুলের জন্যই হয়ত তাঁর নামকরণ হয়েছিল সোনকেশী। গায়ের রঙও ছিল তাঁর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। এত ফরসা রঙ শিংশপা নগরীতে খুব কমই দেখা যেত। উচ্চবর্ণের জাতির সবাই গৌরবর্ণ এবং হীনবর্ণের সবাই ছিল কালো। কিন্তু সোনকেশীর এই গৌরবর্ণ যেন সকলের চেয়ে আলাদা ধরনের। এর কারণ খুঁজতে বেশী বেগ পেতে হবে না। মাত্র সওয়া দু'শ বছর আগে যখন যবনেরা (গ্রীক) উত্তর ভারত আক্রমণ করে যমুনার পশ্চিম সীমা বরাবর অধিকার করে নেয়, তখন সেই সব অধিকৃত এলাকায় লক্ষ লক্ষ সৈনিক ও কারবারী যবন বসবাস সুরু করে। পাঞ্জাবের বাইরেও বেশী সংখ্যায় শিল্পী ও ব্যবসাদার যবন বাস করত। শাসন ব্যবস্থায় এদের পৃথক ব্যক্তিত্ব ছিল। শাসনের অভাবের জন্যই এরা পৃথকভাবে বাস করছিল এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হওয়ার পথে নানা প্রকার সুবিধা থাকায় ক্রমশ এরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাতে লাগল এবং ভারতীয় জনসমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল। সোনকেশী বারাণসীর এক যবন সার্থবাহের কন্যা। কিন্তু পিতৃকুলের আর্থিক অবস্থার পদ-বৈগুণ্যে, ভাগ্যের পরিহাসে শিংশপার শেঠের পুত্রবধূ হতে হল। সোনকেশীর আসল নাম ছিল সুনন্দা, কিন্তু সোনালী চুলের জন্যে সোনকেশী বলেও পরিচিত ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে যবনেরা ভারতীয় নামধামও গ্রহণ করতে সুরু করেছিল। কিন্তু গায়ের রঙে বোঝা যেত এরা অভারতীয়।

আগেই বলেছি শিংশপায় সোনকেশীর এক বিরাট মহাল ছিল, যার শুধু ইঁটের দেয়াল-গুলিই এখন বর্তমান। সমগ্র অট্টালিকা এখন ধ্বংসস্তূপ। অর্থের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও বদলে যায়, সোনকেশীর শ্বশুরকুলের পূর্ব পুরুষদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খরচ করতে করতে সোনকেশীর স্বামী বুদ্ধদাসের সময়ে অবস্থার

চরম অবনতি হয়। কিন্তু বুদ্ধদাসের দূরদর্শিতা ছিল তাই সংসারের চাপ মাথার ওপর পড়তেই তিনি শিংশপার মহাল ছেড়ে দিয়ে কর্ণহটে চলে গেলেন। কর্ণহটে একটু বাগান, সাধারণ ঘর এবং ক্ষেত-খামার কিছুটা ছিল। তাই নিয়ে বুদ্ধদাসের জীবন বেশ সুখেই কেটে যেতে লাগল।

দশ বছরের সন্তান জিনদাস ও সোনকেশীকে রেখে বুদ্ধদাস দেহত্যাগ করলেন। পুত্রকে নিয়ে সোনকেশী রইলেন সেইখানেই। স্বামী বেঁচে থাকতে তাঁর সঙ্গে বছরে পাঁচ-সাতবার শিংশপায় যেতেন —পূর্ব পুরুষের ভিটে ও বিহার দর্শন করার উদ্দেশ্যে। অমাবস্যা পূর্ণিমায় বিহারে আসার জন্যে সোনকেশী ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। এখানে এসে থেরী ধম্মদিন্নার কাছে বসে উপদেশ ও সংবাদ শুনতেন গভীর আগ্রহে এবং তিনি মনে শান্তি পেতেন। এখানকার ধ্বংসস্তূপ দেখে তাঁর বড়ই কষ্ট হত। কিন্তু যে কাজ তাঁর সুচতুর স্বামীর দ্বারা সম্ভব হয়নি সে কাজ তিনিই বা কি করে করবেন! অতএব মুখ বুঁজে বুকের ব্যথা চেপে থাকা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনো উপায় ছিল না।

যখনই সোনকেশী শিংশপায় আসতেন, জিনদাসকে সঙ্গে আনবার কথা কোনোদিন তিনি ভোলেননি। জিনদাস বালক হলেও অবোধ ছিল না। শিংশপার প্রায় সকলেই তাঁদের খুব সমাদর করত। শ্রেষ্ঠীপুত্র এবং শেঠানী বলে তাঁদের সম্বোধন করত। জিনদাসের প্রথম প্রথম এই সকল সম্বোধনের অর্থ বোধগম্য হত না। তার জিজ্ঞাসা বেড়ে যেত মায়ের কাছে। জিনদাস ক্রমশ জানতে পারে তার পূর্ব পুরুষদের কথা, তাদের ঐতিহ্যের কথা। জিনদাসের চিন্তা বেড়ে যায়। আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যেও শেঠানী পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার কোনো ত্রুটি রাখেননি।

জিনদাসের মামার বাড়ি বারাণসীর অবস্থাও পতনের মুখে, অবশ্য শিংশপার মতো অতটা নয়। মাঝে-মধ্যে সেখানে গিয়েও জিনদাস অনেক কিছুই জানতে পেরেছিল।

জিনদাস

কাল : ৮৫ খৃষ্টাব্দ

শিংশপার ধ্বংসস্তূপের কিছু কিছু মেরামত করে মনুষ্যবাসের উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষ এক জাতির মানুষ বাস করতে সুরু করেছে। বেশভূষা এদের অন্য রকম। পরনে ধুতির বদলে পায়জামা, গায়ে অন্য ধরনের জামা এবং কোমরে প্যাচানো কোমর-বন্ধ। পায়ে জানু অবধি জুতো এবং মাথায় টুপি। পোষাক স্ত্রী-পুরুষের সমান। পুরুষদের দাড়ি রাখার খুব সখ। সোনালী রঙয়ের দাড়িওয়ালা ঐ লম্বা-চওড়া দেহধারী

লোকগুলিকে দৈত্যের মতোই মনে হয়। জানু অবধি জুতোর অন্যতম কারণ হল ভীষণ বরফের হাত থেকে পা রক্ষা করা। তবে এত লম্বা জুতোয় শুধুই চামড়ার অপব্যয় হত না, খোলা ও পরার সময়েও বেশ কসরত করতে হত। জাতিতে এরা 'শক'। শিংশপায় এখন এরা কয়েক শ' ঘর বাস করছে। যবনেরা যেমন ভারতবর্ষে লুণ্ঠনকারী হিসাবে এসেছিল, তেমনি যবনদের অনুসরণ করে শকেরাও এসেছিল ভারতবর্ষকে লুট করতে। আগে এরা লুটপাটই করত, কিন্তু এখন এদের রাজা দেবপুত্র কনিষ্ক। কনিষ্ক অশোকের কথা শুনেছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিলেন। কনিষ্ক যুদ্ধে যেমন পরাক্রমশালী, রাজ্য-শাসনের বেলায়ও তেমনি ছিলেন বিচক্ষণ বুদ্ধির অধিকারী। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে মানুষ হওয়ায় ভারতীয়দের তিনি বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তাঁর হৃদয় উদার সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল।

শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে, শিংশপার মতো কত নগর, গ্রাম, কত কীর্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে কালের গর্ভে তার হিসাব নেই। সেই সবের ধ্বংসাবশেষ দেখে দেবপুত্র কনিষ্ক ভাবেন এই সকল ধ্বংসাবশেষগুলিকে পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত দেশে পুরাপুরি সুখ সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কনিষ্কের বিশেষ লড়াই করবার প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে, দেশের অভাব অভিযোগের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে প্রচুর। দেবপুত্রের পূর্বেকার উপরাজ মিত্ররাজকে শিংশপায় শাসন করতে পাঠাবার সময় রাজাদেশ হয়েছিল যে, 'তোমার যোগ্যতার প্রমাণ তখনই হবে যখন তুমি শিংশপার ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধার করতে পারবে।'

মিত্ররাজ জাতিতে পার্থিয় ছিলেন। কিন্তু এখানকার মানুষের মধ্যে শক ও পার্থিয়দের মধ্যে বিশেষ তফাৎ চোখে পড়ত না। দুই জাতিরই রূপ রঙ এবং বেশভূষায় তেমন লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল না। মিত্ররাজের কয়েক পুরুষ আগে তাঁর পূর্ব পুরুষ আপনার জন্মভূমি ইরাণ থেকে এখানে এসে বসবাস করেন। প্রথমে তাঁরা তক্ষশিলায় আসেন। এখন আর তাঁরা অগ্নির উপাসক নন, তাঁরা বুদ্ধ-উপাসক। মিত্ররাজের মনোযোগ পড়ল শিংশপার ওপর, কিন্তু তিনি জানতেন, এত বড় কাজ করতে হলে সকলের আগে সেখানে মানুষের বসবাস আরম্ভ করাতে হবে। তাঁর সঙ্গে একশতের কিছু বেশী শক এবং অনেক গান্ধার সৈন্য ছিল। তিনি শিল্পী, রাজমিস্ত্রি ও ছুতোরের কাজ-জানা সৈন্য বহু পরিমাণে সংগ্রহ করেন এবং মৃত নগরীতে প্রাণ-সঞ্চার করতে জীবনপণ করে লেগেছিলেন। তিনি জানতেন যে, এ কাজ ব্যবসায়ী ও শিল্পকারদের দ্বারাই সম্ভব। তিনি মৃত নগরী দেখতে এলেন এবং লোকমুখে শুনলেন যে এই সার্থবাহ-কুলের উত্তরাধিকারী এখনও জীবিত এবং চাষ-আবাদ করে কোনো প্রকারে জীবনযাপন করছে। মিত্ররাজ জিনদাসকে ডেকে পাঠালেন। তরুণ জিনদাস ভয় পেল সাক্ষাৎ করতে। মা সোনকেশী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন

পুত্রের মঙ্গলের জন্য। মিত্ররাজ বা জিনদাস কেউ কারো ভাষা বুঝতে পারে না, কিন্তু মিত্ররাজ তাঁর হাবভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে ভয়ের কোনো কারণ নেই। মিত্ররাজ হাত বাড়িয়ে জিনদাসকে স্বাগত জানালেন এবং পাশের আসনে বসতে দিলেন। মিত্ররাজ বললেন —শ্রেষ্ঠীপুত্র, তুমি হয়ত জানো না যে আমি কেন তোমাকে ডেকেছি। আমি শিংশপার লুপ্ত বৈভব পুনরুদ্ধারে তোমার সাহায্য চাই।

জিনদাসের মনের শঙ্কা দূর হল বটে কিন্তু সে বুঝতে পারে না, এত বড় কাজ তার মতো সামান্য লোক কিভাবে করতে পারে!

সে জবাব দেয় —আমার কি এমন ক্ষমতা আছে যে আমি এত বড় কাজে লাগতে পারি? এই সামান্য জমিটুকু মাত্র আছে আমার সম্বল। তা দিয়ে কোনো প্রকারে জীবন-ধারণ করে আছি।

মিত্ররাজ বললেন —আমি সবই জানি। তোমারই পূর্ব পুরুষের মহালের ধ্বংসস্তূপ এখনও বিদ্যমান। এই নগরীর চেহারা বদল করতে হলে সবচেয়ে আগে তোমাদের ওই বিরাট মহালের পুনরুদ্ধার দরকার। তুমি নিজেকে ছোট মনে কর না। দেবপুত্রের বরাভয় রয়েছে তোমার পিছনে। যদিও তুমি সার্থবাহের জীবন চাক্ষুষ দেখনি, কিন্তু সার্থবাহের রক্ত বইছে তোমার এই শরীরে।

জিনদাসের চোখে চমক লাগে, বয়স তার মাত্র পঁচিশ বৎসর। ছোট বেলায় মামার বাড়ি যাওয়ার পর থেকে কতই না রঙিন স্বপ্ন সে দেখেছে। সেও তার পূর্ব পুরুষদের মতো সার্থবাহের জীবনযাপন করবে, ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। বাণিজ্যেই লক্ষ্মীলাভ সম্ভব। কিন্তু তার পরেই তার চিন্তার মোড় ঘুরে গেছে, কারণ সে যে গরীব, ব্যবসা করবার মতো তার মূলধন কোথায়! কিন্তু তবুও তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যদি কখনও কোনো প্রকার সুযোগ আসে তা'হলে নিশ্চয়ই সে আবার পূর্ব পুরুষদের পথ অনুসরণ করবে।

হৃদয়ের আবেগ চেপে রেখে জিনদাস বললে —আমিও কতই না চিন্তা করেছি সে সম্বন্ধে, কিন্তু আমি যে গরীব। বারাণসীতে গিয়ে আমি অন্যান্য সার্থবাহদের দেখে এসেছি যে আমার পূর্ব পুরুষরা কি রকম জীবনযাপন করতেন।

মিত্ররাজ জিনদাসের বাপের বয়সী। তিনি তরুণ জিনদাসের মাথায় স্নেহের হাত রেখে বললেন —অর্থের চিন্তা তুমি কর না। তুমি জান যে এই দেশে আগে তামা ও রূপার মুদ্রা প্রচলিত ছিল কিন্তু দেবপুত্র এক লক্ষেরও বেশী স্বর্ণমুদ্রা চালু করেছেন। যত অর্থের প্রয়োজন হয় আমি তোমায় দিচ্ছি, তুমি কাজ সুরু কর। যতক্ষণ তোমার কারবার চালু না হয় ততক্ষণ এ টাকা তোমাকে ফেরৎ দিতে হবে না বা এর জন্যে কোনো সুদও দিতে হবে না। আজ থেকে তুমি শিংশপা পুরীর মহাশ্রেষ্ঠী।

জিনদাসের বুক আশায় ও গর্বে ফুলে ওঠে। সৈন্যসহ বাড়ি থেকে রওয়ানা হবার সময়

জিনদাস ভেবেছিল যে তাকে হয়ত শূলে চড়াতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখন সত্যিই তাকে শূল থেকে নামিয়ে হাতীর পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হল।

মিত্ররাজ বুঝতে পারছেন তরুণ জিনদাসের মনের অবস্থা। তিনি জিনদাসকে কিছু বলার অবসর না দিয়েই বললেন —দেবপুত্রের তরফ থেকে আমার ওপর ভার পড়েছে শিংশপা নগরীকে পুনরায় উদ্ধার করার। সেই কাজে তোমার সহায়তা একান্ত আবশ্যক জিনদাস। দেবপুত্র কনিষ্কের তরফ থেকে আমি তোমাকে মহাশ্রেষ্ঠী পদবী দিলাম। এস আমরা দু'জনে শিংশপার ভাগ্যলক্ষ্মীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি যদি আমায় সহায়তা কর তা'হলে এ কাজে আমাদের সাফল্য নিশ্চিত।

জিনদাস মনের আবেগে উল্টো-পাল্টা নানা কথায় যা বলল তা সাজিয়ে নিলে এই রকম দাঁড়ায় —সর্বপ্রকার সাহায্য করতে এ দাস সর্বদা প্রস্তুত। অভিজ্ঞতা হয়ত আমার নেই কিন্তু আলস্য বা নৈরাশ্য আমার জানা নেই। দেবপুত্র এবং আপনার কাছ থেকে সাহায্য পেলে সফলতার পুরোপুরি আশা আমি রাখি।

মিত্ররাজ জিনদাসকে গোড়া থেকেই লক্ষ্য করে দেখছিলেন যে, তার চুল এবং শরীরের বর্ণ দেখলে মনে হয় সে বোধহয় শক নয় তো পার্থিয় সন্তান অথচ তার পোশাক এবং ভাষায় সেটা মনে হয় না। কিন্তু চেহারায় নিজের মতো মনে হওয়ায় তাকে আপন আত্মীয় বলে ভাবতে ইচ্ছে হয়। জিনদাস যে একজন যবন ব্যাপারীর নাতি সে কথা জানতে মিত্ররাজের বেশী দেরী হয়নি।

সেদিন শক সেনানায়কের অনুরোধে রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য জিনদাসকে থাকতে হল। এদিকে বাড়ি না ফিরলে তার মা চিন্তা করবেন বলে দাস মারফৎ সংবাদ পাঠাল —আজ থেকে আমি শিংশপার মহাশ্রেষ্ঠী নিযুক্ত হয়েছি।

রাত্রিতে ভোজসভা বসল। সেখানে অন্যান্য উচ্চপদস্থ সেনানায়করা সস্ত্রীক উপস্থিত হলেন। শকজাতির স্ত্রীরা পর্দানসীন ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের ভারতীয় স্ত্রীরা ছিলেন। ওদের স্ত্রী-পুরুষদের পোশাকে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। শকদের স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে নিঃসঙ্কোচ মেলামেশা ছিল। মিত্ররাজ নবনিযুক্ত নগরশ্রেষ্ঠীর সঙ্গে সমবেত স্ত্রী-পুরুষ সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। গোমাংসের প্রচলন তখনও আছে। ভারতীয়দের কোনো কোনো মহলে গোমাংস খাওয়া বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু শকদের মধ্যে বিশেষ রুচিকর খাদ্যবস্তু ছিল গোমাংস, এর সঙ্গে মদিরা ছিল আরও বেশী রোচক।

মিত্ররাজ জিনদাসের পানপাত্রে মদিরা ঢেলে দিয়ে বললেন —এ কপিশার মদিরা, শ্রেষ্ঠ সুরা। দ্রাক্ষা অন্যান্য স্থানেও হয় কিন্তু কপিশার দ্রাক্ষার সঙ্গে কোনো তুলনা হয় না। আমাদের দেবপুত্রের রাজ্যের অন্তর্গত এই কপিশা।

অরুণ মদিরা জিনদাসের মুখমণ্ডল আরক্তিম করে দেয়, সমস্ত সঙ্কোচ কেটে যায়, কিন্তু

অসংযম তার চরিত্রে নেই বলেই সে কেবল খোলামেলা মন নিয়ে সকল বিষয়ে আলোচনা করে মিত্ররাজের সঙ্গে। মিত্ররাজের কাছে দেবপুত্রের রাজ্যের যে বর্ণনা সে শোনে তার সবটা বোঝে না। কথার মাঝে মাঝে রোচনা বারম্বার মদিরার পাত্র তুলে ধরে জিনদাসের সামনে, কিন্তু জিনদাস প্রতিবার মাত্র ছোট্ট এক চুমুকের বেশী পান করতে রাজী নয়, তাই ভোজসভায় উপস্থিত সকলের চেয়ে শেষ অবধি তার বাহ্যিক জ্ঞান অনেক বেশী রইল। শক-সেনাপতি মিত্ররাজের ইচ্ছা যে, জিনদাস রাতটা এখানেই থাকুক, আমোদ-আহ্লাদ করুক। কিন্তু জিনদাস বুকের ওপর যেন একটা আনন্দের পাহাড় অনুভব করছে। যতক্ষণ এত বড় সংবাদ সে নিজ মুখে মাকে না জানাতে পারছে ততক্ষণ তার সোয়াস্তি নেই। তার স্বভাবসিদ্ধ মধুর ভাষায় মিত্ররাজ এবং তাঁর কন্যা রোচনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চারজন শক-সওয়ারীর সঙ্গে জিনদাস নিজের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হল।

জিনদাস বাড়ি ফিরছে ভগ্ন-নগরীর মধ্য দিয়ে। রাত্রিশেষের নিঃস্তব্ধতায় সমগ্র নগরীকে প্রেতপুরীর মতো মনে হয়। জিনদাস তাকিয়ে থাকে। যে ঘর একদিন সহস্র প্রদীপের আলোয় আলোকিত থাকত, প্রাণ-চাঞ্চল্যে ছিল মুখর আজ সেখানে মনে হয় দৈত্যপুরী, যেন ভয়ে সবাই চুপ করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে আছে। জিনদাসের মনের পটে ভাবী সমৃদ্ধ নগরীর ছবি ভেসে ওঠে। ওর এখন থেকেই কিছু কিছু বিশ্বাস হচ্ছে যে, আবার সে এই মৃতনগরী শিংশপায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, ওর পিতা-পিতামহের ভিটেতে আবার সে মাকে নিয়ে ফিরে আসবে, সকলের মতো আবার পৈতৃক পেশা সুরু করবে। এই সবের জন্যে একমাত্র প্রয়োজন ছিল অর্থ, এখন সেই অর্থাভাব যখন দূর হল এবং স্বয়ং দেবপুত্রের সে যখন এতখানি সাহায্য পাচ্ছে তখন আর কোনো ভয় নেই। আশা আনন্দের আতিশয্যে তাই জিনদাস বারম্বার ফিরে তাকায় পুরনো, ভগ্ননগরীর দিকে।

মৌর্য আমলের বড়ী পোখরীর (কর্ণহট) কিনারায় ছিল জিনদাসের ঘর। বাড়ির সীমানায় পৌঁছাতেই গৃহপালিত কুকুর এসে স্বাগত জানায়। যাবার সময় পায়ে হেঁটে রওয়ানা হয়েছিল জিনদাস, আর ফিরবার সময় নিজে ঘোড়ার পিঠে ও চারজন ঘোড়সওয়ার পাহারাদার নিয়ে ফিরছে। মালিকের এত তাড়াতাড়ি ভাগ্য ফিরবে কুকুর সে কথা ভাবতে পারেনি, তাই সে আপত্তি ঘোষণার জন্য তারস্বরে চীৎকার করতে থাকে। কিন্তু মনিবের গলার স্বর শুনতে পেয়েই সে চুপ করে গেল। সোনকেশী যদিও পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করেননি তবুও সে ফিরে না আসা অবধি ঘুমোতে পারছিলেন না। তিনি ছুটে আসেন পুত্রকে স্বাগত জানাতে। জিনদাস তাড়াতাড়ি মায়ের পা স্পর্শ করে। মা সন্তানকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। ঘোড়সওয়ারীদের বিদায় দিয়ে মাতা-পুত্র ঘরে গিয়ে বসে, জিনদাস আদ্যোপান্ত সব কিছু বর্ণনা করে, সোনকেশী ছেলের অকল্পনীয় ভাগ্যের কথা প্রাণভরে শোনেন —কথা যেন ফুরায় না। সোনকেশী কারবারী লোকের মেয়ে তিনি ব্যবসা

বেশী বোঝেন। তাই জিনদাসকে বুদ্ধি দিলেন যে, টাকা পেয়ে ঐ ভগ্নস্তূপের মধ্যে সবখরচা না করে বেশী টাকা খাটিয়ে আগে বাণিজ্য কর। স্বয়ং দেবপুত্র যখন তোমাকে বিশ্বাস করে এত বড় দায়িত্ব দিয়েছেন, তখন আগে ব্যবসা করে তাঁর অর্থের সদ্ব্যবহার দেখাও, ঐ ভাঙা বাড়িতে আমরা না হয় কিছুদিন চালা বেঁধে থাকব, তারপর বাণিজ্যে লক্ষ্মী ঘরে এলে তখন মেরামতের কাজে হাত লাগানো যাবে। মাতাপুত্রের কথা শেষ না হতেই পূর্বাকাশে সূর্যদেব দেখা দিলেন।

২

মহাশ্রেষ্ঠী জিনদাস এখন চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ় পুরুষ। বৃদ্ধা মায়ের স্নেহ ও পরামর্শ সর্বদা আশীর্বাদের মতো সঙ্গী। মহাশ্রেষ্ঠী হবার পর মাত্র পনের বৎসরের মধ্যে শিংশপা নগরীর কেমন করে কায়াবদল হল তা এখন শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদ দেখেই বোঝা যায়। পুরাতন ভগ্নস্তূপের বদলে সেখানে এখন বিরাট রাজকীয় অট্টালিকা। দুর্বল দেওয়াল সব ভেঙে নতুন করে তৈরী হয়েছে। চারিদিকে চারতলা, পাঁচতলা নানা আয়তনের প্রাসাদ; মাঝে মাঝে চওড়া আঙিনা। শ্রেষ্ঠীপ্রাসাদের নিবাস কক্ষ আলাদা —দপ্তরখানা লেখাপড়ার ঘর আলাদা। মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার রাখার জন্যে বিরাট বিরাট গুদাম। অশ্বশালা গোশালা প্রভৃতি কোনো কিছুরই অভাব নেই। দাস, কর্মচারী বা অন্যান্য উচ্চ-নিম্ন কর্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসোপযোগী ব্যবস্থা।

সত্যই শ্রেষ্ঠী জিনদাস দেবপুত্রের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হয়েছেন। দেবপুত্রের স্বর্ণ মুদ্রা বা সোনা তেমনই জমা থাকত যদি না জিনদাসের মতো নিপুণ বুদ্ধিমানের দ্বারা বিনিয়োগ হত। মহাশ্রেষ্ঠী জিনদাস শিংশপার অনেক শ্রেষ্ঠীকে সাহায্য করে তাদের লুপ্ত পেশা সুরু করতে সহায়তা করেছেন। নগরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বহু পণ্যশালা দূরে চলে গিয়েছিল। শিল্পী, কর্মকার প্রভৃতি তাদের সব কিছু নিয়ে মঙ্গইয়ের দু'ধারে যেখানে সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে এবং অতি দীনতার মধ্যে বাস করছিল। এখন পুনরায় নগরীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সকলের প্রয়োজন বাড়তে লাগল এবং একে একে তারা সবাই আবার ফিরতে সুরু করল। যে কোনো পণ্যদ্রব্য তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠী জিনদাস সেগুলি কিনে নিচ্ছেন, সকল শিল্পীরাই তাই দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে চলেছে।

অন্যান্য জায়গা থেকেও মানুষজন এসে বসবাস, কাজ-কারবার সুরু করেছে। অনেকে ফিরে আসে ছেড়ে-যাওয়া পৈতৃক ভিটেয় এবং নতুন উদ্যমে সুরু করে ভুলে-যাওয়া পৈতৃক পেশা। আবার নতুন প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর হয়ে ওঠে শিংশপা। নতুন নগরীর চেহারা দেখলে দীন-জীর্ণ হৃতশ্রী পুরনো শিংশপার কথা এখন আর কেউ ভাবতেও পারে না। শিংশপার সীমানায় পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। নতুন নতুন রাস্তাঘাট, অতিথিশালা, বিশ্রামাগার, পুকুর

প্রভৃতি কোনো কিছুরই ত্রুটি রাখেননি মহাশ্রেষ্ঠী জিনদাস। নতুন করে জলপথে আর স্থল-পথে চঞ্চল হয়ে উঠেছে বাণিজ্য-তরী আর যান-বাহনের দল।

শ্রেষ্ঠী জিনদাস যে-সকল জায়গার নাম এতদিন শুধু শুনে এসেছেন এখন নিজে সেই সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতে লাগলেন এবং ছোট-বড় সকল শিল্পী-কারবারীদের সহায়তা করে তাদের উন্নতির ব্যবস্থা করতে লাগলেন। মথুরার মহাক্ষত্রপ জিনদাসকে খুব সম্মান করলেন। জিনদাসের পরিচয় পেয়ে তক্ষশিলার মহাক্ষত্রপও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খুশী হলেন এবং জিনদাসকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। কপিশার দ্রাক্ষা বাগানে সমস্ত গ্রীষ্মঋতু কাটালেন শ্রেষ্ঠী জিনদাস। সেখানকার সকল বিহারগুলিতে তিনি বহু অর্থ দান করলেন —কাশী-শ্রেষ্ঠীর জয়গানে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল। এই যাত্রায় জিনদাসের পত্নী রোচনা তাঁর সহযাত্রিণী ছিলেন।

রোচনার পরিচয় আগে সামান্য দিয়েছি। মিত্ররাজের একমাত্র এই কন্যা বাল্যকালে মাতৃহারা হয়ে অবধি তাঁর পিতার খুব আদরের ছিলেন। প্রথম পরিচয়ের পর থেকে একে অপরের দিকে ক্রমশ আকৃষ্ট হয়, মানুষ চিনতে মিত্ররাজ ভুল করেননি। জিনদাস গরীব হলেও সে সর্বগুণসম্পন্ন। তরুণ, সুন্দর, বুদ্ধিমান বিদ্বান জিনদাসের সঙ্গে রোচনার মিলনে তাই মিত্ররাজ কোনো বাধা দেননি বরং প্রশ্রয় দিয়েছেন। জিনদাসের গৃহে রোচনা প্রায়ই যাতায়াত করতেন। সোনকেশীও অকৃত্রিম স্নেহে অভিভূত হলেন। দু'জনে প্রথম থেকেই প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন, পরে মিত্ররাজ দু'জনকে পরিণয়সূত্রে বেঁধে দিলেন।

মিত্ররাজ দশ বৎসর শিংশপার শাসক-সেনাপতি ছিলেন, এখানেই তাঁর দেহান্ত হয়। আমৃত্যু তিনি শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে শিংশপার উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং সর্বাঙ্গীন উন্নতি স্বচক্ষে দেখে তিনি গভীর পরিতৃপ্তি নিয়ে চোখ বুঁজেছিলেন।

সবই তো লক্ষ্মীর কৃপা! শিংশপার ওপর পুরোপুরি লক্ষ্মীদেবী দৃষ্টি দিয়েছেন। ফলে, ফুলে, ধনধান্যে ভরা নবীন শিংশপা ভুলে গেছে তার অতীতকে। নতুন পদক্ষেপে দিনে দিনে এগিয়ে চলেছে শিংশপা উন্নতির শিখরে। ভারতবর্ষে প্রথম সোনার মুদ্রা দেবপুত্র কনিষ্ক চালু করেন। আজও শিংশপায় কনিষ্কের সিক্কা (দীনার) পাওয়া যায়। এই সময় থেকে সুবর্ণকারদের চাহিদা বাড়তে সুরু করে। শিংশপার দুর্দিনের সময় স্বর্ণকাররা নগরী ছেড়ে মঙ্গইয়ের পথ ধরে দূরে দূরে গিয়ে বসতি করেছিল। তারাও সুসময়ে ফিরে এল। শিংশপার পুরনো দিনের কথা আজ কেউ মনে রাখে না। ধ্বংসমূখী বিহারে, দেবালয়ে এখন ধর্মচর্চা পুরোদমে চলে। দেবপুত্র বৌদ্ধ-সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন সেই জন্যই তাঁর আমলে সকল ধর্ম ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের সমান আদর বা সম্মান ছিল। মুদ্রায় যেখানে বুদ্ধ-দেবের মূর্তি অঙ্কিত ছিল, তার পাশে নতুন করে অঙ্কিত করালেন শিব, বায়ু প্রভৃতি দেবতার মূর্তি। এটা তাঁর উদারতারই নিদর্শন।

শিংশপার বৌদ্ধ বিহারগুলি নতুন প্রাণ পেয়ে বিদ্যা ও শিল্পকলার দানে সকলকে শিক্ষিত করে তুলল। বিদ্বান ব্রাহ্মণের কাছে শত শত বিদ্যার্থীর ভীড় জমে উঠল, তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা রাজকোষ থেকে আসতে লাগল। বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন ভিক্ষু ও গৃহহীন সাধুদের আদর ব্রাহ্মণদের সমানই করা হত। দেশের কারো কাছেই দেবপুত্র বিদেশী বা বিধর্মী ছিলেন না। সকলেই এই ধার্মিক রাজার দীর্ঘ পরমায়ু প্রার্থনা করতেন আন্তরিকভাবে।

শিংশপার এত উন্নতি হলেও তাকে স্বর্গ ভাবা উচিত হবে না। যদিও সে সময় সেখানকার সকলে সুখীই ছিল তবুও জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর হাত থেকে কে কবে নিস্তার পেয়েছে! এই সময় মানবজাতির এক পঞ্চমাংশ ছিল দাসদাসী। আকৃতিতে যদিও তারা মানুষ কিন্তু জীবনযাত্রার প্রণালীতে পশুর সঙ্গে এদের প্রভেদ ছিল সামান্যই। পশুদের মতোই এই হতভাগ্য নর-নারীদের হাটেবাজারে কেনাবেচা করা হত। মালিকরা এদের খাওয়া-পরা বা চিকিৎসার ভার এই জন্যে শুধু নিতেন যে এরাই ছিল মালিকদের সম্পত্তির একটা দিক অর্থাৎ এরা এক প্রকার মূল সম্পত্তি ছিল। এরা মরে গেলে বা জীর্ণ হলে মালিকের তাতে ক্ষতি। জিনদাস ও রোচনার শত শত দাসদাসী ছিল। যদিও এঁদের দাসদাসীদের ভাগ্যে লঘু অপরাধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু তাই বলে সকল দাসদাসীদের কপাল তো আর সমান নয়। শিংশপার সমৃদ্ধির মূলে এই দাসদাসীদের ভূমিকা অসামান্য।

কালী নামে এক দাসী মহাশ্রেষ্ঠীর কুলদাসী ছিল। বয়স তার সোনকেশীর সমান। নিজের কর্তব্যপরায়ণতার জন্য স্বামিনীর খুব আদরের পাত্রী ছিল কালী। স্বামিনীর বৈভবহীন অবস্থা সে দেখেছে, আবার শুনেছেও তাদের লুপ্ত বৈভবের কাহিনী। তার গর্ব ছিল, তার পূর্ব পুরুষেরাও শ্রেষ্ঠীদের সেবা করে এসেছে। সোনকেশীরও কালীর ওপর খুব মমতা ছিল। সমৃদ্ধির দিনে সোনকেশীর ঘর যখন হীরা, মুক্তা, সোনা-দানায় পরিপূর্ণ তখন সোনকেশী কালীর কালো দেহ ভরে দিলেন দামী দামী অলঙ্কারে।

একদিন উদার আবেগে সোনকেশী কালীকে বললেন —কালী, আমি তোকে দাসীত্ব থেকে মুক্তি দিতে চাই।

কালী নিজের সরল স্বভাবানুসারে জবাব দেয় —অর্থাৎ এ বাড়ি থেকে আপনি আমায় বিদায় করতে চান।

—না না, এ ঘর, এই ছেলে-বৌ তোরই মনে করবি। জবাব দেন সোনকেশী।

আনন্দের অশ্রু কালীর দু'চোখে, জিনদাসের প্রতি তার মায়া-মমতা সোনকেশীর চেয়ে কম নয়। কালীর একটি সন্তান হয়েছিল, যাকে বুদ্ধদাসের সন্তান বলা হত। কিন্তু সে সন্তান হয়ত মরবার জন্যেই জন্মেছিল। তাই জিনদাস জন্মাবার সময় রুগ্‌ণা সোনকেশীর মাতৃদুগ্ধ না থাকার জন্যে জিনদাসকে কষ্ট পেতে হয়নি। কালী নিজ স্তন্যদুগ্ধে মানুষ করেছে জিনদাসকে। তাই জিনদাসের ওপর মমতা সোনকেশীর চেয়ে কিছু কম ছিল না কালীর।

কালী জানত, এ বাড়ি থেকে তাকে কেউ কখনো তাড়িয়ে দেবে না অতএব অদাসী হবার কোনো মূল্যই নেই তার কাছে। বার্দ্ধক্যের জন্যে কাজকর্ম করার ক্ষমতা তার নেই, কিন্তু ক্ষমতা যখন ছিল তখনও তাকে কাজের জন্যে জোর-জুলুম করেনি কেউ। সমগ্র শ্রেষ্ঠী পরিবারের কর্তৃত্ব সে নিজ হাতে তুলে নিয়েছিল। রোচনার জন্য কালীর প্রয়োজন ছিল খুব বেশী। রোচনার দুই সন্তানের ঠাকুমা ছিল কালী।

সোনকেশী কালীকে অদাসী করবার কথা এমনিই বলেছিলেন। মাঝে-মধ্যে কালীকে পুরস্কৃত করতেন সোনকেশী। নিজের জন্যে কোনো জিনিসের অভাব কোনোদিন সে অনুভব করেনি।

সোনকেশীর মতো কালীও প্রত্যেক পূর্ণিমায় উপবাসী থেকে বৌদ্ধ বিহারে পূজা-দর্শনে যেত। তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল কর্ণহটের বাগানটি। এই বাগানেই মহা-শ্রেষ্ঠীর জন্ম, এই বাগান থেকেই শক সেনাপতি মিত্ররাজ জিনদাসকে ডেকে নিয়ে মহা-শ্রেষ্ঠীর পদ দিয়েছিলেন। সামনের পুষ্করিণীর দিকে তাকালে আজ কত পুরনো কথাই না মনে পড়ে। সোনকেশী আর কালী আলোচনা করে দু'জনে। রোচনাও মাঝে-মাঝে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে থাকত, তার ছেলেরা তো সব সময়েই সোনাকেশীর কাছে।

পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়, এখানে যেজন্মায় তার মৃত্যু একদিন অনিবার্য। ধরিত্রীর কোলে যা জন্মায়, কালের নিয়মে তা আবার তারই কোলে একদিন বিলীন হয়ে যায় —পড়ে থাকে শুধু স্মৃতিটুকু। সেই স্মৃতিকে অবলম্বন করে এগিয়ে যায় আগামী দিনের ভবিষ্যৎ বংশধর, এমনি করে ক্রমে ক্রমে সেই স্মৃতিটুকুও ম্লান হতে হতে অবশেষে একদিন কালের গর্ভে হারিয়ে যায় —বালুকাবেলায় পদচিহ্ন যেমন চিরস্থায়ী হয় না। তবুও মানুষ চেষ্টা করে তাকে স্মরণীয় করে রাখতে তাতে অসফল হলেও চেষ্টার বিরাম নেই।

সোনকেশীর বয়স এখন ষাটেরও বেশী, তাই তাঁকে বৃদ্ধা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, কিন্তু তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য দেখলে তাঁকে বৃদ্ধা মনে হয় না। বেশীরভাগ সময় তিনি পূজা-অর্চনা নিয়েই কাটাতেন। এখন ভিক্ষুণী ধম্মদিন্নার স্থলে ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা সোনকেশীকে উপদেশ বা ধর্মকথা শোনাতেন। তিনি প্রায়ই আসতেন বৃদ্ধা উপাসিকার কাছে ধর্মকথা শোনাতে। এমনি একদিন ধর্মকথা শুনে রাত্রে শোবার পর সকাল বেলায় সকলে দেখলে সোনকেশী আর ইহজগতে নেই। সকলে বললে শেঠানী ধর্মাত্মা, তাই কাউকে কষ্ট দেননি আর নিজেও কষ্ট পাননি। যে দিন থেকে শেঠানী এই ঘরে এসেছে সে দিন থেকে কালী ছায়ার মতো সোনকেশীর সঙ্গে সঙ্গে থাকত, তাই আর সকলের মতো সোনকেশীর বিয়োগ-ব্যথা অত সহজে সে গ্রহণ করতে পারল না। সারা পৃথিবী তার কাছে শূন্য হয়ে গেল। মহাশ্রেষ্ঠী অনেক সান্ত্বনা দিল কালীকে —কালীমা, আমিই তো তোর ছেলে, আমার একমাত্র অবলম্বন তো এখন তুই, মা।

কালী বোঝে যে, জিনদাস তার প্রাণের কথাই বলছে। এতদিন পর কালী মনে-প্রাণে অনুভব করে মাতৃস্নেহ এবং ভুলিয়ে রাখে জিনদাসকে। তবুও স্বামিনীর কথা সর্বদাই তার মনে হত। সে ভাবত, আমাকে ছাড়া পরলোকেও স্বামিনীর কত না কষ্ট হচ্ছে, অতএব যত তাড়াতাড়ি পারি আমাকেও যেতে হবে তাঁর কাছে। স্বামিনীর কাছ থেকে পাওয়া পয়সা বাঁচিয়ে কালী বহু টাকা জমিয়েছিল, পরে সেগুলি স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্তন করে রেখেছিল, কিন্তু এত অর্থ দিয়ে সে কি যে করবে ভেবে পায় না।

মহাশ্রেষ্ঠী জিনদাস মাতার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য বৌদ্ধবিহারে একটি প্রতিমাগৃহ তৈরী করে দিলেন। মথুরা থেকে আনা লাল পাথরের পুরুষ-প্রমাণ বুদ্ধদেবের মূর্তি তৈরী করালেন এবং প্রতিষ্ঠা করলেন মন্দির (দেবপুত্র কনিষ্কের আগে বুদ্ধদেবের কোনো মূর্তি তৈরী হয়নি)। মন্দির মায়ের নামে উৎসর্গ করলেন। কিন্তু কালী শ্রেষ্ঠীকে অনুরোধ জানাল, মায়ের একটা মূর্তি গড়িয়ে ঐ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে, সেই মূর্তি তৈরীর সমস্ত খরচ কালী নিজের সঞ্চয় থেকে দিল।

মহাশ্রেষ্ঠীর অর্থের অভাব ছিল না এবং এ ব্যাপারে ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। তবু কালীর মনরক্ষা করবার জন্যে তাও করলেন এবং মায়ের পাশে উপবিষ্টা মাতৃসমা কালীরও মূর্তি স্থাপিত করলেন মহাশ্রেষ্ঠী। নিজ চোখে সে দৃশ্য দেখে কালীর চোখে আনন্দের অশ্রু নামল —প্রাণ খুলে সে আশীর্বাদ করে মহাশ্রেষ্ঠীকে।

ইতিমধ্যেই উত্তর ভারতের যমুনার তীরবর্তী অঞ্চল থেকে শকরাজ্যের অবসান হয়েছে, কিন্তু পাঞ্জাব তখনও শকদের শাসনে। স্থানে স্থানে সামন্তরাজরা সম্রাটের মতো দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করছে। নগরীর সংখ্যাও বেড়েছে। শিংশপা ও কর্ণহটেরও প্রতিদ্বন্দ্বী শহর হয়েছে অনেক। মঙ্গই নদীর অপর কিনারে বাস করে যে-সব জাতি, তারা শিংশপার বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল সকলের মধ্যে। এতদিন পর্যন্ত কোনো বাইরের শত্রুর আক্রমণ সহ্য করতে হয়নি শিংশপাকে। অনেক পরে অবশ্য একবার দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ সময়ে শ্বেত-হূনদের আক্রমণে বিপন্ন হতে হয়েছিল শিংশপাবাসীদের।

শিংশপার শিল্পের কিছুটা অবনতি ঘটেছে ইতিমধ্যে; পরিবর্তনের লক্ষণও প্রকট। দেবপুত্রের সময়ে বৌদ্ধধর্মের মান বৃদ্ধি হয়েছিল বহুল পরিমাণে। তখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকগুলি সম্প্রদায় ছিল, তার মধ্যে বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং কর্মকাণ্ডের প্রচলন ছিল বেশী। কিন্তু এখন তাদের থেকে পাশুপত (শৈব) এবং বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রাধান্য। গুপ্তসম্রাট নিজেকে বৈষ্ণব বলে গর্ব অনুভব করতেন। কিন্তু পাশুপত ধর্ম এবং তার উদারতা জনগণকে আকৃষ্ট করল বেশী, তাই শিংশপায় ক্রমশ পাশুপত ধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করল।

শ্রীকর

কাল : ৪০০ খৃষ্টাব্দ

শিংশপায় এ সময় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনকাল। শিংশপা নগরীতে পাশুপত দেবালয় অনেকগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গইয়ের বাম তীরে বড় মেলা বসে এবং দূর দূর থেকে লোকজন এসে সেই মেলায় যোগদান করে। যদিও চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্রে তবুও মগধ, মল্ল, কাশী ও বৃজী প্রভৃতি প্রদেশ পাটলীপুত্রের শাসনাধীন ছিল। এই প্রদেশের লোকেরা চন্দ্রগুপ্তের খুব বিশ্বাসভাজন ছিল। পরমভট্টারক সমুদ্রগুপ্ত এবং চন্দ্রগুপ্ত আপন আপন শারদীয় যাত্রায় কতবার শিংশপা নগরীকে ধন্য করে গেছেন। চিত্রকলা, মূর্তিকলা, সঙ্গীত, নৃত্যকলার মধ্যাহ্নকাল বলা যায় এই সময়কে। শিল্পীর সম্মান তখন খুব বেশী এবং তাদের আদর ও চাহিদারও অন্ত ছিল না। আজকের শিংশপা বা কনৈলাকে দেখে অনুমান করাও শক্ত যে আজ থেকে মাত্র পনের শত বৎসর আগে এখানে শিল্প সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল।

শিবরাত্রির মেলায় মিষ্টি, বস্ত্র-ভূষণ, প্রসাধন দ্রব্যের হাজার হাজার বিপণীর ভীড় জমত কিন্তু তার মধ্যে সব চেয়ে আকর্ষক ছিল মাটির পুতুলের দোকানগুলি। মৃৎশিল্পী মাটির মূর্তিকে প্রাণবন্ত করে তুলত তাদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায়। বেশীরভাগ মূর্তি প্রস্তুত হত দেবদেবীর, তার মধ্যে বিভিন্ন মুদ্রায় হরগৌরীর মূর্তিই বেশী। এই হরগৌরীর মূর্তির চাহিদা ছিল প্রচুর। এ ছাড়া কার্তিক, গণপতি, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, নারায়ণ, বুদ্ধের নানা প্রকার মূর্তি পাওয়া যেত। সকালে হাজার হাজার পুতুল দিয়ে সাজানো দোকানের দিকে তাকালে অনুমান করা কঠিন হত যে, সন্ধ্যার মধ্যে এত পুতুলের দোকান সব খালি হয়ে যাবে। প্রত্যেক মা-বাবা তাদের ছেলেমেয়ের জন্যে বা ঘর-সাজাবার জন্যে একাধিক পুতুল কিনে নিয়ে যেত। এ মেলায় পণ্যদ্রব্যের বিপণী ছাড়া আরও অনেক আকর্ষণীয় মনোরঞ্জনের লোভনীয় ব্যবস্থা থাকত। কোথাও গ্রামীণ লোকেরা নানা রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নৃত্যগীত করছে, কোথাও কোথাও খেলাধূলার নানা আয়োজন।

সে বছর দৈব প্রসন্ন ছিল। ফসল ফলেছে আশাতীতভাবে, তাই কিষাণদের আনন্দের আর সীমা নেই। —কোথাও আখ-মাড়াই কলে আখের রস নিঙড়ানো হচ্ছে, তা দিয়ে কেউ তৈরী করছে গুড়, কেউ নিয়ে যাচ্ছে চিনি তৈরী করতে। সকল চাষীর হাতে অর্থও জমেছে প্রচুর। তামা-রূপার পয়সা এমন কি সোনার মুদ্রারও অভাব নেই। তাই কিষাণ মজুরের দল আনন্দে মেতে উঠেছে।

ছয়-সাত শতাব্দীতে শিংশপা চারকোণা সিক্কার সঙ্গে পরিচিত হয়। ঝড়ের বেগে যবন শাসক এল আর চলে গেল, কিন্তু চারকোণা সিক্কার চালু-ব্যবস্থা স্থায়ী করে গেল তারা। কিছুকাল পরেই আবার গোল মুদ্রার প্রচলন হল। চারকোণা সিক্কায় অক্ষর মুদ্রিত করবার

ব্যবস্থা ছিল না, শুধু ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক চিহ্ন অঙ্কিত থাকত। যবনেরা নিজেদের রাজাদের সুন্দর মূর্তি অঙ্কিত করবার ব্যবস্থা করল—তার সঙ্গে গ্রীক ও ব্রাহ্মী লিপিতে অক্ষর খোদাই থাকত। এই সিক্কার অনুকরণ করল শক রাজারা এবং গুপ্ত সম্রাটদের আমলেও সেই ধরনের মুদ্রার প্রচলন অব্যাহত রইল। গুপ্তযুগ ছিল শিল্পকলার উৎকর্ষের মধ্যাহ্নকাল। কিন্তু যবন শাসনকালে মুদ্রার ওপর যেমন সুন্দর কারুকার্য করা হত তার কাছে গুপ্তযুগের মুদ্রা অতি দরিদ্র।

অপরাহ্ণে ঈশ্বর অর্চনার পর শিংশপাপুরীর সামন্তরাজা সোনালি হাওদা-পরানো হাতীর পিঠে চেপে মেলা দেখতে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন রাণী, রাজকুমারী ও পরিচারিকা। রাজা স্বয়ং গজরাজের মাহুত, গজরাজই বলা হয় এ হাতীটাকে। অনেক যুদ্ধে অনেক কৃতিত্ব দেখিয়ে জয়লাভে সাহায্য করেছে সে—আকারে বিরাট একটা কালো পাহাড়ের মতো দেখতে। সাড়ে তিন হাত লম্বা, সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত দুটি সমানভাবে ওপরের দিকে বাঁকানো। তার ভারিক্কি চলন দেখতে রাস্তার দু'ধারে ভীড় জমে। শকদের আমলেই শিংশপার পুরনো সামন্তবংশ উচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নিজের সেনাপতিদের মধ্যে একজনকে মহারাজ উপাধি দিয়ে শিংশপার শাসনভার দিলেন। এই সেনাপতি সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ে সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের দৃঢ় স্তম্ভ হিসেবে মান্য হতেন এই সেনাপতি। একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন ইনি বৃদ্ধ বয়সে, সেই পুত্রই বর্তমান মহারাজ।

সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ, বড় বড় চোখ, পেশীবহুল হাত এবং লম্বা গুম্ফরাজি দেখে অনুমান করে নেওয়া কঠিন নয় যে, বাপের পরাক্রমের খানিকটা অংশ নিশ্চয় লাভ করেছেন ইনি। মণিখচিত স্বর্ণ মুকুটের পাশ দিয়ে লম্বা চুলের কিছুটা দৃষ্টিগোচর হয়, কানে কুণ্ডল, বুকে মুক্তা এবং আরও কত মণি-মাণিক্যের মালা। দুই পায়ে কামদার জুতায় নানাপ্রকার কারুকার্য করা, তার ওপর জরির পায়জামা। শক জাতি চলে গেছে কিন্তু তাদের পোশাক পরবর্তী রাজাদের বা সামন্তদের জন্যে কায়েম করে গেছে। বাঁদিকে সোনার খাপে বাঁকানো খড়্গ। গজরাজ এগিয়ে চলছে আর দু'দিকে প্রজারা কেউ নতমস্তকে, কেউ বা আভূমি নত হয়ে প্রণাম করছে। রাজা ও রাণী উভয়েই সুন্দর কিন্তু দশমবর্ষীয়া রাজকুমারী রূপে মাতা পিতাকে ছাড়িয়ে গেছে। গজরাজ পরমেশ্বর দেবালয় হয়ে মঙ্গইয়ের তীর ধরে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলে।

পরমেশ্বর মন্দিরের কাছে পাশুপত আশ্রম বিশেষ দর্শনীয়। ভিতরে সারি সারি নিবাসকক্ষ এবং তার সামনে বড় বড় আঙিনা। আঙিনার মাঝখানে প্রকাণ্ড কাঠের ধুনি জ্বলছে এবং তার চারদিক ঘিরে মৃগচর্মের ওপর বসে আছেন জটাজুটধারী পাশুপত সাধুরা। শীত এখনও শেষ হয়নি তবু জ্বলন্ত আগুনের কাছে শীতবোধ হয় না, অবশ্য এই তপস্বীদের

কাছে শীত, গ্রীষ্ম সবই সমান। সকলের গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর পরণে কৌপীন, মাথায় লম্বা পাকানো জটা, সর্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত। ভগবান ভূতনাথের মহোৎসব খুব জাঁকজমক সহকারে পালন করা হচ্ছে। অমৃতসম সুস্বাদু প্রসাদ বিতরণ করা হচ্ছে, সিদ্ধি-গাঁজাও ঢালাওভাবে বিতরণ করা হচ্ছে সমাগত দর্শনার্থীদের মধ্যে। সর্বস্বামীর ধুনীর কাছে অনেক সাধু ভীড় করে রয়েছে। প্রবীণ এই সর্বস্বামীর বয়স সত্তর বৎসর। বয়সানুযায়ী তাঁকে বৃদ্ধ মনে হয় বটে কিন্তু তাঁর দেহ সুগঠিত ও সুন্দর। তাঁর বাণীতে আরও বেশী তেজস্বিতা। বারাণসীর প্রসিদ্ধ এই সাধু নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন এখানে। সর্বস্বামীর গুণের কথা শিংশপাপুরীর সকলে জানে—এর মধ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার অতিরঞ্জিত কথাও প্রচলিত। প্রবাদ আছে, স্বামীজী ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক এবং কৈলাসেও অবাধে যাতায়াত করেন। ভোজনান্তে সিদ্ধির সরবৎ খেয়ে শিষ্যদের বাণী শোনাচ্ছেন। শিষ্যরাও তাঁর নিমীলিত নেত্রের দিকে তাকিয়ে পরম শ্রদ্ধাসহকারে বাণী শুনছে।

…তো হ্যাঁ, সেবার ঠিক শিবরাত্রির দিনে আমি কৈলাস পৌঁছালাম। তারপর ধর, চার প্রহর অখণ্ড জাগরণ করে কৈলাসপতির পূজা করলাম। কৈলাসের রূপ বর্ণনা আর কি করব, সেখানে স্বয়ং শঙ্কর বাস করেন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মা জগদম্বা শঙ্করের বামপার্শ্ব শোভা করে রয়েছেন। শঙ্করের জটা থেকে গঙ্গার ধারা ওপর দিকে উঠে পৃথিবীতে এসে পড়ছে। গণেশ ও কার্তিক দুই ভাই মাতাপিতার দুই পাশে শোভা করে আছেন। গৌরীবাহন সিংহ এবং শিববাহন বৃষ পাশাপাশি উপবিষ্ট। শঙ্করের চেলা-চামুণ্ডারা সকলে নানা প্রকার লীলা করে হরগৌরীকে আনন্দ দান করছেন।

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী আগ্রহভরে শুনছেন আর ভাবছেন—স্বামীজী যা বলছেন, নিশ্চয়ই তা তিনি নিজে চোখে দেখেছেন, কিন্তু আসলে এ সবই যে সিদ্ধির প্রভাব সে কথা একবারও কেউ ভাবেনি।

ইতিমধ্যে একজন সুন্দর তরুণ প্রশ্ন করে—স্বামীজী, কৈলাস যেতে খুব কষ্ট হয় না?

গম্ভীর স্বরে জবাব দেন স্বামীজী—বৎস, কষ্টের কথা আর না-ই বা শুনলে! তবে এই শরীরে কোনো কষ্টই অনুভব হয় না, কারণ আমি বাল্যকালেই এ দেহ ভব-ভবাণীর চরণে সমর্পণ করেছি। কৈলাস থেকেই গঙ্গা-ভাগীরথীর জন্ম এ সকলেই জানে, কিন্তু জানা আর চোখে দেখা তো এক কথা নয়। রাস্তা ভীষণ দুর্গম, কোথাও কোথাও পাহাড়ী রাস্তা ক্ষুরধার। দু'ধারে হাজার হাজার হাত গভীর খাদ, যদি এতটুকু পা পিছলে গেছে তা'হলেই ইহলীলা শেষ, হাড়গোড়েরও পাত্তা পাওয়া যাবে না কোনোদিন। কিন্তু সদাশিব ভক্তের জন্যেই হাত বাড়িয়ে আছেন। এই ভেবে ছাখো—একবার, হ্যাঁ যাওয়ার সময় আমি যতই ওপরে উঠছি ততই হিম বাড়তে লাগল, জলে হাত দিলেই হাত ছেড়ে যায়। অবশ্য পৌষ মাঘ মাসে এখানেও ঠাণ্ডা পড়ে কিন্তু সেখানে চৈত্র-বৈশাখ মাসে এর চেয়ে শতগুণ বেশী

ঠাণ্ডা। যেমন আমাদের এখানে গ্রীষ্মের লু হাওয়া ছাড়ে তেমনি সেখানে হিমের লু ছোটে। বরফের ওপর দিয়ে রাস্তা, মোটা চামড়ার জুতো ছাড়া সে রাস্তায় চলা যায় না। এখানে তো হিমালয় নেই যে কৈলাসের পাথর বা কন্‌কনে জমে-যাওয়া-ঠাণ্ডা তোমরা আন্দাজ করবে।

তরুণ যুবক আবার প্রশ্ন করে —শুনেছি সেখানে এমন এক নদী আছে যেখানে মানুষ পড়লে স্রেফ পাথর হয়ে যায়?

লম্বা দাড়িতে হাত বুলিয়ে স্বামীজী জবাব দেন —হ্যাঁ, তারই নাম হচ্ছে শিলাবতী গঙ্গা, কৈলাস থেকে আরও আগে। ভবানীপতির কৃপায় সেই পর্যন্ত মানুষ যেতে পারে।

সর্বস্বামী জীবনের বেশীরভাগ সময় দেশ পর্যটনে কাটিয়েছেন। পশ্চিম ভারত, পারস্য, বাহ্লীক, কম্বোজ এবং পূর্ব সাগরপারে বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন তিনি। তাই তাঁর পক্ষে অতিরঞ্জিত কথা বলায় বিশেষ বেগ পেতে হত না। তা'ছাড়া সে সময়কার লোকেরা এই রকম অতিরঞ্জিত কাহিনী শুনতেও ভালোবাসত।

২

মাত্র এক বৎসর আগে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের দেহাবসান হয়েছে। পাটলীপুত্রের সিংহাসনে তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য বসেছেন।

এই কয় বৎসরের মধ্যে শিংশপারও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এই বছরেই একজন নতুন সামন্তরাজ শিংশপার গদীতে বসেছেন। তিনি আগের সামন্তরাজের পুত্র নন—জামাতা। পূর্বতন সামন্তরাজের অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যার কথা আগেই বলেছি, যাঁকে দেখলে লোকে তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারত না তিনিই বর্তমান মহারাজের পত্নী।

*　*　*

শ্রীকর সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চিত্রাঙ্কন, মূর্তিশিল্প, সঙ্গীত, নৃত্যকলা প্রভৃতি সর্ব-বিদ্যাতেই অদ্ভুত পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। বীণাবাদনে তাঁর জোড়া মিলত না। চরিত্র ছিল অদ্ভুত ধরনের। শিংশপা নগর প্রান্তে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যে বিদ্যাভ্যাস কালে নগর উপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষালাভ করে তাঁর আদৌ তৃপ্তি হয়নি তাই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্যও বহুদিন ঘুরলেন নানা দেশে নানা গুরুর সন্ধানে। শিখলেন বহু রকম বিদ্যা। মথুরা, উজ্জয়িনী, কাঞ্চী, সিংহল প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিখ্যাত বিখ্যাত সমৃদ্ধ নগরীতে তিনি পর্যটন করে বেড়িয়েছেন।

শিবরাত্রির মেলায় ইনিই সর্বস্বামীর নিকট দেশভ্রমণের ও নানা তীর্থের সংবাদ শুনে অনেক জ্ঞান লাভ করেন। কৈলাস যাত্রার কথা শুনে তিনি কনখল ও হরিদ্বারের পথে দুর্গম কৈলাস যাত্রা করলেন। খড়্গের ধারের মতো ধারালো রাস্তা তিনি দেখলেন না বটে কিন্তু কৈলাসের হিমবহুল দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা তিনি দেখলেন এবং পথের দুর্গমতা অনুভব

করলেন। কৈলাসে তিনি দেখলেন কিরাতদের বাসস্থান, কিন্তু শঙ্করপার্বতীর বাসস্থানের কোনো চিহ্নই নজরে পড়ল না। পুরো একটা শীত ঘুরে বেড়ালেন শঙ্করপার্বতীর বাসস্থানের সন্ধানে কিন্তু কোথাও কিছু না দেখে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে হরগৌরীর দর্শনেচ্ছা ত্যাগ করে ফিরে আসেন।

ছয়-সাত বৎসর পর ফিরে এলেন নিজ জন্মভূমিতে। শ্রীকরের যদিও শিংশপায় থাকার ইচ্ছা ছিল না তবুও মা ও মাতৃভূমি দর্শনের প্রবল ইচ্ছাই তাঁকে টেনে নিয়ে আসে। এখানে এসে বন্ধু ও মিত্রজনের অনুরোধে অর্জিত তাবৎ কলাবিদ্যা প্রদর্শন করেন। অল্প দিনেই শিংশপা নগরীতে তাঁর গুণের কথা প্রচারিত হয়ে গেল। রাজদরবারে তাঁর গুণের কদর বাড়ল। কিন্তু তিনি সেখান থেকে ছুটি নিয়ে চলে যেতে চাইলে তাঁর সে অভিলাষে বাদ সাধল রাজ-ইচ্ছা। মহারাজ এমন গুণীকে রাজ্যের বাইরে রাখার অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং রাজকন্যা স্বয়ং শ্রীকরের নিকট সঙ্গীত শিক্ষার জন্য পিতাকে পীড়াপীড়ি করায় তিনি শিংশপাতে থাকতে বাধ্য হলেন।

ইতিহাসে দেখা যাবে এমন অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটেছে অনেক। তবুও মানুষ বিপদের ঝুঁকি নিতে পিছপাও হয়নি। শ্রীকর শুধু অসাধারণ শিল্পীই ছিলেন না—বয়সে তরুণ, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান আর রাজকুমারী ষোড়শী তরুণী। সঙ্গীতকলা যত তাড়াতাড়ি কাম বাসনাকে উত্তেজিত করে তেমন আর কোনো শিল্পই নয়। মহারাজও এ সম্বন্ধে ভেবেছেন। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে এটাও ভাবতেন যে, নির্ধন-কুলজাত শ্রীকর রাজকন্যাকে লোভের দৃষ্টিতে দেখতে সাহসী হবে না।

প্রথমে শ্রীকর আনমনাভাবে রাজকুমারীকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজকন্যাও একেবারে সঙ্গীতের সা-রে-গা-মা শিখছেন না। গীত, বাদ্য ও নৃত্যবিদ্যায় তিনি যথেষ্ট অধিকার অর্জন করেছেন ইতিপূর্বে। রাজকুমারী অনোমার কণ্ঠ সুমধুর ছিল, যার জন্যে তিনি শ্রীকরের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। শিষ্যার এত তাড়াতাড়ি উন্নতি দেখে শ্রীকরও মনোযোগ দিলেন নিত্য-নতুন শিক্ষা উজাড় করে দিতে। প্রথমে শিষ্যাকে তিনি বাৎসল্যভাবে দেখতে লাগলেন। অন্য প্রকার মনোভাব তখন কারো মনে উদয় হয়নি। শ্রীকর শুধু ভাবতেন—অনোমা যদি শিষ্যা না হয়ে শিষ্য হত! কিন্তু সত্যই যদি অনোমা শিষ্য হত, তা'হলে তার ওপর শ্রীকরের বাৎসল্যভাবই চিরকাল বজায় থাকত। স্বভাবের নিয়মে স্ত্রীপুরুষ, আগুন আর ঘি। অত্যন্ত নিকটে গেলে জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে তাদের নিরস্ত করা অসম্ভব।

দুই বৎসর খুব মনোযোগ সহকারে সঙ্গীত-শিক্ষা চলল, ইতিমধ্যে উভয়ের হৃদয় ভিন্ন পথে চালিত হয়েছে। সঙ্গীতে যেন আর পূর্বেকার মতো আগ্রহ নেই তবুও একের হৃদয় অন্যের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। শিক্ষার সময় দু-তিন ঘণ্টার বেশী ছিল না। এই সময় হয়

রাণী নতুবা দু-চার জন পরিচারিকা উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু সঙ্গীতের ভাষা এমনই যে, যে-কোনো লোকের সামনে সে ভাষায় মনের কথা আদান-প্রদান করা চলে।

অনোমার দ্রুত প্রগতি দেখে মাতাপিতার আনন্দের সীমা থাকে না। তাঁদের একমাত্র সন্তান, তাঁরা ভাবতেন তাঁদের সর্বগুণ-সম্পন্ন কন্যাকে কোনো পরমভট্টারক বংশজাত পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে নিজ সিংহাসন প্রদান করবেন। অনোমা নৃত্য ও সঙ্গীত কলায় সত্যিকার পারদর্শিণী হয়েছেন এবং রূপের তো কথাই নেই, অতএব কোনো উৎসব উপলক্ষে তাঁকে সঙ্গে করে পাটলীপুত্রে নিয়ে যেতে পারলে সুন্দর রাজপুত্রের অভাব হবে না।

রাজকুমারী অনোমা রাজপ্রাসাদের মধ্যেই বদ্ধ থাকতেন না, সময় সময় যাত্রা-উৎসব, বনভোজন, জলক্রীড়া করতেন এবং সেই সময় শ্রীকরও থাকতেন তাঁদের সঙ্গে।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে মঙ্গইয়ের দু-কূল যখন জলে পরিপূর্ণ থাকত তখন প্রায়ই রাজকুমারী নিজ পরিবারের লোকের সঙ্গে আচার্যকে নিয়ে জলবিহার করতেন। পূর্ণিমার রাত্রে নৌকার ওপর রাজকুমারীর সুমধুর কণ্ঠের সুর গুঞ্জন করে উঠত। দূর থেকে মনে হত কোনো অপ্সরালোক থেকে ভেসে আসছে এই সুর।

যদিও মঙ্গইয়ের দুই তীরে ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম তবুও উত্তর দক্ষিণে কিছুদূর এগিয়ে গেলে ঘন জঙ্গল। সেখানে চিতা, বাঘ ও অন্যান্য বন্য জন্তু দেখা যেত। মৃগয়া যুদ্ধেরই এক ছোট সংস্করণ। সে সময়কার সকল সামন্ত রাজাই মৃগয়া করতে ভালোবাসতেন। অনোমার পিতাকে যুদ্ধ করতে হয়নি বটে তবে তিনি পিতার অযোগ্য পুত্র ছিলেন না। শিকার-যাত্রায় নিজের একমাত্র সন্তান অনোমাকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন।

শ্রীকর স্বভাবতই কোমল হৃদয়ের মানুষ। নিজের সখ মেটাতে অপরের প্রাণহরণ তাঁর অসহ্য মনে হত। প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় তিনি বিহারে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করতেন এবং সকলকে উপদেশ দিতেন প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু শিষ্যার অনুরোধে নিজে এই মৃগয়া দর্শনে না গিয়ে পারতেন না। বনভোজনে শ্রীকরের সব চেয়ে বেশী উৎসাহ। কারণ এতে শুধু পানাহারেরই উত্তম ব্যবস্থা থাকত না, নিজ শিষ্যার নৃত্যগীত পরিবেষণের সুযোগও তিনি পেতেন।

শ্রীকর জানতেন যে, রাজকুমারীর শিক্ষা শেষ হয়েছে। কিন্তু উভয়ের কেউই পিতা-মাতাকে এ কথা জানতে দিতেন না। কারণ তা'হলে একজনকে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে —যেটা কেউই চান না। আর পিতামাতাও অনোমার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এই শিক্ষা থেকে মেয়েকে বিযুক্ত করতে চান না।

চার বৎসর বাদে, দু-একজন রাজকুমার অনোমাকে দেখে যেতে লাগলেন। অনোমার পিতামাতাও চিন্তা করছেন এদের মধ্যে কোন রাজকুমারকে জামাতা করবেন। এদিকে তরুণ গুরু এবং শিষ্যা প্রাণের বাজী রেখে চলতে সুরু করেছেন। কখনো কখনো দু-একজন

পরিচারিকার সামনে পড়েছেন —তারাও সাধ্যমতো সাবধান করেছে, কিন্তু দু'জনে আর কোনো বাধাই মানতে রাজী নয়।

একদিন বীণা-বাদনের সময় রাণী ঘরে গিয়ে দেখলেন, একে অপরের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন। রাণী বুঝলেন সব। তিনি কঠিন স্বরে আদেশ করলেন, আজ থেকে আর কিছু শেখবার দরকার নেই অতএব আচার্যের ছুটি। অনোমা ও শ্রীকর আকাশ থেকে পড়লেন।

আর কিছুদিন পর অনোমার বিবাহ হবে, সে যদিও বাপের বাড়িতেই থাকবে কিন্তু সে অপরের হয়ে যাবে। উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হল বটে কিন্তু পত্রের সাহায্যে মনের কথা বিনিময় হতে লাগল। অবশেষে স্থির হল, ওঁরা দু'জনে পালিয়ে যাবেন রাজ্য ছেড়ে বহুদূরে। একদিন সময়মতো দু'জনে বেরিয়ে পড়লেন অজানার উদ্দেশে, প্রেমকে সার্থক করার আশা বুকে নিয়ে। অনোমা পুরুষের বেশ ধারণ করলেন। ঘোড়ায় চেপে দ্রুত গেলে লোকের সন্দেহ হতে পারে এই ভয়ে রাত্রে সুরু হল পথ চলা আর দিনে কোনো গ্রামের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বিশ্রাম করা ও লুকিয়ে থাকা। দু-তিন দিন পথ চলায় আনোমার পা জখম হল তবু হাঁটা বন্ধ হল না, চলতে থাকলেন প্রেমিকযুগল বিপদসঙ্কুল অজানা পথে।

এদিকে শিংশপা থেকে দিকে দিকে ঘোড়সওয়ার ছুটল দু'জনের সন্ধানে। কয়েকদিনের মধ্যেই ধরা পড়লেন অনোমা আর শ্রীকর। ওঁরা বন্দী হয়ে এলেন শিংশপায়।

সামন্তরাজের মাথায় রক্ত উঠেছে অপরাধীকে শাস্তি দেবার জন্যে। শ্রীকর ছোটখাটো অপরাধ করেননি, তবু সামন্তরাজ চিন্তা করতে সময় নিলেন। শ্রীকর বন্দী হয়ে রইলেন কারাগারে। অনোমার আহারনিদ্রা শেষ হয়ে গেছে। কি উপায়ে শ্রীকরকে বাঁচানো যায় তাই শুধু ভাবেন আর কাঁদেন। বাবার কাছে শ্রীকরের প্রাণভিক্ষা চেয়ে কোনো লাভ নেই। আর অনোমার মা শ্রীকরের প্রাণদণ্ডের আদেশের অপেক্ষায় উপবাসী হয়ে রইলেন।

নিজ গুণে শ্রীকর দেশবাসীর সব চেয়ে প্রিয়পাত্র ছিলেন। শ্রীকরের মতো গুণী শিংশপায় আর একজনও নেই। এই তরুণের কাছে অনেক প্রত্যাশা। সত্যিই যদি তাঁর প্রাণদণ্ড হয় তা'হলে দেশের ক্ষতি —তাই শিংশপাবাসীরা সকলে মিলে শ্রীকরের প্রাণভিক্ষা চাইল।

রাজপরিবারের মর্যাদাহানির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন শ্রীকর। সামন্তরাজ নিজেও সঙ্গীতপিপাসু ছিলেন, তিনিও অনুভব করলেন শ্রীকরের জীবনের মূল্য। অবশেষে বিচারের দিন এল। দেশবাসী উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করতে লাগল বিচারের ফলা-ফলের জন্যে। সামন্তরাজ বিচার করলেন —আচার্য শ্রীকর যে চোখের দৃষ্টিতে

রাজকন্যা অনোমার দিকে তাকিয়েছেন সে চোখ নিয়ে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। অতএব শ্রীকরকে চক্ষুহীন করে মুক্তি দেওয়া হল।

এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো ছিল শ্রীকরের কারণ এ জীবনে তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে দেখতে পাবেন না কোনোদিন।

দেশবাসী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল আর ভাবল—যাক শ্রীকরের শুধু চোখই গেল কিন্তু শিল্পী শ্রীকর তো বেঁচে রইলেন। দৃষ্টিহীন শিল্পী শ্রীকরের গুণের সমাদর পরে হল বটে, কিন্তু হৃদয়ের ব্যথা কোনো কিছুতেই মিটল না। তবু অন্তরের আবেগটা প্রকাশ করার একটা সুযোগ খোঁজেন তিনি।

গুপ্তবংশের সকলেই কলাপ্রেমী, সমুদ্রগুপ্ত অদ্বিতীয় বীণাবাদক ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত কালিদাসের মতো মহান্ ব্যক্তির সাহচর্য পেয়েছিলেন। তাঁর অগ্রজ রামগুপ্ত নিজের পাটরাণীকে শক রাজাকে ভোগ করতে দিতে স্বীকৃত হয়ে বংশের নামে কলঙ্ক লেপন করেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত ছদ্মবেশে শক রাজার শিবিরে গিয়ে তাকে হত্যা করে বংশের মর্যাদা রক্ষা করেন। পুরাণে এই কাহিনী অবলম্বন করে নানা ধরনের রূপক, গাথা রচিত হয়েছে। বিশেষ করে বরাহ দ্বারা পৃথিবী উদ্ধারের যে গল্প মূর্তিশিল্পে রূপায়িত করার নিদর্শন আছে সেটা এই কাহিনীরই সূত্রে সম্পর্কিত। এর দু-একটা নমুনা আজ পর্যন্ত বিদিশার পর্বতগুহায় দেখতে পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত পিতা ও পিতামহের মতোই গুণী ও শিল্পরসিক ছিলেন। খুঁজে খুঁজে গুণী শিল্পীদের এনে আশ্রয় দিতেন তিনি।

দৃষ্টিহীন শ্রীকর শিংশপা ত্যাগ করে চলে গেলেন। শিল্পীর কদর তখন দেশের ঘরে ঘরে, তাই শ্রীকরকে ভিক্ষা করতে হল না পেটের জন্যে। লোকে স্বেচ্ছায় তাঁকে আদর করে ঘরে নিয়ে যেত। কিন্তু শ্রীকরের ইচ্ছা দেশ ছেড়ে চলে যাবেন—যেখানে প্রিয়তমা অনোমাকে নিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প করেছিলেন। কিন্তু হায়, যাওয়ার জন্যে পা প্রস্তুত থাকলেও চক্ষু অক্ষম।

৩

বিদিশার রাজকুমারের সঙ্গে অনোমার বিবাহ হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছার ধার ধারেননি পিতামাতা। বিদিশার রাজকুমার শিংশপাতেই থেকে গেলেন। কিন্তু শিংশপায় থাকতে মন চায় না অনোমার, এখানকার প্রত্যেকটি জিনিস সর্বদা শ্রীকরের স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়। পতি অথবা পিতামাতাকে খুশী করার জন্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তিনি হাসিখুশী থাকার চেষ্টা করতেন কিন্তু হৃদয়ে সর্বদা শ্রীকরের বিচ্ছেদের আগুন জ্বলত। সব সময় অনোমা ভাবতেন—আমারই জন্যে আজ আমার প্রিয়তমের এই অবস্থা। চক্ষুহীন অবস্থায় আজ কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন শ্রীকর! তাঁর চোখ যদি অপরাধী

হয় তবে আমারও তো চোখ সেই একই অপরাধ করেছে! তা'হলে আমারও চোখ রাখবার অধিকার নেই।

অনোমা নিজের চোখ নষ্ট করতে পারতেন কিন্তু জীবনে আর একবার তাঁর প্রিয়তমকে দেখবার আশায় দিন গুণতে থাকেন। রোজ সকালে এই আশা নিয়েই অনোমা ঘুম থেকে উঠতেন যে, আজ বোধহয় তাঁর প্রিয়তমকে দেখতে পাবেন। তা যদি নাও পান তবে তাঁর কোনো সংবাদ নিশ্চয়ই পাবেন। কিন্তু হায়, জীবনে সে সৌভাগ্য তাঁর আর হয়নি।

শ্রীকর নিজের নাম বদল করে সুকণ্ঠ রেখেছিলেন। এখন তিনি পাটলীপুত্রে আচার্য সুকণ্ঠ নামে পরিচিত। জন্মভূমি ত্যাগ করে পশ্চিমের দিকে এগোতে এগোতে চার বছর বাদে তিনি মথুরায় পৌছান। সেখানকার সামন্তরাজ তাঁর গুণের পরীক্ষা দেবার জন্তে তাঁকে কুমারগুপ্তের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। পাটলীপুত্রে আচার্য সুকণ্ঠের গৃহ সুখ ও বৈভবে পূর্ণ। চাকর-বাকরের অভাব ছিল না আচার্যের। মুগ্ধ হয়ে কত কুলাঙ্গনা নিজেকে নিবেদন করতে চেয়েছে, কিন্তু আচার্যের হৃদয়ে অনোমা ভিন্ন আর কারো স্থান হওয়া অসম্ভব।

বিশেষ অনুষ্ঠানে ও অবসরে আচার্যের ডাক পড়ত রাজদরবারে। তখন তিনি নিজে এবং তাঁর শিষ্য-শিষ্যার দ্বারা সঙ্গীত পরিবেষণ করাতেন। বাকি সময় কাটত সঙ্গীত-শিক্ষা দিয়ে। তাঁর ঘর শুধু ঘর নয়, সঙ্গীত ভবন বললেও অত্যুক্তি হয় না। রাজধানী থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে আসত শিক্ষাগ্রহণ করতে। তাদের নিয়ে আচার্যের সময়টা বেশ কেটে যেত। রাতেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গীত শিক্ষা দিতে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন —সর্বদাই অন্ধকার। শ্রীকর ভাবতেন সব সময়ই চলুক এই সঙ্গীতের রেশ! কিন্তু তা তো হয় না। তাই যতক্ষণ চুপ করে থাকতে হত ততক্ষণই পূর্বস্মৃতি তাঁর দু'চোখ ভাসিয়ে দিত অশ্রুজলে। অনোমার সংবাদ পাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না, তবু বুকভরা হতাশার মধ্যেও ক্ষীণ একটা দুরাশা —হয়ত কোনো দিন কেউ তাঁকে এসে জানাবে তাঁর প্রিয়তমা অনোমার সংবাদ! কালচক্র কারও জন্যে অপেক্ষা করে না। সময়ের চাকা ঘুরতে থাকে। আচার্যের জীবনের কত বৎসর কেটে গেছে এমনি করে।

কুমারগুপ্ত পিতার অযোগ্য পুত্র ছিলেন না। তবুও রাজলক্ষ্মীকে সুরক্ষিত রাখার জন্ত যে শক্তির দরকার তা তাঁর একটু কমই ছিল। সেই স্বল্পতা তাঁকে টেনে নিয়ে এল সঙ্গীত ও কলার দিকে। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে পাটলীপুত্র যতখানি সঙ্গীতকলায় সমৃদ্ধশালী হয়েছিল, ততখানি আর কখনও হয়নি। আচার্য সুকণ্ঠও সাধারণ সঙ্গীতাচার্য ছিলেন না —তাঁর সঙ্গীতে এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ভগবান শঙ্করকে পাওয়ার জন্ত গৌরীর

তপশ্চর্যার সঙ্গীত তিনি তন্ময় হয়ে গাইতেন। সঙ্গীতের স্বরলোকে বিচরণে বিভোর সুকণ্ঠের হৃদয়ে তখন আর কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ববোধ থাকত না। তাঁর গানের মধ্যে পার্বতী ও শঙ্করের মিলন হত কিন্তু নিজের হৃদয়ের আগুন নিভত না বরং জ্বলত দ্বিগুণ হয়ে। তিনি গাইতেন আর শ্রোতারা অশ্রু বিগলিত হতেন।

শ্রীকর ছিলেন ভগবান বুদ্ধের ভক্ত, কিন্তু তিনি আচার্য সুকণ্ঠে পরিবর্তিত হয়ে হরগৌরীর ভক্ত হলেন। এতে তিনি অধিক তৃপ্তি পেতেন। অবশ্য বুদ্ধদেবেরও শান্ত ব্যক্তিত্বে অশান্ত হৃদয়কে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু চক্ষুহীন আচার্য সুকণ্ঠর কাছে সব কিছুই বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হত, তাই তিনি হরগৌরীর আশ্রয় নিলেন এবং সান্ত্বনা পেলেন।

মুসলিম বিজয়
কাল : ১২১০ খৃষ্টাব্দ

সময় আসে, সময় যায়, অবশিষ্ট থাকে শুধু স্মৃতিটুকু তার। পরবর্তী যুগে কিছু সত্য কিছু কল্পনা দিয়ে তাকে তৈরী করে মানুষ। নিজের ও অপরের কাছে বাহবা নেয় ও মনস্তুষ্টি করে। এমনি এক প্রবাদ শোনা যায় রাজা ভোজের সিংহাসন নিয়ে। প্রবাদ আছে, ভোজরাজা গত হবার বহুদিন পর কোনো এক মাঠে কিষাণ বালকেরা খেলা করত, তারা নিজেদের মধ্যে রাজদরবারের অনুষ্ঠান করে কেউ রাজা হত, কেউ বা মন্ত্রী, আর কেউ অপরাধী সাজত।

যেখানটায় খেলার রাজা বসে বিচারের অভিনয় করত, সেইখানে অনেকটা মাটির নীচে ভোজরাজার ঐ সিংহাসন আবিষ্কৃত হয়। বত্রিশটি পুতুলের ওপর এই সিংহাসন তৈরী ছিল। ভোজরাজার পর কোনো এক অযোগ্য রাজা ঐ সিংহাসনে বসতে গেলে উক্ত বত্রিশটি পুতুল এক এক করে উঠে ভোজরাজার এক একটি গুণের কাহিনী শোনায় এবং সেই রাজার সিংহাসনে বসার অযোগ্যতার ইঙ্গিত করে। এই কাহিনী অতিশয় মনোরঞ্জক সন্দেহ নেই কিন্তু এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতখানি, তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

আমার পৈতৃক গ্রাম কনৈলা, জিলা আজমগড়। সরকারী কাগজপত্রে কনৈলাকে কর্ণহট বলে লেখা হয়। হয়ত অন্য কোনো গ্রাম থেকে একে আলাদা করার জন্যে কনৈলার সঙ্গে কর্ণহট কথাটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিংবা এমনও হতে পারে যে কর্ণহটই পুরনো নাম, সেখানে কনৈল ফুলের জঙ্গল ছিল বলে কনৈলা কথাটা যুক্ত হয়েছে। এরই পাশে রয়েছে নরহতা গ্রাম। এও হয়ত কর্ণহটের মতোই এক সময়ে নরহট বলে পরিচিত

ছিল। হাটবাজার থেকেও এমন ধরনের শব্দের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। বর্তমানে অবশ্য হাট বা বাজার থেকে এই দুই গ্রামের দূরত্ব প্রায় আট-নয় মাইল। অধুনা কনৈলার একদিক দিয়ে পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে যাত্রীবাহী বাস চলছে। যাওয়া-আসারও কোনো কষ্ট নেই এখন। কনৈলায় পাওয়া পুরনো যুগের জিনিস-পত্র দিয়েই কনৈলার প্রাচীন অস্তিত্বের প্রমাণ। মৌর্যযুগের ইঁট পাওয়া যায় যেখানে, সেখানে কনৈলার মাটির নীচে ডীহ্ বাবার স্থানে বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের মহাকালের মূর্তি এখনও পূজা হয়। এটা আন্দাজ দশম-একাদশ শতাব্দীর। এই ডীহ বাবার থানের কাছে লম্বা-চওড়া একটা উঁচু জায়গাকে এখনও কোট বলা হয়, সেখানে সৈয়দবাবার কবর আছে। যতদূর জানা যায় এই সৈয়দ-বাবা ইসলাম যুগের প্রারম্ভিক কালে কোনো এক তুর্কী সেনাপতি ছিলেন।

এখান থেকে বারাণসী মাত্র বিশ ক্রোশ দূরে। পাশেই মঙ্গই নদীর আশপাশে মাইলের পর মাইল শিংশপার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় যা প্রমাণ করে যে, মুসলিম যুগেও এই স্থানের প্রাধান্য ছিল। হয়ত কোনো এক সময় এর অবনতি কিছু হয়েছিল এবং সেই সময় তুর্কীরা আক্রমণ ও লুটপাট করে, এবং সকল বৈভব-সম্পন্ন মানুষকে হত্যা করে। এই সৈয়দবাবার সময়কার কিছু মুসলমান কারিগরদের বংশধর এখনও আছে।

এ সময়কার প্রথমদিকে গুলাম-খলজী-তুঘলকের সময়ে (খৃঃ. ১১৯৪-১২৫১) শাসন-কর্তাদের মধ্যে অর্থাৎ বড় বড় অফিসার পদে তুর্কী ছাড়াও আসল বা নকল সৈয়দ মুসল-মানেরা বহাল হয়েছিল। সৈয়দ মসউদ সালার গাজী নামক তুর্কী সেনাপতির কথা আমি জানি। কনৈলাতেও এমন এক সৈয়দ মুসলিম শাসক ছিল। শত শত বৎসর পরে এখনও তার বা তাদের বংশধরদের অত্যাচারের কাহিনী প্রচলিত আছে।

কর্ণহট শিংশপা শহরের উপনগরী ছিল, সেখানে কোনো পুরনো শাসকের নামানুসারে হট বা হাট ছিল। শুধু তাই নয়, এখানে রাজা লক্ষ্মণদেবেরও এক ছোট মহাল ছিল। এক প্রান্তে অবস্থিত এবং চারিদিকের রমণীয় সৌন্দর্যের জন্যে এই মহাল কখনো খালি থাকত না, এক সময়ে এখানে রাজকীয় কোলাহল ছিল, কিন্তু আজ সেখানে আর সেই মুখরতা নেই।

* * *

এই মহালের পূর্বদিকের পুকুর পাড়ে এক গাছতলায় ভিক্ষু তথাগতশ্রী এবং পণ্ডিত মাধবের মধ্যে আলোচনা চলছিল। এই কথোপকথন থেকেই সে সময়ের অবস্থা আন্দাজ করে নেওয়া যায়। ভিক্ষু তথাগতশ্রীর বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে কিন্তু সুন্দর স্বাস্থ্যের জন্য ত্রিশের বেশী মনে হয় না। শরীরের তাম্রবর্ণের সঙ্গে গায়ে-জড়ানো চাদরটার রঙের মিল রয়েছে। সৌম্য চেহারা, চোখের জ্যোতি দেখলেই বোঝা যায় ইনি মেধাবী পুরুষ। এই আলাপের সময় প্রয়োজনের চেয়েও বেশী গম্ভীরভাবে তিনি বসেছেন।

মাধব পণ্ডিত তথাগতশ্রীর চেয়ে বয়সে দু-চার বছরের ছোট হবেন কিন্তু তাঁকে দেখলে বয়সের চেয়েও বেশী বৃদ্ধ বলে মনে হয়। মাথার চুলও সব সাদা, ঢিলেভাবে ধুতি পরা ও সাদা চাদর গায়ে জড়ানো। মাথায় লম্বা শিখা —পেছনের দিকে বাঁধা।

দু'জনে এক ধর্মাবলম্বী নন, তবুও দু'জনের সংস্কৃতি এক হওয়ায়, মতভেদ বিশেষ নেই। বারাণসীতে বহুদিন দু'জনে একই গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সে জন্যে দু'জনের মধ্যে একটা আত্মীয়তার ভাব। কিন্তু আজ দু'জনেই সমান চিন্তিত।

মাধব পণ্ডিত বললেন —ভন্তে তথাগত! আমিও জ্যোতিষশাস্ত্র পড়েছি। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণীতে আমায় যেমন বিশ্বাস হয় না তেমনি এও বিশ্বাস করি না যে, পুরাণে আমাদের দেশে ম্লেচ্ছরাজ্য কায়েম হওয়া বিষয়ে যে সমস্ত কথা লেখা আছে সেগুলো সত্যি! আমি তো এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমাদের দেশ এত সহজে পরাজয় স্বীকার করল কি করে! এত বড় দেশ, যেখানে কোটি কোটি লোক বাস করে, বীরত্বে যাদের তুলনা হয় না, সেখানে কি করে বহিরাগত কয়েক দল তুর্কী সৈন্য এসে দেশের ধনসম্পত্তি লুট, নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ করে বিজয়ীর মতো বারাণসী পর্যন্ত অনায়াসে দখল করে নিতে পারে?

তথাগত জবাব দিলেন —ভাই, এতে আশ্চর্যের কি আছে। নিজের চোখে যা কিছু ঘটছে দেখতে পাচ্ছি, তাতে আশ্চর্য হবার কি থাকতে পারে? তুর্কীরা অজেয়। তারা কনৌজ জয় করেছে, সিন্ধু জয় করেছে, দিল্লীতে নিজেদের রাজধানী করেছে, বারাণসীকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গঙ্গার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগের অধিকাংশ অঞ্চলই তারা জয় করেছে। নালন্দার দেবালয় ও পুস্তকালয় পুড়িয়ে ছাই করেছে এবং ধ্বংস করেছে সব কিছু। কোথায় তাদের মূল ভূমি কাবুল থেকেও পশ্চিমে, আর কোথায় বারাণসী-নালন্দা —একবার ভাবো তো!

মাধব —আমি বুঝতে পারি না —আমাদের দেশের এত বড় শক্তি কি করে পরাজিত হচ্ছে একের পর এক!

তথাগত —ভাই মাধবপণ্ডিত, এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। এই তোমার ও আমার কথা দিয়েই সারা দেশটাকে একবার বিচার করে দেখ, অতি সহজে জবাব পাবে। এখানে মহারাজ লক্ষ্মণদেবের মঙ্গল কামনায় আমরা পুরশ্চরণ করছি (পুরশ্চরণ, অর্থাৎ কোনো অভীষ্ট কার্যসিদ্ধির জন্য নিয়মানুসারে মন্ত্রোচ্চারণ বা জপ করা)। তারা কিম্বা মহাকালের আরাধনা করছি। অন্য দিকে তুমিও সিংহবাহিনী দেবীর আরাধনা করছ কঠোরভাবে। কিন্তু ঘটে-যাওয়া ঘটনাগুলির দিকে চেয়ে দেখ। এই 'তারা' ও 'সিংহবাহিনীর' কারও এতটুকু শক্তি নেই যে আমাদের আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে। যদি সত্যিই এদের কোনো শক্তি থাকত তা'হলে বিধর্মীর হাত থেকে আমাদের বারাণসী, নালন্দা ও

অন্যান্য বহু পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কি রক্ষা পেত না ? এমনি করে সে সব জায়গা আগুনে কি ভস্ম হত কিম্বা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হত ?

মাধব —আপনার সঙ্গে আমি সর্বদাই একমত তথাগত।

মাথা নেড়ে বললেন তথাগত —তা'হলেই আমাদের মানতে হবে যে, সিন্ধু থেকে সোনভদ্র পর্যন্ত আমাদের দেশে বীরের বদলে মেষ বাস করছে ! যারা সামান্য একমুষ্টি তুর্কী সৈন্যের সামনে মরতে অথবা প্রাণ নিয়ে পালাতেই পারে। তা'ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। অবশ্য এটাও ঠিক আমাদের দেশবাসী মেষ ছিল না, তাদের মেষবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করা হয়েছে। আমি তো অন্যান্য দেশেও গিয়েছি—সেখানে দেখেছি, শত্রুর আক্রমণের সময়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ-বনিতা অস্ত্রধারণ করে শত্রুর বিরুদ্ধে। কিন্তু আমাদের দেশে সে নিয়ম কোথায় ?

মাধব —আজ্ঞে না, আমাদের দেশে একমাত্র ক্ষত্রিয়গণই অস্ত্রধারণ করবার অধিকারী।

তথাগত —হ্যাঁ, কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়গণ ! ক্ষত্রিয় নারী পর্যন্ত নয়। ক্ষত্রিয়াণীদের সতীত্ব রক্ষা করবার জন্য শুধু আগুনে পুড়ে মরবার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ক্ষমা কর ভাই, তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে দু-একটা কড়া মন্তব্য প্রয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছি।

মাধব —ক্ষমার প্রশ্নই ওঠে না তথাগত, যা সত্য তা নিত্য। আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।

তথাগত —আমাদের দেশবাসীর প্রতি ত্রিশজনের মধ্যে একজনের বেশী ক্ষত্রিয় নয় এ কথা কি ঠিক ?

মাধব —ঠিক।

তথাগত —এই একজনের অর্ধেক ক্ষত্রিয়াণী, তারা শুধু আগুনে পুড়ে মরবার শিক্ষা পেয়েছে ! অর্থাৎ প্রতি ষাট জনের মধ্যে মাত্র একজন অস্ত্র ধারণের অধিকারী হিসাবে ক্ষত্রিয়ের সন্ধান মেলে। এর থেকে যদি বৃদ্ধ ও নাবালকদের বাদ দেওয়া যায়, তা'হলে দেখা যাবে সমস্ত জনপদের মধ্যে শতকরা মাত্র একজন ক্ষত্রিয় পাওয়া যাবে। তা'হলেই দেখ বাকি নিরানব্বই জন মেষ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। নিরানব্বই জন লোক, মাত্র একজনের ওপর নির্ভর করে আছে, তাদের শক্তি থাকলেও অস্ত্রধারণ করবার অধিকার নেই। কিন্তু এই মেষদের কোনো একজন যদি তুর্কীদের দলে ভিড়ে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বীরত্ব দেখাবার সুযোগ পায় তা'হলে এরা প্রত্যেকেই এক একটি সিংহের কাজ করবে।

মাধব —বুঝেছি তথাগত, আপনি বারাণসীর তন্তুবায় জাতিদের কথা বলছেন, যারা ম্লেচ্ছধর্ম গ্রহণ করেছে এবং হিন্দুদের কাফের বলে প্রতি একশ' হিন্দুর বিরুদ্ধে একজনকেই যথেষ্ট মনে করে।

তথাগত —নিঃসন্দেহে, তা'ছাড়া ঐ একশ' জনের মধ্যে যে একজন তরবারি ধারণে সক্ষম সেও নিজেদের দলাদলি বা শত্রুতার জন্য যথাসময়ে তরবারী ধরতে পারে না। এই

দেখ না বারাণসীতে তুর্কী হামলা হবার পরেও মহারাজ জয়চন্দ্রের উত্তরাধিকারী মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন অথচ আমাদের ছোটবড় অন্যান্য সামন্তরাজাদের দিকে দেখ, তাদের কারও নিজেদের ওপর আস্থা নেই, তারা বিধর্মীদের সামনে মস্তক অবনত করতেও রাজি—তবুও সকলে মিলে তাদের প্রতিরোধ করে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে উদ্যোগী নয়। কিন্তু শুধু মাথা নীচু করলেই তুর্কী সেনারা রেহাই দিচ্ছে না। বিদেশে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতে তাদের সবচেয়ে আগে চাই খাদ্য ও অর্থ—তাই যেখানে তারা ধনসম্পত্তির সন্ধান পাচ্ছে সেখানেই সবশক্তি নিয়ে লুটপাট করছে। এইভাবেই তাদের অত্যাচার আমাদের গোটা দেশটাকেই গ্রাস করবে।

মাধব—এখনও আমাদের এলাকা তুর্কীদের আক্রমণ থেকে বেঁচে আছে, কারণ আমাদের এখানে ধনসম্পত্তি নেই।

তথাগত—না, ধনরাশি আমাদের এলাকাতেও আছে এবং সেই জন্যেই আমাদের মহারাজা বারাণসী গিয়ে তুর্কী সেনাপতিকে প্রচুর ধনরত্ন ভেট দিয়ে এসেছেন। কিন্তু তা'হলেও আমাদের এলাকা শেষ পর্যন্ত নিস্তার পাবে না।

মাধব—তা'হলে আমাদের এখন কি করা কর্তব্য? আমরা কি শুধু তারা আর সিংহবাহিনীর পূজা নিয়েই পড়ে থাকব?

তথাগত—হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, তুর্কী তরবারীর নীচে নিজেদের বলিদানও দিতে হবে। তা'ছাড়া তাদের হাতুড়ীর আঘাতে আমাদের এই দেবদেবীর মূর্তি চূর্ণ হবে, সেটাও সহ্য করতে হবে, বেঁচে থাকলে সবই দেখতে পাবে।

মাধব—ভন্তে তথাগত, আমরা কত অসহায়!

তথাগত—আমরা নিজেরাই নিজেদের অসহায় করে তুলেছি, মাধব পণ্ডিত। এখনও আমাদের দেশবাসীর চৈতন্য হল না যে, আমরা এখন নিজেদের দলীয় স্বার্থ ও দলাদলির কথা ভুলে যাই এবং শত্রুকে সমবেতভাবে প্রতিরোধ করি। কিন্তু সেটা তো এখন অসম্ভব কল্পনামাত্র!

মাধব—কেন তথাগত, অসম্ভব কিসে?

তথাগত—এই দেখ না, আমাদের এলাকায় ক্ষত্রিয় সন্তানের অধিকার আর আমাদের এলাকার বাইরে ভৌমিক সামন্তের অধিকার। এই ক্ষত্রিয় এবং ভৌমিক সামন্তদের মধ্যে সাপ ও বেজীর সম্বন্ধ। অথচ তুর্কী সেনার সামনে মাথা নীচু করে তাদের কৃপাপাত্র হবার সময়ে দেখবে একজনকে আর একজন ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আগে মাথা পেতে দিচ্ছে।

ভিক্ষু তথাগতশ্রী এবং পণ্ডিত মাধবের আলোচনায় বুঝতে পারা যায় যে শিংশপা ও কর্ণহটের সঙ্কটের দিন আগতপ্রায়।

২

তুর্কী সেনাপতি সৈয়দ আক্রম বারাণসীর উত্তর দিকে নিজ ফৌজের সঙ্গে ফিরছিলেন। তাঁরই কৃপায় এবারকার লুণ্ঠনে বহু ধনসম্পত্তি এদের হস্তগত হয়েছে। এত অর্থ কখনও কেউ ভেট দেয়নি বা দেবে না। তাঁর সৈন্যদলও একেবারে বোকা নয়, তাদের সহায়তা না পেলে লুট করা সম্ভব হত না—অতএব লুটের ভাগ তাদেরও চাই। শুধুমাত্র ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুর্কী সৈন্যদেরই এই ধরনের মনোভাব ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ সৈন্যদলেরও লুটের মালের অংশগ্রহণ করার মনোবৃত্তি ছিল। শুধু ক্লাইভ, হেষ্টিংস বা তার সৈন্যদের নয়, তাদেরও আগে সিন্ধু-বিজেতা ইংরেজ অফিসার, জেনারেল ও সেপাইদেরও এমনি মনোবৃত্তি ছিল। আউটরাম লুটের ভাগ ৩০০০ পাউণ্ড পেয়েছিল। অবশ্য আজ-কাল যুদ্ধের সঙ্গে লুটতরাজের রেওয়াজ তেমন নেই।

সেনাপতি সৈয়দ আক্রম লুটের পরিমাণ তার ওপর-ওয়ালার কাছে গোপন করবার দরকার মনে করত না। কারণ আইনত লুট ধর্মানুকূল, বিশেষত কাফেরদের কাছ থেকে লুট করে আনা জিনিস। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের ওপর অত্যাচার করা, এ তো কর্তব্যের মধ্যে ধরা হয়। অতএব লুটের মাল তার অর্জিত সম্পত্তি।

শিংশপার মতো আরও ছোটখাটো অনেকের ছোট রাজধানী ছিল, কিন্তু কে জানে কখন সেনাপতি আক্রম সেনাবাহিনীর ঘোড়ার লাগাম কার দিকে ফেরাবে! এই সব খুচরো রাজারা যে-যার নিজের ঘর সামলাতেই ব্যস্ত। সকলে মিলে এক হয়ে বিদেশীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কথা এরা কেউ ভাবতেই পারত না। কিন্তু শিংশপা আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য সাধ্যমতো প্রস্তুত হল।

মহারাজ লক্ষ্মণদেব তাঁর বাছাই-করা সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজধানী থেকে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে ডোভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু চতুর সৈয়দ আক্রম সামান্য কিছু সৈন্য দক্ষিণ দিকে পাঠিয়ে দিয়ে তার বাছাই-করা সৈন্যসহ উত্তর দিক থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করল। এই খবর লক্ষ্মণদেব যখন পেলেন তখন তাঁর রাজধানীর দুর্গে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না।

তাঁর সৈন্যদল বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করল। তারা জানত যুদ্ধে পরাজয় মানেই সর্বনাশ। তুর্কীরা দয়া করবে না কারোর ওপর। কাফেরদের গর্দান তাদের তলোয়ারের জন্যেই তৈরী হয়েছে, এর চেয়ে পুণ্য কাজ আর কিছু নেই। শুধু তাই নয় সতীসাধ্বী স্ত্রীরা তাদের হাতে পড়ে ভ্রষ্টা হবে। বংশ পরম্পরায় তারা যে ধর্ম মেনে আসছে তার চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। বারাণসীর বিশ্বনাথ, কালভৈরব, ও চক্রপ্রবর্তন-এর (সারনাথ) যা অবস্থা হয়েছে এখানেও তাই হবে। কিন্তু তাদের এত শক্তি ও এত বীরত্ব শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল।

সে সময় লোকের কাপড়ের সমস্যা মেটাত বহু সংখ্যক তন্তুবায়। বারাণসী বস্ত্রশিল্পে বহু শতাব্দী ধরে বিখ্যাত। এখানকার রেশমী ও সূতীবস্ত্র শুধু ভারতেই নয় ভারতের বাইরেও উচ্চমূল্যে বিক্রী হত। তন্তুবায় জাতি শূদ্র ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে বহু ধনী ও সম্পন্ন পরিবার ছিল। জাতিতে হীন হওয়ার ফলে যখন তাদের চেয়েও কম বিত্তবানদের কাছে অপমানিত হতে হত তখন তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগত। কিন্তু এই অপমানকেও হয়ত তারা ভাগ্য বলে মেনে নিচ্ছিল যতদিন না তুর্কীরা এসে তাদের চোখ খুলে দিল। এখন তারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের তাঁতির পরিবর্তে জোলা বলে সম্বোধন করা অধিক গৌরবের মনে করল ও তাদের তুর্কী প্রভুদের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত হল।

রাজধানী শিংশপায় এই তন্তুবায় সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক। এদের অনেকের আত্মীয়-স্বজন বারাণসীতে ছিল। যদিও বারাণসীর সকল তন্তুবায় সম্প্রদায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে কিন্তু তাদের একান্ত নিকট অমুসলমান আত্মীয়দের তারা একেবারে ভুলতে পারেনি। কিন্তু শিংশপার তন্তুবায়েরা মুসলমান ধর্মগ্রহণকারী আত্মীয়দের সঙ্গে কোনো প্রকার সংস্রব রাখাও পাপ মনে করত যদিও এই ভাবটা খুব কড়াকড়ি হয়নি। চতুর তুর্কীরা বারাণসীর ধর্মান্তরিত তন্তুবায়দের দ্বারা কাজ উদ্ধার করতে চাইল। তারা হিন্দু তন্তুবায়ের ছদ্মবেশ নিয়ে শিংশপায় অনুপ্রবেশ করতে লাগল এবং গোপনে গোপনে প্রচার কার্য স্বরু করল তুর্কীদের পক্ষে। তারা বলতে লাগল, তোমরা তুর্কীদের ধর্ম গ্রহণ করলে তোমরা মহান্ সেনাপতির সঙ্গে এক টেবিলে খানা খাওয়ার সম্মান পাবে, তোমাদের মেয়েরা উচ্চশ্রেণীর তুর্কীদের বিবি হবার অধিকার পাবে, সমাজে তোমরা অভিজাত হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে।

প্রতিরক্ষা কেবল ইঁট-পাথরের দেওয়াল এবং তীর-তলোয়ার দিয়েই হয় না, তার জন্যে চাই মানুষ, তার শক্তি ও কৌশল। শিংশপার দেওয়ালে আগেই ফাটল ধরেছিল, তারপর সৈয়দ আক্রমের গুপ্তচরেরা বাকি কাজটুকু শেষ করল। তারা সংবাদ নিয়ে এল দুর্গের ভিতরে কোথায় কি প্রকার প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত আছে এবং কোথায় কোথায় আছে গুপ্তপথ। এইসব সংবাদ সংগ্রহ করতে আক্রমের খুব বেশী বেগ পেতে হয়নি। এক অন্ধকার রাত্রে নিজ গুপ্তচর তন্তুবায়দের সাহায্যে সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে অতর্কিতে দুর্গ আক্রমণ করে। দুর্গের সৈন্যরা এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তারা ভাবতে পারেনি, এত তাড়াতাড়ি পশ্চিমের গুপ্তদরজা শত্রুরা অধিকার করবে। বলা অনাবশ্যক, সে রাত্রে শিংশপার লোকদের ঘাস কাটার মতো কেটেছিল সৈয়দের সৈন্যদল।

সকালের আগেই সৈয়দের সৈন্যদল দুর্গ অধিকার করে নেয়। স্থানীয় সকলেই সাধ্যমতো শত্রুদের প্রতিরোধ করেছিল কিন্তু সব বিফল হল। রাজপ্রাসাদ এবং সমস্ত ধনীর

গৃহ লুট করে তারা বহু ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করল। শিংশপার সুন্দরী তরুণীদেরও তারা একত্রিত করল। কিন্তু সৈয়দ আক্রম এতেও শান্তি পেল না কারণ রাজা লক্ষ্মণদেব জীবিত রয়েছেন, যে লক্ষ্মণদেবকে আক্রম খুবই ভয় করত। গুপ্তচরেরা সংবাদ দিল যে, লক্ষ্মণদেব তাঁর কর্ণহটের প্রাসাদে সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

নিজ ভ্রাতা মক্রমকে শিংশপার দুর্গের ভার দিয়ে আক্রম তখনই চলল কর্ণহটের দিকে। এ বার যুদ্ধ হল দিনের বেলা। রাজা লক্ষ্মণদেব বিপুল বিক্রমে লড়াই করলেন, কিন্তু সব কিছুই বিফল হল। সৈয়দ আক্রম শিংশপার চেয়ে কর্ণহটকে বেশী পছন্দ করে লক্ষ্মণদেবের পরিত্যক্ত প্রাসাদে বাস করতে লাগল।

কর্ণহট এলাকায় তন্তুবায় বা চুড়িওয়ালা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক তত বেশী ছিল না। কাহার, স্বর্ণকার, ও ছুতার প্রভৃতি শিল্পীই এখানে বেশী ছিল, কিন্তু এরা সমাজের চোখে ততটা নীচু ছিল না যতটা তন্তুবায়, চুড়িওয়ালা বা দর্জিদের নীচু বলে গণ্য করা হত। সৈয়দ আক্রম কর্ণহটে আসার পর, এই সকল নীচ জাতিরা পঞ্চায়েত বসাল এবং সেখানে বারাণসী থেকে আগত তাদের স্বজাতি যারা তুর্কীধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা তুর্কীধর্মের শাসন ও শক্তির মহিমা বুঝিয়ে দিল এবং উদাহরণ স্বরূপ নিজেদের দেখিয়ে বলল, আমরা এই পথ গ্রহণ করে দেখ কত সুখে আছি, অতএব তোমরাও এই পথ গ্রহণ করো।

শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা যে জাতিধর্মকে মান্য করে এসেছে তাকে একদিনে ত্যাগ করা কঠিন। মানুষকে এরা ততটা ভয় করে না যতটা দেবতাকে ভয় পায়। তবে এটা তারা জানে, তুর্কীরা তাদের কল্পনার দেবদেবীর চেয়ে অধিক শক্তিশালী। দেবতার যে মন্দির এবং মূর্তি তারা এতদিন পূজা করে এসেছে তার একটিও তুর্কীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তুর্কীরা সমস্ত মন্দির, বিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বুঝিয়ে দিয়েছে —দেখ, তোমাদের দেবতা মিথ্যা এবং আল্লা ও তরবারির শক্তিই সত্য।

কর্ণহটের বৌদ্ধ বিহারের মহাকাল টুকরো টুকরো হয়েছেন বিধর্মীদের হাতে। শিল্পকারদের বেশীরভাগ বৌদ্ধ ছিল এবং অন্যান্য ছোটবড় সকলের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। হাজার হাজার বৎসর যাবৎ কায়মনোবাক্যে যে সকল মূর্তিকে দেবতা জানে এ দেশের সকলে পূজা করে আসছে, আক্রমের আমলে সেগুলি পা-রাখার সিঁড়ির কাজ করতে লাগল।

লোকে কল্পনাও করতে পারেনি যে তাদের আরাধ্য দেবতার এই রকম পরিণতি হবে এবং তাদের দেবতা এত দুর্বল। অতএব বেশী দিন দেরী হল না —কর্ণহটের সকল ছোট-ছোট শিল্পকার জাতিই তুর্কীধর্ম গ্রহণ করল। সৈয়দ আক্রম সকলের মুখে কাঁচা গোমাংস স্পর্শ করিয়ে তাদের ইস্‌লামে দীক্ষা দিল। তারা এখন থেকে মনে প্রাণে হিন্দুবিরোধী আর অন্যদিকে তুর্কীদের বিশ্বাসের পাত্র, বন্ধু অথবা গোলাম হয়ে রইল।

সৈয়দ আক্রম দেশ অধিকার করবার কিছুদিনের মধ্যেই তলোয়ারের চমক দেখিয়ে দেশের লোককে বশীভূত করে। প্রতিরোধ সুরু হয়েছিল ধনী সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে কিন্তু আক্রমের তরবারি কাউকে ক্ষমা করেনি। নির্বিচারে তার তরবারি চলতে লাগল বিরোধীদের গর্দানের ওপর। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হল, সম্পত্তি লুট করে নেওয়া হল। বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের ভয়ে বহু লোক সুযোগ মতো প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সুরু করল—সুদূর নদীর পারে অথবা অন্য কোথাও। খুব কম লোকই রয়ে গেল সৈয়দের অত্যাচার সহ্য করে।

এই একই সময়ে মধ্য এশিয়ার বুখরা বা সমরখন্দের মতো বড় বড় শহর চেঙ্গিজ খাঁ একই রকম ক্রুরতার সঙ্গে অধিকার করেছিল, যেমন করে ভারতবর্ষ তুর্কীরা অধিকার করছিল। কিন্তু চেঙ্গিজ খাঁ এবং তুর্কীদের মধ্যে পার্থক্য এই ছিল যে চেঙ্গিজ খাঁ লুটপাট নরহত্যা প্রভৃতি চরম অত্যাচার করলেও কখনও কারও ধর্মের ওপর আঘাত করেনি। দরিদ্র শিল্পীদের বা দুর্বলদের আগে থেকে অভয় দান করে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তবেই সে লুটপাট করত। চেঙ্গিজ খাঁ আর সৈয়দ ছিল এই দিক দিয়ে ভিন্ন স্বভাবের মানুষ।

যৌবনে সৈয়দ আক্রম নির্দয় প্রকৃতির ছিল নিঃসন্দেহে। শুধু সৈয়দই নয় ঐ সময়কার প্রায় সকল সেনাপতিই একই স্বভাবের ছিল। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে সৈয়দ নিশ্চিন্ত জীবনে বিলাসী হয়ে উঠল।

সৈয়দ আক্রমের হারেমে রাজা লক্ষ্মণদেবের অন্তঃপুরিকাদের যৌবন একে একে ঢলে পড়তে, তাদের বিদায় করে নতুন নতুন সুন্দরী আমদানী হতে থাকল। দরবারের বহু লোক নিযুক্ত ছিল কেবল সুন্দরী মেয়ে যোগাড় করবার কাজে। দেশের যে কোনো স্থানে সুন্দরী নারীর সন্ধান পেলে তাকে সৈয়দের হারেমে নিয়ে আসতে মোটেই দেরী হত না। ভয়ে ভয়ে লোকে নিজ কন্যাদের অল্প বয়সে বিবাহ দিতে আরম্ভ করল, কিন্তু সৈয়দের কাছে সে খবর যদি তাদের সন্তান হবার আগে আসত তা'হলে তাদেরও রেহাই ছিল না। অগত্যা বড়লোকেরা যুবতী স্ত্রীদের পর্দার মধ্যে রাখতে সুরু করল।

সৈয়দ নতুন নিয়ম করল যে, প্রত্যেক স্ত্রীকে বিবাহের প্রথম রাত্রি সৈয়দের কোট অথবা হারেমে বাস করতেই হবে। কত লোক এই নিয়ম রক্ষা করে আত্মরক্ষা করেছিল তা জানা যায় না। তবে এক রাত্রিতে ধর্ম নষ্ট হয় না এই সান্ত্বনা নিয়ে যে বেশীরভাগ দুর্বল প্রকৃতির লোক বাধ্য হয়ে সে নিয়ম মেনেছে এ কথা নিশ্চিত।

কর্ণহটে এখনও পুরনো যুগের বহু পুকুর বা দীঘি রয়েছে, তার বেশীর ভাগেরই রূপ বদলে গেছে। তখনকার বড়ী পোখরী এখন দেখলে মনে হয় যে এত বড় পুকুর কোনো মানুষে তৈরী করেনি। তারই পাশে দলসাগরা নামে যে পুকুরটি আছে সৈয়দের আমলে সেটা একটা বিরাট দীঘি ছিল। হয়ত এটা রাজা লক্ষ্মণদেবের আগে তাঁর কোনো

পূর্বপুরুষ প্রস্তুত করেছিলেন —নিজের কীর্তি অমর করবার জন্য বা তাঁদের সৈন্যসামন্ত বা ঘোড়া-হাতীর জলপানের জন্য, তাই পুকুরের নামকরণ হয়েছিল দলসাগরা।

৩

সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল, এ সময়ে মানুষ বিশেষ করে পথযাত্রীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং প্রিয়বস্তু হল জলাশয় বা জল। ভদ্রপুর বা বড়োরার উত্তর দিক থেকে একদল লোকের সঙ্গে একটা পাল্কি দক্ষিণ দিকে যেতে দেখা গেল। সঙ্গে তাদের ঢাক-ঢোল প্রভৃতি আছে। একে গ্রীষ্মকালের দুপুর তার ওপর অনেকখানি রাস্তা হেঁটে আসছে, তৃষ্ণায় পাল্কিবাহক কাহারদের বুক শুকিয়ে গেছে। দলসাগরার কাছে এসে তারা পাল্কি নামিয়ে গাছের তলায় বিশ্রাম করে। কেউ কেউ ঘাটে নেমে স্নান করে, কেউ বা হাত মুখ ধুয়ে জল খায়। ইচ্ছেটা আমগাছের ছায়ায় দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকালের দিকে আবার রওনা হবে। সবাই তখন খেতে বসছে আর ইতিমধ্যে চারজন পেয়াদা এসে কাহারদের হুকুম করে, পাল্কি সৈয়দের কোটে নিয়ে চল। তাদের দেখে কাছাকাছির আরও দু-চারজন লোক সেখানে এসে জমা হয় এবং পেয়াদাদের পক্ষে সায় দিয়ে বলে, এখানকার সৈয়দ সাহেবের হুকুম এবং নিয়ম —এক রাত সৈয়দ সাহেবের কোটে রাত্রিবাস করতেই হবে। যারা এই কথা বলছিল তারা জাতিতে হিন্দু এবং যারা যাচ্ছিল তারাও হিন্দু। বিয়ের পর কন্যা শ্বশুরবাড়ি চলেছে, সঙ্গে তার স্বামী।

উপস্থিত লোকদের একজন বরকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল, আপনাদের এদিক দিয়ে আসা উচিত হয়নি। সৈয়দ সাহেবের এলাকায় তার অত্যাচারে লোক জর্জরিত। তবে এখন এসেই যখন পড়েছেন তখন সৈয়দের হুকুম না মেনেও আর উপায় নেই। ঐ দেখুন আরও সশস্ত্র সেপাই আসছে এদিকে। ওদের সঙ্গে লড়াই করাও বৃথা, সৈয়দের রাজত্বে সকল হিন্দুই এই নিয়ম মেনে কোনো রকমে টিকে আছে। এরপর আপনারা যা ভালো বিবেচনা হয় করুন।

সৈয়দের রাজত্বের বাইরে দক্ষিণে কোথাও নিবাস এই লোকটির। সৈয়দের অত্যাচারের কথা কিছুই সে জানে না নইলে নব-পরিণীতা বধুকে নিয়ে এ পথে আসার মতো এমন ভুল সে নিশ্চয়ই করত না। নিজ দলের সঙ্গে পরামর্শ করে লোকটি দেখল যে, সৈয়দের সেপাইদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দিলেও আত্মসম্মান বা ধর্মরক্ষা করতে পারবে না, কারণ ইতিমধ্যেই বহুসংখ্যক সেপাই পাল্কি ঘিরে ফেলেছে। আবার এদিকে প্রাণের চেয়ে ধর্ম বড়, নিজ পত্নীকে একরাত্রি অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে কোনমুখে তাকে ঘরে নিয়ে তুলবে সে।

তরুণ বর এগিয়ে এসে পেয়াদাদের বলল —দেখুন, আমরা সকলেই এখন আপনাদের অধীন। রাজা লক্ষ্মণদেব যখন আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছেন তখন আমরা তো আপনাদের কাছে কিছুই নই। পাল্কি আপনাদের সঙ্গে এক রাতের জন্যে পাঠাতে

রাজি আছি, কিন্তু নতুন বউ, বেচারী কিছুই জানে না। একলা নতুন জায়গায় গিয়ে ঘাবড়ে যাবে, কেঁদে-কেটে হয়ত বা ভয়েই একটা অনর্থ বাধিয়ে বসবে। সেই জন্যে আপনারা একটু দূরে দাঁড়ান আমি ওকে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝিয়ে দিই।

এ কথায় পেয়াদাদের আপত্তির কিছু নেই। তারা সরে দাঁড়াল। তরুণটি পাল্কির মধ্যে প্রবেশ করে স্ত্রীকে সব কথা বলে। তার পত্নী ঘাবড়ে যায়, কিন্তু এখন স্বামীর ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। স্বামী বলে —তোমাকে ওদের হাতে তুলে দেবার আগে আমি আমার পেটে কাটারী মেরে আত্মহত্যা করব।

পত্নী বলে —আপনার যুক্তি উত্তম, কিন্তু আমিই বা এক রাত্রি পর-পুরুষের সঙ্গে বাস করে অসতী হয়ে বেঁচে থাকি কেন? অতএব আগে আমাকে হত্যা করুন, পরে আপনি নিজে আত্মহত্যা করবেন।

কাজ শেষ করতে বেশী দেরী হল না। ওদিকে যুবককে পাল্কি থেকে বেরুতে দেরী দেখে পেয়াদা ডাক দেয় বাইরে থেকে। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে পাল্কির দরজা খুলে অবাক হয় সকলে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের বুক থেকে তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দু'জনেই প্রাণত্যাগ করেছে ধর্মত্যাগ করবার আগে। সৈয়দের কোটে সে পাল্কি গেল না। কিন্তু ব্যাপারটি নিয়ে কর্ণহটের লোকেদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হল, নিজেদের মধ্যে হিন্দুরা এমন শোক প্রকাশ করতে লাগল যেন তাদেরই ঘরের কেউ মারা গেছে। সসম্মানে এক চিতায় দু'জনকে দাহ করল কর্ণহটবাসী।

এদের আত্মোৎসর্গ কেউ যেন কখনও ভুলে না যায় তাই দলসাগরার পাড়ে কারা যেন মাটির ঢিবি তৈরী করে রেখে দিল। বর্ষার জলে কখনও কখনও তা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। বর্ষার শেষে কোনো এক অজ্ঞাত হাত আবার নতুন করে ঢিবি দুটো তৈরী করে দিয়ে যায়। কিন্তু সৈয়দের আমলে কোনো মানুষের এত সাহস হয়নি যে মাটির এমন ঢিবি তৈরী করবে যা এক বর্ষা অক্ষত থাকতে পারে।

সৈয়দ আক্রমের এন্তেকাল হয় একদিন, তার বংশধরেরাও লুপ্ত হয়ে যায় কর্ণহট থেকে, সৈয়দের কোটেরও অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু সেই মাটির ঢিবি দুটি আজও তেমনি আছে। সৈয়দের মৃত্যুর পর এ দুটির আকার কিছুটা বড় হয়, এবং এর মহিমাও বাড়ে। লোকে প্রথম প্রথম লুকিয়ে মানত করে দুধ দিত ঢিবির মাথায় কিন্তু পরে খোলাখুলি-ভাবেই সুরু করে। পরে সেই ঢিবির পাশে কেউ একটা গাছ লাগিয়ে দেয়। সেই গাছ বড় হয়ে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয় এবং জায়গাটির শোভাবর্ধন করে। ভূত-তাড়ানো বা অন্য কোনো চমৎকারিত্ব দেখায়নি বলে এই ঢিবি বা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর স্মৃতি কেবলমাত্র গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজকের কর্নৈলাবাসী এই গাছ ও ঢিবি দেখে সাত শতাব্দী আগের সেই ভীষণ ঘটনা মনে করে শিউরে ওঠে।

কালচক্রে কর্ণহট বাজার বিলীন হয়ে গেছে। সৈয়দের কোটের বেশীর ভাগ এখন চাষ-আবাদ হয়। এখানে না-কি ফসল খুব ভালো হয়। তবুও সেই বিশাল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে চার-পাঁচ গজ চওড়া ও লম্বা একটা টিলাকে এখনও সৈয়দের কোট বলে থাকে আজকের কনৈলাবাসী।

এই শতাব্দীর প্রথমদিকেও এখানকার নিমগাছ ও অন্যান্য গাছের ঝোপঝাড়গুলি কারো কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করেনি, গাছগুলির মাথায় লতাগুল্ম শোভাবর্ধন করত। জঙ্গলের মধ্যে দু-চারটে ইঁট এখনও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। সেই পুরনো ইঁটগুলি এখনকার ইঁটের চেয়ে কিছুটা বড়। ইঁটগুলি হয়ত সৈয়দের আমলের—হয়ত এখানেই সৈয়দের বৈঠক বসত। এই একই ধরনের ইঁট সৈয়দের কবরের গাঁথনিতেও পাওয়া যায়, যে কবরকে সৈয়দের কবর বা সৈয়দবাবা বলা হয়। সেই কবরে এখনও চুড়িওয়ালা বা অন্যান্য মুসলমান সম্প্রদায় শুধু নয় হিন্দুরাও ঘিয়ের প্রদীপ জালিয়ে দিয়ে যায়, মানত করে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সৈয়দবাবা নিশ্চয় তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করবে।

এই শতাব্দীর প্রথমদিকে সৈয়দবাবার মহিমা বাড়াতে কনৈলার মথুরা পাণ্ডে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। কনৈলার এই মথুরা পাণ্ডেই সবচেয়ে বড় ওঝা এবং চতুর লোক ছিল। আশ্বিন মাসের নবরাত্রিতে (প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত 'নবদুর্গা' ব্রত পালন করা হত) বহু লোক আসত তার কাছে বহু প্রকার সমস্যা নিয়ে।

ভূত ছাড়াবার জন্যে মথুরা পাণ্ডের খ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশী। সৈয়দের কবরের পাশে যারা বাস করে তারা নিজেদের দেখা কত ঘটনার সাক্ষ্য দেয়। আজও তারা বলে, এখনও পূর্ণিমার রাত্রে সৈয়দ সাহেব তার ঘোড়ায় চেপে রাস্তায় বের হয়, বহু দূর থেকে সেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা যায়। চারিদিকে ঘুরে ফিরে, মক্রমপুরে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আবার নিজের কবরে অদৃশ্য হয়ে যায় সৈয়দবাবা। মথুরা পাণ্ডে বলত, সৈয়দের নামে আশপাশের ভূত পালিয়ে যায়, সৈয়দ থুথু ফেললে ভ্রষ্ট হবার ভয়ে মহাবীরজী দূরে পালিয়েছেন।

যাইহোক সৈয়দ আজ আর সে সৈয়দ নেই—যে সৈয়দ মহারাজ লক্ষ্মণদেবকে পরাস্ত করেছিল এবং দলসাগরার কাণ্ড ঘটিয়েছিল, তার কথা কেউ মুখে আনে না। তার কবরকে হিন্দু-মুসলমান সকলেই মান্য করে, আর হিন্দুরাই কেবল পুজো দেয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর টিবিটাকে। তাদের স্মৃতিচিহ্ন আজও হিন্দুদের মনে বেদনাদায়ক ঘটনা হিসাবে জাগ্রত হয়ে আছে।

৪

মুসলিম শাসনকালে বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ও বিহারকে বহুবার খণ্ড প্রলয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীকে এই জন্য খুনী শতাব্দী বলা হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতেও

দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ সময়েও গঙ্গার তীরবর্তী প্রদেশ সমূহে অনেকবার রক্তের হোলি খেলা হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর আগেও গোরখপুর জেলা ও সমস্ত তরাই অঞ্চল মুসলিম আক্রমণ থেকে বেঁচে ছিল। বদায়ু জেলার বিসৌলী কসবাকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত বলা হত কারণ তুর্কী সাম্রাজ্য এখান থেকে আর আগে বাড়তে পারেনি। গোরখপুরও তাই ছিল। কিছুকাল পরে এখানেও মুসলমানদের অত্যাচারে সব ধ্বংস হয়েছে। তবু এই সকল তুর্কী-অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহে ছোটজাতির লোকেরা মাটি কামড়ে পড়ে ছিল। কারণ এদের লুট করবার মতো ধন-সম্পত্তি ছিল না বা জাতবিচার ও বিদ্রোহেরও প্রয়োজন হত না সমাজের উচ্চবর্ণের শ্রেণীদের মতো।

১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ তুঘলকের শাসনের শেষ হতেই দিল্লীতে তুর্কী সিংহাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। বিরাট সাম্রাজ্য টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। উত্তর ভারতে জৌনপুরের সিংহাসন আলাদা হয়ে পড়ে দিল্লীর শাসন থেকে। তুঘলক রাজ্যপালের ভাই ইব্রাহিম শর্কী নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করলেন। পশ্চিমে বুলন্দ শহর থেকে পূর্বে মিথিলা অবধি শর্কী সুলতান ইব্রাহিমের রাজ্য ছিল। ১৪০০ থেকে ১৪০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন।

রাজধানীর পাশেই আজমগড় ও গোরখপুর জেলা, সেখানকার বেশীরভাগ প্রজা হিন্দু। ইব্রাহিম অতি সহজেই তাদের মন জয় করে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন এবং শান্তিতে রাজত্ব করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও ঝগড়া বিবাদের ফলে এই বিরাট ভূ-ভাগের শাসনভার ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায়। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট বাবর আবার এই টুকরো রাজ্যগুলিকে এক করে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বার্ধে মুঘলদের একছত্র আধিপত্য বহু দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কিন্তু সম্রাট আকবরের সময় পর্যন্ত সামন্তরাজাদের আপোষে ঝগড়া-বিবাদ চলতেই থাকে।

৫

গোরখপুর জেলায় মলাঁব অতি প্রাচীন গ্রাম। আঁব গ্রামের প্রাকৃত অপভ্রংশ নাম মলাঁব। মুসলিম শাসনের পূর্বে ছিল মল্লগ্রাম। বৌদ্ধযুগে মল্লদের নয়টি গণরাজ্যের কোনো একটির শাসনে ছিল এই গ্রাম। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পরিবর্তে এই গ্রাম ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান। মল্ল নামের মহিমা ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যেত। যদিও বিদ্যায় বা জ্ঞানচর্চায় এই ব্রাহ্মণরা উদাসীন ছিলেন না তবু গায়ের জোরের ওপরই এঁদের আস্থা ছিল বেশী।

গহড়বার বংশোদ্ভূত গোবিন্দচন্দ্র ব্রাহ্মণদের পংক্তিবদ্ধ করে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি করেন (সম্ভবত ১১১৪-৫৫ খৃষ্টাব্দ)। তিনি এঁদের জীবিকার জন্যে বহু জমিজমা দান করে গেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত এই পংক্তি-ব্যবস্থা আজও বহু জায়গায় বজায় আছে। যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে মলাঁব গ্রামের পাঁড়েরা পংক্তিবদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পণ্ডিত শিবদত্ত পাঁড়ে নিজের বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেখানে গেলহই পাঁড়ের আখড়াও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। একদিকে শতশত বিদ্যার্থী সকালে স্নান করে পড়াশুনায় ব্যস্ত অন্যদিকে শত শত ছাত্র ডন, বৈঠক ও কুস্তিতে ব্যস্ত।

সকল পাঁড়ে সন্তানই সর্বদা সশস্ত্র থাকত। এদের সকলেই অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করত। পলতে-ওয়ালা বন্দুকের ব্যবহার তখন সবে সুরু হয়েছে এবং পাঁড়েরাও এই বন্দুক চালাতে শিখেছে। মলাঁব ছাড়াও অনেকগুলি গ্রামের মালিক ছিল এরা। রাপ্তী নদীর ডানদিকের তটবর্তী অনেকখানি এলাকা এদের দখলে ছিল। ক্ষেত-খামারের কাজ নিজেদের করবার দরকার হত না কারণ ছোট জাতের লোকেরাই এ সব করত, আর পাঁড়েরা শুধু দেখাশোনা করত। মল্ল পালোয়ানদের জন্যে দুধ-ঘিয়ের প্রয়োজন হয়, তাই গরু-মোষ পালন করা সে সময় সেখানে খুব প্রচলিত ছিল।

যদি মলাঁবের কোনো ব্রাহ্মণ-সন্তান সত্যি খেটেখুটে রোজগারের জন্য কিছু করে থাকে —তা এই পশুপালন। গহড়বারের রাজা পংক্তি-মর্যাদা স্থাপন করবার সময় ব্রাহ্মণদের নিরামিষভোজী হয়ে থাকবার জন্য জোর করেননি, সম্ভবও ছিল না। সমস্ত ব্রাহ্মণজাতি মাংস ভক্ষণের পক্ষপাতী। যজ্ঞের হবনের জন্য পশুমাংস ছিল অত্যাবশ্যক। পরে যখন যাগ-যজ্ঞের স্থান দেবদেবীর মূর্তিপূজা গ্রহণ করল তখনও পশুবলি অবশ্যকর্তব্য হয়ে থাকল। বর্তমান যুগে এখনও পংক্তি-ব্রাহ্মণেরা গর্বভরে বলে থাকেন, যার ঘরের সামনে পিছনে হাড় পড়ে নেই সে আবার পংক্তি-ব্রাহ্মণ কিসের? পাঁড়েরা জন্মগত যোদ্ধা এবং শিকার করার অভ্যাস তাদের ছিল।

ভাই-ভাইয়ে ঝগড়া হয়েই থাকে, মলাঁব গ্রামের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও যদি কখনো ঝগড়া হয়ে থাকে তো আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার সময় এরা কখনই নিজেদের দলাদলির কথা মনে রাখত না। নিজেদের মর্যাদা রক্ষার জন্যে এরা প্রাণ তুচ্ছ করে এগিয়ে যেত লড়াই করতে।

রাপ্তী নদীর পারে গোরখপুরের পাশে ডোমিনগড়ে ডোমকটার রাজপুতদের রাজত্ব ছিল। শোনা যায়, দশম শতাব্দীতে এখানে থারুদের শাসন ছিল, তাদের উচ্ছেদ করে ডোমকটার রাজপুতরা নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। এই থারুরা ছিল মঙ্গোলীয় কিরাত। আজ তারা গোরখপুরের পঁচাশি মাইল উত্তরে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে বাস করছে। পুরাণের যুগে এরা অবশ্যই গঙ্গার তীরবর্তী বিস্তৃত এলাকায় বসবাস করত। হিন্দুযুগে এরা গহড়বারদের সামন্ত রাজা ছিল। এদের সঙ্গে গহড়বারদের ঝগড়া প্রায়ই লেগে থাকত। কিন্তু এরা কেউ কাউকে হারাতে পারেনি।

মলাঁব গ্রামের পাশ দিয়ে ডোমিনগড়ের রাস্তা বারাণসী পর্যন্ত গেছে, দূরত্ব হবে প্রায় ছয় ক্রোশ। একদিন সন্ধ্যার সময় মলাঁব গ্রামের আমবাগানে দেখা গেল শতশত তাঁবু

পড়েছে, তার সঙ্গে রয়েছে হাতী, ঘোড়া, লোক-লস্কর। ডোমিনগড়ের রাণী তীর্থযাত্রায় চলেছেন বারাণসী, পথে আমবাগানে বিশ্রাম করে নিচ্ছিলেন।

এমন সময়ে কোথা থেকে কে যেন রাণীকে বলে গেল, মলাঁব গাঁয়ের অমুক কুয়ার জল পান করলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, বীর সন্তানের জননী হয়। রাণীর কোনো সন্তানাদি ছিল না। তিনি তখনই কয়েকজনকে পাঠালেন কুয়া থেকে এক ঘটি জল আনতে। পাঁড়েরা এই কুয়াকে খুব পবিত্র জ্ঞান করত, কুয়া থেকে একবিন্দু জল কাউকে নিতে দিত না। তারা রাণীর লোকদের অন্য কুয়া থেকে জল নিতে বলল, কিন্তু রাণীর হুকুম যে ঐ কুয়ারই জল চাই।

এ-কথায় সে-কথায় তর্ক হয়, এমন সময় এক বদমেজাজি পাঁড়ে রাণীর লোককে এক চড় বসিয়ে দেয় ও অপমান করে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা গ্রামের বৃদ্ধদের হাতের বাইরে চলে যায়।

শূন্য হাতে ফিরে আসে লোকেরা। রাণী সব শুনে মনের রাগ মনে চেপে পরদিন সকালে বারাণসী রওয়ানা হন। তীর্থযাত্রা শেষ করে রাণী আবার নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

ডোমিনগড়ের রাজার কানে এ সংবাদ আগেই পৌঁছেছিল। রাণী ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে সব ঘটনা বললেন। প্রথমত সন্তান-প্রাপ্তির আশা ব্যর্থ, তার ওপর অপমান। রাজপুতেরা কখনও অপমান সহ্য করেনি আর করবেও না। অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে। সেনাদল তৈরী হল যুদ্ধের জন্যে। তবে রাণী যদি ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতেন তা'হলে হয়ত সামান্য ব্যাপারে সেদিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হত না।

সময়টা তখন শ্রাবণ মাস, আমগাছের শাখায় দোলনা বেঁধে গৃহস্থ কুলবধূ ও কন্যারা দোল খায় অবসর সময়ে, আর গান গায় মিলিত কণ্ঠে। তাদের মধুর কণ্ঠের সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে ওঠে অপরাহ্ণের আম্রকানন। প্রায় অর্ধরাত্রি পর্যন্ত চলে এমনি আনন্দোচ্ছ্বাস। আমের ফলনও হয়েছে এ বার খুব বেশী। গ্রামবাসীরা সকলেই খুব খুশী। গ্রামের পাশ দিয়ে রাপ্তী নদী প্রবাহিত। এর জন্ম হিমালয়ে তাই প্রাচীন কাল থেকে পঞ্চ মহানদীর (যমুনা, গঙ্গা, সরযূ, অচিরবতী ও মহীগণ্ডক) মধ্যে রাপ্তী (অচিরবতী) স্থান পেয়ে এসেছে কিন্তু অন্য চার মহানদীর মতো রাপ্তী হিমালয়ের হিমপ্রবাহ থেকে জন্ম নেয়নি। পর্বতের সমতলভূমি থেকে জন্ম হয়েছে। তাই, সমতলভূমিতে বর্ষার স্রোত-ধারাই এর প্রাণ।

এই নদী বর্ষায় চণ্ডরূপ ধারণ করে। মলাঁব বহুবার রাপ্তীর গর্ভে পড়েছে তবুও গ্রাম-বাসী নদীর কাছছাড়া হয়নি, তাই আজও এখানে-সেখানে গ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। শ্রাবণ মাসে এখানে অনেক পার্বণ ও পূজানুষ্ঠান হয় তার মধ্যে নাগ-পূজার শেষরূপ অনন্ত চতুর্দশী ধুমধাম ও ঘটা করে সম্পন্ন হয়। ঐ দিন সকল প্রকার অস্ত্র-

শস্ত্র ধুয়ে-মুছে সাজিয়ে রাখা হয়। দুপুরবেলা সমস্ত লোক রাপ্তী নদীতে স্নান করে এবং আনন্দ-উৎসবে মেতে থাকে।

ঘরে ঘরে উৎসবের সাড়া, ঘরে নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র সাজানো রয়েছে। পুরুষেরা সকলেই রাপ্তীতে স্নান করতে গেছে। পালোয়ানরা সাঁতার কাটছে, জলক্রীড়া করছে, পণ্ডিতেরা কেউ তর্পণ কেউ বা প্রাণায়াম করছেন। আজ বর্ষা হয়নি তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর সেই সঙ্গে পূর্ব দিক থেকে মলাঁব গ্রামের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা ধেয়ে আসছে। ঠিক মধ্যাহ্ন, এমন সময় দেখা গেল দূর থেকে শত শত নৌকা এগিয়ে আসছে। সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার আগেই নৌকাগুলি কাছে এসে পড়ল এবং বৃষ্টিধারার মতো তীর ও গুলি এসে পড়তে লাগল পাঁড়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে।

পাঁড়েরা তখন সকলেই নিরস্ত্র, তাদের কেউ কেউ ছুটে গ্রামের দিকে যেতে চেষ্টা করল কিন্তু যাবার পথে আগে থেকেই বাণ-বর্ষণ সমানে চলছে। ব্রাহ্মণরা কচু-কাটা হয়ে মরতে লাগল। ডোমকটার রাজা নিজে সৈন্য পরিচালনা করছিলেন। রাজা হুকুম দিলেন, পাঁড়েদের বংশের একটা শিশুও যেন রক্ষা না পায়। হয়ত কোনো স্ত্রীর গর্ভে সন্তান থাকতে পারে তাই একটি স্ত্রীলোকও যেন বেঁচে না থাকে। ডোমকটার রাজা রাজপুত আর পাঁড়েরা ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মহত্যা পাপ, কিন্তু শত্রু কখনো ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নিয়ে রক্ষা পায়নি! কিছুক্ষণের মধ্যে মলাঁব গ্রাম পাঁড়ে-শূন্য হয়ে গেল।

ডোমকটার রাজা জানত, এই ব্রাহ্মণ হত্যার ফল তাকে একদিন ভুগতেই হবে, তবুও তার সান্ত্বনা এই যে, তখন একজনও পাঁড়ে ব্রাহ্মণ থাকবে না তার দুর্দশা দেখবার জন্যে।

যে কূয়ার জল নিয়ে এত বড় কাণ্ড সেই কূয়ার মধ্যে পাঁড়েদের মৃতদেহ ভর্তি করে মাটি চাপিয়ে ভরাট করে বুঁজিয়ে দেওয়া হল এবং অন্যান্য মৃতদেহগুলিও পুঁতে ফেলা হল। মলাঁব গ্রামের পতনের পর গ্রামের সকল সম্পত্তিই রাজার দখলে এল। গ্রামের অন্যান্য জাতি সেইদিনই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালাল। একজনও রইল না মলাঁব গ্রামে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাবার জন্যে।

এরপর দু-একটা বর্ষায় গ্রামের বাড়ি-ঘর সব ভেঙে পড়ল। যেখানে দু-বছর আগে কোলাহল মুখরিত সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল সেটা জনমানব-বর্জিত এক জঙ্গলে পরিণত হল।

মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে যেমন এক কুল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলেও উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিত পাণ্ডবকুল রক্ষা করে তেমনি ব্যাপার মলাঁবগ্রামের পাঁড়ে-বংশেও ঘটেছিল। নরমেধের সময় মলাঁব গ্রামের রাজেন্দ্রদত্ত পাঁড়ের স্ত্রী ছিল পিত্রালয়ে। তাই তার গর্ভের সন্তান অহিরুদ্র বেঁচে রইল পাঁড়েবংশের কুলপ্রদীপ হয়ে।

মামার বাড়িতে মানুষ হতে লাগল অহিরুদ্র। বড় হয়ে নিজের পিতৃকুল ধ্বংসের কাহিনী শুনল অহিরুদ্র। মাতুলালয়ের কেউ অহিরুদ্রকে মলাঁব পাঠাতে রাজী হয়নি।

কিন্তু পঁচিশ বৎসর বয়সে অহিরুদ্র পিতৃগ্রামে ফিরে আসে। তখন মলঁাব গ্রামে জঙ্গল ও ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নেই।

অহিরুদ্র সেইখানে প্রথমে ঘর বাঁধল এবং কুলদেবতার কাছে প্রার্থনা জানাল যদি আমার কোনো কুলদেবতা থেকে থাক তা'হলে আমার পিতৃগ্রামের সীমা নির্ধারিত করতে সাহায্য কর। পাঁড়েদের ইষ্টদেবতা মলকবীর বিষ্ণুর মতো বরাহ রূপে দেখা দিলেন অহিরুদ্রকে সাহায্য করতে (এই মলকবীরকে কেউ কেউ নরসিংহ বলে থাকেন)। অহিরুদ্রকে ঘুরে ঘুরে বরাহ গ্রামের প্রাচীন সীমা দেখিয়ে দেয়। এই দৈবী সহায়তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য অহিরুদ্র নিয়ম করে দিয়েছিল যে, প্রত্যেক পুরুষ সন্তানের জন্ম হলে বরাহদেবকে একটি শূকরছানা উৎসর্গ করতে হবে। পূজার দিন ধার্য ছিল শ্রাবণের শুক্লা সপ্তমীর পরের মঙ্গলবার। পূজার সাতদিন আগে চাল-বাটা রঙ দিয়ে ঘরের দেওয়ালে অনেক মুণ্ডযুক্ত স্ত্রী-পুরুষের ছবি আঁকা হত। ঘরের বাইরে একটি শূকরছানাকে যবের পুরি, হালুয়া তৈরী করে খাইয়ে পূজার দিন সেই শূকরছানাকে বলি দেওয়া হত।

ডোমকটার রাজার সঙ্গে অহিরুদ্রকে যুদ্ধ করতে হয়নি প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যে। নরমেধের পর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে রাজার অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে পড়ে—হয়ত ব্রহ্ম হত্যার দণ্ড! তাই বংশপরম্পরায় পাঁড়েরা আর কেউ প্রতিশোধ গ্রহণ করবার কথা ভাবেনি। অহিরুদ্রের দুই পুত্র গেন্দী ও গয়াধর। তাদের বংশধরেরা শত গ্রামে বিস্তার লাভ করে বসবাস করছে।

মলঁাব গ্রামে নরমেধ সংঘটিত হওয়ার পর পাঁড়েদের একমাত্র বংশধর অহিরুদ্র জীবিত ছিল এটা বলা ভুল। মলঁাব গ্রামের বাইরে দেশের অন্যত্র আরও বহু পাঁড়ে-বংশধর ছিল। তবে মূল মলঁাব গাঁয়ের একমাত্র সন্তান অহিরুদ্রের ছোট ছেলে গয়াধরের প্রথমা পত্নী পংক্তিকন্যা ছিল। তার পুত্র প্রভাকর মলঁাব গাঁয়ের পাশে নাউরদেউর নামক গ্রামে বসবাস করতে থাকে এবং তার বংশধররা সেখানে আজও আছে। এরা অর্ধপংক্তি ব্রাহ্মণ, এদের কন্যাদের বিবাহ পংক্তিবান ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দেওয়া হয় কিন্তু পুত্রদের বিবাহ হয় পংক্তিহীনদের সঙ্গে। বিবাহের পর কন্যারা পিতৃগৃহস্থ লোকের ছোঁয়া-জল গ্রহণ করতে পারে না।

মধ্যবয়সে গয়াধর যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়, বহুপ্রকার চিকিৎসা করেও কোনো ফল হয় না; রোগ ক্রমশ বেড়ে যায়, এমন সময় মীঠাবেলের দুবে বৈদ্য তাকে দেখে বললেন যে, গয়াধর যদি দুবের কন্যার পাণিগ্রহণ করে তা'হলে বৈদ্য তাঁকে রোগমুক্ত করে দিতে পারেন। কিন্তু তা'হলে গয়াধরকে পংক্তিচ্যুত হতে হবে, নিজের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে দিতে হবে জন্মের মতো। মরতে তো একদিন হবে—অতএব গয়াধর কাশীবাসী হবার সঙ্কল্প গ্রহণ করল।

প্রাণের মায়া সকলের কাছে সমান, মর্চাঁব থেকে রওয়ানা হয়ে গয়াধর কাশীর বদলে সে মীঠাবেল পৌছাল। দুবে বৈদ্য সানন্দে গয়াধরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলেন এবং জামাতাকে চিকিৎসা করে রোগমুক্ত করলেন।

গয়াধর এ বার বারাণসীতে গেল। সে সময় সরযূ নদীর পারের (গোরখপুর-দেবরিয়া জেলা) পংক্তিবদ্ধ ব্রাহ্মণদের ততটা সম্মান ছিল না যতটা অন্যান্য জায়গার ব্রাহ্মণদের ছিল। কিন্তু দক্ষিণদেশের পংক্তিহীনদের কাছে এরা কুলীন ছিল। গয়াধর কুলে শ্রেষ্ঠ এবং বিদ্বান, বারাণসী যাওয়ার পথে আজমগড় জিলার জাঠী গ্রামের কোনো এক ভূমিহারের মঞ্চোপবনে সে উপস্থিত হল এবং সেখানের পুরোহিত দুর্গা পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচিত হল।

দুর্গা পণ্ডিত কুলীন ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করে পুণ্যার্জন করতে চাইলেন। গয়াধরের পংক্তিহীন ব্রাহ্মণ-কন্যা পত্নী মীঠাবেলে থেকে গিয়েছিল, সুতরাং দুর্গা পণ্ডিতের কন্যার সঙ্গেও গয়াধরের বিবাহ হয়ে গেল। এই পত্নীর গর্ভে গয়াধরের পাঁচ সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং আজও রাণীপুর, বড়ৌরা, টাড়ী, দিলমপুর, ডীহা, জলালপুর প্রভৃতি গ্রামে গয়াধরের সন্তানরা বংশপরম্পরায় বাস করছে।

সময়টা আকবরের শাসনের অন্তিম যুগ। রাজনৈতিক শান্তির জন্য নিত্য-নতুন গ্রাম ও বসতি তৈরী হতে থাকে। শাহী শাসক গ্রামের মাথা বা মাতব্বরদের হাত করে নেয় এবং গ্রামের শাসনভার অর্পণ করে। গয়াধর পাণ্ডেও চক্রপানপুর নামে এমনি একটি গ্রামের শাসনভার পায়। এই গ্রামেই গয়াধর চার বৎসর বসবাস করে।

গয়াধর-বংশের ষষ্ঠ পুরুষ ইচ্ছা পাণ্ডের সময় বংশবৃদ্ধি হয়েছে অনেক। ইচ্ছা পাণ্ডে দেখলেন পাশের গ্রাম কনৈলা জনশূন্য। অবশ্য জনশূন্য মানে যে সেখানে লোক একেবারেই ছিল না, তা নয়। দর্জি, ধুনিয়া প্রভৃতি হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া জাতি, ও মুচি সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ বাস করত এবং তারাই যথাসম্ভব চাষ-আবাদ করত। ইচ্ছা পাণ্ডে ভাবলেন, এইসব লোকদের দিয়ে পতিত জমি আবাদ করানো যায় কিন্তু মালগুজারী ঠিক হবে কি-না সন্দেহ আছে। এরা ইচ্ছা পাণ্ডের হুকুম হয়ত নাও মানতে পারে। তাই তিনি সম্রাটের দরবারে গিয়ে কনৈলার ভার গ্রহণ করলেন। এ বার সবাই তাঁর হুকুম মানতে বাধ্য।

এই সময়ে সমস্ত বর্ধিষ্ণু গ্রামপতিদের সুরক্ষিত কোটে বাস করতে হত। ইচ্ছা পাণ্ডের কোট শুধুমাত্র ইট চুণ দিয়ে তৈরী ছিল না, চারিদিকে মোটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও ছিল। সময়টা ছিল জোর যার মুল্লুক তার গোছের, তাই নিজেদের সব সময় শক্তিশালী ও সতর্ক হয়ে থাকতে হত। ইচ্ছা পাণ্ডের তিন পুত্র, তাঁর প্রপৌত্রদের সময় এখানকার গ্রামবাসীদের সঙ্গে পূর্বের ধনারবাঁধ ও দক্ষিণের উমরপুরের রাজপুতদের প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত।

পূর্বের শত্রুদের এরা লাঠির জোরে দমন করে রেখেছিল। কিন্তু দক্ষিণের রাজপুতরা কৌশল করে গ্রাম পঞ্চায়েত মোড়লদের অনেক ধানের জমি উপঢৌকন দিয়ে কনৈলাকে হস্তগত করার চেষ্টা করে। তবুও ইচ্ছা পাণ্ডের জমির পরিমাণ এত বেশী ছিল যে, অষ্টম পুরুষেও কনৈলার পাণ্ডে ব্রাহ্মণদের কখনও জমির টান পড়েনি।

কনৈলার ইতিহাস এমনি করে একবার ভাঙে আবার গড়ে, আবার ভাঙে···

মহাবিদ্রোহ

কাল : ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ

মুঘলদের সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে নবাবী শাসন কায়েম হয়েছে। মারাঠা এবং শিখজাতিও নিজেদের অধিকার জোরদার করে নেবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। সকলেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সুরু করেছে অধিকতর ক্ষমতালাভের জন্যে।

এমন সময় আহ্মদশাহ আব্দালীকে ডাকা হল দিল্লীর সিংহাসনে বসবার জন্য, কিন্তু তিনি শুধু লুট করতে পারেন —দিল্লীতে পাঠান সিংহাসন কায়েম করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ইংরেজরা এই সুযোগ নিল। কলকাতা ও মাদ্রাজে বসে তারা পাশার দান চালতে লাগল। আজমগড় জিলা লক্ষ্ণৌ-এর নবাবের শাসনাধীন। জৌনপুরের শাসন শুধু পূর্বস্মৃতি বহন করছে, কারণ নবাবী শাসনে সব কিছুতে যথেচ্ছাচার, আইন-কানুনের বালাই ছিল না। নবাবরা ভাবতেন, এমনি যথেচ্ছাচার চালালে প্রজারা নবাবকে খুব ভয় করবে।

এই শতাব্দীর প্রথম দিকেও বৃদ্ধদের মুখে শোনা গেছে, সেই সময় ক্ষেতে ফসল হলে নবাব সিপাহীদের পাহারা বসিয়ে দিতেন। যতক্ষণ না নবাবী কর বা খাজনা শোধ হবে ততক্ষণ ক্ষেতের ফসলে জমির মালিক হাত দিতে পারবে না। আজমগড় জিলা ১৮০১ সালে নবাবের হাত থেকে ইংরেজের হাতে চলে যায়। ইংরেজ আমলে লুটপাট যে একেবারেই ছিল না তা নয়, তবে নবাবের আমলের চেয়ে অনেক কম। তা'ছাড়া ইংরেজদের লুটপাট করবার পদ্ধতি ছিল সূক্ষ্ম।

শিংশপা হয়ত মুসলিম শাসনের দ্বিতীয় শতাব্দীতেই নিজের মহত্ত্ব হারিয়েছিল। কর্ণহট (কনৈলা), নরহতা, চক্রপানপুর, খুদবন, ভীহা, বছবল প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত নগরী আজ ছোট ছোট গ্রামে পরিণত। নগর ধ্বংস হবার পর এখানকার মালী, ছুতার, স্বর্ণকার ও হালুয়াই জাতিরা অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, বিশেষ করে বছবল ও চক্রপানপুরেই বেশীরভাগ

চলে আসে। খুরবন গ্রামও বছবল গ্রামের মতোই বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল মঙ্গই নদীর অপর পারে। কিন্তু তবুও বছবলের মতো খ্যাতি বা আভিজাত্য তার ছিল না।

মৌর্যকাল থেকে গুপ্তযুগের কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই শিংশপা এক সমৃদ্ধশালী সামন্তনগর ছিল। সকল দিক দিয়ে এর বিশেষ তাৎপর্য ছিল। বিশেষ করে, জল ও স্থলপথে বাণিজ্য করবার প্রশস্ত সুযোগ ছিল এখানে। কিন্তু এখন আর সে শিংশপা নেই, এরপর শিংশপার এমন দুরবস্থা হয় যে, গরু-মহিষে-টানা গাড়ির পক্ষেও সেখানে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এমন স্থানে বাইরের সরকারী লোক বা অন্যান্যদের পক্ষে যাতায়াত বা বাস করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। ইংরেজ আমলে অবশ্য যাতায়াতের সুব্যবস্থা অনেকখানি হয়েছে, কিন্তু প্রধান বা আদি শিংশপার দশ মাইলের মধ্যে কোনো পাকা রাস্তা কিম্বা রেল-স্টেশন হয়নি যার জন্যে বাইরের জগতের সঙ্গে শিংশপার আর বিশেষ কোনো সম্পর্কই থাকেনি।

প্রাক্ আর্যজাতিদের মধ্যে ভর জাতি বিশেষ মহত্বপূর্ণ জাতি ছিল। মুসলমানদের শাসনের পূর্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে এদের শাসন ছিল। আজও তার সাক্ষী হিসাবে রাজভর নামে একটা জায়গা আছে। রাজভরদের রীতি-রেওয়াজ উচ্চবর্ণের জাতিদের মতোই। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে এরা শূকর পালন করত, হয়ত এই কারণেই এদের বর্তমান শতাব্দীতে ছোট নজরে দেখা হয়। অন্তিমকালে স্বয়ং বুদ্ধদেব শূকর মাংস ভোজন করেছিলেন, এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, তখন বড় বড় জাতি শূকরকে গৃহপালিত পশু পর্যায়ে গণ্য করত এবং সে সময়ে শূকর অভক্ষ্যও ছিল না; অথবা শূকর রাখলে পাড়াপ্রতিবেশীর আপত্তির কারণও ঘটত না।

পালির এক গ্রন্থে এক ব্যক্তির মূর্খতার একটা গল্প আছে। একটা লোক রাস্তার ওপর ছড়ানো শুকনো বিষ্ঠা দেখে মনে করল, এগুলি জড়ো করে ঘরে নিয়ে যাই, শূকর খেতে পাবে। সেগুলি কুড়িয়ে মাথায় করে নিয়ে যাওয়ার সময় খুব বৃষ্টি নামল এবং শূকর বিষ্টা ভিজে-গলে তার সমস্ত শরীর দুর্গন্ধময় করে দিল—তখন সে নিজের মূর্খতা বুঝতে পারল।

ভর জাতি এককালে খুব আত্মাভিমানী জাতি ছিল এবং এদের সামাজিক রীতিনীতিও ছিল খুব ভালো। ১৮৯৬-৯৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় এই ভর জাতির একটা বড় অংশ কনৈলা থেকে অন্য দেশে চলে যায়। এই দুর্ভিক্ষের সময় বহুসংখ্যক ভর মারা যায়, তবুও কনৈলাতে এখনও ভর জাতি সংখ্যায় ব্রাহ্মণদের সমান।

কনৈলায় ব্রাহ্মণবংশের সংস্থাপক ইচ্ছা পাণ্ডের জ্যেষ্ঠপুত্র রামহিত পাণ্ডে, এবং রামহিত পাণ্ডের পুত্রদের চাষ-আবাদের জমি চক্রপানপুরের একেবারে কাছেই ছিল। পুরনো প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠপুত্রের পাওনা জমি অন্যদের তুলনায় পরিমাণে কিছু বেশী, এবং ইচ্ছানুসারে

সে নিজের প্রাপ্য অংশ বেছে নিতে পারত তাই ভীহার উর্বরা জমিগুলির সবটাই এদের দখলে ছিল।

যদিও এ সময়ে বিলাতি কাপড় এবং কারখানায় প্রস্তুত অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হচ্ছিল তবুও গ্রামবাসীদের আত্মনির্ভরতা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। নিজেদের প্রয়োজন মতো সকলেই কার্পাসের চাষ করত এবং সুতো কেটে নিজেরাই পরবার মতো কাপড় বুনে নিত। নিজেদের চাষের আখ থেকে গুড় তৈরী হত প্রত্যেক পরিবারে। এই গুড় থেকে নিজেদের খরচের মতো কিছুটা রেখে বাকিটা বিক্রী করে যে পয়সা পাওয়া যেত সেই পয়সা দিয়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনত। ভীহা এবং অন্যান্য জায়গার কারখানার মালিকরা এই গুড় কিনে নিয়ে তাদের কারখানায় চিনি তৈরী করত।

১৮৫৭ সাল। তখন পাণ্ডেবংশের জ্যেষ্ঠতম পরিবারের মুখ্য গোপাল পাণ্ডে। গোপালেরা তিন ভাই। তাদের একজন বৈমাত্রেয় ভাইও ছিল। গোপাল নিজের ভাইদের সঙ্গেই থাকত। আশপাশের লোকেরা এদের তিন ভায়ের লাঠিকে যমের মতো ভয় পেত। একবার জমির সীমানা নিয়ে এদের সঙ্গে রাজপুতদের ঝগড়া হয়। গোপাল পাণ্ডেকে একলা পেয়ে রাজপুতরা গোপালের ওপর লাঠি চালাতে সুরু করে। গোপালের বাঁ হাত একটু অকেজো ছিল। সেই হাত দিয়ে ঢালের মতো করে লাঠি সামলাতে থাকে গোপাল, তারপর সুযোগ বুঝে যখন ডান হাতে লাঠি ধরে চালাতে আরম্ভ করল তখন রাজপুতরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচে।

ব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ ফর্সা হওয়া উচিত কিন্তু এই পাণ্ডেদের গায়ের রঙ ছিল কালো। রক্তের সংমিশ্রণের ফলেই বোধ করি এই গাত্রবর্ণের পার্থক্য। এখনও পাণ্ডেদের বংশধররা কালোই আছে। গোপাল পাণ্ডের পরিবার নিজেদের ক্ষেতে চাষ করত না। ভর, চামার প্রভৃতি জাতির লোকেরা তাদের জমিতে চাষ-আবাদ করত আর পাণ্ডেরা দেখাশোনা করত এরা ভাত খাওয়ার অভ্যাস করেছিল বলে রবিশস্যের চেয়ে ধানের চাষেই প্রাধান্য দিত।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষ দিক, সময়টা শীতকাল। পাঁড়ে-বাড়ির আঙ্গিনায় ধান মাড়াই হচ্ছে। ভোলা ভর, মংরু চামার আরো কয়েকজন কাজ করছে। যারা কাজ করছে তারা সবাই একদিকে আগুনের কুণ্ডলী জ্বেলে দেহটাকে দারুণ শীতের হাত থেকে রক্ষা করছে আর গল্পগুজব চলছে। রাত্রি ক্রমশ বেড়ে চলে। সমস্ত পৃথিবী নিঃশব্দ, এদের কাজ চলবে কিন্তু সারারাত্রি ধরে।

ভোলা কাজের ফাঁকে মংরুকে বলে —শুনেছিস মংরু, গোরা-লোক আমাদের দেশ-গ্রাম ছেড়ে শহরে পালাচ্ছে।

কর্নৈলায় গোরা অফিসার বা সৈন্যদের আসার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। তা'ছাড়া বেনারস, গাজীপুর, জৌনপুর বা ফৈজাবাদ যাওয়ার যতগুলি রাস্তা আছে তার কোনোটাই

কনৈলার আশপাশ দিয়ে যায়নি, সে জন্যে গোরা সৈন্যরা ভুলেও এদিকে আসার কোনো প্রয়োজন বোধ করত না।

আজমগড় মংরুর মতো লোকদের কাছে বিলেত ছিল। লোকের মুখের কথা শুনেই ইংরেজ এবং তাদের রাজ্যের সম্বন্ধে এরা আন্দাজ করত, কিন্তু ভোলা মাঝে-মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়া উপলক্ষে দু-চার জায়গায় ঘোরাফেরা করত তাই তার কাছে অনেক পাকা খবর পাওয়া যেত। বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে ভোলা মংরুকে বলে —না না, খবর খুব পাকা, এখন আজমগড়ে হিন্দুস্থানীদের শাসন চলছে।

—তবে কি ইংরেজ রাজত্ব উঠেই গেল ?

—আপাতত উঠে গেল বটে, তবে লড়াই এখনও শেষ হয়নি।

—লড়াই এখন কোথায় চলছে ?

—তা ঠিক বলা যায় না, তবে চলছে। আমাদের মালিকের কাছে খবর এসেছে যে, গোরাদের তাড়াবার জন্যে লোক দরকার। কনৈলা থেকে অনেকগুলি জোয়ান চেয়ে পাঠিয়েছে লড়াই করবার জন্যে।

—তা তো চাইবেই! লড়াই করতে কনৈলার লোক কবে পিছপাও হয়েছে ? কনৈলার এক-এক লাঠি যদি একশো লোকের মহড়া না নেয় তো লজ্জার কথা, অমন দল বেঁধে লড়াই করবার মতো বাহাদুর তো রাস্তা-ঘাটে কত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভোলার শরীরের রঙ কালো এবং গঠন সুদৃঢ়। নিজের গ্রামের জন্যে ভোলারও গর্ব ছিল। লড়াইয়ের কথায় বাইরের ঠাণ্ডা ভুলে গিয়ে ভোলার শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে। সে বলে —কনৈলা কখনও পেছনে পড়ে থাকবে না। আমরা লাঠি চালাতে জানি, তলোয়ার চালাতে জানি কিন্তু গোরা সৈন্যদের হাতে বন্দুক। তা'ছাড়া শুনছি তারা না-কি এক নতুন রকমের বন্দুক বার করেছে।

—কি রকম এই নতুন বন্দুক, ভাই ভোলা ?

—কেন, আমাদের এখানকার গাদা বন্দুক তুমি দেখনি ? নলের মধ্যে বারুদ আর গুলি ভর্তি করে গজ ঢুকিয়ে দাগাবার সময় ঘোড়ার মুখের কাছে একটা টুপি দিতে হয়। তারপর টুপির ওপরে ঘোড়ার চাপ পড়লেই মসলায় আগুন ধরে যায়, আর অমনি গুলি বেরিয়ে যায়।

—আর পলতে-ওয়ালা বন্দুক ?

—পলতে-ওয়ালা বন্দুক তো খুবই সাধারণ জিনিস। কিন্তু ইংরেজদের এই নতুন বন্দুক সব চেয়ে ভালো। বারুদ, গুলি, মশলা, আগুন লাগাবার ব্যবস্থা সব এক করে তারা একটা টোটা তৈরী করেছে। ব্যস, টোটাটা বন্দুকের নলের মধ্যে দাও আর গুলি ছুঁড়তে থাক। এতে কোনো রকম ঝামেলা নেই, তড়াক-পড়াক কাজ।

—তাই তো, এই ফিরিঙ্গী বেটাদের খুব মাথা আছে বলে মনে হচ্ছে!

—মাথাওয়ালা না হলে কি বিলেত থেকে এখানে এসে রাজত্ব করতে পারে কখনও? তবে এখন আমাদের বড় বীর বাঁকের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে বেটাদের। এখন আমাদের ভাইয়েরা, যারা গোরাদের সিপাহী ছিল তারা বিদ্রোহী হয়ে ওদের বিপক্ষে লড়ছে। বেটা-দের অবস্থা ভীষণ কাহিল হয়ে উঠেছে।

—কেন ভাই, আমাদের সিপাহী ভাইরা খামকা বিদ্রোহ করছে কেন? ওরা তো ভালো টাকা মাইনে দেয়।

—আর বলো কেন, ইংরেজদের মতলব খুব খারাপ। জানো ওরা আমাদের জাত-ধর্ম সব নষ্ট করতে চায়। বন্দুকের টোটার মধ্যে গরু ও শুয়োরের চর্বি দিয়ে রেখেছে। বন্দুক দাগতে হলে টোটা দাঁত দিয়ে কাটতেই হবে, আর টোটা মুখে দিলেই ধর্ম নষ্ট। আর ধর্মই যদি যায় তা'হলে রইল কি!

—তা'হলে ওরা সকলের ধর্ম নষ্ট করে খৃশ্চান বানাতে চায়?

—হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো হিন্দু-মুসলমান সব এক সঙ্গে ক্ষেপে গেছে।

২

কনৈলায় তিনটে মহল্লার সর্দার ছিল গোপাল পাণ্ডে। তিনটে মহল্লার সবাই গ্রামের মধ্যে সন্ত গোবিন্দ সাহেবের লাগানো অশ্বত্থ গাছের তলায় এসে জুটেছে। গ্রামের যুবকদের লড়াই করার আহ্বান এসেছে। সেই চিঠি সবাইকে পড়ে শোনানো হচ্ছে। সভাপতি হয়েছে গ্রাম-প্রধান গোপাল পাণ্ডে। তার কাছে চিঠি এসেছে যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে এই গ্রাম থেকে বারো জন লোক পাঠাতে হবে। এই লোকগুলি বিশেষভাবে শিক্ষিত হওয়া চাই কারণ ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই। গ্রামের সকল জোয়ান ব্যক্তিই লাঠি তলোয়ার নিয়ে আজমগড় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু চিঠিতে লেখা নেই, কোথায় যেতে হবে। তা'ছাড়া অনেকের চোখে-মুখে কেমন যেন একটা দুর্ভাবনার ছায়া, কারণ গ্রামে গ্রামে লড়াই হলে কোনো কথাই ছিল না, চোদ্দ বৎসরের বালকও বিনা দ্বিধায় লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত কিন্তু এ লড়াই সে লড়াই নয়। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই, বিদেশীরা সমুদ্র পেরিয়ে এ দেশে এসেছে, তাদের দাপট কি সোজা! কোথায় যেতে হবে, কেমন লড়াই হবে—সব কিছুই গ্রামের লোকের কাছে অজানা। সভায় সকলের দৃষ্টি গোপাল পাণ্ডের দিকে। তার কথা মতোই সব কিছু হবে।

* * *

সাধু গোবিন্দ দাসের কথা সকলেই জানে, তিনি কখনও-সখনও এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করতেন। এক সময় গ্রাম-প্রধান গোপাল পাণ্ডে গোবিন্দ দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পাণ্ডেরা জলাভাবের জন্যে পুকুর কাটাত কিন্তু দুঃখের বিষয় পুকুর কাটালেই

জল পাওয়া যেত না। গোপাল পাণ্ডে গোবিন্দ দাসের শিষ্য হবার পর গুরুকে দুঃখ জানাতেই গোবিন্দ দাসের আশীর্বাদে পুকুর জলে ভরে ওঠে। সেই থেকে গোবিন্দ দাসকে খুব মান্য করা হত।

ইংরেজরা আসার পর দাস-প্রথা তুলে দেয়, কিন্তু তাতে বড়লোকদের কোনো অসুবিধা হয়নি, কারণ তারা নামমাত্র মজুরীতে অর্ধদাস পেত। অসুবিধা হল এই অর্ধ-দাসদের। মালিকদের সঙ্গে তাদের শুধু কাজের সম্বন্ধ, এদের মরা-বাঁচার কোনো ব্যাপারেই মালিকরা আদৌ চিন্তা করত না।

৩

গোপাল পাণ্ডে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে—নিজের গ্রামের মর্যাদা রক্ষা করা যেমন আমাদের কর্তব্য, তেমনি দেশের মর্যাদা বা স্বাধীনতা রক্ষা করাও আমাদের কর্তব্য। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা কাপুরুষের কাজ। চিঠিতে শুধু মাত্র লেখা আছে বাছাই করা বারো জন বাহাদুর পাঠাও, কিন্তু কোন সময়, কোথায় পাঠাতে হবে সেটা লেখা নেই। তা'ছাড়া আরও লেখা আছে—সব জিনিসপত্র দিয়ে পাঠাতে। কিন্তু যারা লড়াই করতে যাবে, তাদের সঙ্গে বড়-জোর আট-দশ দিনের খাবার ছাড়া আর বেশী কিছু পাঠানো সম্ভব নয়। তা'হলে সেটা দস্তুর মতো বোঝা হয়ে যাবে। আর সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল, আমাদের গ্রামে চার-পাঁচটার বেশী গাদা বন্দুক নেই, আর পলতে-ওয়ালা বন্দুকের চেয়ে লাঠি অনেক বেশী শক্তিশালী অস্ত্র।

—কিন্তু ফিরিঙ্গীদের নতুন বন্দুকের কাছে আমাদের গাদা বন্দুক কিছুই নয়। আমাদের একটা বন্দুক দাগতে ওরা দশটা দাগবে। —বলল একজন গ্রামবাসী।

—তা'হলে আমাদের কি কর্তব্য? —অন্য একজনের প্রশ্ন।

—আমাদের বারো জন জোয়ানকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে এই বারো জন কে কে যাবে, সে বিষয়ে নির্বাচন করা হবে কুরা প্রথায় (ভোট প্রথা)। গোপাল পাণ্ডের এই প্রস্তাবে সকলেই খুশী হল, এতে কারো অমতের বা অসন্তোষের কারণ নেই।

কনৈলার বাহাদুরেরা বন্দুক চালাতে জানত কিন্তু ইংরেজের মতো মিলিটারী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল না। লাঠির মতো তখন বন্দুক প্রায় ঘরে-ঘরে রাখা সুরু হয়েছে, এর জন্যে কোনো লাইসেন্স দরকার হত না। তবে গ্রামে গ্রামে লড়াইতে কখনও বন্দুকের ব্যবহার কেউ করত না। ধর্মযুদ্ধ বলে সে সব লড়াইতে শুধু লাঠির ব্যবহার ছিল, বন্দুক ব্যবহার করা হত শিকারের সময়। কিন্তু শিকারের উপযুক্ত জঙ্গলও এখন নামমাত্র অবশিষ্ট আছে। কখনও কখনও জলপক্ষী বা হরিণের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত—সেটাই শিকার করত শিকারীরা। হরিণ জাতীয় আরও এক প্রকার পশু ফসলের খুব ক্ষতি করত কিন্তু এই জন্তুদের নাম ছিল নীলগাই, তাই ফসলের ক্ষতি হলেও কোনো হিন্দু এদের হত্যা করত

না। কাজে লাগুক বা না-লাগুক বন্দুকের মালিকরা সব সময় বন্দুক সঙ্গে রাখত। বলা তো যায় না, কখন ইংরেজ শত্রু এ রাস্তা দিয়ে যাবে, হয়ত লড়াই হতে পারে তাদের সঙ্গে। নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুর হাতে মার খাওয়ার কোনো সার্থকতা নেই।

বর্তমান কনৈলার ব্রাহ্মণরা খুব গর্ব করত যে, তারা সরযূপারের মলাঁব বংশের ব্রাহ্মণ। লম্বাচওড়া শরীর ও লড়াই করবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকার মনোবল যে তারা মলাঁব-বাসীদের কাছ থেকে পেয়েছে এটা বলাই বাহুল্য। সরযূ নদীর অপর পারের ব্রাহ্মণরা এদের কাছে নীচু স্তরের বলে গণ্য হত। তাদের কন্যা-গ্রহণে এদের কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু নিজেদের কন্যা তাদের দান করতে আত্মমর্যাদায় লাগত। এর জন্যে কখনও কখনও এদের বিশ-পঁচিশ ক্রোশ দূর অবধি সম্বন্ধ ঠিক করতে যেতে হত। যাতায়াতের ব্যবস্থা তেমন ছিল না। হয় পায়ে হেঁটে, নতুবা ঘোড়ায় চেপে যাতায়াত করতে হত।

গোপাল পাণ্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ ঠিক হল সরযূর ওপারে। সময়টা ছিল আষাঢ় মাস, সন ১৮৫৭। অত দূরে অনেক বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধা। তবু রাস্তায় চলতে বিশ-পঞ্চাশ জন না হলেও সাহস হয় না। বাদ-সাদ দিয়ে সর্দার ও অন্যান্যদের মিলিয়ে জনা পঞ্চাশ লোক হল। সবাই সশস্ত্র।

যাওয়ার সময় কোনো অসুবিধা হয়নি, বিবাহ পর্ব শেষ হল। কিন্তু আসার সময় ইংরেজদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের এক সংঘর্ষ বাধল। তার জন্যে সকলকেই থেকে যেতে হল কয়েক দিন। গ্রামবাসীরা সকলে মিলে এই বরযাত্রী-বাহিনীর সকল ভার গ্রহণ করেছিল।

কনৈলার অধিবাসীদের বড় একটা গ্রামের বাইরে যাওয়ার দরকার হত না। তা'ছাড়া ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় লোক-লৌকিকতার জন্যেও কেউ গ্রাম ছেড়ে যেত না। চুড়িহার জাতিরা কনৈলাতে কয়েক ঘর বাস করত। তাদের পেশাই ছিল গ্রামে গ্রামে ঘুরে চুড়ি বিক্রী করা। ব্যবসার জন্যে মাঝে-মধ্যে মউ, মুহম্মদাবাদ ও আজমগড় যেতে হত এদের। অতএব এরাই ছিল গ্রামে সংবাদ সরবরাহকারী। অবশ্য এদের সংবাদের অনেকখানি অতিরঞ্জিত থাকত। কিন্তু এ ছাড়া বাইরের সংবাদ পাওয়ার আর কোনো সুযোগই গ্রামবাসীদের ছিল না।

৪

গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে বর্ষা সুরু হয়েছে। বর্ষাতি ফসল বোনা চলছে চারিদিকে। ফিরিঙ্গী-দের নিয়ে-আসা মকাইর চাষও করছে চাষীরা কিন্তু ততটা প্রচলন তখনও হয়নি। ফিরিঙ্গী-দের আমদানী-করা আনাজপত্র সম্পর্কে চাষীদের মনে সন্দেহ রয়েছে প্রচুর। ভোলা, গোপাল পাণ্ডের ঘরের লোক। চাষী-মজুরদের খবরদারী করে আর নিজেও খাটে মাথার

যায় পায়ে ফেলে। এই জন্যে ওকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে অনেকে, কিন্তু ভোলা সে সব কানেও তোলে না। কারণ ও মনিবের নুন খেয়েছে। কথা বলতে গেলে ঝামেলা হবে, তার চেয়ে চুপ করে থেকে মনিবের কাজ আদায় করে দেওয়াই ও কর্তব্য মনে করত। কিন্তু তবুও ভোলার মনে একটু অসন্তোষ ছিল, সেটা হল —ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে ওর ছেলে খদেরুকে কেন নেওয়া হল না। খদেরু যে-কোনো উচ্চবর্ণের পালোয়ানের চেয়ে বেশী শক্তি ধরে নিঃসন্দেহে। সে বার গাঁবপুরের সঙ্গে মারামারিতে খদেরুর লাঠির সামনে দাঁড়াবার মতো বাহাদুর এ তল্লাটে যে কেউ ছিল না সে কথা কে না জানে। মনিবের বন্দুক নিয়ে হরিণও শিকার করেছে কয়েকবার। তা'হলে আর ফিরিঙ্গী শিকার করা খদেরুর কাছে কি এমন শক্ত কাজ ? কিন্তু যুগ-যুগ ধরে ছোট-বড়র মধ্যে যে পার্থক্য চলে আসচে তাকে একলা ভোলা বা খদেরু ভাঙবে কি করে ! তাই মনের আফসোস মনেই থাকে ভোলার।

ক্ষেতে ধান গাছের চারা আনন্দে নৃত্য করছে হাওয়ার দোলায়। চারিদিকে সবুজ রঙ যেন ঢেলে দিয়েছে প্রকৃতি। এ বার অন্যান্য ফসল এত বেশী হয়েছে যে, চাষীরা স্বপ্নেও সেটা ভাবেনি। সবচেয়ে বেশী হয়েছে আম। গ্রামের বৃদ্ধদের কাছে শোনা যায় যে, এত আম হয়েছিল —যে শেয়াল-কুকুরও ঘেন্নায় ছোঁয়নি।

এত আনন্দের মধ্যে সংবাদ এল ইংরেজ দেশ ছেড়ে এখনও পালায়নি —লড়াই খুব জোর চলেছে। ১৮৫৭-র মার্চ মাসে সংবাদ এল, বীর কুঁবরসিং আজমগড় থেকে ইংরেজদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত করেছেন। লোকে ভাবল হয়ত আর ইংরেজদের মুখ দেখতে হবে না। গ্রামে গ্রামে বীর কুঁবরসিংহের নাম ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ বলতে লাগল কুঁবরসিংহের বয়স আশি, কেউ বলে —না, একশ'। কেউ আবার তাঁকে ভীষ্মের অবতার বলতে লাগল।

সময় বহে চলেছে, ক্ষেতের ফসলে পাক ধরেছে। ভোলা আর মংরু এখনো কাজ করছে —ওদের কাজের বুঝি বিরাম নেই।

আগেই বলেছি কনৈলা গ্রামটি এমন এক জায়গায় যার আশপাশ দিয়ে বহু দূর অবধি কোনো কাঁচা-পাকা রাস্তা নেই। তাই ইংরেজদের নিদারুণ অত্যাচার এদের সহ্য করতে হয়নি এখনও। ইংরেজদের অমানবিক অত্যাচার এ সময়ে অন্যান্য অঞ্চলে ক্রমশ বেড়েই চলেছে। শতশত নিরাপরাধ লোককে ফাঁসিতে লটকে দিচ্ছে। মেয়েদের ওপর বলাৎ-কার করতে, নির্বিচারে হত্যা করতে উৎসাহ যোগাচ্ছে ইংরেজ অফিসাররা।

গোবেচারী বলচু পাঠক সরকারী খাজনা জমা দিয়ে আজমগড় থেকে ফিরছে ! রাস্তায় সে ধরা পড়ল ইংরেজ সৈনিকের হাতে। দেখতে খুব পালোয়ান ছিল বলচু পাঠক —এই হল তার অপরাধ। অমন দশাসই চেহারা বলচুর অতএব সে নিশ্চয় বিদ্রোহীদের দলে

ছিল —কাজেই একে গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়া হোক। অনুনয়-বিনয় করে, খাজনার রসিদ দেখিয়ে, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করল বল্কু —কিন্তু ফাঁসি তার রদ হল না।

বহুবল গ্রামে ঢুকে ইংরেজরা নির্বিচারে হত্যা করল পুরুষদের; অতঃপর গ্রামের সুন্দরীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চলল। অবশেষে তিনজন স্ত্রীলোককে তারা ধরে নিয়ে গেল নিজেদের সঙ্গে।

পথে একটা নদীর সেতু পার হবার সময় বন্দীদের মধ্যে দু'জন স্ত্রীলোক জলে লাফিয়ে পড়ে সতীত্ব রক্ষা করল কিন্তু অন্যজন পারল না। তাই ইংরেজরা ঐ একজনের ওপরেই তাদের সম্মিলিত পাশবিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে শেষে আজমগড়ে তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ ফেলে দিয়ে গেল।

ইংরেজ সরকারের নতুন হুকুম হল, যার ঘরে বন্দুক বা তলোয়ার পাওয়া যাবে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। লড়াইতে জনগণও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই প্রাণভয়ে সকলেই বন্দুক লুকিয়ে ফেলতে লাগল। কর্মকারদের ঘরে তলোয়ার রূপ বদলে দা-কাটারী হয়ে গেল। বন্দুকগুলি সব যে-যার বাড়ির মাটির তলায় পুঁতে ফেলল।

গোপাল পাণ্ডে একখানি তলোয়ার উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিল। সেটা ভাঙতে কিছুতেই তার মন সরেনি। ইচ্ছা পাণ্ডের সেই তলোয়ার হত যে শত্রু-সংহার করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

কনৈলার পাণ্ডে বংশের মর্যাদা-রক্ষাকারী সেই তলোয়ার, কিন্তু ইংরেজরা তো সে সব কথা বুঝবে না, অতএব গোপাল পাণ্ডে আর ভোলা দু'জনে মিলে একটা বাঁশের নলের মধ্যে পুরে ধান ক্ষেতের মধ্যে পুঁতে ফেলল সেই তলোয়ার।

শতবর্ষ বাদে আজও হয়ত গোপাল পাণ্ডের সেই তলোয়ার কোথাও মাটির নীচে মরচে ধরা অবস্থায় আছে —হয়ত বা নেই। সন্ধানী মানুষের হাতে এখনও এসে পৌঁছায়নি সেই স্মৃতিচিহ্নটি।

* * *

ইংরেজদের নিত্য-নতুন মনগড়া আইনের চাপে লোকের মনোবল ভেঙে পড়ছে, তবুও গ্রামবাসীরা প্রাচীন পঞ্চায়েত প্রথা আঁকড়ে ধরে আছে। পঞ্চায়েতের বিচার এবং বিধান মেনে নেয় সকলে।

গোপাল পাণ্ডের পুত্র জানকী পাণ্ডে তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও ন্যায়প্রিয়তার জন্যে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়েও কর্তব্যপালনে তিনি বিরত হননি। —পঞ্চায়েতের ডাক পড়েছে, অতএব অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি গেলেন বিচার করতে এবং সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

স্বরাজ

কাল : ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ

মাত্র পাঁচ পুরুষ আগেও দেশের সকল লোকের মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আমরা হয়ত আর কোনো দিনই ইংরেজদের তাড়াতে পারব না। জন্মজন্মান্তরে, বংশ-পরম্পরায় ওদের অমানুষিক অত্যাচার আমাদের সহ্য করতে হবে। কিন্তু ক্রমশ অতীতকে ভুলে যেতে সুরু করল পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ। তারা নতন করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বিচার করল এবং কখনও-সখনও গোপনে দু-একটা চাপা প্রতিবাদের আওয়াজও তুলতে থাকল। অতীতের নির্যাতনের ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে নবযুগের মানুষ।

শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে কনৈলা ছিল সবার পিছনে। এ গ্রামের অধিবাসীদের অক্ষর-পরিচয় ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোনো এক সময়ে একজন অধ্যাপক এখানে এসে এখানকার অধিবাসীদের শিক্ষিত করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সার্থক হয়নি তাঁর সে চেষ্টা। দু-চারজন লোক 'রামাগতি দেহ মতি' পর্যন্ত শিখেছিল—এটাও বোধহয় রামচরিতমানসের ব্যাপকতার পরিণতি।

গ্রামের মধ্যে একমাত্র গোবর্ধন পাণ্ডে কোনো প্রকারে রামায়ণটা পড়ে ফেলতে পারতেন এবং মামুলী দু-একটা কাগজপত্র পড়তেন। গোবর্ধনের কাকা জানকী পাণ্ডে তাঁর ভাই মহাদেব পাণ্ডের বিদ্যাশিক্ষার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। মহাদেব পাণ্ডে পাঁজি-পুঁথিটা অথবা সত্যনারায়ণের পাঁচালিটা পড়তে পারতেন। এই বিদ্যার গৌরবেই তিনি দু-দশ গ্রামের মধ্যে মহাদেব পণ্ডিত বলে খ্যাত হয়ে ছিলেন। বড় ভাই জানকী পাণ্ডের মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত দায়িত্ব মহাদেব পণ্ডিতের ওপর এসে পড়ল।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেও মহাদেব পণ্ডিতকে পঞ্চায়েতের মুখ্য বলে স্বীকার করা হত কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এই মহাদেব পণ্ডিতের মুখেই নৈরাশ্যের কথা শোনা গেল—আজকাল আর লোকেরা পঞ্চায়েত মানে না, কথায় কথায় কোর্ট-আদালতে ছুটে যায়। এই সময় থেকেই পঞ্চায়েত প্রথা উঠে যায় সম্পূর্ণভাবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে নতুন সভ্যতার প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে দেশের সর্বত্র কিন্তু কনৈলা যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই রয়ে গেল। আন্দোলনের তরঙ্গ এতটুকু লাগেনি কনৈলার অঙ্গে।

রুশ-জাপান যুদ্ধ চলছে তখন। তার খবর কলকাতা-প্রবাসী পুলিশ কনস্টেবল, বাচ্চা পাঠক জানে। লেখাপড়া না জানলেও তার দুটো কান তো আছে, সেই কানে শুনেছে এ খবর। সে'বার ছুটিতে গাঁয়ে ফিরে খুড়োকেও সবিস্তারে সে গল্প করল। বলা বাহুল্য যে, অতিরঞ্জিতভাবেই গল্প করার নিয়ম। এইভাবে রুশ-জাপানের লড়াইয়ের কথা কনৈলার লোকের কাছে পৌঁছাল।

কনৈলার অধিবাসীরা কখনো গাঁ ছেড়ে বাইরে যেত না চাকরি করবার জন্তে। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে এরা খুবই অনভিজ্ঞ ছিল। ক্রমশ গ্রামে পাঠশালা বসল, শিক্ষার প্রসার সুরু হল কনৈলাতে।

সরযূপার থেকে আগত পাণ্ডে ব্রাহ্মণদের জমিদারী কনৈলাতে। বংশপরম্পরায় তারা ভোগ করেছে এই জমিদারী। এখানকার মাটিই তাদের জন্মভূমি, এই মাটিকেই তারা তাদের ভবিষ্যৎ বলে জানে। কোনোদিন যে তাদের পূর্ব পুরুষ সরযূপার থেকে এখানে এসেছিল, সে কথা এখন তারা ভুলে গেছে। ভর, চামার, চুড়িহার আর দর্জি জাতিও বহুকাল থেকে কনৈলাতে বাস করছে। কনৈলার সঙ্গে এদের সম্বন্ধ এক প্রকার অনাদি-কালের, কিন্তু যেটুকু জমির ওপর তাদের ছোট্ট কুটির দাঁড়িয়ে আছে সেইটুকু ছাড়া তারা আর কোনো কিছুর হকদার নয়। তাদেরই পরিশ্রমে সীমাহীন মাঠে সবুজ ফসল ফলে, কিন্তু সে সবই তাদের মনিবের। সেই মনিব দয়া করে পরিশ্রমের মজুরী বাবদ যতটুকু তাদের হাতে তুলে দেবে ততটুকুতে তাদের অধিকার। সারা জীবন প্রাণপাত মেহনতের বদলে মনিবেরা কখনো এদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর দিত না। কার্তিক মাসের ফসল কাটার পর মাসখানেক সময় একটু ভালো যেত ; পৌষ-মাঘ খুবই কষ্টে চলত ; ফাল্গুন-চৈত্র মাসের ফসল কাটার শেষ অবধি আবার একটু অবস্থার উন্নতি হত বটে কিন্তু তার আয়ু জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি অবধি। আষাঢ়-শ্রাবণে এক প্রকার অনাহারেই থাকতে হত এই সব মানুষদের। বর্ষার শেষে জমিতে নতুন ঘাস জন্মালে তাই দিয়ে চলত আবার কয়েকটা দিন। এত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও এই ছোট জাতিরা বেঁচে আছে মনিবদের মুখের দিকে চেয়ে। ছোট-বড়র এই প্রভেদ জোর করেই তৈরী করেছিল বড়রা, সে কথা জানে সকলেই। হাতে টাকা থাকলেও এই ছোট জাতের মানুষরা জমি কিনতে পারত না, কারণ তাদের কাছে কেউ জমি বিক্রী করত না। তারা যদি নিজেদের জমিতে ফসল ফলাবার সুযোগ পায় তা'হলে বড়লোকদের গোলামী করবে কে ?

ইচ্ছা পাণ্ডের সাত পুরুষের মধ্যেই পাণ্ডে-পরিবার কনৈলাতে এক ঘরের জায়গায় পঁচিশ ঘর বেড়ে দাঁড়ায়। এদের মধ্যে মাত্র চার-পাঁচ ঘর বাদে সকলকেই বারোমাস ভাত-কাপড়ের চিন্তা করতে হত। এদের সকলের দুর্দশার সীমা ছিল না। ক্রমশ তাদের জমি-জমা অন্যের কাছে হয় বন্ধক, নয় বিক্রী হতে লাগল পেটের দায়ে। কেউ বা দু-একটা যজমানী সুরু করল, কেউ বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হল। কিন্তু চেনা-জানা জায়গায় ভিক্ষা করতেও আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে তাই তারা সরযূপারে চলে যেতে লাগল অনেকে। কেউ আবার বেরিয়ে পড়ল দিনমজুরী করবার আশায় বিদেশে।

গত শতাব্দীর উত্তরার্ধে এমনি এক যুবক বিদেশে বেরিয়ে পড়ল চাকুরীর আশায়। এক কালে গ্রামের মধ্যে এদের জমি ছিল সবচেয়ে বেশী। কিন্তু পিতার রক্ষিতার সন্তান

বা বৈমাত্রেয় ভাইদের হাতে পড়ল সব কিছু। জীবিকার সন্ধানে সে এসে পৌঁছাল ত্রিনিদাদে। জাহাজে সে একটা কাজ পেল, আর চৌদ্দ বছর দেশ-বিদেশে ঘুরে, চাকরি করে ফিরে এল মাতৃভূমিতে।

ইতিমধ্যে বৈমাত্রেয় ভাইরা জমি-জমা বেচে কিম্বা বন্ধক দিয়ে সর্বস্বান্ত, দেউলিয়া হয়ে বসে আছে। যুবক জয়পাল পাণ্ডে চাকরি করে সঙ্গে এনেছিল পনের হাজার টাকা। সে তাই দিয়ে সমস্ত সম্পত্তিই উদ্ধার করল। ভগ্নীর ও ভাইয়ের বিবাহ দিয়ে, নিজে বিবাহ করে আবার সুখের সংসার পাতল। কনৈলার প্রাচীন সংস্কার অনেকখানি শুধরে গেল এই জয়পাল পাণ্ডের চেষ্টায়।

উত্তর ভারতীয় যুবকদের শারীরিক পরিশ্রম করে রোজগার করবার মাত্র দুটি প্রশস্ত স্থান, মাদ্রাজ ও কলকাতা। কিছু কিছু বোম্বাইয়ের কাপড়ের মিলেও মজুরী খাটে। এই সব জায়গায় বেশীরভাগ এরা দারোয়ানী, চৌকিদারী বা গরু-মহিষ পালন প্রভৃতির কাজ করে থাকে। ওখানে ওদের 'ভাইয়া' বলে সম্বোধন করা হয়, যার অর্থ কুলি-মজুর। এরা পশ্চিমে লাহোর এবং পূর্বে ভারতের বাইরে রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যায়—পরিশ্রম করে রোজগার করবার জন্যে।

কনৈলাবাসীদের কাছেও এখন নিজেদের গ্রাম খুব ছোট মনে হতে লাগল এবং তারাও বেরিয়ে পড়ল গ্রামের বাইরে শহরে কাজের আশায়। যারা বড়লোক তারা বাবুলোক, চাষবাস করা তাদের পক্ষে অসম্ভব, তবু ছোটজাতের মানুষরা কোনো সুযোগ পেল না।

এ ছাড়াও অন্যদিক থেকে ব্রাহ্মণদের দারিদ্র্য বেড়ে যায়। প্রথমে অন্য অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা ধন-সম্পত্তি দেখেই এখানে মেয়ের বিবাহ দিত কিন্তু এখন সে সুযোগ হারাল কনৈলাবাসী। এখন নিজ গ্রামের আশপাশেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হতে লাগল, তাও যাদের কিছু খরচ করবার সামর্থ্য আছে তাদেরই। বেশীরভাগ যুবকেরা অর্থাভাবে অবিবাহিত থাকতে বাধ্য হল, তার ফলে তাদের বংশ লোপ পেতে লাগল। গ্রামে বালবিধবার সংখ্যাও কম ছিল না, যদি বিধবাবিবাহ প্রথা চালু থাকত তা'হলে অমন বহু বালবিধবা কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচত এবং অনেকের বংশরক্ষাও হত, কিন্তু বিধবাবিবাহের প্রচলন তো নেই-ই, উপরন্তু অমন কথা উচ্চারণ করলে হয়ত সমাজচ্যুত হতে হবে। অথচ সকল বিধবা যে সারা জীবন নিষ্কলঙ্ক বৈধব্য পালন করেছে সে কথাও বলা যায় না, তার ফলে ভ্রূণহত্যা ছাড়া উপায়হীনা বিধবা তরুণীদের অন্য পথ ছিল না। কুমারী তরুণীদের বয়স বিশ বছর পার হয়ে গেলে তার বিয়ে হত না। গ্রামের লোকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করে, নয় তো কোনো আত্মীয়-স্বজনের দ্বারস্থ হয়ে থাকতে হত তাকে। কোনো বিধবা যদি এক মাসের বেশী কোনো আত্মীয়-বাড়ি গিয়ে থাকত—গ্রামের লোক জোর করে তাকে গ্রাম থেকে বিদায় করবার চেষ্টা করত। এমনি অবস্থায় এসে দাঁড়াল ধর্মকর্ম আর সমাজ।

২

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে দেশে রাজনীতিক জাগরণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। অসহযোগ আন্দোলন দেশের লোকের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। দেশবাসী খোলাখুলিভাবে ইংরেজদের বিরোধিতা করতে লাগল। আইন ভঙ্গ চলতে লাগল নানা স্থানে, কিন্তু কনৈলা তখনও এ ব্যাপারের কিছুই জানে না। শিক্ষার প্রসার কিছু কিছু হয়েছে, দু চারজন যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে এবং যারা দরকারে গ্রামের বাইরে যেত, তাদের মারফৎ বাইরের সংবাদ কিছু কিছু এসে পৌঁছাত কনৈলায়। এমনি করে বাইরের খবর ক্রমশ জানতে ও শুনতে পেল কনৈলাবাসী। কিন্তু গ্রামের আবহাওয়া এমনি ছিল যে, তাদের পক্ষে কোনো কিছু করার উৎসাহ বা সাহস ছিল না। ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত কোনো কনৈলাবাসী আন্দোলন করে জেল খাটেনি। তাই বলে কনৈলাবাসী একেবারেই যে কিছুই করেনি, সেটা জোর করে বলা যায় না। কেননা ইংরেজদের জেলখানায় তত জায়গা ছিল না। যাইহোক কনৈলা সব ব্যাপারেই পিছিয়ে পড়ে গিয়েছিল।

নতুন বংশধরেরা মেহনত করে পতিত জমি উদ্ধার করল এবং ক্রমশ কনৈলাকে সংস্কারমুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। আর্থিক অবস্থারও কিছুটা উন্নতি হল। অবশ্য সেটা উচ্চজাতি ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমস্ত জনসংখ্যার অর্ধেক নিম্নবর্ণের মানুষদের অবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেল।

গোপাল পাণ্ডে ভাইদের সঙ্গে বাস করত। মেজ ভাইয়ের কোনো ছেলে ছিল না, আর ছোট ভাইয়ের তিনটি ছেলে। গোপাল পাণ্ডের মৃত্যুর পর তার পুত্র জানকী পাণ্ডে অন্য ভাইদের সঙ্গে মিলেমিশে এবং আমরণ চেষ্টা করে একান্নভুক্ত সংসার রেখেছিল, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে সংসারে ভাঙন ধরল এবং এক ঘর চার ঘর হয়ে গেল, আজও সেই চার ঘরই রয়েছে আলাদা আলাদা।

অসহযোগ আন্দোলনের পর সুরু হল লবণ আইন অমান্য আন্দোলন। দেশবাসী আওয়াজ তুলল, 'ইংরেজ ভারত ছাড়'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের হেরে যাওয়ার খবর আসছিল। কনৈলার মানুষও এ খবর জানতে পারল। আরও জানল জাপানীরা আসামে এসে গেছে, কলকাতায় বোমা পড়েছে। যদিও ভৌগোলিক পরিস্থিতি কনৈলাকে পিছনে ফেলে রেখেছে তবুও এ বার কনৈলাবাসী আন্দোলনে যোগ দিল। প্রথমে এদের বিশ্বাস ছিল না যে, সত্যিই ইংরেজ কোনোদিন ভারত ছেড়ে চলে যাবে। এমনি করে কনৈলাবাসী আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে লাগল।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত কনৈলার ক্রোশ খানেক দূরে একটা মাত্র ইমদাদী মাদ্রাসা ছিল ছোটদের লেখাপড়ার জন্যে। এখন গ্রামের ভেতর সরকারী সাহায্য-বঞ্চিত একটা স্কুল

হয়েছে। এ বার গ্রামের পাশেই বড় স্কুল স্থাপিত হল। বিদ্যাশিক্ষাও বেশ সুচারুভাবেই চলতে থাকল দিনের পর দিন।

গোপাল পাণ্ডের প্রপৌত্র শ্যামলাল পাণ্ডে গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। পঞ্চায়েতের নির্বাচনে শ্যামলাল পাণ্ডে গ্রাম-প্রধান নির্ব্যাচিত হয়েছেন। ইনি বয়সে প্রৌঢ় এবং লেখাপড়ায় 'মিড্‌ল' পাস। গ্রামবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ইনি।

শ্যামলালের পিতা গোবর্ধন পাণ্ডে নিজের মিতব্যয়িতার ফলে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। পিতার সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি চেয়েছিলেন নিজে কিছুটা করবেন। সেই টাকা খাটিয়ে আরও কিছুটা বাড়ালেন। তখন ভাবলেন, কনৈলার পূর্বে জিগরখণ্ডী গ্রামে রাজপুতদের জমিদারীটা কিনে নেবেন। এই রাজপুতরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে ভাগাভাগি হয়ে যায়, ফলে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়-তাদের বড় জমিদারী। চেষ্টা করে গোবর্ধন পাণ্ডে তাঁর ভগ্নীর শ্বশুর মরজাদ দুবের নামে সমস্ত জমিদারী কিনে নেন। মরজাদ দুবে ধার্মিক লোক ছিলেন। জমিদারী তাঁর নাম থেকে তাড়াতাড়ি লেখাপড়া করে দিতে ব্যস্ত হলেন আসল মালিক গোবর্ধন পাণ্ডের নামে। কিন্তু নিয়তির এমন পরিহাস যে, কয়েক দিনের মধ্যেই মরজাদ দুবে মারা যান এবং তাঁর বড় ছেলে সমস্ত জমিদারীর ওপর অধিকার কায়েম করে গোবর্ধন পাণ্ডেকে ফাঁকি দেয়। এই বেইমানীর শোকে ভেঙে পড়েন গোবর্ধন পাণ্ডে।

শ্যামলালও চেষ্টা করতে থাকেন পিতার সঙ্গে বেইমানীর প্রতিশোধ গ্রহণ করবার। কখনও কখনও সেই জমির দিকে তাকিয়ে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতেন —এই পঞ্চাশ হাজার টাকার জমিদারীর প্রকৃত মালিক আমি।

শ্যামলালের মতো গ্রামের আর সকলেই ভাবত, তারা যে সমস্ত পতিত জমি, পুনরুদ্ধার করেছে, তাই দিয়েই তাদেরও অবস্থা ফিরবে। ছোটবেলা থেকে তারা শুনে এসেছে —উত্তম ক্ষেতী, মধ্যম বাণিজ্য, ঘৃণ্য চাকুরি ভিখারী সমান।

বিদ্যাশিক্ষা এখন আর শুধু ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নীচু জাতের ঘরের ছেলেরাও লেখাপড়া শিখতে সুরু করেছে এবং কতিত্বের সঙ্গে একের পর এক 'মিড্‌ল' পাশ করছে। লেখাপড়া শেখা নিয়ে গ্রামের মধ্যে দলাদলি সুরু হল, কে কাকে পিছিয়ে রাখতে পারে এই নিয়ে চলল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এমন কি এই সব দলাদলি এক-এক সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি করত যা কেউ ভাবতেও পারে না।

চুড়িহার জাতি এই গ্রামের পুরনো বাসিন্দা। মরবার পর তাদের কবর দেওয়া হয়ে আসছে একশ' বছরেরও আগে থেকে। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা এদের। নমাজ পড়বার জন্যে এক সময়ে এরা একটা নতুন মসজিদ তৈরী করতে মনস্থ করল। অর্থের অভাবে

সম্পূর্ণ ইঁট-চুণের মোকাম তৈরী করা সম্ভব হবে না, তাই তারা ঠিক করল, কাঠ দিয়ে তৈরী করবে তাদের মসজিদ।

ভালো জায়গা দেখে তারা কাঠ জোগাড় করে জড়ো করল, এতে গ্রাম-প্রধান শ্যামলালের কোনো অমত ছিল না কেননা তার কাছে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমান। কিন্তু তার বিপক্ষ-দলের লোকেরা এর বিরোধিতা করতে দেরী করল না। শ্যামলালের শত্রুদের কাজই ছিল শ্যামলালের কাজের খুঁত খুঁজে খুঁজে বার করা। এ ক্ষেত্রে তো হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ উস্কে দিয়ে মজা দেখা খুবই সহজ! তাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি হল—আমাদের গ্রামে মুসলমানরা মসজিদ বানাতে পারবে না। একদিন তারা সুযোগ মতো সেই কাঠগুলি লুট করে নিয়ে গেল এবং প্রচার করল পাণ্ডেই এ কাজ করেছে। তার ফলে সম্মান বাঁচাতে শ্যামলালকে ক্ষতিপূরণ দিতে হল।

৩

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। ইংরেজ সত্যিসত্যিই ভারত ছেড়ে চলে গেল। কর্নৈলার কয়েকজন শিক্ষিত লোক ছাড়া এ কথা কেউ বিশ্বাস করল না। তারা বলল, ইংরেজরা হয়ত সাময়িকভাবে কিছু কিছু রাজকার্য ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেছে। কর্নৈলার অধিবাসী ইংরেজ-তাড়ানো আন্দোলনে যেমন খুব বেশী অংশগ্রহণ করেনি, তেমনি ইংরেজকে তোষামোদও কেউ করেনি অথবা সরকারী চাকুরির জন্যে ইংরেজদের কাছে কৃতজ্ঞ হবারও প্রয়োজন হয়নি কোনো ব্যক্তির। ইংরেজ চলে গিয়ে প্রমাণ করে গেল যে, অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভিত চিরস্থায়ী হয় না। গ্রামের ছোট থেকে বড় জাতির সব মানুষ আস্তে আস্তে বিশ্বাস করতে সুরু করল যে, এ বার তারা স্বাধীন হয়েছে।

গ্রাম-পঞ্চায়েতের নির্বাচন সুরু হল কর্নৈলায়। ইতিহাসে এই প্রথম উচ্চ ও নিম্ন জাতির মানুষদের একত্রে মত প্রকাশের অধিকার কার্যকরী হল। একই বিষয়ে একই ভোট দেবার অধিকার পেল দু-দলেই। এতদিন যারা ছিল বঞ্চিত আজ তারা আবছা-আবছা দেখতে সুরু করল তাদের অধিকারকে। আজ থেকে তারা বুঝতে লাগল যে, সহস্র সহস্র বছর ধরে উচ্চজাতি তাদের ওপর কি অত্যাচার না করে এসেছে। এতদিন পঞ্চায়েতের মুখ্য হবার অধিকার ছিল ব্রাহ্মণদের। কিন্তু এখন আর তা নেই, যে বেশী ভোট পাবে সে-ই নির্বাচিত হবে। নীচু জাতের সবাই নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে এতদিন, তাই আজ তারা সকলে মিলে নির্বাচিত করল তাদের জাতের লোককে।

ভোটের ফলাফল বেরুল এবং সকলে অবাক হয়ে দেখল যে, বড় জাতের প্রতিদ্বন্দ্বী অর্ধেক ভোটও পায়নি। ছোট জাতের মধ্যে থেকে যে নির্বাচিত হল অগত্যা তাকেই সকলে মেনে নিল মুখ্য বলে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কনৈলার চেহারারও পরিবর্তন হল। পুরনো জীবন আর পুরনো মনোভাব পাল্টে যেতে লাগল। আগে পঞ্চাশ বৎসর একাদিক্রমে চাষ করলেও সেই জমিতে চাষীর কোনো অধিকার ছিল না। বর্তমান অবস্থায় চাষী যে জমি চাষ করবে তার হাত থেকে সে জমি কেড়ে নেওয়া মুস্কিল হল। গ্রামের সমস্ত পতিত জমির মালিক হল সমস্ত গ্রামবাসী এবং চাষ করবার প্রথম অধিকার পেল ভূমিহীন চাষী, মজুর অথবা ছোট জাতির লোকেরা। এইভাবে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হওয়ার ভয়ে মনিবেরা শঙ্কিত হয়ে উঠল। দৌড়োদৌড়ি করেও কোনো ফল হল না মালিকপক্ষের। এখন ব্রাহ্মণদের চাষ করা এক প্রকার পাপ বলে গণ্য করা হয়, তাই তাদের নির্ভর করে থাকতে হবে চাষীদের ওপর, কিন্তু যে চাষ করবে তার অধিকার আগে —এ জন্যে উচ্চ বর্ণের মানুষদের হিংসা হওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু উপায়ও নেই।

মাত্র কয়েক বছর আগে যে নিম্নজাতির লোককে লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দেওয়া হত, এমন কি তাদের নিশ্চিহ্ন করবারও ব্যবস্থা হত আজ আর সে'দিন নেই। যুগ যুগ ধরে ছোটদের ওপর অত্যাচারের প্রতিফল তারা নত মস্তকে মেনে নিল।

গোপাল পাণ্ডের ভাইয়ের তিন পুত্রের মধ্যে মথুরা পাণ্ডে ছিল মধ্যম। তার ছেলে বংশী পাণ্ডের পুত্র রামচন্দ্র পাণ্ডে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি প্রায় বৃদ্ধ। সমস্ত গ্রামে সংস্কৃত জানতেন একমাত্র রামচন্দ্র পাণ্ডে, তা'ছাড়া দেশ-ভ্রমণও তিনি কিছু কিছু করেছেন। তাই তাঁকে রামচন্দ্র পণ্ডিত বলেই মান্য করত সবাই। ক্ষেত বা জমিজমাও ছিল তাঁর যথেষ্ট। গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী চালান দেবার মতো চাষ ছিল আখের। সব্জিরও চাষ হত প্রচুর। রপ্তানীর লোভ রামচন্দ্র পণ্ডিতেরও ছিল, কিন্তু চাষ করতে পরিশ্রমের দরকার সবচেয়ে বেশী।

গরমের সময় আখ পোঁতা হয় এবং সমস্ত গরমকাল কুয়ো থেকে জল এনে গাছের গোড়ায় দিতে হত যাতে লু লেগে গাছের ক্ষতি না হয়। তারপর বর্ষায় যদি অন্য কোনো বিপদ না ঘটে তা'হলে ফলন ভালো হয় এবং তাতে মুনাফাও প্রচুর।

বিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধ থেকে কনৈলার পরিবর্তন সুরু হয়েছে। বর্তমানে আজমগড় থেকে কনৈলা পর্যন্ত এক কাঁচা-পাকা রাস্তা তৈরী হয়েছে এবং এই রাস্তা শিসবা (শিংশপা) হয়ে মঙ্গই নদীর পারে অনেক দূর চলে গেছে। বর্তমানে কনৈলাতে রিক্সা ও লরী যাতায়াত করছে। হয়ত আরও কিছুদিন বাদে মোটর-বাসে ছ'ঘণ্টায় বারাণসী যাবে কনৈলাবাসী। আজকের অবস্থা দেখে মনে হয় শিসবার লুপ্তভাগ্য বোধহয় আবার ফিরে আসবে একদিন। তীহাতে এখন হাইস্কুল চলছে। যদি কনৈলাবাসী তখন অদূরদর্শিতার পরিচয় না দিত তা'হলে এই স্কুল কনৈলাতেই হত। চারদিকে যাতায়াতের সুবিধা ক্রমশ উন্নত হচ্ছে, তবে কনৈলা গ্রামে আখ-মাড়াইয়ের কল বসাবার ব্যবস্থা এখনও হয়নি।

রামচন্দ্র পণ্ডিত আখের চাষ করবার জন্যে নিজের ক্ষেতে জল দিতে লাগলেন। আখের চারা কেটে রাত্রে ভিজিয়ে দিলেন, সকালে সেগুলি পুঁতে দেওয়া হবে। সকালে গেলেন চাষীদের ডাকতে চারা পুঁতবার জন্যে। কিন্তু তারা আসতে অস্বীকার করল। কারণ যারা চাষ করে তাদের জন্যে জমির একটা টুকরো ছেড়ে দেওয়া হত মজুরী হিসাবে। গত বছর চাষের সময় জমির যে অংশটুকু চাষীরা পেয়েছিল এ বার রামচন্দ্র পণ্ডিত সে জমিটা নিজে জল দিয়ে ভিজিয়ে দিলেন নিজের চাষের জন্যে, আর চাষীদের দিতে চাইলেন অন্য একটা অংশ। কারণ এ বছর যদি ঐ একই জমি চাষীকে দেওয়া হয় তা'হলে সেই অংশটুকু চাষীর অধিকারে চলে যাবে। এই অবিচারের প্রতিবাদে রামচন্দ্রের জমিতে কাজ করতে কেউ রাজি হল না। ভর, চামার প্রভৃতি সকল জাতির চাষীর কাছে গিয়ে রামচন্দ্র পণ্ডিত ভালো করে বুঝলেন যে, ছোটরা সকলে একই সুরে গান গাইছে —যুগের পরিবর্তন ঘটছে।

যদি সেইদিনই আখ বোনা না হয় তা'হলে ভিজানো ক্ষেত শুকিয়ে যাবে এবং ভিজানো চারা নষ্ট হবে। খবর গেল ইচ্ছা পাণ্ডের বংশধরদের কানে, সৌভাগ্যবশত এদের ঘরে ঘরে মিল ছিল। আখ পোঁতা না হলে তো সমস্ত ব্রাহ্মণকুলের অপমান —এই মনে করে সকল ব্রাহ্মণ তরুণরা ক্ষেতে এসে দাঁড়াল এবং বহু পরিশ্রমে কাজ শেষ করল। এমনি করে সে'দিন রামচন্দ্র পণ্ডিতের মানরক্ষা হল।

সময়টা সঙ্কটের মুখোমুখিই বলা চলে। ছোট-বড় দুই জাতির মধ্যে দুটি আলাদা দলের সংগঠন হয়ে যেতে সভা-সমিতির প্রয়োজন হল না। রামচন্দ্র পণ্ডিত ঘোরতর কম্যুনিস্ট-বিরোধী ছিলেন। বলতেন —অমুক গ্রামের কম্যুনিস্টরা এসে এই গ্রামটা নষ্ট করে দিয়েছে।

কেউ যদি প্রশ্ন করত —আপনি কখনও গ্রামের মধ্যে কোনো কম্যুনিস্টকে দেখেছেন?

—মাথা খারাপ? গ্রামের মধ্যে যদি দেখতে পেতাম তো ওদের মাথা আস্ত রাখতাম? ওরা রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি আসে।

অন্যদের মতো রামচন্দ্র পণ্ডিতেরও ধারণা যে, এই সব ছোট জাতদের মাথায় তুলেছে কম্যুনিস্টরা। বড় জাতদের অধঃপতনের মূল কারণ কম্যুনিজম। অথচ কনৈলাবাসী কখনও কোনো কম্যুনিস্ট কর্মীকে চোখেও দেখেনি। তাদের কাছে সোসালিস্ট, প্রজা-সোসালিস্ট, কম্যুনিস্ট —সবই এক কথা। ওটা অনেকটা নামের আতঙ্ক।

রামচন্দ্র পণ্ডিতের বয়স হয়েছে; এখন আর কোদাল চালাবার ক্ষমতা নেই যে নিজে চাষ করবেন। অতএব অন্যের ভরসায় তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে বাকি জীবনটা।

নরহতা গ্রামে শ্যামলালের বেশ কিছু জমি-জমা ছিল, যার ফসল বিক্রী করলে অনায়াসে দেড়-দু'হাজার টাকা পাওয়া যেত। দিন বেশ কাটছিল শ্যামলাল পাণ্ডের,

কিন্তু কে জানত যে তারই কপালে এমন করে একের পর এক বিপদ আসবে? সে বছর ফসলের ফলনও যেমন কম হল তেমনি ঠিক চাষের আগেই সবচেয়ে ভালো বলদ-জোড়া মারা গেল। সাত-আটশ' টাকা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলদ কিনে আনা তো মুখের কথা নয়, আজমগড়ের এ পাশে কখনও মহিষ দিয়ে চাষ করতে দেখা যায়নি। কিন্তু দামে সস্তা বলে সাড়ে তিনশ' টাকায় মহিষ কিনে আনল শ্যামলাল এবং নিরুপায় হয়ে নিজেকেই লাঙ্গল ধরতে হল। মহিষ দিয়ে চাষ সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণদের লাঙ্গল ধরতে দেখে সকলে আন্দাজ করল —সত্যি সত্যি এ বার কলিযুগ সুরু হয়েছে।

জয়পাল পাণ্ডে প্রতিনিয়ত চিন্তা করে গ্রামের আরও উন্নতি কিসে করা যায়। নিজের সংসার দিন দিন বাড়ছে, আটার খরচও বাড়ছে, তাই বাধ্য হয়ে সে মাথা খাটিয়ে বলদে-টানা চাকী বসালো ঘরে। চাষের জন্য সর্বসমেত ৫০-৬০ একর জমি আছে জয়পালের। এর কিছুটা মজুর দিয়ে চাষ করানো হয়, কিছুটা নিজেরা করে, কিন্তু তাতে মন ওঠে না। তাই জয়পাল ভাবে, একটা ট্রাক্টর আনলে বেশ হয়। কিন্তু মাত্র ৫০-৬০ একর জমির জন্যে আট-দশ হাজার টাকা খরচ করে একটা ট্রাক্টর কিনলে পোষাবে না —ভাড়া দিলে চলতে পারে। কিন্তু কনৈলা গ্রামে এই প্রথম ট্রাক্টর আসবে —লোকে কিভাবে গ্রহণ করবে কে জানে। তারপর চাষের সময় যদি মেসিন বিগড়ে যায় তা'হলে সেটা মেরামত করানোও মুখের কথা নয়। তখন ঘরে না থাকবে গরু-মহিষ যে কোনো রকমে চাষের কাজ চালিয়ে নেবে। সাত-পাঁচ চিন্তা করে জয়পাল মন থেকে ট্রাক্টরের পরিকল্পনা ছেড়ে দিল। কিন্তু জয়পালের ছেলেরা চিন্তা করতে লাগল।

রামচন্দ্র পাণ্ডে তার বন্ধুর কাছে গেল পরামর্শ নিতে। বন্ধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল —কি করবে বল, আগেকার মন্ত্র ছিল এক ক্ষেতকে চার কর, আর এখনকার মন্ত্র হল চার ক্ষেতকে এক কর। সে'দিন যেমন আখ চাষের সময় সকলে মিলে কাজ করেছিলে আজও তেমনি সকলে মিলে চাষ-আবাদ কর। হাঁড়ি আলাদা থাক, কিন্তু চাষ হোক সমবায় প্রথায়।

রামচন্দ্রের তবুও মন ওঠে না, বলে —কিন্তু এতে কি সকলে রাজি হবে?

—রাজি না হলে চলবে না। বোঝাতে হবে যে, এইভাবে কাজ না করলে সকলেই মরবে। সরকারের নতুন আইন হয়েছে, দু'বছর চাষ না করে জমি ফেলে রাখলে সে জমি সরকার খাস দখলে নিয়ে নেবে। অতএব সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হল তুমি রামসহায় পাণ্ডের ছেলেদের ক্ষেতের সঙ্গে নিজের ক্ষেত এক করে মিলেমিশে চাষ কর। বিঘে পিছু দু-তিন মণ আনাজের বন্দোবস্ত ঠিক করে নাও, যাতে কেউ কাউকে ঠকাতে না পারে। বন্যার সময় ভেড়া-ছাগল একই জায়গায় বাস করে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে —তোমরা তো মানুষ,

—বেশ, দেখি চেষ্টা করে, শ্যামলালের ভাই আর হরিহর কাকার ছেলেরা তো এক কথায় রাজি হয়ে যাবে, কিন্তু জয়মঙ্গল কাকা আর বদরী কাকাকে বোঝানোই মুস্কিল।

কনৈলার প্রত্যেক জমি-মালিকের সামনে এই চাষের সমস্যা এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিল। এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র রাস্তা—সম্মিলিত চাষের ব্যবস্থা। বেশীরভাগ লোকে এ ব্যবস্থা শুনল না, বা মানল না। রামচন্দ্র পণ্ডিতের মতো দু-একজন যদিও কথাটা কান দিয়ে শুনল কিন্তু কার্যকরী করার বিষয়ে ভরসা করতে পারল না। কনৈলায় নিম্নবর্ণের মানুষরা সব কিছুর অধিকার থেকে যে এখন বঞ্চিত নয়—এ কথা তারা সর্বান্তকরণে মেনে নিতে পারছে না কিছুতেই।

এখন থেকে গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে যা কিছু চেষ্টা করতে হবে সেটা পূর্বের মতো শতকরা ৪০ ভাগের জন্যে নয়, শতকরা ১০০ জন ছোটবড় সকল লোকের জন্যে। ছোটদের ক্ষেত কম থাকতে পারে কিন্তু সবচেয়ে বড় শক্তি তাদের লাঙ্গল, পরিশ্রম, আর একতা। অতএব এখন আর তাদের অস্বীকার করা চলতে পারে না। যুগ-যুগ ধরে কনৈলার আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ওপর এমন আঘাত ও অত্যাচার হয়ে আসছে যে আর বেশী দিন কনৈলার মতো গাঁয়ের টিঁকে থাকা কঠিন।

বর্তমান কালে শিক্ষার প্রসারে এ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। গ্রামের যে লোক একটু লেখাপড়া শিখেছে সে গ্রামের এই নানা রকম ঝামেলা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চাকরি নিয়ে প্রবাসে চলে যাওয়া পছন্দ করছে।

শ্যামলালের পরিবারের কথাই ধরা যাক। তার বড়ভাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই গ্রাম-ছাড়া। ছোটভাই গত কয়েক বৎসর যাবৎ দিল্লিতে গিয়ে মিষ্টির দোকান খুলে ব্যবসা সুরু করেছে। গ্রামের জমিদারী ভোগ করার চেয়ে সপরিবারে দিল্লিতে যে কোনো কাজ করতে এরা প্রস্তুত।

শ্যামলাল আর রামধারী দুই ভাই গ্রামেই রয়ে গেছে কারণ দু'জনেরই বয়স ষাটের কাছাকাছি। চাষ-আবাদের দেখাশুনা এরা দু'ভাই না করলে অন্য উপায় নেই। এদের সন্তান সন্ততি আরও শিক্ষিত হল। শ্যামলালের তিন ছেলের বড় জন এম. এ. পাশ করে সারনাথ মাধ্যমিক স্কুলে মাষ্টারী করতে গেছে। গ্রাম বা চাষবাসের কোনো ধার ধারত না। বছরে বা ছ'মাসে ২-৩ দিনের জন্যে গ্রামে ছুটি ভোগ করতে আসত। দ্বিতীয় ছেলে এফ. এ. ফেল করে টি. বি. হাসপাতালে কেরানীগিরি করতে গেছে। পরিবারের আরও দুই ছেলে ম্যাট্রিক পাশ, তার একজন কেরানীর চাকরি করছে। বাকি একজন চাকরির চেষ্টায় আছে, হয়ত দু-চারদিনের মধ্যে সেও একটা কিছু পেয়ে যাবে।

বৃদ্ধ শ্যামলালের কাঁধে বিরাট জমিদারী। পরিবার, সমস্যা, চাষবাস, ক্ষেত-খামার, সব মিলিয়ে হাঁফিয়ে ওঠে শ্যামলাল। শিক্ষা-প্রসারের পরিণাম শেষ পর্যন্ত এই হল যে,

লেখাপড়া শিখে সবাই গ্রাম ছেড়ে যেতে লাগল। অনুন্নত জাতিরাও শিক্ষিত হয়েছে এখন, তবে এদের পরিণতি কি হবে, সে পরের কথা। কিন্তু প্রত্যেক উচ্চবর্ণের শিক্ষি পরিবারের একই পরিণাম—গ্রাম ছেড়ে শহরে যাও। এতদিন তারা জমির আ মালিককে ফাঁকি দিয়ে তাদের বঞ্চিত করে রেখেছিল—আজ তাই আসল মালিকের স্থা পাওনা বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে।

এখনও উঁচু-নীচু জাতের মধ্যে যে বিভেদটুকু বজায় আছে, আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সে বিভেদও আর থাকবে না। সকলে মিলে সমান হয়ে যাবে—সকলের পরিশ্রমলব্ধ ফসলের অন্ন সকলে গ্রহণ করবে মিলেমিশে হাসিমুখে।

